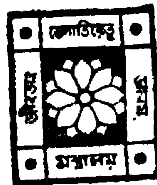
অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

ভক্ত বিবেকানন্দ . বিরেশ্বর বিবেকানন্দ (প্রথম)
রত্নাকর গিরিশ ও তৎসহ বিস্তৃত তথ্য পঞ্জী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত —



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol—VII)
(Collected writings of Achintyakumar Sengupta)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২

সম্পাদনা :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী
প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১/এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯
ও
দুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

সূচীপত্র

আলেখ্য-সূচী

জীবনী-সাহিত্য



ভক্ত বিবেকানন্দ

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম ॥

মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা

* * *

পূজনীয় অগ্রজ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীচরণেষু

১

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

'তিনটে স হয়েছে কেন ? শ—ষ—স ?' শ্রীরামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা।

'তুই লক্ষ্য করিসনি বাল্যকালে তোর মা তোর কানে একটি গূঢ়মন্ত্র দিয়েছেন —স, স, স—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। কী করছিস রে ? সহ্য করছি। সহ্য করাই তপস্যা করা।'

সহ্য করে কী হবে ?

স-এর পরে কী আছে ? হ। হয়ে ওঠ্। সইতে-সইতে হয়ে ওঠ্।

হে কাষ্ঠ, তুমি আগুন হয়ে ওঠো। হে দুগ্ধ, তুমি ঘৃত হয়ে ওঠো। হে সর্ষপ, তুমি তেল হয়ে ওঠো। তেমনি, হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরায়িত হয়ে ওঠো।

আমেরিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলছে, 'তুমি ঈশ্বরকে ব্যক্তিস্বরূপ বলে নিতে না পারো নিও না, তুমি ঈশ্বরকে আদর্শস্বরূপ বলে নাও। কিসের আদর্শ ? বৃহতের আদর্শ, মহতের আদর্শ, মধুরের আদর্শ। তুমিও কিয়ৎ-পরিমাণে বৃহৎ হয়ে ওঠো, মহৎ হয়ে ওঠো, মধুর হয়ে ওঠো। করার জন্যে করা নয়, হওয়ার জন্যে করা। হয়ে ওঠো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জল কোথাও ধানের শিষে শিশিরবিন্দু, কোথাও গোষ্পদ, কোথাও গেড়ে-ডোবা, কোথাও পুষ্করিণী, দিঘি, সরোবর, হ্রদ—কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র। তুমিও কিয়ৎপরিমাণে জল—শীতল হয়ে ওঠো।'

তাকিয়ে দেখ তার গোপন গিরিগৃহ থেকে ক্ষীণা জলধারা বেরিয়ে পড়েছে। জানে না কোথায় তার অম্বুনিধি। বিশ্বাস করেছে কোথাও আছে তার পরম পরিণতির আশ্বাস। পরিণত হওয়াই প্রাপ্ত হওয়া। তাই সে জলধারা নিজের ব্যাকুলতাকে গুরু করে নিরালা পথে বেরিয়ে পড়েছে—কোথায় পথ—'পথ আমাকে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।'

একটি বিপথগামিনী মেয়ে সারদামণির কাছে কেঁদে পড়ল। বললে, 'মা,

আমি পথ হারিয়েছি।' মমতার নির্ঝরিণী মা ঠাকরুন বললেন, 'মা, পথ কি কেউ হারায় ? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।'

পদে-পদে যেমন বিপদ পায়ে-পায়ে তেমনি উপায়। বিপথ বলে কিছু নেই। সমস্তই পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভাব যেমন পথ অভাবও তেমনি পথ। যেমন পথ বিশ্বাস তেমনি পথ সংশয়।'

উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে বহু বিস্তীর্ণ কাহিনী ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই জলধারা এগিয়ে চলেছে। শরবৎ তন্ময়। ক্রমে ক্রমে সেই জলধারা নির্ঝরিণী হয়েছে। নির্ঝরিণী বেগবিস্ফারিণী নদী হয়েছে। নদী পরিশেষে সমুদ্রে এসে মিলেছে, সমুদ্রকে পায়নি, সমুদ্রায়িত হয়ে উঠেছে। আমরাও তেমনি বৃহৎ হতে মহৎ হতে মধুর হতে চলেছি। ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। আমরা ব্রহ্ম হতে চলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া নয়, ঈশ্বর হয়ে ওঠা। ঈশ্বর কোনো পৃথক বস্তু নয়, বাড়িঘর চাকরিবাকরি নয়, বিষয়-আশয় নয় যে তাকে পেতে হবে। আমাদের মধ্যে রয়েছে যে বৃহতের সত্তা, যে ইয়ত্তাহীন পরিচ্ছেদ, যে ভূমা, যে ব্রহ্ম তাতে প্রকাশিত হওয়া। বীজের মধ্য থেকে পত্রপুষ্পফলাঢ্য বনস্পতিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলা।

'এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে। এই দেহমন ভূমানন্দময় হবে॥'

'কত তোকে সইতে হবে, কত তোকে বইতে হবে।' নরেন্দ্রনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'সহ্য করা ছাড়া তপস্যা কী। যত দুঃখকষ্ট আসবে, জানবি সমস্ত শরীরের, সমস্ত সংসারের। তুই থাকবি ঈশ্বর-আনন্দে ভরপুর। সমস্ত ধূমপঙ্কের ঊর্ধ্বে তুই বিশুদ্ধ নীলিমা, সর্বভাসক উপস্থিতি। দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

কিন্তু গোড়া থেকে নরেন্দ্রনাথের ঘোরতর সংশয় : 'ঈশ্বর কি আছেন ?'

অস্তি—ভাতি—প্রিয়। অস্তি আছেন, ঠিক-ঠিক বিদ্যমান আছেন। ভাতি—প্রকাশিত হয়ে আছেন। আর প্রিয়—আনন্দময় হয়ে আছেন। বহিরন্তশ্চ ভুতানাং। যেমন তিনি তোমার ভিতরে আছেন তেমনি আছেন আবার বাইরে। জ্ঞানীর কাছে তিনি বোধ, ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তি।

'কিন্তু তিনি যে আছেন তার প্রমাণ কী ?'

'তোর বাবা যে অমুক তার প্রমাণ কী ?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'কোনো প্রমাণ নেই। শুধু তুই তোর মাকে বিশ্বাস করে বাপকে চিনেছিস। তেমনি দ্যাখ, ব্রহ্মের

সঙ্গে ঘর করেছে এমন মা পাস কিনা। তেমন মা যদি পাস আর সে যদি চিনিয়ে দেয় ব্রহ্মকে, কেন মানবিনে ?'

তাই বলে অন্ধবিশ্বাস ?

হ্যাঁ, অন্ধবিশ্বাস। বিশ্বাসের আবার চোখ কী। তার সবটাই অন্ধ। হয় বল্ বিশ্বাস, নয় বল্ জ্ঞান। বিশ্বাস যত অন্ধ, যত নীরন্ধ্র, তত সে অপ্রতিরোধ্য, তত তার জোর বেশি। যত লোক গাড়ি চাপা পড়ে, পড়ে এখানে-ওখানে, উঠতে-নামতে, চকিত মুহূর্তের ভুলচুকে, সব চক্ষুষ্মান লোক। অন্ধ কি কখনো পড়ে ? অন্ধ পড়ে না। তাকে একজনে ধরে। তার হাত ধরে পার করিয়ে দেয়।

আমি হাতধরা লোক পাব কোথায় ? আমাকে কে ধরবে ?

'যার জন্যে অন্ধ হয়েছিস সে ধরবে ?'

কিছু সরাসরি মেনে নিতে চায়নি নরেন্দ্রনাথ। তর্ক করেছে, বিদ্রূপ করেছে। যুক্তিগ্রাহ্যতার মধ্যে বিষয়কে আনতে চেয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে ছুঁতে পারেনি, তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতেই মহাখুশি। নিশ্চয়ই মহাজনকে বাজিয়ে নিবি, যাচাই করে নিবি। 'সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে নিবি।' কিন্তু অনুভবটাও তো যুক্তি। সুখানুভব দুঃখানুভব—এ-সব তো সত্য বস্তু। তেমনি ঈশ্বরও অনুভবের জিনিস, উপলব্ধির জিনিস।

সে কি, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের জিনিস নয় ? তাঁকে চোখে দেখা যায় না ?

বা, যায় বৈকি। ভক্তের কাছে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁকে দেখবার জন্যেই তো এ দেহ। চক্ষুর এত পিপাসা। তাঁকে সম্ভোগ করবার জন্যেই তো এ জীবন। 'শরীর ধারণ হরির কারণ।' যে জ্ঞানী, বৈদান্তিক, ব্রহ্মানন্দী, তার আত্মদর্শন, তার সোঽহং, সে নিজেই ঈশ্বর। আর যে ভক্ত, সে দাসোঽহং, তার দর্শন ভেতরেও যেমন বাইরেও তেমনি। তার একবার 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী,' আরেকবার 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।'

শ্রীহরি যখন ধ্রুবকে দর্শন দিলেন, ধ্রুব বললে, তোমার এ সাক্ষাৎকারের কাছে কিসের ব্রহ্মানন্দ ? নির্বিশেষে ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ আর এ সবিশেষ স্বরূপদর্শনের সুখ সমুদ্রের সমতুল।

তোমাতে আমি নিমগ্ন হতে চাই না, বিলীন হতে চাই না। তোমাকে আমি দেখতে শুনতে ধরতে ছুঁতে চাই। তোমাকে নিয়ে আসতে চাই আমার অনুভবের সীমার মধ্যে, সচেতন সাধনায় একটি সানন্দসুন্দর যথার্থ মূর্তির মধ্যে। আমার

অল্পে সুখ নেই, অস্পষ্টে সুখ নেই, অগোচরে সুখ নেই। আমি চাই অবাধ দর্শন। অবারিত দর্শন। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়াও, তোমার সুধাদৃষ্টি আমার সমস্ত হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করে দিক। যেখানে বিরহবর্তিকা নিয়ে আমি একলা জেগে আছি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখচন্দ্রিকা হোক।

'বলি, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' বহু দরজায় ঘুরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এসে পড়ল।

'দেখিনি? যেকালে তিনি আছেন তাঁকে দেখব না? তবে চোখ দিয়েছেন কেন? তাঁর চোখের উপর রাখব না দু চোখ?'

'দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈ কি। তোকে যেমন দেখছি, যেমন দেখছি ঐ গাছ, মানুষ, দালান তেমনি করে দেখেছি। স্পষ্ট, সুন্দর, উজ্জ্বল।'

'আমাকে দেখাতে পারেন?'

'পারি বইকি। যা আমি দেখেছি তা তুইও দেখবি। আমাকে তিনি দেখা দিয়েছেন, তোকেও দেবেন। কেন দেবেন না? আমিও তাই এই বলে কাঁদতাম, মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কেন দেখা দিবিনে?'

বলে কী সাধু! দেখা যায়? আবার দেখানোও যায়? কী সুদৃঢ় সারল্যের সঙ্গে বলছে! কই নরেন্দ্রনাথ হেসে উড়িয়ে দিতে পারল কই? অপেক্ষা করতে লাগল।

'দিনের বেলায় তো তারা দেখতে পাও না তাই বলে কী বলবে তারা নেই?' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'যদি তারা দেখতে চাও তবে দিনান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। দুধের মধ্যে যে মাখন আছে তা কি দুধ দেখলে ঠাহর হয়? দুধকে আগে দধিতে ঘনীভূত করো, তারপর সূর্যোদয়ের আগে সে দধিকে মন্থন করো। তারপরে উদ্ধার করো সেই নিহিতকে।'

তোমার সুখদুঃখমন্থনধনকে।

যতক্ষণ এ দেহ ততক্ষণই সন্দেহ। সংশয়ই তো নিয়ে যাবে নির্ণয়ে। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকবে ততক্ষণ অবিশ্বাসও থাকবে। আর যখনই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু হবে, জানবে সেই হল আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা।

যে সন্দেহের নিরসনের জন্যে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সমীপস্থ হয়েছিল,

উত্তরকালে সেই সন্দেহেরই সম্মুখীন হয়েছে স্বামীজি। এবার সে জিজ্ঞাসু নয়, এবার সে উত্তরদাতা।

'ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কী?' দক্ষিণ-ভারতে স্বামীজিকে মুখোমুখি প্রশ্ন করল একজন।

'অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির থেকেই বলা যায় তিনি আছেন।' বললে স্বামীজি।

'অতীন্দ্রিয় কাকে বলে?'

'তৃতীয় চক্ষুকে বলে।'

'দুই চোখেই সামলানো যায় না, আবার তৃতীয় চক্ষু!' জিজ্ঞাসু পরিহাস করল। বললে, 'এই দু চোখে কী করে বুঝতে পারি তাই বলুন।'

'তা হলে চোখের লেন্‌স্‌ বদলাও।'

'লেন্‌স্‌ বদলাবো?'

'হ্যাঁ, গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নাও।' বললে স্বামীজি, 'এমনি শাদা চোখে দেখছ একটা সরল পাতা—কতটুকু দেখছ? স্বচ্ছ কাচের উপর সেই পাতাটি রেখে যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখ, দেখবে রূপের কত নিপুণ ও সূক্ষ্ম কারিকুরি। চোখে দেখা যায় না অথচ যা আছে তাই অতীন্দ্রিয়। চোখে ঠিক-ঠিক লেন্‌স্‌ লাগাও, দেখবে সেই কারিগরকে। নইলে যা তোমার মননচিন্তনের বাইরে তাকে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তির মধ্যে আনবে কী করে?'

'রিয়্যালিটির কথা বলুন।' প্রশ্নকর্তা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'রিয়্যালিটি?' স্বামীজি বললে শান্তস্বরে, 'যাকে রিয়্যালিটি বলছ তা হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বল্প মনের আচ্ছন্ন দৃষ্টি। চলন্ত ট্রেনে বসে দেখছ তীরের মত গাছ ছুটছে। কী, তাই দেখছ না? ঐ হচ্ছে তোমার রিয়্যালিটির চেহারা।'

'কিন্তু আপনি—আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?' খৃষ্টান কলেজের ছাত্র সুব্রহ্মণ আয়ার প্রশ্ন করে উঠল। 'দেখা যায় কখনো?'

এ সেই নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

স্বামীজি এত দিন পরে বললে, 'দেখা যায়। আমি দেখেছি।'

এ সেই শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর।

মনে পড়ে কী রকম আজগুবি মনে হত—বলে কিনা কালী হাঁটে চলে কথা কয়, নাকের নিচে প্রদীপ ধরলে সলতে কাঁপে, হাতে নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাওয়া যায়।

এ সংসারে এমন অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে ? এ নিশ্চয়ই চোখের ভুল, মাথার গোলমাল। যা হোক, রহস্য ধরে ফেলতে হবে। কোথায় কী যন্ত্র-তন্ত্র ইন্দ্রজাল আছে দেখব পরীক্ষা করে। কিন্তু কখন যাব ? যাব দুর্যোগের মধ্যরাত্রে। যখন ঠাকুর একা থাকবেন। যখন কেউ আসবে না ভিড় করতে।

নিজেই পরে আবার অলৌকিককে প্রতিষ্ঠিত করছে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকৃতির এ কাব্যই তো অলৌকিক। 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন জীর্যতি, ন মমার।' ঈশ্বরের কাব্য পুরোনো হয় না, অচল হয় না—প্রতিদিনের হয়েও চিরদিনের হয়ে থাকে। অলৌকিক আর কিছুই নয়, এমন একটা ঘটনা যার কারণটা সম্প্রতি অজ্ঞাত থেকে গেছে। যেই কারণটা জানা যাবে তখন আর সেটা অলৌকিক থাকবে না, বিজ্ঞান হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান কী বলে ? বলে, যা আপাতপ্রতীয়মান, যা অনুমানগ্রাহ্য তাই সত্য, যতক্ষণ না তুমি তার উলটোটা সাব্যস্ত করতে পারছ। নদীতে যদি জল বাড়ে সহজেই অনুমান করব কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। তুমি যদি বলো বৃষ্টির জন্যে নয় অন্য কারণে বেড়েছে, তোমাকেই সেই অন্যকারণ প্রমাণ করতে হবে। যদি ধোঁয়া দেখি, যুক্তিযুক্ত অনুমান করব, আগুন লেগেছে। তুমি যদি বলো ধোঁয়ার কারণ আগুন নয়, অন্য কিছু, সেই অন্য কিছুকে তোমাকেই স্থাপিত করতে হবে। এ সংসারে আমরা কী দেখি ? কোনো জিনিসই আপনা থেকে চলে না নড়ে না ছোটে না ঘোরে না, একজন বুদ্ধিমান চালক পিছন থেকে কল টেপে বা শক্তি জোগায় বলেই তা চলে নড়ে ঘোরে ছোটে। তাই যখন দেখি এ জগৎ সংসার চলছে ছুটছে ঘুরছে এগিয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি খাটিয়েই অনুমান করতে পারি এর একজন চালক আছে। এখন তুমি যদি উলটোটা বলো, না, চালক নয়, একটা নির্বুদ্ধি অন্ধশক্তিতেই সে চলছে, তা হলে তোমাকেই তা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রমাণের ভার আমার উপর নয়, তার বিপরীত অন্ধশক্তির প্রমাণের ভার তোমার উপর।

চালক ছাড়া চলমানতা নেই এটাই আমার সহজ বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বাড়বে। একটা চাঁদে পৌঁছে হয়তো দেখা যাবে আরো কত চাঁদ। আরো কত সৌরজগৎ।

বিবেকানন্দ বলছে, 'শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান মহত্তম বিস্ময়ই ঈশ্বর।'

তবু, আবার বলছে, 'আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ।

প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেটা সত্য কিনা। যদি কোনো ধর্মাচার্য বলে, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা পারবে কিনা সন্দেহ, তার কথা বিশ্বাস কোরো না। কিন্তু যে বলে তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারবে কেবল তার কথা বিশ্বাস করবে।'

ডেট্রয়টে ডিনারের শেষে কফি নিয়ে বসেছে স্বামীজি। অভ্যাগতদের সঙ্গে গল্প হচ্ছে। পেয়ালা তুলে চুমুক দিতে যাবে, দেখল তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া।

সেই ইঙ্গিতই তো যথেষ্ট ছিল। না, চোখের ভুল কিনা কিংবা কে জানে হয়তো মাথার গোলমাল, যাচাই করে দেখতে হবে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল. স্বামীজি—সত্যি ঠাকুর একেবারে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। চোখে মুখে উদ্বেগ—দুশ্চিন্তার মালিন্য।

'ও কফি খাসনে।' বললেন ঠাকুর, 'ওতে বিষ দিয়েছে।'

কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখল স্বামীজি, খেল না। বুঝল, ক্ষুদ্রাত্মা বিরুদ্ধবাদীদের কীর্তি।

প্রসন্ন হাসি হেসে ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, ঈশ্বরের স্বরূপ কী বলতে পারেন বুঝিয়ে?' আয়ার জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র।' স্বামীজি বললে, 'শক্তি—এনার্জি জিনিসটা কী বল তো বুঝিয়ে।'

আয়ার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দেখল এমন জিনিসও আছে যা বোঝা যায় অথচ বোঝানো যায় না।

'তুমি কুস্তি লড়তে পারো?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'পারি। লড়বেন?' আয়ার আস্তিন গুটোলো।

'এসো না।'

মুহূর্তে পরাস্ত হল আয়ার। কী দেখছ? লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাত-কঠিন স্নায়ু, না কি ব্যায়ামের কৌশল? আসল হচ্ছে, পেশী নয়, স্নায়ু নয়, নৈপুণ্য নয়—সমস্ত কিছুর অন্তরালে অদৃশ্য শক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ কী জানতে চাইছিলে না?

অল্পতার শেষসীমা পরমাণু, বৃহতের শেষসীমা আকাশ। তেমনি

জ্ঞানক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা জীবাণু বীজাণু, জ্ঞানক্রিয়াশক্তির আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

কে ঈশ্বর ?

যাঁর দ্বারা জন্ম স্থিতি ও লয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। যিনি অনন্ত শুদ্ধ নিত্যমুক্ত সর্বশক্তিমান। যিনি সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক অখণ্ড প্রেমস্বরূপ।

সেই প্রার্থিত দুর্যোগের মধ্যরাত্রি উপস্থিত হল। জলঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল নরেন্দ্রনাথ। আহিরিটোলার ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। ধরে ফেলব, কী করে, কী বলে, কী দেখে—সমস্ত রহস্য উন্মোচন করব।

নরেন এসেছে টের পেয়েছেন ঠাকুর। অন্তরে-অন্তরে অপর্যাপ্ত খুশি হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাইরে কাঠিন্য বজায় রেখে বলছেন, 'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন ?'

নরেন থমকে দাঁড়াল। সত্যিই তো আমি আসি কেন ? আমি বিশ্বনাথ দত্ত এটর্নির ছেলে, আমি ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার পড়া ফিলসফার—আমি কেন আসি ? কে কোথাকার এক গেঁয়ো মুখখু বামুন, কালী পেয়েছে কি না পেয়েছে তাতে আমার কী মাথাব্যথা ? আমি কেন আমার উত্তপ্ত সুখশয্যা ছেড়ে এই বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এসেছি এতদূর ?

'বল্ কেন আসিস ? আমাকে নিস না আমাকে মানিস না তবু আসিস কেন ?' ঠাকুর আবার গর্জে উঠলেন।

যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছে সেই প্রশ্নের সামনেই নরেনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঠাকুর। এবং সেই উত্তর সেদিন তাকে দিতে হল। বললে, 'আসি কেন ? আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

জীবনের এই শেষ উত্তর—ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে দরকার কেন ? মানুষকে ভালোবাসার জন্যে। যে ঈশ্বরকে ঠিক-ঠিক ভালোবাসে সে সমস্ত মানুষকে ভালোবাসে। মানুষকে মনে করে তার প্রভুর প্রতিভূ, তার মিত্রের মিত্র, তার নিজেরই আরেক প্রতিভাস। নয়ন তো নয়নকে দেখতে পায় না—কী করে দেখবে ? একটি দর্পণ নিয়ে এস। দর্পণ কোথায় পাব ? হে বন্ধু, তোমার দুটি নয়নই আমার দর্পণ। নয়নে-নয়নে নয়নানন্দকে নয়নাতীতকে নিরীক্ষণ করো।

মূলে জলসেচন করো, তাহলেই বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে। গোড়া ছেড়ে আর

সর্বত্র জল ঢাললে কোথায় তোমার পত্রশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো মূলকে ধরো শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেখানে সন্তোষ করলেই সকলে সন্তোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এক সাধে সব সাধে সব সাধে সব যায়।' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না।

লক্ষ শূন্যে যোগ করলেও শূন্য। এককে বসাও। বলছে স্বামীজি, সেই এককে না বসানো পর্যন্ত দশ হয় না, একশো হয় না, এক হাজার হয় না, লক্ষ-কোটি হয় না। সেই এককে নিয়েই সমস্ত। এককে বসালে, আর কিছু না হোক, অন্তত এক তো হবে।

সমস্ত শূন্যকে মূল্যবান করবার জন্যে অর্থান্বিত করবার জন্যে সেই এককে দরকার।

'খেতড়ির রাজপ্রাসাদে আমাকে কী দেবে? পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড, আমেরিকাই বা আমাকে কী দেবে?' পায়ে হেঁটে চলেছে স্বামীজি আর বলছে পদব্রজী সংগী সন্ন্যাসীদের! 'কী হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে বসনে-ভূষণে করণে-উপকরণে, স্তূপীভূত জড়ের জঞ্জালে? শুধু শূন্যের আস্ফালনে? যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাই না সম্মান চাই না সিংহাসন চাই না, সমস্ত ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।'

'কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।...দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেবলেছে সে হোম-হুতাশন।
শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।'

কাম-কাঞ্চন তোমাকে কতদূর নেবে? পাশের বাড়ি, পাশের গাঁ, পাশের শহর—আর ঈশ্বর? ঈশ্বর নেবে তোমাকে দিগন্তের সমস্ত সীমারেখাকে অতিক্রান্ত করে পৃথিবী ছাড়িয়ে। এই অমৃত-পথযাত্রার সম্প্রসারের জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার।

'ঈশ্বরকে ধরলে কী হয়? শিং বেরোয় না লেজ গজায়? কিছু হয় না। বুকটা মাঠ হয়ে যায়।'

একটা ঘরে কটা লোকের জায়গা হবে? একটা হল্-এই বা কটা লোকের? কিন্তু একটা মাঠ হলে? অঢেল অফুরন্ত মাঠ?

বুকটাকে মাঠ করবার জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার। অপরিমাণ প্রেমে প্রসারিত হবার জন্যেই দরকার ঈশ্বরকে।

'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন?'

'আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

ঠাকুর তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আর সকলে আসে স্বার্থের জন্যে। নরেন আসে আমাকে ভালোবাসে বলে।'

'তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসতে পারে যখন সে দেখতে পায় তার ভালোবাসার জিনিস কোনো ক্ষুদ্র মর্ত জীব নয়, খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নয়, স্বয়ং ভগবান।' বলছে স্বামীজি: 'স্ত্রী স্বামীকে আরো বেশি ভালোবাসবেন যদি তিনি ভাবেন স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিকতর ভালোবাসবেন যদি তিনি জানতে পারেন স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ! সেই মা-ও সন্তানদের বেশি ভালোবাসবেন যিনি তাদের ব্রহ্ম-স্বরূপ দেখবেন। সেই ব্যক্তি তার মহাশত্রুকেও ভালোবাসবে যে জানবে ঐ শত্রুও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ।'

এই বিরাটবিস্তার অনুভূতির জন্যেই ঈশ্বরকে দরকার।

'যা কিছু দেখছ, স্থাবর জঙ্গম, সমস্তই সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ।' আমেরিকাকে বলছে স্বামীজি, 'সেই চৈতন্যস্বরূপই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর। যা কিছু সৃষ্টি সবই প্রভুর পরিণাম—আরো যথার্থ বলতে গেলে, প্রভু স্বয়ং। তিনিই সূর্যে চন্দ্রে তারায় দীপ্তি পাচ্ছেন, দীপ্তি পাচ্ছেন অন্ধকারে, ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ আকাশে। তিনিই জননী ধরণী, তিনিই মহোদধি। তিনিই শীতল বৃষ্টি, স্নিগ্ধ আকাশ, আমাদের রক্তের মধ্যে শক্তি। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। যার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই বেদীও

তিনি, যে আলো দিয়ে আপনাদের মুখ দেখছি সেই আলোও তিনি। যিনি পরমাণু তিনিই ঈশ্বর। তিনিই সঙ্কুচিত হতে-হতে অণু, বিকশিত হতে-হতে আকাশ। তিনিই খণ্ডে-খণ্ডে অখণ্ড। জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই মানববুদ্ধি মানবযুক্তি পরিতৃপ্ত।

এই অপূর্ব বিশ্বপ্রাণতাবোধের জন্যে ঈশ্বরকে দরকার।

ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায়, না, বড় হয়ে ওঠে? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ভেবে মানুষ কি নিষ্ক্রিয় হয়, আলস্যের জড়পিণ্ড হয়, না তাঁর ইচ্ছা আমার জীবনে প্রস্ফুটিত করি, এই প্রয়াসে প্রেরিত হয় সর্বক্ষণ? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ? কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি? কে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা? সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন?

কিন্তু তোমার ঈশ্বর ক্ষুধার্তকে রুটি দিতে পারে? খাওয়াতে পারে নিরন্নকে? আমেরিকা স্বামীজির মুখের উপরে বিদ্রূপ করে উঠল।

'গান খাওয়াতে পারে? কবিতা খাওয়াতে পারে? যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখ তখন বলো, হে কাঞ্চনজঙ্ঘা, রুটি পাঠাও?' পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল স্বামীজি: 'ঈশ্বর এক অন্তহীন মহাসংগীত, এক মৃত্যুহীন মহাকাব্য, এক ক্ষয়হীন সৌন্দর্য-নিকেতন। জীবনের এত বড় সম্ভোগ এ আমি কিছুতেই পারি না ত্যাগ করতে।'

'ফাউ কি কেউ ছাড়ে?, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর আমাদের ফাউ। এক পয়সায় চারটে মুলো পাওয়া যায়, তার উপরে আরো দুটো ফাউ, কোনো বুদ্ধিমান লোক সেই ফাউ ছেড়ে দেয় না। যদিও দেয়, সংসার তাকে বোকা বলে। বলে, আর সকলে ছ-ছটা মুলো নিয়ে এল, আর তুমি এমন পণ্ডিত, ঠকে এলে, ছেড়ে দিয়ে এলে নিজের পাওনা? যাও, নিয়ে এস ফাউ। হায়, গিয়ে হয়তো দেখবে, দোকান উঠে গিয়েছে।'

আমরা এখানে কেউ ঠকতে আসিনি, ছাড়তে আসিনি, বোকা বনতে আসিনি, আসিনি দোকান বন্ধ দেখে ফিরে আসতে। সমস্ত প্রাপ্তির উর্ধ্বে ঈশ্বর এক মহত্তম উদ্বৃত্তি। তাতে আমার জন্মগত অধিকার। এ অধিকার আমি পারব না খোয়াতে। আমার যা হক, আমার যাতে স্বত্ব-স্বামিত্ব তা আমি নেব আদায় করে। নইলে আমি কিসের মানুষ? কিসের কী!

অশ্বিনী দত্ত বললে, 'আপনি মজার লোক।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি আমাকে ঠিক চিনেছ। আমি মজার লোক। যেহেতু ঈশ্বর একটা বড় মজা। বিনি পয়সার ভোজ। বিনি সাধনার ধন। এ ভোজ, এ ধন আমি ছাড়ি না।'

কোনো চতুর ব্যক্তিই ছাড়ে না। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

বলছেন, আমি তোকে ঈশ্বরকথা বলতাম না, কিন্তু তুই যে সুখ চেয়েছিস, শান্তি চেয়েছিস, স্থান চেয়েছিস, আশ্রয় চেয়েছিস—বল, চাসনি ? সুখ মানেই আরো সুখ। টাকা মানেই আরো টাকা। নামযশ মানে আরো নামযশ। শক্তি প্রতাপ মানে আরো শক্তি প্রতাপ। আরো আরো, আবার আরো, কেবল আরো। এক শৃঙ্গে উঠে আরেক শৃঙ্গে, তুঙ্গতর শৃঙ্গে, ওঠবার জন্যে লালসা। তুঙ্গতরে উঠে আবার উত্তুঙ্গতরের দিকে হাত বাড়ানো। অধিক থেকে অধিকতরের দিকে যেতে-যেতে—প্রতি পদক্ষেপে এই ইঙ্গিত করছি যে কোথাও না কোথাও আছে আমার অধিকতম। যার পরে আর আরো নেই। যা পেয়ে আর কিছু পাবার আছে বলে মনে হয় না। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। সেই অধিকতম, পরমতম, পরিপূর্ণ-তমের নাম দিবিনে ? তোর যা খুশি তুই নাম দে। আমি বলি ঈশ্বর।

'হ্যাঁ রে, ওরা কিছু আছে বলে মানে তো ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, নীতি বলে শক্তি বলে—'

'ঐ, ঐ, ঐই ঈশ্বর। শুধু চেহারার রকমফের।'

বিমূর্তে শক্তি, প্রমূর্তে শিবশঙ্কর।

'কিন্তু যাই বলুন, মূর্তিপূজা আমি বিশ্বাস করি না।' আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গলসিং বললেন স্বামীজিকে। 'আপনি করেন ?'

'করি।'

'কাঠ মাটি পেতল পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন ?'

'ভাবি।'

'আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কী উপায় হবে ?' মহারাজার কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর।

'কী আবার হবে। ভাববেন না।'

সহসা দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল স্বামীজি : 'এটা কার ফটো ?'

দেওয়ান এগিয়ে এল। বললে, 'মহারাজার।'

'ফটোটা নামান।' স্বামীজি আদেশ করল।

আদেশ পালন করল দেওয়ান। স্বামীজি তাকে এবার আরেক আদেশ করল, বললে, 'এটার উপর থুতু ফেলুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল দেওয়ান। স্বয়ং মহারাজাও নিস্পন্দ।

'থুতু ফেলুন। লাথি মারুন।' গর্জে উঠল স্বামীজি : 'কেন, কিসের কুণ্ঠা ? এ তো তুচ্ছ একটুকরো কাগজ। এতে থুতু ফেলতে আপত্তি কী!'

'এ কী বলছেন?' দেওয়ান মাথায় হাত দিয়ে বসল : 'এ যে মহারাজার প্রতিচ্ছবি।'

'তাতে কী? এ তো খানিকটা কালিমাখা কাগজ। এর মধ্যে মহারাজা কোথায়? এর মধ্যে প্রাণ কোথায়, রক্তমাংস কোথায়? এ তো অনড় জড় ছাড়া কিছু নয়। এতে থুতু ছিটোলে থুতু তো কাগজে পড়বে, মহারাজার গায়ে পড়বে না। কী, ফেলুন থুতু।'

শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেওওান।

স্বামীজি বললে, 'থুতু ফেলছেন না কেন তাও আমি বলে দিই। ফেলছেন না, যেহেতু এটা মহারাজার ছায়া, একে দেখলে মহারাজাকে মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলেই মহারাজাকেই অপমান করা হয়। তাই এ ছবি শুধু কালিমাখা তুচ্ছ কাগজ নয়, এ ছদ্মবেশী মহারাজ।'

মঙ্গলসিংকে লক্ষ্য করল স্বামীজি : 'এক অর্থে আপনি এতে নেই, অন্য অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিন্ন করা যায়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভক্ত সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা কি আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করি। আপনার সেবকেরা কি কাগজকে প্রণাম করে, কাগজের মাধ্যমে আপনাকেই প্রণাম করে।'

'কিন্তু তোমার ধর্ম যদি এতই ভালো, এতই উদার,' জিগগেস করল আমেরিকা, 'তবে তোমার দেশ এত দরিদ্র কেন, অধোগত কেন!'

'তাতে ধর্মের কী?' স্বামীজি বললে, 'তাই বলে আমার ধর্ম কি দরিদ্র, আমার ধর্ম কি অধোগত? কোথায় তুমি ছিলে হে আমেরিকা যখন আমরা বিশ্বের অধিবাসীদের অমৃতের পুত্র বলে প্রথম সম্ভাষণ করেছিলাম—'

'তবু, যাই বলো, অনবরত আধ্যাত্মিকতার পিছনে ছুটতে গিয়ে তোমরা পার্থিবতাকে হারিয়েছ। ফাঁকা ভবিষ্যৎকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়েছ বর্তমানকে। তোমাদের এই বুদ্ধি মানুষকে বাঁচতে শেখায়নি—'

'মরতে শিখিয়েছে।'

'কিন্তু, আমরা বর্তমান সম্বন্ধে নিশ্চিত।'

'তোমরা কোনো কিছুর সম্বন্ধেই নিশ্চিত নও।'

'কিন্তু যাই বলো, আদর্শ ধর্ম তাকেই বলব যা বাঁচতেও শেখায় মরতেও শেখায়—'

'ঠিক বলেছ,' সমর্থন করলো স্বামীজি : 'আমরা তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থিবতাকে মেলাতে চাচ্ছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা : খালি পেটে ধর্ম হয় না।

'ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা।' বলছে স্বামীজি, 'আমরা আজ চারযুগ ধরে কী করেছি ? ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। ওদের ওঠবার শক্তি আমাদেরই জোগাতে হবে প্রাণপণে। আমাদের ধর্মের দোষ নেই, দোষ আমাদের। ধর্ম ঠিক-ঠিক পালন না করবার দোষ।'

কিন্তু ধর্ম কি দারিদ্র্য মোচন করতে পারে ?

না, পারে না। কত কিছুই তো কত কিছু করতে পারে না। তলোয়ার দিয়েও তো দাড়ি কামানো যায় না। কলেজে ছাত্রদের নিয়ে দুরূহ কোনো বিজ্ঞানের ক্লাশ হচ্ছে, সেখানে ছোট একটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। বলছে, এখানে কি লজেনচুষ পাওয়া যাবে ? না, লজেনচুষ পাওয়া যাবে না। তোমারও সেই জাতীয় প্রশ্ন। না, বীণা দিয়ে ফসল ফলানো যাবে না। যার যেমন ওজন তাকে সেই আয়তনে বিচার করো। যা অনন্ত তাকে ক্ষণকালের নিক্তিতে মাপতে যেয়ো না।

ধর্ম অনেক কিছুই পারে না। না পারুক। কিন্তু একটা জিনিস পারে। হ্যাঁ, শুধু একটা জিনিস। স্বামীজি বললে, মানুষকে দেবতা করতে পারে। তাকে দিতে পারে অমৃতআনন্দময় বিপুল জীবনের অধিকার।

ডেট্রয়েটের মিসেস ফাঙ্কি বললে, 'স্বামীজিকে দেখে আর সন্দেহ থাকে না মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কেন ? সে শুধু ঈশ্বর পাওয়া ঈশ্বর হওয়ার জন্যে।'

সেই স্বামীজি ঠাকুরের কাছে এসেছিল অদ্ভুত প্রার্থনা নিয়ে : 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন।'

যখন ঠাকুর তাকে অষ্টসিদ্ধি দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তখন কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল নরেন। বললে, 'অষ্টসিদ্ধি দিয়ে আমার কী হবে? তা দিয়ে কি আমি ঈশ্বরদর্শন করতে পারব?'

'না, তা পারবিনে। তবে কিছু ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখাতে পারবি।'

'ম্যাজিক দেখিয়ে আমি কি করব? পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে কী লাভ যেখানে দু' পয়সায় খেয়ার নৌকোয় পার হওয়া যায়? সিদ্ধাইয়ের দাম দু' পয়সা। দু' পয়সার বাজার করতে আসিনি সংসারে।'

সেই ম্যাজিক দেখাতে বলছে আমেরিকা। বলছে, শুধু বক্তৃতাই দেবে, হাতে-কলমে কিছু করবে না? কিছু করে দেখাবে না? না দেখালে কী করে মানব তোমার ধর্ম জোরদার?

কী দেখাব?

একটা রোপট্রিক দেখাও। একটা দড়ি শূন্যে ছুড়ে দেবে সেটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা লোক তাই বেয়ে-বেয়ে উঠে যাবে উপরে এবং অবশেষে শূন্যে লীন হয়ে যাবে। হিন্দুমাত্রই তো শুনেছি জাদুকর, সেই একটা কিছু ভেলকিবাজি দেখাও।

ধর্ম মানে ভেলকিবাজি নয়, ধর্ম সহজ সরল সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, হাতসাফাইয়ের চালাকির উপর নয়। যে অজ্ঞানী সেই শুধু ভোজবাজির খোঁজ করে। যীশুখৃস্টকেও বলা হয়েছিল, ভেলকি দেখাও। যীশু বলেছিল, ভেলকিতেও তোমরা বিশ্বাস করবে না। যদি মৃত লোক কবর থেকে উঠে আসে, তোমরা তা মানবে না—বলবে, লোকটি আদৌ মরেনি।

ও-সব কথা শুনছি না। যদি ম্যাজিক না দেখাও তা হলে তোমাকে এই ঘরে বন্ধ করে রাখলাম। যদি ম্যাজিক দেখাতে রাজী হও তবেই দরজার তালা খুলে দেব।

মিসেস ব্যাগলির বাড়িতে তখন আছে স্বামীজি, বাড়ির এক কোণে ছোট পড়ার ঘরে তাকে আটকে রাখা হল। দরজায় তালা লাগানো হল। চুপচাপ বসে থাকো স্থাণু হয়ে, চলবে না বাইরে বেরুনো।

বাড়ির আরেক প্রান্তে বৈঠকখানায় বহু লোক সমবেত হয়েছে, চলছে বিচিত্র কথাবার্তা। হঠাৎ দেখা গেল তাদের মধ্যে স্বামীজি উপস্থিত।

সে কী ? তাকে দরজা খুলে দিল কে ? কে আবার খুলে দেবে, চাবি তো এই আমার পকেটে। তবে কি জানলার শিক বেঁকিয়ে বেরুলো ?

চলো, স্বচক্ষে দেখে আসি। গিয়ে দেখল ঘরের দরজা যেমন-কে-তেমন তালাবন্ধ। তালা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকল। দেখল যেমন-কে-তেমন স্বামীজি বসে আছে চেয়ারে। তন্ময় হয়ে বই পড়ছে।

এ-সব অতি তুচ্ছ জিনিস। অণিমা-লঘিমা-গরিমা-প্রাপ্তি। এ-সব দেখতে চেও না। যদি সত্যিই কিছু রূপান্তর দেখতে চাও দেখ এই বিবেকানন্দকে। কী করে এক সংশয়াচ্ছন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব-কণ্টকিত নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হল। গর্বে পর্বতায়মান অন্ধ অবিশ্বাস কি করে দাঁড়াল এসে ভক্তিতে বিশ্বাসে শরণাগতিতে।

'তোমার কিসের কী দয়াময় ?' নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তেড়ে এল : 'যেখানে এত দুঃখকষ্ট অত্যাচার নির্যাতন অনৈক্য বৈষম্য সেখানে কোথায় ঈশ্বর ? সব বুজরুকি, গাঁজাখুরি।'

অগাধ অমিয়দৃষ্টি, ঠাকুর শান্তস্বরে বললেন, কথা কোসনে। আকাশের দিকে তাকা।

একটি মহান সূক্ত। আকাশের দিকে তাকা। প্রতিনিয়ত তো মাটির দিকেই তাকিয়ে আছি, একবার আকাশের দিকে তাকাই।

আকাশের দিকে তাকালে কী দেখবি ? পরমাণুপুঞ্জের মত কোটি-কোটি নক্ষত্র। একেকটা তারা সূর্যের চেয়ে কোটি-কোটি গুণ বড়। সেই অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে তোর এই পৃথিবী কি ? সর্ষপপিণ্ড। একদানা সরষে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এক কণা ধুলো। সেই ধূলিকণার মধ্যে তুই। তোর হৃৎপিণ্ড, তোর মস্তিষ্ক, তোর বুদ্ধি, তোর ফুট গজ-কম্পাস ! কথা কোসনে। শুধু অহেতুকী কৃপা। তোর এই প্রাণকণা শুধু এক অহেতুকী কৃপা। সেই অহেতুকী কৃপার বিনিময়ে তাঁকে একটু অহেতুক অনুরাগ দিয়ে ফ্যাল। দিয়ে ফেলে দ্যাখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

তাই বলছি বিবেকানন্দকে দেখ। ফলেন পরিচীয়তে—ফলকে দেখ। ললাটে ঈশ্বরের নির্ভুল ঠিকানা লেখা এক জ্বলন্ত জীবন্ত পুরুষই বিবেকানন্দ।

'সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া ফোটাতে কেবা জানে।'

সেই বিবেকানন্দ—তখনো নরেন্দ্রনাথ—ঠাকুরকে গিয়ে বললে, 'আমাকে

সমাধিস্থ করে দিন। শুকদেবের মত আমি ব্রহ্মভূমিতে লীন হয়ে থাকব, কদিন পরে নেমে এসে আহার্য গ্রহণ করে আবার চলে যাব ব্রহ্মভূমিতে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন : 'ছি ছি, তুই এত বড় ছোট লোক, তোর এত ছোট নজর ? তুই তোর নিজের কাজ গুছিয়ে সরে পড়তে চাস ? সোঽহং মানে কি আমি একলা ? সোঽহং মানে আমরা সকলে। আমিছাড়া সকল নেই, সকলছাড়া আমি নেই। তুই একা নিজে রাজভোগ খাবি আর তোর বঞ্চিত পীড়িত ক্ষুধিত জনগণকে তার আস্বাদ দিয়ে যাবিনে ? প্রহ্লাদ কী বলেছিল ? বলেছিল, হে অচ্যুত, আমি একাকী মুক্ত হতে চাই না, আমার সংগী এই সব অসুর বালকেরা অত্যন্ত দীন অসমর্থ, এদের আমি ছাড়তে পারব না। তাই আমার সংগে এদেরকেও মুক্ত করুন। এক নিয়েই অনেক, অনেককে নিয়েই এক।'

'আমাকে কী করতে হবে ?'

'কাজ করতে হবে। অনেক—অনেক কাজ।'

'পারব না।'

'তোর ঘাড় পারবে।'

'কী কাজ ?'

'লোকশিক্ষা।'

'লোকশিক্ষা ?'

'হ্যাঁ, মানুষকে শেখাতে হবে, হে মানুষ, তুমি ক্ষুদ্র নও খর্ব নও অল্প নও হ্রস্ব নও, তুমি নিরতিশয় তুমি অপরিমেয়। তুমি অনৃতের নও, তুমি অমৃতের পুত্র। তুমি অনন্ত শক্তির আধার, তুমি দ্বিবাহু হয়েও মহাবাহু। তুমি কেবলমাত্র অন্নাধীন নও, তুমি আবার পরমান্নভোজী।'

প্রতি মানুষকে এই অভয়ের সংবাদ এনে দিতে হবে। বনের বেদান্তকে নিয়ে আসতে হবে ঘরে-ঘরে। ঘরে-ঘরে আমার পট পুজো হবে, মঠে-মন্দিরে নয়, ঘরে-ঘরে। মানুষ দীনহীন ভাগ্যের কার্পণ্যে বিড়ম্বিত নয়—সে তার অমোঘ মহিমা উদ্ঘাটিত করবার জন্যে উদয় দিগন্ত থেকে উদার দিগন্ত পর্যন্ত যাত্রা করেছে, তাকে দিতে হবে অক্ষয় পাথেয়। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে পুরুষ, সেই পুরুষই সে। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

তাই জীবে সেবা নয়, জীবে পুজা। বিবেকানন্দ বলেছে, সেবা বললে আমার ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হবে না। জীবে পুজা। নিরন্নকে অন্ন দাও, পীড়িতকে

শুশ্রূষা দাও, নিরালম্বকে আশ্রয় দাও। এ সেবা তো সেবা মাত্র, এ তো যে কোনো প্রতিষ্ঠানই করতে পারে, আর রাষ্ট্রই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই চলে যেতে পারে দারিদ্র্য। কিন্তু তার চেয়ে আরো একটা বড় সেবা আছে, যেটা পূজার পর্যায়ে। বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ সেবা, আর আধ্যাত্ম-বিদ্যাই বিদ্যার মধ্যে গরীয়সী। মানুষকে এই তত্ত্ব শেখাও যে মানুষ, তুমিই ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ। তুমিই একমাত্র অনন্তের আয়তন। জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

স্বামীজি বলেছে, এই সব মানুষ এই সব পশু, তোমার এই সব স্বদেশবাসী এরাই তোমার ঈশ্বর, এরাই তোমার প্রথম উপাস্য। যদি ঈশ্বরকে মানুষের মুখে না দেখতে পাও তবে তাকে মেঘে বা কোনো মৃত জড়ে বা তোমার নিজের মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কী করে দেখবে? মনুষ্যে ঈশ্বরোপাসনা এই বেদান্তের আদর্শ।

'অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি, ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। মূর্তিমান বেদান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতরে যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণজ্ঞান।'

যা রামকৃষ্ণ তাই বিবেকানন্দ। এ নয় যে একে অন্যের পরিপূরক। এ নয় যে বিবেকানন্দ জ্ঞান আর কর্ম আর রামকৃষ্ণ ভক্তি। কেউই আংশিক নয়, দুইই স্বসম্পূর্ণ। রামকৃষ্ণও জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি; বিবেকানন্দও জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি। রামকৃষ্ণ মন্ত্র, বিবেকানন্দ উচ্চারণ। রামকৃষ্ণ উৎস, বিবেকানন্দ উৎসার।

'কাঠে আগুন আছে এ জানলে কি ভাত রান্না হবে? হবে না। আগে কাঠের আগুনকে বার করো।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'কী করে করবে? আরেকটা কাঠ নিয়ে এস। বেগে ঘর্ষণ করো। আস্তে-আস্তে ঘষলে চলবে না। দ্রুত হও, দীপ্ত হও, দৃঢ় হও। বেগে ঘর্ষণ করে প্রসুপ্ত আগুনকে জাগ্রত করো। তারপর আগুন পেয়েই বা কী হবে? সে আগুনকে কাজে লাগাও। ভাতটা রান্না করো। রান্না করেই বা কী হবে? খাও, আস্বাদ করো। অন্নময় অমৃতময় হয়ে ওঠো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছেন, করেছেন, খেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই জ্ঞান কর্ম আর ভক্তির সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধেয়, বিবেকানন্দ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্নি, বিবেকানন্দ উদ্ভাসন।

কাঠের মুক্তি কাঠে। তেমনি তোমার মুক্তি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

নিরুদ্ধ বক্ষে করাঘাত করো। জাগো জাগো এবার প্রসুপ্ত বহ্নি। দৈদশীর্ণ শীতশুষ্ক শাখায় বাতাসের ব্যাকুলতা, জাগো এবার বনশোভনা পুষ্পমঞ্জরী। মুক্তি মানে বিমোচন নয়, মুক্তি মানে উন্মোচন।

কাশী শুধু জানা নয়, কাশী যাওয়া, পরে কাশী দেখা। কাশী সর্বপ্রকাশিকাকে সম্ভোগ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ, কিছু খেতে পাচ্ছেন না। নরেন্দ্রনাথ জোরজার করে তাঁকে মন্দিরে পাঠিয়েছে ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতে, যাতে তিনি খেতে পারেন।

'ওরে নিজের জন্যে মাকে কিছু বলতে পারি না।'

'তোমার নিজের জন্যে কে বলছে। আমাদের জন্যে বলবে।' বললে নরেন্দ্রনাথ, 'তোমার গলা দিয়ে কিছু নামছে না, কিছু খেতে পাচ্ছ না, এ কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না আমরা। আমাদের কষ্ট লাঘবের জন্যেই তুমি মাকে বলবে।'

প্রায় ঠেলেঠুলে মন্দিরে পাঠাল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে ঠাকুর ফিরে এলেন। নরেন্দ্রনাথ বললে, 'কী, কী, বলেছিলে মাকে ?'

'বলেছিলাম।'

'কী বললেন মা ?'

'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে। তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস। তোর নরেন খাচ্ছে বাবুরাম খাচ্ছে রাখাল খাচ্ছে—একি তোর খাওয়া নয় ?'

দেশ কাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে ফেললে সবই এক, এক অখণ্ড সত্তা এই অখণ্ডস্বরূপই ব্রহ্ম। বলছে স্বামীজি। আর এই ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের নেপথ্যে আছে বলে প্রতীত হয় তখন সে ঈশ্বর। ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ, সমগ্র ও অবিভক্ত। সকল হাতে সে কাজ করছে, সকল মুখে খাচ্ছে, সকল নাকে শ্বাস নিচ্ছে, সকল মনে চিন্তা করছে। সে অনন্তকে কেন খণ্ড-খণ্ড দেখাচ্ছে এ যদি প্রশ্ন করো তবে বলি এ একটা আপাতপ্রতীয়মানতা মাত্র। অনন্তের বিভাজন নেই। অতএব আমি-তুমি অংশ মাত্র এ ভাবনা সত্য নয়। আমিও সেই তুমিও সেই। এ জ্ঞানই জ্ঞান আর বাকি সব অজ্ঞান। 'এক জানার নাম জ্ঞান আর অনেক জানার নামই অজ্ঞান।'

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এ রাজার রাজত্বে।'

যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে রাজা কোথায়, রাজা কোথায়, বলে ছুটে

বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায়, সে কোনোদিন রাজার উদ্দেশ পাবে না, যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, তোমার এ খণ্ডতা সত্য নয়, তোমার এ বন্ধতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও তা হলে ঈশ্বর কোথাও নেই, কোথাও হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে তবে এ বলা পাপ আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।

তারপরে কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্বামীজি শোনাচ্ছে আমেরিকাকে : 'জীবনে একরাতি বিশ্রাম পাননি—চাননি। জীবনের প্রথমাংশ গেছে ধর্ম-উপার্জনে। আর শেষাংশ গেছে ধর্ম-বিতরণে। ঠিকই বলতেন, ভক্তের দুই লক্ষণ, এক রস-আস্বাদন আরেক রস-বিতরণ। দলে দলে লোক আসত তাঁর কথা শুনতে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তাদের কথামৃত বিতরণ করতেন। গলায় ঘা, শরীরের কষ্টকে কষ্ট বলেই মানতে চাইতেন না, যদি একটি মানুষেরও উপকারে আসতে পারি, তাকে দিতে পারি এক বিন্দু উপশম, বলছেন ঠাকুর, তাহলে হাজার হাজার শরীর আমি দিয়ে দিতে প্রস্তুত।'

আর স্বামীজি নিজে ? নিরবচ্ছিন্ন কর্ম আর সংগ্রামের প্রতিমূর্তি।

'চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র আর বজ্রের মত অটল। আমি লড়াইয়ে কখনো পেছপা হয়নি। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে, মিনমিনে ভিনমিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব, তুমি চিরকাল বলতে, এ বীর! আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। যা কখনো করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি তাই হবে ? হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হটে আসব ? হার তো অঙ্গের আভরণ, কিন্তু না লড়েই হারব ? মা আমায় মানুষ দিন, যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন তবে কাজ করব, তবে আবার আসব। নইলে জানলুম, মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত।'

'পুজা তার সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

কিন্তু জ্ঞান আর কর্ম দাঁড়াবে কোথায় ? দাঁড়াবে ভক্তিতে। ভালোবাসায়।

'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তাহলেই হয়ে গেল।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পথ কথা নয়, কথা হচ্ছে ভালোবাসা। কথা হচ্ছে একবার মন দিয়ে ফেলা। ঢেলে দেওয়া, বিকিয়ে দেওয়া, বিলিয়ে দেওয়া। নিজের জন্যে বিন্দুমাত্র না রাখা।

'ঝিনুক বালিকেই মুক্তো করে, তেমনি প্রেম মানুষকেই ঈশ্বর করে তোলে।' বলছে স্বামীজি : 'প্রেমের তিন কোণ। এক—প্রেম কিছু প্রার্থনা করে না, দুই—প্রেম ভয়শূন্য, তিন—প্রেম সবসময়েই আদর্শতমের উপাসনা। আর শুধু ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বর সন্নিহিত।'

জ্ঞান থেকে কর্ম, আর কর্ম থেকেই ভক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ অভেদ। একজন সূক্ত আরেকজন তার ভাষ্য। একজন শঙ্খ আরেকজন তার নির্ঘোষ।

'চল, একবার পণ্ডিতকে দেখে আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন নরেন্দ্রনাথকে।

কে পণ্ডিত ? শশধর তর্কচূড়ামণি।

তুমি মুখখু-সুখখু মানুষ, তোমার পণ্ডিতের কাছে যাবার সাহস কী !

তার জন্যেই তো তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছি। যদি তেমন কোনো কথা ওঠে তুই তর্ক করতে পারবি।

কিন্তু কী দরকার ?

ওরে গুণদর্শনই ব্রহ্মদর্শন। শশধরের ওখানে ঈশ্বর বিদ্যারূপে মেধারূপে পাণ্ডিত্যরূপে প্রকাশিত। যেখানে যতটুকু গুণবিকাশ সেইখানে ততটুকু ঈশ্বর-প্রকাশ। চল দেখে আসি, নমস্কার করে আসি।

চলুন। তর্কের আশায় উদ্যত নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুরকে চোখের সামনে আবির্ভূত দেখে শশধর তো অবাক।

কী ভাগ্য তুমি এসেছ। শশধর তার জামার বোতাম খুলে বুক অনাবৃত করল। বললে, ঠাকুর, জ্ঞানচর্চা করে করে আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে, একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?

ঠাকুর শশধরের রিক্ত-বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আর শশধর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।'

সমস্ত জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি তর্ক পাণ্ডিত্য বিগলিত হয়েছে ভক্তিতে। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।' পরমবেদ্যকে জানা নয়, পরমবেদ্যকে ভালোবাসতে জানার নামই বিদ্যা।

'প্রভু কহে বিদ্যামধ্যে কোন বিদ্যা সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর ॥'
'পড়ে কেন লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ॥'

'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।' শুধু ভক্তিতেই হবে। একমাত্র ভক্তিতেই ঈশ্বর বশংবদ। ভক্তির সাধনে কিছুই লাগে না, না জ্ঞান না বৈরাগ্য না অন্যতর অনুষঙ্গ। ভক্তি অন্যানিরপেক্ষ।

ঠাকুরের সে কী আনন্দ ! 'নরেন আমার মাকে মেনেছে।' সমস্ত রাত মায়ের গান গেয়েছে—'মা, ত্বং হি তারা, ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। তোমায় জানি গো দীনদয়াময়ী দুর্গমেতে দুঃখহরা।'

তাই অমরনাথে 'সোঽহং শিবোঽহং' বলে শেষ হল না, বিবেকানন্দ ক্ষীর-ভবানীতে এসে মা, মা, বলে কাঁদতে লাগল।

এই ভালোবাসাই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।' এই ভালোবাসাই 'কলসে কলসে ঢালি তবু না ফুরায়।'

'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই। সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অহেতুকী কৃপা, বদ্ধজীবের জন্যে সে প্রগাঢ় সহানুভূতি—এ জগতে আর দেখিনি।' চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ : 'তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেননি—আমার লক্ষ অপরাধ মার্জনা করেছেন—এত ভালোবাসা আমার মা-বাবাও বাসেনি। এ কবিত্ব নয়, অতিরঞ্জন নয়, এ কঠোর সত্য। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলে কেঁদে সারা হয়েছি—কেউই উত্তর দেয়নি কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার যাই হোন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জেনে নিজে ডেকে অপহরণ করেছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনো তিনি থাকেন আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা অহেতুকদয়াসিন্ধু, আমার এই বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।'

রামকৃষ্ণই পরিপূর্ণ প্রেম। এবং বিবেকানন্দও।

২

কর্মযোগী বিবেকানন্দ

পথিক পথের সন্ধানে বেরিয়েছে।

ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে তিন দিকেই পথ। অমুক গাঁয়ে যাব, কোন পথটা ধরি? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। একজন কাউকে জিগগেস করলে হয়।

দেখলে বুড়ো মতন একটা লোক তার বাড়ির দরজার গোড়ায় বসে আছে চুপচাপ। বেশ প্রাচীন লোক বলেই মনে হচ্ছে। পথের হদিস দিতে পারবে বোধ হয়।

পথিক জিগগেস করল, 'অমুক গাঁয়ে যাব কোন পথে? সে গাঁ এখান থেকে কতদূর?'

প্রশ্ন বুড়ো কানেও তুলল না।

পথিক আবার জিগগেস করল, 'বলুন না কোন পথে যাব?'

বুড়ো আগের মতই নীরব হয়ে রইল।

'সে কী, কানে শুনতে পান না নাকি? না কি-বোবা?' পথিক তিরস্কার করে উঠল।

তবুও বড়ো নির্বাক।

'এ তো এক অদ্ভুত লোক দেখছি। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না।' পথিক আবার মুখিয়ে উঠল: 'যদি না জানেন তাই বলুন। আর যদি জানেন একটু সাহায্য করতে দোষ কী।'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ উদাসীন।

অগত্যা পথিক নিজের বুদ্ধিতেই একটা পথ ধরে অগ্রসর হল।

যেই পথিক চলতে আরম্ভ করেছে অমনি সেই বৃদ্ধ তাকে ডাকতে সুরু করল চেঁচিয়ে: 'ও মশাই, শুনছেন? ও মশাই, শুনুন—'

এ তো মজা মন্দ নয়। পথিক ফিরল।

'আপনি অমুক গাঁয়ের কথা জিগগেস করছিলেন না? সে গাঁ-টা ওদিকে নয়, এদিকে।' বৃদ্ধ আরেক দিকের রাস্তা দেখিয়ে দিল: 'আর দূর কতটা? তা বেশি নয়, মাইল খানেক।'

পথিক রুখে উঠল: 'এতক্ষণ এত অনুরোধ-উপরোধ করছিলাম, একটা শব্দও তো করেননি, এখন জানাবার কী দরকার?'

বৃদ্ধ হাসল। বললে, 'যতক্ষণ জিগগেস করছিলেন, নিষ্ক্রিয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সাহায্য করিনি। এখন দেখছি নিজের বুদ্ধিতে হাঁটতে সুরু করেছেন, তাই জানিয়ে দিলাম।'

স্বামী বিবেকানন্দ তার মাদ্রাজী শিষ্য-বন্ধু আলাসিংগাকে লিখছে: 'আলাসিংগা, গল্পটা মনে রেখো। যে কাজ করে, যে কাজে লাগে তাকেই ভগবান পথ দেখান। যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে নয়।'

নিরন্তর চেষ্টা, নিরন্তর আগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। অতন্দ্র সূর্যের মত কাজ করা।

এগিয়ে যাও, শুধু এগিয়ে যাও। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকো ছেড়ে দাও।

এক কাঠুরে বন থেকে সরু সরু কাঠ কেটে এনে কোনো রকমে দুঃখেকষ্টে দিন কাটাত। একদিন পথে এক লোকের সংগে দেখা। কাঠুরেকে বললে, বাপু এগিয়ে যাও। পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল মোটা-মোটা কাঠের জংগল। সেদিন মোটা কাঠ কেটে এনে আগের চেয়ে বেশি পয়সা পেল। পরদিন ভাবল, এগিয়ে তো যেতে বলেছিল, আরো একটু এগিয়ে দেখি না কেন? এগিয়ে গিয়ে দেখল চন্দনের বন। কাঠুরেকে আর পায় কে? চন্দনের বন পাওয়া যাবে এ তার কল্পনার অতীত। চন্দনকাঠ বেচে-বেচে আণ্ডিল হয়ে গেল কাঠুরে। পরে আবার ভাবলে, থামি কেন? লোকটা তো এগিয়ে যেতে বলেছিল। আবার এগোলো কাঠুরে। দেখল তামার খনি। তামায়ও থামা নেই। আবার এগোলো। শেষে রুপো সোনা হীরে—তারপর শেষে দেউড়ি পেরিয়ে স্বয়ং রাজা।

'কাঠুরে, তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি মিটল না তোর জঠরজ্বালা॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে মেলে ধন দূর বনে গেলে রে কাঠুরে,
ও তুই, এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চ্যালা॥
আরো যদি যাস এগিয়ে, রজত-খনি দেখবি গিয়ে রে কাঠুরে,
ওরে, তারো ধারে সোনা হীরে মনি-মানিক-রত্ন মেলা॥
তোর নিজের মাঝে আছে সে বন যদি না পাস তার অন্বেষণ
রে কাঠুরে,
ধর ওরে রামকৃষ্ণচরণ, সেবন যার করেন কমলা॥'

'এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও।' বলছে বিবেকানন্দ, জীবনের অর্থই বৃদ্ধি অর্থাৎ বিস্তার। বিস্তার আর প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমেই জীবন আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালোবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরর মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।'

বিশ্রাম অর্থ কর্ম থেকে বিরতি নয়, কর্মান্তরগ্রহণ। কর্মেই আমাদের ছুটি। নদী ছুটি পায় স্রোতে, প্রবাহে, আগুন ছুটি পায় শিখায়, পুষ্পগন্ধ ছুটি পায় বাতাসে, বাতাসের বিস্তারে। তেমনি আমাদের ছুটি নিরবচ্ছিন্ন কর্মে, ফলাকাঙ্ক্ষা-হীন কর্মে, বিনিময়ের প্রত্যাশাবিহীন ভালোবাসায়।

'ক্রীতদাসের মত নয়, প্রভুর মত কাজ করো।' বলছে স্বামীজি। কর্মকে ত্যাগ করে নয়, কর্মের মধ্যে নিজেকে ত্যাগ করে। কর্মকে ফলের দিকে পাঠিয়ে নয়, ঈশ্বরের দিকে পাঠিয়ে। ঈশ্বরই পরম ফল। কর্ম-অর্পণই ব্রহ্মতর্পণ। যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

একটি মেয়ে সারদামণিকে প্রশ্ন করল, 'মা, কালীকে ফল দেব। ফল দিয়ে কী প্রার্থনা করব?'

সারদামণি বললেন, 'মাকে বলবে, মা, এই ফল নাও আর ফলের যে ফল, তাও নাও।'

'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণ সমীরে।—
জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরাখসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে
চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধু যামিনীরে॥'

এই চরম দেওয়ার জন্যে কর্ম করে যাওয়া। আর সেই চরম দেওয়া কাকে? আমার পরমতমকে।

আমার সেই পরমতম, আমার সেই ঈশ্বর কোথায়?

প্রহ্লাদকে তার বাবা হিরণ্যকশিপু জিগগেস করল, তোমার হরি কি এই স্তম্ভেও আছেন?

প্রহ্লাদ বললে, আছেন।

প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করল হিরণ্যকশিপু। স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল। নৃসিংহ বেরিয়ে এলেন। স্তম্ভ কী? দম্ভের স্তম্ভ এই দেহ। বেরুল কে। তুমিই বেরুলে সিংহরূপে। অর্থাৎ অহং বিচূর্ণ হলেই আত্মা আবির্ভূত হল। তুমি নৃসিংহ অহঙ্কারের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলে, যেই অহঙ্কার বিলুপ্ত হল অমনি তুমি তোমার মহৎস্বরূপে সিংহস্বরূপে প্রকাশিত হলে। সেই অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্যেই আঘাত। আর এই আঘাতই কর্ম। কঠিন কর্ম। নিষ্ঠুর, নির্বিরাম কর্ম।

ঈশ্বর কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ আরো সহজ করে সর্বব্যাপক করে বললেন। কোথায়? 'যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেইখানে।'

অর্থাৎ তুমি যে সংসারে যে পরিবেশে যে কর্মে নিয়োজিত আছ সেই সংসারে সেই পরিবেশে সেই কর্মে। জল কোথায় নেই? মাটির নিচে সর্বত্র জল, সুচির নীরনিবাস। খনন করো। খনন করে উদ্ধার করো তাপভঞ্জন তৃষ্ণার পানীয়। হলে হল, না হলে না হল, এই গয়ংগচ্ছ ভাব ত্যাগ করো—হতেই হবে। খুঁড়তে খুঁড়তে বালি বেরুল ছেড়ে দেওয়া চলবে না, পাথর বেরুল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আরো গভীরে যাও, আরো গহনে যাও, সেইখানেই রয়েছেন তোমার গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ। তাকে উদ্ধার করে জীবনে উৎকীর্ণ করে যেতে হবে।

ভূমি কী? দৃঢ় প্রত্যয়ই তোমার ভূমি। আর খননাস্ত্র কী? কর্মই খননাস্ত্র।

যেহেতু তুমি বীর যেহেতু তুমি বিবেকানন্দ সেইহেতু তোমার জন্যে রুক্ষ রুষ্ট প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ ভূমি নির্ধারিত হয়েছে। যোগ্য প্রত্যুত্তর দাও। মরুভূমির বিশুষ্ক বক্ষ থেকে টেনে আনো তৃষ্ণাহরণ জলধারা।

বিবেকানন্দ সেই প্রত্যুত্তর।

'নরেন আমার খানদানী চাষ, বারো বচ্ছর অজন্মা হলেও চাষ ছাড়ে না।'

লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পেছন ফিরে তাকানো নয়। বলছে স্বামীজি। লাঙলে হাত দিয়েও যে পেছন ফিরে তাকায় তার আর ফসল হয় কই?

'যদি বৃষ্টি না হয়, ফসল মারা যায়, তা হলে কী করবি?' বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল নরেন্দ্রনাথ: 'তা হলে কি চাষ ছেড়ে দিয়ে দোকান করবি?'

বন্ধুরা বললে, 'না, আরেকবার, আরো একবার চাষ করব।'

নরেন্দ্রনাথ বললে, 'সহস্রবার চাষ করব। যতক্ষণ পরাঙ্মুখ পাথরে অঙ্কুর না জাগছে ততক্ষণ চাষ ছাড়ব না।'

'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' পরমতমকে প্রাপ্ত হবার পর নিবৃত্ত হব। তার আগে নয়। তার আগে কদাচ নয়।

এই তোমার দুয়ারে আসন জমিয়ে বসলাম। উঠব না হটব না সরব না নড়ব না কিছুতেই। আর যাকে খুশি তুমি হটিয়ে দাও সরিয়ে দাও আমাকে পারবে না। আমি একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর-দুয়ার এক করে ছাড়ব।

এ ভঙ্গি বীরের ভঙ্গি, ভক্তের ভঙ্গি, শরণাগতের ভঙ্গি। আর শরণাগতি মানে নিষ্ক্রিয়ের মত বসে থাকা নয়, কুঁড়েমি নয়, 'বৈরিগ্যি' নয়—শরণাগতি মানে এগিয়ে গিয়ে ধরা, জোর করে রোক করে ধরা। উদ্দাম হয়ে ছোটা, নেই-আঁকড়ার মত ধরা, বিরক্ত করে আদায় করে নেওয়া—এই তিন কর্মেই পরা প্রাপ্তি।

ধার্মিকের লক্ষণই নিয়তকর্মশীলতা। কর্মপরায়ণ থাকাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা। কার্মিকই ধার্মিক।

পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না। মন্থন না করলে মাখন তোলা যায় না। জমি পাট করে না নিলে বপন-রোপণ ব্যর্থ হবে। গলা না সাধলে কোথায় সুরসংগম? আর হাত রাঙাবি, মেদি পাতা বাটতে হবে না?

আগে মেদি পাতা তোলো, জলে ভেজাও, তারপর তাকে ছেঁচ, বাটো, নিংড়োও, তারপরে হাত রাঙাও। তেমনি কর্ম দিয়ে জীবন রঙিন করো। কী করলাম সেটি প্রশ্ন নয়। করতে-করতে কী হলাম সেটি প্রশ্ন। মন্দিরে কটি দীপ জ্বাললাম সেটা প্রশ্ন নয়, নিজেও দীপ হয়ে জ্বললাম কিনা সেটা প্রশ্ন।

'মহারাজ, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

গিরিগোবর্ধনের দিকে যাচ্ছে স্বামীজি, পায়ে হেঁটে, খালি পায়ে। প্রতিজ্ঞা করেছে, কোথাও ভিক্ষে করবে না, থাকবে নিরাহারে। ঈশ্বরের করুণা চাইতে যাব কেন, যদি করুণা বলে কিছু থাকে তা আপনা থেকেই প্রতিমূর্ত হবে।

জঠরে দুঃসহ ক্ষুধা, দুই পায়ে গুরুভার ক্লান্তি, তবু এগিয়ে চলেছে স্বামীজি। থামব না, বসব না, হা-পিত্যেশ করব না। যখন মৃত্যু আসবে তখনই ক্ষান্ত হব। তার আগে নয়, কিছুতেই নয়।

'মহারাজ, আপনার জন্য খাবার এনেছি—' পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল।

এ মিথ্যা এ ভ্রম এ মরীচিকা। পেছন ফিরে তাকাল না স্বামীজি।

প্রখর রোদ ছিল এখন সুরু হল বৃষ্টি ! রোদ-বৃষ্টি সমান, শ্মশান-ভবন সমান, তৃণ-হিরণ্য সমান, শত্রু-মিত্র সমান। রোদে যখন হেঁটেছি বৃষ্টিতেও হাঁটব।

'মহারাজ, শুনুন, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

এ কী ছলনা ! এ কোন প্রলোভনের হাতছানি !

ক্রমশই সে-ডাক নিকটবর্তী হচ্ছে। তার মানে পেছনের লোক ছুটে আসছে তাঁকে ধরবার জন্যে। বটে ? স্বামীজিও ছুট দিল। পশ্চাৎ মৃত, পশ্চাৎ মিথ্যা। কিছুতেই প্রলুব্ধ হব না, পশ্চাৎপদ হব না।

শুধু ভগবানই ভক্তকে পরীক্ষায় ফেলে না। ভক্তও ভগবানকে পরীক্ষায় ফেলে। আর, ভগবানও শক্তের ভক্ত, নরমের যম। আর সবচেয়ে শক্ত কে ? ভক্তই শক্ত। কিছুতেই তার বিরতি-বিচ্যুতি নেই, স্খলন-পতন নেই।

ক্লান্তির দরুন বেশি দ্রুত ছুটতে পারল না স্বামীজি, পেছনের লোক তাকে ধরে ফেলল। ঈশ্বরের কৃপাশক্তি মানুষের শারীরশক্তিকে অভিভূত করল। মহারাজ, আপনার জন্যে খাবার এনেছি। বলে সেই লোক খাবারের পুঁটুলি খুলে ধরল।

কে তুমি ? কী করে জানলে আমি ক্ষুধার্ত ? এ খাবার কোত্থেকে সংগ্রহ করলে ? কে পাঠাল তোমার হাত দিয়ে ? প্রশ্নও করল না স্বামীজি : খেতে সুরু করে দিল। যদি এখনো কিছু প্রমাণ চাও এই তো প্রমাণ। বিজনে-প্রান্তরে এই আহার্যের আবির্ভাব।

বীরের মত এগিয়ে চলো, তা হলেই তোমার খাদ্য তোমার অমৃত এসে জুটবে।

'বীরের মত এগিয়ে চলুন,' নিউইয়র্ক থেকে ডাক্তার রাওকে লিখছেন স্বামীজি : 'সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হোন, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন। সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির বিশ্বাসভাজন হোন। এই জীবন ও ব্যক্তিগত চরিত্রই সমস্ত শক্তির উৎস।'

আর কর্ম—কর্মই উপাসনা।

রসকে মেথর দক্ষিণেশ্বরের চত্বর ও অঙ্গন ঝাঁট দেয়, নর্দমা পরিষ্কার করে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে জিগগেস করলে, 'ঠাকুর, আমার কি গতিমুক্তি হবে ?'

'কেন এ কথা জিগগেস করছিস ? কিসে তোর এ সন্দেহ ?'

'ঠাকুর, আমি হীন কর্ম করি—'

'হীন কর্ম ?' ঠাকুর বললেন, 'কর্ম কি কখনো হীন হয় ? কর্ম কর্ম। কর্মের কোনো বিশেষণ নেই। ঈশ্বর যাকে যা কাজ দিয়েছেন কর্তব্য দিয়েছেন তাই ঠিক-করে যেতে পারলেই গতি-মুক্তি। তুই কোথায় ? এ নারায়ণই মেথর সেজে নর্দমা সাফ করছে—ছলরূপী নারায়ণ—মেথর-নারায়ণ।'

এঞ্জিনের ছোট নাট বা বলটু—আসলে ছোট নয়, বিরাট এঞ্জিনকে চালাবার আয়োজনে তারও বৃহৎ অংশ আছে। সেই ছোট নাট বা বলটু খুলে নাও, সমস্ত এঞ্জিন বিকল হয়ে যাবে। এই জগৎনাট্যে আমিও যদি ঐ রকম নাট বা বলটু হই, আমিও হীন নই, অশ্রদ্ধেয় নই। আমিও এই নাট্যের সামগ্রিক সাফল্যে সার্থক অংশীদার। আমার 'পার্ট' যদি খারাপ হয় তাহলে সমস্ত নাটকই খারাপ হয়ে যায়।

আমাকে কাজে কে লাগিয়েছেন ? কে আমাকে পার্ট দিয়েছেন ? আমার সত্যিকার ওপরআলা কে ? সত্যিকার ওপরআলা ঈশ্বর। তিনিই একজনকে মুনিবের পার্ট দিয়েছেন আরেকজনকে চাকরের পার্ট। দুজনকেই সার্থক অভিনয় করে যেতে হবে। রঙ্গমঞ্চে কেউ কারু ছোট নয়। চাকরের পার্টেই মাতিয়ে দিতে হবে। কাউকে যদি মৃত সৈনিকের পার্ট দেওয়া হয়, তাকে স্ট্রেচারে করে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এলে তাকে থাকতে হবে মৃত সেজে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে। নইলে মৃত-সৈনিক যদি শুয়ে-শুয়ে শরীর কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে, সমস্ত নাটক ভণ্ডুল হয়ে যায়। আমি যদি এ জীবনে মৃত-সৈনিকের পার্টেই মনোনীত হয়ে থাকি তবে তাই আমি সুষ্ঠুভাবে, সুচারুরূপে করে যাব, নাটককে ভণ্ডুল হতে দেব না।

কোনো কাজই তুচ্ছ নয় ক্ষুদ্র নয় অকিঞ্চিৎ নয়, যদি এই বোধ আসে যে এই কাজের ভার যিনি দিয়েছেন তিনিই ভগবান। এই বোধ এই যুক্ততার চেতনাই কর্মের কৌশল।

যোগঃ কর্মসু কৌশলং। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাই যোগ। সিদ্ধিতে হর্ষ বা অসিদ্ধিতে বিষাদ দুইই ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে। এ সমচিত্ততা কার পক্ষে সম্ভব ? যে ফলাকাঙ্খা বর্জন করেছে তার পক্ষে।

'ভারতীয় যোগের কথা আমাদের কিছু বলবেন ?' আমেরিকার এক শহরে কতকগুলো কৃষি ও পশুপালন শেখা যুবক স্বামীজিকে তাদের ফার্মে নিমন্ত্রণ করল।

'বেশ, বলব।'

'ভারতীয় যোগটা কী বস্তু, এককথায় বুঝিয়ে দিতে পারেন ?'

'পারি।'

'কী ?'

'নির্বিচলতা। সর্ব অবস্থায় অনুদ্বিগ্ন থাকা।'

'বেশ, যাবেন বলতে।'

নির্ধারিত দিনে একটা খোলা মাঠে একটা পিপের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজি বক্তৃতা সুরু করলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের দল শুনছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলি ছোকরা স্বামীজির দিকে গুলি ছুড়তে সুরু করল। দেখো গুলি যেন গায়ে না লাগে, শুধু এ পাশ ও পাশ দিয়ে চলে যাক। দেখি একবার তার কর্মের কৌশল, কেমন সে নির্বিচল থাকে।

কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে যেতে লাগল গুলি, একচুল নড়ল না স্বামীজি। একবিন্দু চাঞ্চল্য বা কৌতূহল দেখাল না। থামল না এক নিঃশ্বাস। ভয় নেই চিন্তা নেই বিক্ষেপ নেই বিক্ষোভ নেই, নিজের কর্তব্য নিজের বক্তব্য শেষ করলে।

'কাউকে ছোট কিছু করতে হচ্ছে বলে যদি সে অভিযোগ করে,' বলছে স্বামীজি, 'তবে সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযোগ করবে। সর্বক্ষণ অসন্তোষ আর অভিযোগ এতেই জীবন দুঃখময় হয়ে উঠবে আর সমস্ত কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। যাই কর্তব্য হোক, সেই কর্তব্যে যে নিয়ত অবিচল থেকে অগ্রসর হতে পারে, সেই আলোকের সন্ধান পায়, উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্তব্যে তার ডাক পড়ে।'

একটি গৃহস্থ মেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছে। অভিযোগের সুরে বললে, 'আমি কিছু করি না, আমার কী হবে ?'

'কর না মানে ? কী কর না ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'পুজো-আচ্চা করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, মন্ত্র নেই, দীক্ষা নেই, সাধন-ভজন নেই—কিছুই করি না—'

'কিন্তু কর-টা কী ?'

'হাতাখুন্তি নাড়ি।'

'হাতাখুন্তি নাড়ো ? তুমি তো তা হলে বিরাট সাধন করছ।'

'বিরাট সাধন ?'

'হ্যাঁ, তুমি হাতাখুন্তি নেড়ে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করছ। সেই অন্নব্যঞ্জনে তুমি তোমার নারায়ণরূপী স্বামী, গোপালরূপী পুত্র, গৌরীরূপিণী কন্যার সেবা

করছ। আর সেই রান্নায় এমন এক মশলা এনে মেশাচ্ছ যা বেনের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না—তা হচ্ছে তোমার পরিজনদের প্রতি অনুরাগ—মঙ্গলেচ্ছা। তুমি সাধন করছ না? সার্থক সাধন করছ।'

তোমার কর্মে এই মহৎ ভাবনাটি যুক্ত করো। তোমার সমস্ত কাজই পুজো হয়ে যাবে।

কী করছিস রে? অফিসে কলম পিষছি। কে বলে? কালীনাম দুর্গানাম লিখছিস।

তা ছাড়া আবার কী! তিন আঙুলে যে কলম ধরেছিস এটা শুধু কলম ধরা নয়, এটা পুজোর মুদ্রা-রচনা। আর লেজারে যে আঁক আঁকছিস, কে বলবে এ চামুণ্ডা-বগলার মূর্তি নয়?

কর্ম আর ধর্ম। কর্মের বানান ক দিয়ে ধর্মের বানান ধ দিয়ে। এটুকু যা তফাৎ, বাকিটা সমান। যতক্ষণ ক-এর আঁকড়িটা নিচের দিকে স্বার্থের দিকে আছে ততক্ষণ সেটা কর্ম। যেই আঁকড়িটা ঊর্ধ্বে তুলে দেবে, ঈশ্বরের দিকে তখনই কর্ম ধর্ম হয়ে যাবে।

'আমি শুধু এক ধর্ম মানি। বলছে স্বামীজি, 'সে ধর্মের নাম পরোপকার।'

পর, উপ, আর কার। পর মানে পরম, মানে ঈশ্বর। উপ মানে সমীপস্থ হওয়া। উপাসনা মানে কাছে গিয়ে বসা, উপবাস মানে কাছে গিয়ে বাস করা। আর কার মানে কার্য। এমন একটা কার্য যা তোমাকে ঈশ্বরের সমীপস্থ করে দেবে।

'মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ার পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। পরোপকারের জন্যেই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যেই সমুদয় ত্যাগ করবেন। তোমার ভালো করলেই আমার ভালো হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে, আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব, আর কিছু নয়, শুধু কাজে লেগে যা।'

পরোপকারে কার উপকার? নিজের উপকার। কোনো স্বার্থ নেই আসক্তি নেই ফলাশা নেই, শুধু পরের জন্যে কাজ করে যাওয়া, এ তো জীবনের পরম সুযোগ ও পরম সৌভাগ্য। স্বামীজি বলছে, 'পরোপকার আমাদের জীবনে এক আশীর্বাদস্বরূপ।'

'আমাদের কৃত উপকারের জন্যে কেন আমরা প্রতিদান আশা করব? যাকে

সাহায্য করছ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করো। মানুষকে সাহায্য করে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করতে পারলেই আর দুঃখ নেই অশান্তি নেই।'

'যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদ হোক যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই তাতে থাকুক, যতক্ষণ তা মত বা পুস্তকে আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি ধর্ম নাম দিই না। চোখ আমাদের পিঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সামনে অগ্রসর হও, আর যে ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গৌরব করো তার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত করো—ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।'

'যথার্থ ভালোবাসা কখনো নিষ্ফল হয় না। একদিন সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস? তা হলে ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাচ্ছ জিগগেস করি। দরিদ্র দুঃখী দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করে কেন কূপ খনন করছ? প্রিয় বৎস আলাসিঙ্গা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি। দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্যে নরকে যেতেও প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি।'

তাই বিবেকানন্দ ডাক দিল: গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাবা নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যা।

কাজ না করে উপায় কী? অকর্মকৃৎ হয়ে কে থাকতে পারবে? কর্মহীন হলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে কাজ করো। অন্যতর কাজই বন্ধনের কারণ। যে অনাসক্ত সেই পরমপদ লাভ করে।

গীতায় অর্জুনকে কী বলছেন কৃষ্ণ? বলছেন, স্বর্গমর্ত্যপাতালে তিন লোক আমার কোনো কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্তও কিছু নেই, প্রাপ্তব্যও কিছু নেই, তবু আমি অতন্দ্রিত কাজ করে চলেছি, শুধু লোকহিতের জন্যে। সূর্য হয়ে আলো দিচ্ছি, আগুন হয়ে তাপ দিচ্ছি, মাটি হয়ে শস্য দিচ্ছি, মেঘ হয়ে জল দিচ্ছি। কর্মে আমার অবকাশ নেই, আলস্য নেই। আমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি তা হলে

আমার দৃষ্টান্ত দেখে মানুষও কর্মত্যাগ করে বসে থাকবে। সৃষ্টি উচ্ছন্নে যাবে। তুমি অলস হয়ে থেকো না, আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাভিসন্ধি-রহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ করো।

আগে শক্তিমান হও, পরে শান্তির কথা বোলো। বুদ্ধই সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু যে ভিক্ষুক সে কী ত্যাগ করবে? যদি অশুভের প্রতিকারের শক্তি না থাকে তা হলে তোমার সেই অক্ষমতাকে প্রেম বোলো না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টাশূন্য থাকো তা হলে বুঝতে পারি তুমি উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয়েছ। এই আদর্শে পেঁছিবার আগে মানুষের কর্তব্য অশুভকে প্রতিরোধ করতে শেখা। অন্যায়ের প্রতিকার করেই অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তি আয়ত্ত করা যায়। তাই স্বামীজি বলছে, কাজ করো, সংগ্রাম করো, যতদূর সম্ভব মহোদ্যমে আঘাত করো। প্রতিকারের শক্তি যার নেই তার কিসের ক্ষমা, কিসের অপ্রতিকারধর্ম।

'ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কী করতে হবে? কী উপায়ে আমি মুক্ত হব?' একজন জিগগেস করল স্বামীজিকে।

লোকটাকে স্বামীজি চিনত। অত্যন্ত অলস, অজ্ঞ, নির্বোধ, পশুবৎ জীবন যাপন করছে। স্তূপীকৃত নিষ্ক্রিয়তা।

স্বামীজি তাকে প্রশ্ন করল: 'তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো?'

'না। তা পারি না।'

'তবে তোমাকে মিথ্যে বলতে শিখতে হবে।' বললে স্বামীজি, 'একটা পশুর মত বা কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবন যাপন করার চেয়ে মিথ্যে কথা বলা ভালো। তুমি অকর্মণ্য। কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করে, যা কিনা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি তার ধারে-কাছেও নেই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে একটা অন্যায় কাজও করতে পার না।'

কিছু একটা করো। হাতের কাছে সমূহ যে কর্তব্য আছে তাই সম্পাদন করো। তাতেই ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় হবে। ক্রমশ অগ্রসর, ক্রমশ শক্তিধর। কেউই আমরা নিঃসম্বল নই, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কর্ম আছে, তাই ফুটিয়ে করো। তাতেই প্রসুপ্ত শক্তির বিকাশ হবে। 'ধীরে ধীরে মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়।' বলছে স্বামীজি, 'ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পড়তে হয়। তারপর একদিন এককণা অগ্নি। তারপরেই সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দুই যোগ আছে, কর্মযোগ আর মনোযোগ। মনটি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে কাজটি করো।

কারু কারু ক্ষেত্রে কর্মদ্বারাই সিদ্ধি। তার কৌশল কী? সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করো। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করো। কর্তৃত্বের অভিমানও দূর করে দাও। যে জীব প্রকৃতির বশীভূত সে কাঁচা-আমি, আপাত-আমি, সে মনে করে আমিই করছি, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সবই আমার, আমিই কর্তা। কিন্তু মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের উপরে যিনি আছেন তিনিই পাকা আমি, প্রকৃত আত্মা। পাকা-আমির জ্ঞানের দ্বারা কাঁচা-আমিকে দূরীভূত করো। নিজেই নিজেকে স্থির করো। তা হলেই কামনা-কলুষ থাকবে না। সকল অনর্থের অবসান হবে।

'কোনো আপস চলবে না। আদর্শকে কার্যে পরিণত করতেই হবে।' বলছে স্বামীজি : 'ত্যাগ করো, ত্যাগ ছাড়া কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বার করতে হবে, সেই রক্তসিক্ত হৃদয় উৎসর্গ করতে হবে বেদীমূলে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। মহৎ কার্যে বিরাট মূল্য দিতে হয়—সে কী বেদনা, কী যন্ত্রণা, প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ!'

কিন্তু উপায় নেই, এই জীবনের অভিজ্ঞতা। যদি তুমি সত্যিই পরহিত চাও, যদি সত্যিই তুমি আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ হও, বিশ্বজগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারবে না, ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যে জাগ্রত থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি গুঁড়ো করে দেবে।

দশ বছর কোনো আশার আলো দেখে নি। কখনো রাত নয়টায় এক বেলা আহার কখনো বা ভোরে আটটায়—তাও আবার তিন দিন পরে—আর, সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। ভিখিরিকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? শুধু একবেলা আহারের জন্যে বেশির ভাগ সময় পায়ে হেঁটে তুষারশৃঙ্গ ডিঙিয়ে কখনো দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করে চলেছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খাম্বিরা দেয় না। কখনো কখনো এই খাম্বিরা না দেওয়া রুটি বিশ ত্রিশ দিন ধরে সঞ্চিত রাখা হয়, তখন তা ইঁটের চেয়েও শক্ত হয়ে ওঠে। এই ইঁটের মত শক্ত রুটি চিবোতে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত। নদী হতে জল এনে একটি পাত্রে ঐ রুটি ভিজিয়ে রাখতাম। মাসের পর মাস থাকতে হয়েছে এ ভাবে। তবু থামিনি, দমিনি, সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়িয়েছি।

সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা ল্যভালাভৌ জয়াজয়ৌ। সুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয়-

পরাজয় সব সমান করে দাও। শুধু যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকাই জয়ে প্রস্তুত থাকা। সেবিতেব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥ যে গাছের ফল ও ছায়া আছে তারই আশ্রয় নিতে হয়। ফল যদি নাই বা পাওয়া যায়, ছায়া থেকে তো কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। সুতরাং সার কথা, বড় আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যেই কাজ করা উচিত। ফল কী জানি না, প্রচেষ্টা তো মহৎ ছিল!

কপর্দকহীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙছে। সঙ্গে এক বৃদ্ধ সাধু। সে সকাতরে বললে, 'আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

কয়েকশো মাইল দুর্গম পথ তখনো পড়ে আছে সামনে। বৃদ্ধের মুখে সকরুণ জিজ্ঞাসা: 'এই দীর্ঘপথ কী করে অতিক্রম করব?'

স্বামীজি বললে, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।'

কী জানি কী, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পায়ের দিকে তাকান।

স্বামীজি বললে, 'আপনার পায়ের নিচে যে পথ পড়ে আছে তা আপনি অতিক্রম করে এসেছেন, আর সামনে যে পথ দেখছেন সে ঐ একই পথ। সে পথও শিগগির আপনার পায়ের নিচে আসবে।'

পথে বেরিয়ে আর ফিরে যাওয়া নয়। প্রাপ্তি শুধু পথের অন্তে নয়, পথের প্রান্তে। পথের শেষে নয় পথের আশে-পাশে। সচল হওয়াই সফল হওয়া।

'কার্য কার্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কী? ফিলসফি, যোগ তপ, ঠাকুরঘর আলোচাল কলামুলো এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম—পরোপকারই এর সার্বজনীন মহাব্রত। শুধু নেগেটিভ ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না—তাতে আসে যায় কী? তুমিও চুরি করো না, মিথ্যে কথা বলো না, ব্যভিচার করো না, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা বাজাও—'মধু, তা কার কী?'

শুধু কাজ করে চলো। কর্মেই চিত্তের বিশুদ্ধতা। কর্মেই প্রেমের প্রসারণ। শুধু পরবর্তী ঢেউয়ের জন্যে অপেক্ষা করো। পেলেও ছেড়ো না, পাবার জন্যে ব্যস্তও হয়ো না। ভগবান স্বেচ্ছায় যা পাঠান তার জন্যে অপেক্ষা করো। কর্মেই শরণাগতি। শুধু কাজে লাগো, দূরে করে দাও ইহলোক ও পরলোকের ভোগের বাসনা, আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও আর লোকদের ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। বলছে স্বামীজি, ঠাকুরঘর মন্দ নয় তবে ঐটিই

সর্বস্ব করে ফেলার ঝোঁকের জন্যেই আমার ভয়। আসলে অন্তরাত্মা কাজ চায়, পায় না বলেই ঘণ্টা নেড়ে শক্তি খরচ করে। ধর্মকে কর্মমুখর করে তোলো। মুক্তির যে স্ফূর্তি তা শুধু কর্মেই মূর্তি ধরে আছে। সৎকর্মকারীর কখনো দুর্গতি হয় না—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। বাইরে বৈফল্য এলেও অন্তরে একটি অমোঘ সন্তোষের পবিত্র স্পর্শ লেগে থাকবে, তাতেই আবার নবতর কর্মের উদ্বোধন হবে। কর্মই হচ্ছে জীবনভোর ঈশ্বরের জয়ধ্বনি।

নিয়তকর্মশীল ঈশ্বর যার চোখেব সামনে, সে কী করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে। কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। তার শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে। শুধু বসে থেকে ভোগ করবার জন্যে নয়, কাজ করতে করতে উদ্ঘাটিত হবার জন্যে। কর্মই হচ্ছে জীবনের আনন্দিত ক্রন্দন। ক্রন্দন, কেননা জীবনের ছোট-বড় সমস্ত কাজে, বাক্যে-চিন্তায়-ব্যবহারে পরিপূর্ণ করে পরমতমকে প্রকাশ করতে পারছি না আর আনন্দ, কেননা এই প্রকাশের প্রয়াসেই আমি চিরপ্রেরিত, অনন্তের কাছেই আমি চিরন্তন আত্মনিবেদন করে আছি।

ফরাসিনী গায়িকা মাদাম কালভেকে বলছে স্বামীজি, আমি আমার ব্যক্তিত্বের বিনাশ চাই না, চাই না আত্মচেতনার বিলুপ্তি। লাখ লাখ বার লোকসংসারে জন্ম নিতে চাই। পৃথিবীকে নিয়ে যেতে চাই এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে, সর্বানন্দ প্রদাতা ঈশ্বরে।

জানো আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। আকাশবাসী ছোট্ট বারিকণা, কিন্তু আমি আকাশেই বসবাস করব না। ঝরে পড়ব। হ্যাঁ, ঝরে পড়ব। কিন্তু সমুদ্রে নয়, যেহেতু জলে পড়ে জলে লীন হয়ে যাবার আমার ইচ্ছে নেই। না, নেই। আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, সমাপ্তি চাই না। আমি মাটিতে ঝরে পড়ব, বিশুষ্ক মলিন মাটিতে। ধুয়ে নেব এককণা ধূলি, মুছে দেব একবিন্দু পিপাসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কাটবে। আর মনের ময়লা কাটলেই তিনি দেখা দেবেন।

শুধু অভাবের তাড়নায় নয়, স্বভাবের পরিতৃপ্তির জন্যে কাজ করো। জৈবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটলেও অভাব মেটে কই? কোনো পার্থিব প্রাপ্তিতেই আমাদের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না—সে আরো চায় আরো খোঁজে। কোনো এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে পড়তে রাজী নয়, যত বড়ই জমকালো হোক, সে তার বর্তমানের পিঞ্জরে বন্দী থাকতে চায় না, যা সে হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারার জন্যে সে

আবার প্রসারিত হয়। কর্মই তার সেই প্রসার-শাখা, প্রসার-স্রোত। সেই স্রোতেই তার অনেক দুঃখ ও শোক, গ্লানি ও বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই স্রোতেই তাকে শক্তিতে বীর্যে মহানন্দময় জীবন-উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত করে।

'এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে
যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।
যদি আলস ভরে . আমি বসি পথের পরে
ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে
যেন সকল পথই আছে বাকি সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥'

'অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ির ইঞ্জিন, তারাও জড়—চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়।' বলছে স্বামীজি, 'কিন্তু ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণু, রেলের গাড়ির পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সরে গেল, ও চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নেই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করতে চায় না। কীট নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বর ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা তাই তিনি সর্বোচ্চ।'

আমি বলি বন্ধন খোলো, জীবের বন্ধন খোলো। যতদূর পার খোলো। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধন দিয়ে কি বন্ধন কাটে? তুমি পরহিত করবে কেন? শুধু নিজের হিতের জন্যে। সমাজের জন্যে যখন নিজের সমস্ত শুভেচ্ছা বলি দিতে পারবে তখনই তুমি বুদ্ধ হবে, মুক্ত হবে। সে অনেক দূর। জগৎপ্রেম অনেক দূর। তবু বীজটিকে চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষ ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে ত্যাগ হবে কী? সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে। আসবে আশাহীনতা অহঙ্কারহীনতা নিষ্কাম-অনাময়।

কোনো চিন্তা নেই. বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় ঘা লাগলেই তবে সে ফণা ধরে। বলেছে স্বামীজি, যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, তখনই এ মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য থেকে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনো না ফেলে ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন। কাঁদতে ভয় পাও কেন। কাঁদলেই চোখ সাফ হয়, অন্তর্দৃষ্টি খোলে, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এক হাতে কাজ করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। যখন কাজ ফুরোবে তখন দুহাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

স্বামীজিরও সেই কথা : কে তোমার সহগামী হল বা না হল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না। শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখনো ভুল না হয়।

কিন্তু শুধু কর্মযোগের ঔদ্ধত্যে কী হবে। হবে না। কৃপা আকর্ষণ করতে হবে। 'মামনুস্মর, যুধ্য চ।' শুধু স্মরণমননেই হবে না, যুদ্ধ চাই। শুধু যুদ্ধেই হবে না, ভগবদনুগ্রহ চাই। একা অর্জুনে হবে না, কৃষ্ণকে চাই। একা কৃষ্ণে হবে না, অর্জুনকে দরকার। দৃঢ়ধনুা অর্জুন আর যোগেশ্বর কৃষ্ণ। তারই যোগফল শ্রী ও অভ্যুদয়।

আমার চোখ সুস্থ, পূর্ণদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, স্নায়ু-শিরা নিটুট নিখুঁত, কিন্তু আমি চোখ মেললেই কি দেখতে পাবো যদি আলোটি না জ্বলে ? চোখের তো আলো করবার আলো জ্বালবার ক্ষমতা নেই। চোখ মেল আর প্রার্থনা করো, হে আলোকময়, আলোটি দাও, আলোটি জ্বালো। এমন যেন না হয় যে আলো জ্বলেছিল আমি চোখ মেলিনি। আমার বাহুতে বল আছে, আমার ক্ষেত্র আছে, লাঙল-গরু আছে, আমি চাষ করব। কিন্তু জল আমাকে কে দেয় ? আমার কর্ষণেই তো বর্ষণ নেই। চাষ করো আর প্রার্থনা-পরিপূর্ণ হয়ে থাকো, হে বারিবাহ, হে পর্জন্যদেব, জল দাও, জল ঢালো। এমন যেন না হয় যে জল ঝরেছিল আর আমি চাষ করে রাখিনি।

কৃপাকে কে আকর্ষণ করবে ? যে ক্লান্ত হয়েছে, সে করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে ছেলে রোয়াকে বসে থাকে তাকে তার মা ধরে না, বলে, এ আমার ভালো ছেলে, ঠাণ্ডা ছেলে, রোগা ছেলে, একগলা মাদুলি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সে বসে

আছে, তার ভাগ্য বসে আছে তার ভগবানও বসে আছেন। কিন্তু যে ছেলে ছুটোছুটি করছে, যার দম বেরিয়ে গিয়েছে, সারা গায়ে ধুলো বালি কাদা মেখেছে, তাকে তার মা এসে ধরবে। ধরে মা তার স্নেহ-বিস্তীর্ণ মার্জনামধুর অঞ্চলে ছেলের স্বেদক্লেদ মুছে দেবে। যদি মার হাতের সেই স্নেহস্পর্শ পেতে চাও তো ক্লান্ত হও। ক্লিষ্ট হও।

ক্লৈব্য নয় ক্লান্তি। বিরতি নয় নিয়ত উদ্যতি।

ছেলেবেলায় বাবা বিশ্বনাথ দত্ত যখন নরেন্দ্রনাথকে জিগগেস করেছিল, হ্যাঁরে বিলে, বড় হয়ে তুই কী হবি? নরেন বলেছিল, বড় হয়ে আমি কোচোয়ান হব, দুই ঘোড়ার গাড়ি চালাব। এক ঘোড়ার নাম ধর্ম আরেক ঘোড়ার নাম কর্ম। এক ঘোড়ার নাম অর্জুন আরেক ঘোড়ার নাম কৃষ্ণ। এক ঘোড়ার নাম ক্লান্তি আরেক ঘোড়ার নাম কৃপা।

ক্লান্ত হবার উপায় কি? কর্ম—আমৃত্যু কর্ম।

'এই তো জীবন, শুধু খেটে মরো আর খেটে মরো। আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? শুধু খেটে মরো - খেটে মরো। শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে যায় কেন? মর্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভালো। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেলকি খেলবে তার ভাবনা কী! দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কমে নেশাই হবে না। তাল ঠুকে লেগে যাও—ওয়া গুরুকী ফতে।'

আত্মানং সততং রক্ষেৎ। বলরাম বসুকে লিখছে স্বামীজি: ভগবৎকৃপায় সব ঠিক হয় বটে কিন্তু যে উদ্যমী ভগবান তাকেই দয়া করেন।

পরের কৃপা চাও, নিজেকে আগে কৃপা করো। নিজের শরীরকে কর্মক্ষম রাখো দৃঢ়তায় ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করো। অপ্রমেয় মহাবাহু হও। অব্যাহতবলবিগ্রহ। তা নইলে আলস্যে স্তূপীভূত হয়ে থাকবে, সে নীরন্ধ্র আত্মঘাত। স্বামীজি বলছে, আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করতে পারেন না।

গীতায় অর্জুনের শেষ কথা কী? করিষ্যে বচনং তব। তোমার কথামত কাজ করব।

যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। যে শির ডার দিতে পারে সেই সর্দার হতে পারে।

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' আগে শ্রদ্ধাকে স্বীকার করো, হৃদয়ে

এনে বসাও, তবেই না কর্মে প্রবৃদ্ধ হবে। দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রীতি—তারই নাম শ্রদ্ধা। কেউ তোমাকে ডাকেনি, তুমি নিজের থেকেই স্কুলে ঢুকেছ। সুতরাং স্বীকার করে এসেছ শিক্ষক তোমার চেয়ে বেশি জানে, তুমি শিক্ষকের কথার বাধ্য হবে। এই বিনম্র বশবর্তিতাই শ্রদ্ধা। তুমি যখন খেলতে নেমেছ তখন এ স্বীকার করে এসেছ যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তুমি মেনে নেবে। রাস্তায় যখন নেমেছ গাড়ি নিয়ে স্বীকার করে নিয়েছ বাঁয়ে থাকবে। রাস্তার আইনকে মেনে চলবে। তেমনি নচিকেতা যখন যমালয়ে যাত্রা করল, শ্রদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে গেল—আত্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা যম ছাড়া কেউ নয়। সে যা বলে তাই মানব। শ্রদ্ধাই বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র। শ্রদ্ধাই সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্তা। যে শ্রদ্ধাহীন সে-ই অজ্ঞ, সে-ই নাস্তিক, সে-ই সর্বস্বান্ত।

আত্মশ্রদ্ধাই আত্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা। আবরণ বাধা উন্মোচনই সাধন। কর্মযোগে সেই উন্মোচন ত্বরান্বিত করো। হে অঙ্গার, কর্মযোগে হীরক হয়ে ওঠ। হে মলিন মাটি, কর্মযোগে পবিত্র বারি-বিতরণের কলসী হয়ে ওঠো। নিজের ঔজ্জ্বল্যে নিজে পরিচিত হও। স্বস্বরূপে বিশ্বাসী হও। তুমি সমর্থ তুমি কৃতার্থ তুমি পরিপূর্ণ। তুমি দুর্বল নও দীনহীন নও, তুমি অকল্মষ তুমি অপাপবিদ্ধ, তুমি জ্যোতির তনয়, বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র।

আমি ভয়ের মহাভয়। 'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি॥' আমিই একমাত্র সত্তা, অচ্ছিদ্র সত্তা,—আমিই সমস্ত কিছু। আমিই সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম, আমি চিরসুখী চিরপবিত্র চিরসুন্দর। আমিই অনন্ত নীলাকাশ।

'আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করবে মনন করবে নিদিধ্যাসন করবে।' হাত যখন কাজ করবে মন যেন তখন জপ করতে থাকে, আমিই ব্রহ্ম, আমিই অশেষ ; আমিই অনন্তের আয়তন।

আমার সমস্ত জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সমস্ত শিল্পকর্ম তোমার মুদ্রারচনা, আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান, আমার শয়ন তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—আমার সমস্ত কর্ম সমস্ত চেষ্টা তোমারই পূজাবিধি।

আমি নিজেই যদি ঈশ্বর, তবে কার কাছে কৃপা প্রার্থনা করব ? ঈশ্বর যেমন আমার মধ্যে, তেমনি আমার বাইরেও। আমার মধ্যে তিনি পুরুষকার, বাইরে

তিনি কৃপা। বাইরের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, কৃপা করে আমার পুরুষকারকে জাগ্রত করো। আবার পুরুষকারকে জাগাতে পারলেই কৃপা আসবে। পুরুষকারহীনের পক্ষে কৃপার প্রত্যাশা অলীক। তাই পুরুষকার আর দৈব দুইই চাই। কর্ম আর প্রার্থনা দুইয়েরই দরকার। যোগ আর যুদ্ধ। মাম্‌ অনুস্মর, যুধ্য চ।

৩

বিবেকানন্দ ও সাম্যবাদ

যত মত তত পথ।

কথাটার মধ্যে দেখাই যাচ্ছে, যুক্তি-অক্ষর দূরের কথা, একটা আকার-ইকার পর্যন্ত নেই। বানানে-উচ্চারণে এর মত সহজ-সরল আর কী হতে পারে। যত মত তত পথ।

অনন্ত মত অনন্ত পথ। মতে-পথে নানা বৈষম্য, নানা বিরোধ। কিন্তু সমস্ত রাস্তাই চলেছে 'রোমে'র দিকে—এক গন্তব্যে। আশ্চর্য, ঋজু কুটিল এত বিচিত্র নদী, কিন্তু মিশতে চলেছে এক সমুদ্রে, এক অগাধে। এত অনৈক্যের মধ্যে কোথাও তা হলে এক আছে, পূর্ণ আছে, সমগ্র আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি কাঠের সিঁড়ি মই-দড়ি, আবার আছোলা বাঁশ বেয়েও উঠতে পারো। এক কালীঘাটে আসতে হলে কেউ নৌকোয় কেউ গাড়িতে কেউ বা সটান পায়ে হেঁটে চলে আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই নানা ধর্ম নানা পথ হয়েছে। যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। কোনো ছেলের জন্যে ভাত, কারু জন্যে লুচি, কারু জন্যে খই-বাতাসা ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা বহু, কিন্তু তিনি এক। বাড়িতে একজনই সেই বাবু আছেন, কেউ ডাকছে খুড়োমশাই, কেউ মামাবাবু, কেউ মেসোমশাই। ডাক আলাদা কিন্তু ব্যক্তি সেই এক বই দুই নয়। এক রাম তার হাজার নাম। সকলেরই একে লক্ষ্য কিন্তু পাত্র আলাদা পথ আলাদা পদ্ধতি আলাদা। আমাকে সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, সবাই আসছে তাঁর কাছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।'

স্বামীজি বলছে, এই বিভিন্নতা এই বিচিত্রতা থাকবেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে থেকে যাবে এক সুমহান ঐক্য। তাই সাম্য জীবত্বে নয় সাম্য দেবত্বে। বিবেকানন্দের সাম্য জীবসাম্য নয় শিবসাম্য।

নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : আর সকলে ঘটিবাটি, নরেন জালা। আর সকলে পোনা কাঠি বাটা, নরেন রাঙাচক্ষু রুই। আর সকলে ডোবা পুষ্করিণী, নরেন বড় দিঘি, যেন হালদার-পুকুর। পদ্মমধ্যে সহস্রদল। আমরা সকলে নর আর ও নরের মধ্যে ইন্দ্র।

তবে শক্তির তারতম্য তো আছেই। প্রকাশের তারতম্য। কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে একটা মশাল। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ। আবার জলের চেয়ে আর্শিতে বেশি প্রকাশ।

তারতম্য থাকবেই। তা না হলে সৃষ্টিতে আনন্দ কী। নরেনে-কেশবে শক্তিতে পার্থক্য আছে, কিন্তু নরেনও যে ঈশ্বর কেশবও সেই ঈশ্বর।

শুধু নরেন-কেশব কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ডাকাতরূপী নারায়ণ, লম্পটরূপী নারায়ণ, ছলরূপী নারায়ণ, খলরূপী নারায়ণ। স্বামীজি বলেছে, প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ মহতো মহীয়ান ঈশ্বরের মন্দির। সাম্য জীবভূমিতে নয়, সাম্য দেবভূমিতে।

'পূর্ণ সাম্য আর পূর্ণ বিলয় একই কথা'—বলছে স্বামীজি। 'জগতে বৈষম্য-উৎপাদিকা শক্তি যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে জগৎই লোপ পায়। বৈষম্য ও বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ। একীকরণ বা সমতা দৃশ্যমান জগৎকে এক নিশ্ছিদ্র প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে। মানুষ এ অবস্থা মেনে নিতে কখনো সম্মত নয়। জড়দেহে ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগে সম্পূর্ণ সমতা স্বাভাবিক মৃত্যু আনে এবং সমাজের বিলোপ ঘটায়। চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা মননশক্তির অপচয় ও অবনতি ঘটায়। সুতরাং সম্পূর্ণ সমতা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।'

সম্পূর্ণ সমতা একটা অবাস্তব কাহিনী। খাদ্যের সমতা ঘটালেও ক্ষুধার সমতা ঘটবে না, না বা রুচির সমতা, না বা পরিপাক-শক্তির। রসবোধের ক্ষমতাও লোকে-লোকে ভিন্ন। রূপে গুণে শক্তিতে চরিত্রে মেধায় বিদ্যায় বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। বৈচিত্র্যই জীবনের সারবস্তু। আমি একঘেয়ে কেন হব ? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। আমি মাছকে ঝালে ঝোলে অম্বলে ভাজায় বিচিত্র ব্যঞ্জনে আস্বাদ করব।

যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলবে ততদিন পর্যন্ত চলবে বিচিত্রতা, ততদিন সর্বভেদের বিলয় ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থা অসম্ভব।

'কিন্তু তাই বলে তুমি ক্ষমতাধিক্যের বলে দুর্বলকে নিপীড়িত করবে, পদদলিত করবে, তার মানবিক অগ্রাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে', স্বামীজি জিগগেস করছে, 'এটা কোন নীতি? তুমি কি দেখছ না এত বিস্তৃত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তুমি আর সে একসত্তা' এক মহিমময় সত্তা, এক ঈশ্বর? তা হলে তুমি কী করে অন্যকে শোষণ করো, পীড়ন করো, তার দুঃখে-দারিদ্র্যে উদাসীন থাকো?'

'সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ।' কিডিকে চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘেঢাকা সূর্যের মত। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ এই—কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু পাতলা। সূর্য কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুট। বিভিন্ন উপাধির মধ্যে সেই একের—এক আত্মারই প্রকাশ, এক আত্মারই পরিচয়। তুমিও যে সেও সে। তাই প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত। যদি মানুষকে ঈশ্বর বলেই ভাবা যায় তবে ঘৃণানিন্দা লুণ্ঠনপীড়ন থাকে না, থাকে না বিন্দুমাত্র অনিষ্টচেষ্টা।'

বৈচিত্র্য থাকবে, জীবনের প্রয়োজনে থাকবে, থাকবে বৈষম্য, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে যে একত্ব আছে সেই একত্বে মানুষের মহামিলন ঘটাতে হবে। তা হলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত হবে। যদি এ কথা ভাবতে পারা যায়, বিশ্বাস করতে পারা যায় যে সবাই আমরা ঈশ্বর, তা হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে প্রেম আসে। জীবে দয়া? না। কী সাধ্য তোর, তুই দয়া করবি? তুই কি উঁচুতে দাঁড়িয়ে? আর ও নিচে? কখনো না। দুজনেই সমতলভূমিতে, ব্রহ্মভূমিতে দাঁড়িয়ে। জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। সেবা বলেও ঠিক ভাবটা প্রকাশ করা যায় না। জীবে পুজো। জীবে প্রেম। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে—না, পূজিছে ঈশ্বর।' বৃহতের প্রতি প্রেম জাগলে তুচ্ছ তোমার ক্ষুদ্র-আমির সুখদুঃখ, ক্ষুদ্র-আমির লাভলোকসান।

ঠাকুরের অসুখ, নানা জনে নানা কথা কইছে।

রামদত্ত বলছে, 'এ অসুখ না হলে ঠাকুরকে চিনত কে? সুস্থ শরীরে সবাই ভগবানে মন রাখতে পারে কিন্তু এই দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে যিনি সর্বক্ষণ ঈশ্বরের অনুধ্যানে থাকতে পারেন তিনিই অবতার।'

বলরাম বললে, 'ঠাকুরের কখনো অসুখ করতে পারে ? এ আমাদের অসুখ, আমাদের পাপ।'

শশী বললে, 'জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।'

'এত কথায় কাজ কী! শুধু সেবা, সেবা লাগিয়ে দে।' বলে উঠল নরেন, 'দেখছিস না আমাদের সেবা নেবেন তাই তাঁর এ অসুখ। সেবাই যে পূজা, সেবাই যে শিব, তাই শেখাবার জন্যে এই আয়োজন।'

কাশীপুরের বাড়িতে তখন অন্য পূজা-অর্চনা বন্ধ।

কে একজন এসে নালিশ করলে, 'সারাদিন কেবল রুগীর সেবাই করেন, জপধ্যান উপাসনা আরাধনা কিছুই করেন না ?'

'সেবাই আমাদের একমাত্র উপাসনা, একমাত্র আরতি।' বললে নরেন, 'এ ছাড়া আমাদের আর কোনো পূজা-চর্যা নেই। যাকে শুশ্রূষা করছি, নাওয়াচ্ছি-খাওয়াচ্ছি, যার পা টিপে দিচ্ছি, মলমূত্র পরিষ্কার করছি, সে-ই আমাদের ইষ্ট, সে-ই আমাদের ভগবান।'

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। এই জগতে গতি সম্ভব হচ্ছে কিসের থেকে ? সমতাচ্যুতি থেকে। যখন এই জগৎ ধ্বংস হবে তখনই সাম্য-ঐক্য আসতে পারে। তার আগে নয়। বলছে স্বামীজি। আমরা সকলেই একরকম চিন্তা করব এরূপ ইচ্ছে করাও উচিত নয়। তা হলে চিন্তা করবারই কিছু থাকবে না। তখন যাদুঘরের মিশরীয় মামিগুলির মত আমরা সকলে এক রকমের হয়ে যাব আর পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকব—আমাদের মনে ভাববার মত কথাই উঠবে না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস। আমাদের সকল মনন-চিন্তনের প্রসূতি।

তবে আমরা এক কোথায় ? আমরা সত্তায় এক—সেই সত্তাই ঈশ্বর। আমরা অহং-এ বিচ্ছিন্ন, আত্মায় এক। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ জীবনের মানকে নামিয়ে এনে নয়, জীবনের মানকে ঊর্ধ্বে তুলে ঈশ্বরে বেদান্তে সাম্যবাদ।

তাই বলে কি সংগ্রাম নেই ? সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল ?

না ঘোরতর সংগ্রাম। বঞ্চনা-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করবার জন্যে সংগ্রাম। তারপর মানুষকে ঈশ্বর করে তোলবার সংগ্রাম।

কী বলছে স্বামীজি ?

বলছে, 'এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোকের চেয়ে স্বভাবতই বেশি বুদ্ধিমান—এ আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ নিয়ে এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকদের থেকে তাদের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও কেড়ে নেবে কিনা। এই পীড়নকে রোধ করবার জন্যে সংগ্রাম। কেউ কেউ আর কারু চেয়ে বেশি বলশালী হবে, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু তার জন্যে দুর্বলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নিজেদের জন্যে কেড়ে নেবে—এই অধিকারবোধ নীতিসম্মত নয়, আর সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবেই চলবে। এক দল লোক আরেক দলের থেকে বেশী ধনসঞ্চয় করবে এ আশ্চর্য কী, কিন্তু ধনসঞ্চয়ের সামর্থহেতু তারা অসমর্থদের উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করবে এ নীতিসম্মত নয়, আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনিবার্য। নীতিধর্মের লক্ষ্যই এই বিশেষ অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। ততঃ কিম? লুণ্ঠন-পীড়ন বন্ধ হল, বিশেষ অধিকারবাদ থাকল না—তারপর কী হল? কাজ শেষ হল? না, আসল কাজই এখনো বাকি। মানুষকে এখনো ঈশ্বর করা হয়নি।

বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। বলছে স্বামীজি, তুমি আমার চেয়ে বেশি ধনী, তুমি আমার চেয়ে বেশি বলবান, তুমি আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান, তুমি আমার চেয়ে বেশি অধ্যাত্মপ্রবণ—হলেই বা। তাতে কী এসে যায়? আমাকে আমার সাধ্যমত স্বাধীনমতই থাকতে দাও। তুমি আমার চেয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বেশি বলবান বলে আমার চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করবে তা হতে পারে না। আমার চেয়ে তোমার বেশি ধনদৌলত আছে বলে তুমি আমার চেয়ে বড় বলে কুলীন বলে বিবেচিত হবে এ হতে পারে না। কেননা অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের সেই একই সমতা। সোঽহং আর তত্ত্বমসি।

আমেরিকাকে বলছে, 'কী কতগুলি মিশনারী পাঠাচ্ছ আমাদের দেশে? আমাদের দেশকে তোমরা কী ধর্ম শেখাবে? আমাদের দারিদ্র্যমোচনের জন্যে বরং যন্ত্রপাতি পাঠাও। কল-কারখানা বানাতে শেখাও। জাতিভেদের কথা তোমরা বলতে এস না। নিগ্রোদের সম্পর্কে তোমাদের যা ব্যবহার তা এক কথায় পৈশাচিক। আমাদের এখন প্রধান কাজ দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা। ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র্য। এর নিরসন না হলে ভারতবর্ষ ধর্মে-কর্মে জ্যোতির্ময় হবে কী করে? তারাই যথার্থ জীবিত যারা অন্যের জন্য জীবনধারণ করে। তুমিও এই

দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর দারিদ্রকে ডেকে বলো, তুমি দরিদ্র বলেই অশ্রদ্ধেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। তুমি মেঘে ঢাকা সূর্য, কোণে ঢাকা ক্ষুর, ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা অম্লান হীরকখণ্ড। তুমিই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। তুমিই শুদ্ধ শাশ্বত অটল অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্ম।'

তীর্থ করতে বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্যনাথধামে নেমেছেন। কোথায় বৈদ্যনাথ? শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে পড়ল অনাথ-দরিদ্রদের দিকে। পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই একফোঁটা। জীবন কোনদিন হেসেছে তার লক্ষণ লেখা নেই মুখে-চোখে।

মথুরবাবুকে ধরলেন। বললেন, 'তুমি তো মার দেওয়ান। এদেরকে একমাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর একদিন খাইয়ে দাও পেট ভরে।'

মথুরবাবু আপত্তি করলেন। বললেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলো লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারব না।'

ঠাকুর মথুরবাবুকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'দূর শালা। তোর তীর্থ তুই একলা কর, একলা যা। আমি এদের কাছেই থাকব। এদের ছেড়ে আমি আর যাব না কোনোখানে।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুরবাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন। দরিদ্র-আতুরদের মধ্যে বিতরণ করলেন মুক্তহস্তে। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন।

লোকগুলির আনন্দ দেখে কে? তাদের আনন্দেই শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ?

'দেশের লোক খেতে-পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?' বলছে স্বামীজি: 'ওদেশে যখন গিয়েছিলুম মাকে কত বললুম, মা এখানে লোক সুখের বিছানায় শুচ্ছে, চর্বচুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা, তাদের কোনো উপায় হবে না? ওদেশে কি আমি শুধু ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলাম? আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল, যদি এদেশের লোকের জন্যে অন্ন-সংস্থান করতে পারি।'

মঠের জঙ্গল সাফ করতে ও মাটি কাটতে কতগুলি সাঁওতালমজুর নিযুক্ত হয়েছে। তাদের একজনের নাম কেষ্টা। সব কাজ ফেলে স্বামীজি তার সঙ্গে গল্পে

মেতেছেন। কথা বলতে-বলতে কেষ্টা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'ওরে স্বামী, বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানে আসিস না। তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে বুড়ো বাবা এসে বকে।'

স্বামী অদ্বৈতানন্দকে বুড়ো বাবা বলছে।

স্বামীজির চোখ ছলছল করে উঠল, বললে, 'না, না, বুড়ো বাবা বকবে না। তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল।'

একটি গরিব মজুরের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথাই বুঝি ঈশ্বরকথা।

স্বামীজি হঠাৎ বললে, 'ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?'

'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না।' বললে কেষ্টা একটি সলজ্জ হাসির রেখা টেনে। 'এখন যে বিয়ে হয়েছে। তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ।'

'বা, নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেব—তা হলে তো খাবি?'

'তা হলে খেতে পারি।'

মঠ থেকে লুচি তরকারি দই মিষ্টি প্রচুর আনা হল কেষ্টা ও তার সঙ্গীদের জন্যে। কাছে বসিয়ে খাওয়াতে লাগল স্বামীজি।

খেতে খেতে তৃপ্তিভরা স্বরে কেষ্টা বললে, 'হ্যাঁ রে স্বামী, বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কুথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।'

'তোরা যে আমার নারায়ণ।' বললে স্বামীজি, 'আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।'

'কী শিখিয়েছেন আমাদের বিবেকানন্দ?' ডক্টর গ্রসম্যান বক্তৃতা দিচ্ছেন: 'শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম, জীবন্ত কর্ম। আমাদের ভাব আছে কিন্তু ভাবের রক্তমাংস যে কর্ম সেই কর্ম নেই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা বলি কিন্তু প্রাচ্যদেশের লোক এলে তাকে প্রত্যক্ষ অপমান করতে পেছপা হই না। আমাদের ঈশ্বর আকাশে কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে।'

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলো তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে ॥'

'দেশের লোক দু মুঠো খেতে পায় না দেখে এক-এক সময় মনে হয় ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া, নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা। সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকেদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

তোরা কী করলি বল দিকি ? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলিনে ? আবার জন্মে এসে বেদান্ত-ফেদান্ত পড়িস। এবার পর-সেবায় দেহটা দিয়ে যা। গেরুয়া পরে তবে আর কী হল ? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণের নামই যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছে হয় মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই। এইসব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আমরা তো গাছতলা সার করেছি।'

দরিদ্রনারায়ণ ! সম্প্রতি এই কথাটার উপর কেউ-কেউ কটাক্ষ করছে। যেন বলা হচ্ছে, হে দরিদ্র, তুমি দরিদ্রই থাকো, যাতে তোমাকে আমরা চিরকাল নারায়ণজ্ঞানে সেবা করে কৃতার্থ হতে পারি। যদি দারিদ্র্য চলে যায় তবে আমাদের নারায়ণপুজো হবে কী করে ?

যাদের চিত্তে দারিদ্র্য এ-কটাক্ষ তাদেরই। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা হবে এ আদর্শের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে প্রবুদ্ধ-প্রেরিত। কিন্তু একদিন বিত্তের দারিদ্র্য দূর হয়ে গেলেও চিত্তের দারিদ্র্য দূর হবে না। অন্তত তাদের হবে না মানুষকে যারা শুধু শরীর মনে করে, যন্ত্রাধীন মনে করে, মনে করে একস্তূপ অভ্যাসের পুঁটলি। তখন আবার সেই চিত্তদরিদ্রদের সেবা করব আমরা, বলব, হে মানুষ, তুমি শুধু দেহ নও, যন্ত্র নও, ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার নও, তুমি ক্ষুদ্র বদ্ধ নও, তুমি বিরাট তুমি স্বরাট তুমি আত্মা তুমিই ঈশ্বর। তখন এইভাবেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে। তখন আবার বলা হবে তুমি আপন মহিমা থেকে কেন বঞ্চিত হয়ে থাকবে। তুমিই সেই তেজোময় অমৃতপুরুষ, তুমিই জীবনের মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি।

'যদি ভালো চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করোগে—বিরাট

আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ।' বলছে বিবেকানন্দ, ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়িব বেটাদের গুষ্টির পিণ্ড করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—এ পাগলা গারদ, দেশ নয়। তোরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার কর। এই চিরপতিত দরিদ্ররা তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক ইষ্ট হোক। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তক্ষরণ হয়—তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রচেষ্টা, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক।'

'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সকলে তাঁর অবতার। তুমি নতুন লীলা কী দেখাবে, তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি,' বলছে স্বামীজি, 'জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছু নেই।'

তাই এ বলা ঠিক হবে না যে বিশুদ্ধ মানবিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের সার কথা। বলা উচিত ঐশ্বরিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের সার কথা। সে যে মুক্তি খুঁজেছে তা শুধু দারিদ্র্যের থেকে পীড়নের থেকে বঞ্চনার থেকে মুক্তি নয়, এ মুক্তির চেয়েও আরো এক বড় মুক্তি আছে যার অর্থ হচ্ছে উন্মোচন। তোমার প্রচ্ছন্নকে প্রস্ফুট করে প্রকাশিত হওয়া—প্রকাশিত হয়ে প্রমাণিত হওয়া যে আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। আদিম পাপ নয় আদিম পবিত্রতা। কাকে তুমি পাপী বলছ? ও আসলে হীরে, শুধু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। ওর গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলেন্দাও, ও আবার হীরে, প্রথম থেকেই হীরে।

শ্রেণীহীন সমাজ শুধু অমৃতত্বে, সত্তার পরিপূর্ণ উদ্ঘাটনে ঈশ্বরায়ণে, সেইখানেই মানবভ্রাতৃত্ব সম্ভব। শুধু মানবভ্রাতৃত্ব নয়, তার চেয়েও বড় জিনিস ব্রহ্মৈকাত্মতা।

আধ্যাত্মিক সত্যের অসীম সমুদ্র আমাদের সামনে প্রসারিত। সেই সমুদ্রে

স্নান করে আমরা সোঽহং বলে চিনব নিজেদের। আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হতে হবে। সেই পূর্ণতাতেই আমাদের সমতা—এর কমে নয়, এর নিচে নয়, এর বিকল্পে নয়।

শুধু আমি নই, তুমিও ঈশ্বর। আর, সকল মানুষে এই ঈশ্বর-দর্শনই পরম সুখ।

আগ্রা থেকে বৃন্দাবনে চলেছে স্বামীজি। বসনে গ্রন্থি নেই কানা-কড়িও সম্বল নেই। চলেছে পায়ে হেঁটে। ভারতবর্ষের মাটি মমতায় স্পর্শ করে করে করে।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে শরীর। কোথাও বিশ্রাম নেই, নেই ছায়াঘন শ্যামকুঞ্জ। তবু দুর্বিষহ দাবদাহের মধ্য দিয়েই পথ করে নেব।

কিছুদূরে এগিয়ে দেখতে পেল পথের ধারে গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। কী তৃপ্তি চোখে মুখে!

স্বামীজি থামল। মনে হল যদি কলকেটা তুলে তাতে একটা টান দিতে পারে তা হলে এই ক্লান্তির অপনোদন হয়।

কাছে এসে হাত বাড়ালে, বললে, 'ভাই, তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই?'

সে লোক মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল স্বামীজির দিকে। কে এই প্রদীপ্ত পুরুষ!

অপরাধীর মত মুখ করে লোকটা বললে, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর। আমার মুখের কলকে তোমাকে কী করে দেব?'

প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিল স্বামীজি। সত্যিই তো, মেথরের উচ্ছিষ্ট কলকে কী করে মুখ দিই?

এগিয়ে চলল স্বামীজি। কতদূর যেতেই তার মনে ডাক দিল: এই আমার সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন? আমি কাকে ঘৃণা করলাম? কাকে ছোট বলে পরিহার করলাম? আমি তাকে ছোট দেখলাম বলেই সে আসলে ছোট নয়। আমার চোখে যদি ন্যাবা লেগে থাকে আমি জিনিস হলদে দেখব কিন্তু সূর্য ঠিকই আছে। শুধু আমার দেখবার ভুল। আর এই ভুলের জন্যেই যত দুঃখ ও গ্লানি।

ফের সেই গাছতলায় ফিরে এল স্বামীজি। সেই পথাশ্রয়ী লোকটার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। বললে, 'ভাই, আমাকে শিগগির এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে লোকটা বললে, 'মহারাজ আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর।'

'কে বললে ? তুমি নারায়ণ। তুমিও যে আমিও সে। দাও, দেরি কোরো না।'

'কিন্তু মহারাজ, এ বড়ো-তামাক।' লোকটা বুঝি স্বামীজিকে নিবৃত্ত করতে চাইল।

স্বামীজি বললে, 'তা হোক। তুমি কলকে ধরিয়ে দাও।'

লোকটা কলকে ধরিয়ে দিল। ভরাট কলকে আগধ তৃপ্তিতে টানতে লাগল স্বামীজি।

তুমিও যে আমিও সে। সমান-সমান। তুমিও অমৃত আমিও অমৃত। তুমিও অভয় আমিও অভয়। সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্রে যে পুরুষ, যে পুরুষ বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডে সেই পুরুষই আমি, সেই পুরুষও তুমি।

'অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি…
ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চাহি কহি জোড়হাতে
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার-আমার মাঝে এক।'

শুধু নিজে দেখি না, অন্যকেও দেখাই। আর এই স্বরূপকে দেখানোও পরম সেবা। যে এই স্বরূপের সন্ধান জানে না সে নারায়ণ হয়েও দরিদ্র। সেও দরিদ্র-নারায়ণ। তার উজ্জীবনেই তার সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছাগলের পালে বাঘ পড়ার গল্পটা মনে করো।

একটা বাঘিনী ছাগলের পালে পড়েছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে তীর ছুড়ে তাকে মেরে ফেললে। বাঘিনীর পেটে বাচ্চা ছিল তখনি সেটা প্রসব হয়ে গেল। ছানাটা প্রথমে ছাগলের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়ে পরে দলে পড়ে ঘাস খেতে লাগল। গলার আওয়াজও বেরোল ভ্যা-ভ্যা। আবার, যদি কোনো জানোয়ার দেখে, অমনি পালায়। ছাগলদের মতই পালায়।

একদিন সেই পালে আরেকটা বাঘ এসে পড়ল। ছানাটা আর-আর ঘাসখেকো ছাগলদের সঙ্গে দৌড়ে পালাল। তখন বাঘটা ছাগলদের কিছু না বলে সেই

বাঘটাকে ধরল। সে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল, আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তাকে টেনে হিঁচড়ে একটা নালার কাছে নিয়ে এসে বাঘ বললে, 'এই জলে তোর মুখ দ্যাখ। আমার যেমনি হাঁড়িমুখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার মুখে খানিকটা মাংস গুঁজে দিলে। সে কোনোমতে খাবে না, কেবল ভ্যা-ভ্যা করে। শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে বেশ খেতে লাগল। তখন বাঘটা বলেল, 'এখন বুঝেছিস আমিও যা তুইও তা। এখন আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।' বাঘের বাচ্চা বনে চলে গেল।

ঘাস খাওয়া কিনা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ডাকা আর পালানো কিনা সামান্য জীবের মত আচরণ করা। জলে নিজের মুখ ঠিক দেখা কিনা স্ব-স্বরূপকে চেনা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া কিনা গুরু যিনি চৈতন্য করলেন তাঁর শরণাগত হওয়া। আর বনে যাওয়া কিনা স্বধামে প্রত্যাবর্তন করা।

তাই যেদিন তোমার দারিদ্র্যমোচন হবে, মাত্র ঘাসখেকো বাঘ হয়ে ছাগলের দলে মিশে থাকবে, তখন আবার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে যে তোমাকে তোমার হাঁড়িমুখটা দেখায়, তোমাকে তোমার স্বরূপ চেনায়, তোমাকে তোমার উপযুক্ত খাদ্য, রক্তাক্ত মাংস পেঁছিয়ে দেয়।

তাই যতদিন মানুষ না ঈশ্বর হচ্ছে ততদিন থাকবে দরিদ্রনারায়ণ। থাকবে সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করো, সর্বভূতেই তিনি আছেন জানো, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত মনে করো—জেনে রাখো এই আমাদের একমাত্র কর্তব্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য একমাত্র আদর্শ। যখন সকল বস্তুতেই ঈশ্বর বিদ্যমান তাকে লাভ করবার জন্যে কোথায় যাব, কোন্ দূর দুর্গমে? প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক চিন্তায় তিনি পূর্ব থেকেই অবস্থিত। যীশু বলেছেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে।' বেদান্তও তাই বলে। স্বর্গরাজ্য প্রথম থেকেই তোমার মধ্যে বিরাজমান। শুধু ঐটুকুই নয়, সমুদয় জগৎই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। যখন বেদান্ত বলে, সংসার ত্যাগ করো, তার অর্থ, তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করেছিলে সেই অনুমান ত্যাগ করো। অনন্তকাল ধরে একমাত্র ঈশ্বরই বিদ্যমান, তাঁকে দেখ। তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর, খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার দুর্বলতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত্যাগ করো অর্থ ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ করো, জগৎকে যেরূপ ভাবছিলে যেভাবে দেখছিলে—সেটা

ভ্রম, স্বপ্ন, মায়া। সেই জগৎকে ত্যাগ করো। নিত্যবস্তু একমাত্র ঈশ্বরকে দেখ। সংসার ত্যাগ করবে মানে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করবে না, স্ত্রী-পুত্রে যে ভ্রান্ত দৃষ্টি ফেলেছিল তা সরিয়ে নাও, তাদের মধ্যেও সেই সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে দেখ। ঈশ্বরকে দেখতে-দেখতে ঈশ্বর হয়ে যাও। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। ঈশ্বরই প্রকাণ্ডতম সুখ প্রচণ্ডতম শান্তি। বৃথা বাসনায় ইতস্তত কেন ঘুরে মরি? ঈশ্বরের কম কোনো বাসনাপূর্তিতেই তো আমার নিবৃত্তি হবে না। আর অকামো বিষ্ণুকামো বা। ঈশ্বরকামনা কামনার মধ্যে পড়ে না। আর সেই কামনাই জীবনের মৃত্যুহীন আনন্দ।

হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করে আছো। আমি সত্যধর্মা, যাতে আমি ঠিক-ঠিক দেখতে পারি তার জন্যে এই আবরণ অপসারিত করো। সর্বত্র সেই এক পুরুষকে দেখি, অকায় অব্রণ অস্নায়ু, পবিত্র ও নিষ্পাপ —যে পুরুষ আমিই নিজে।

দেখতে দেয় না কে? জানতে দেয় না কে? ঐ আবরণ। হরিদাস বাঘের ছাল পরে সবাইকে ভয় দেখায়, সকলে বাঘ ভেবে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে। শুধু একটা ছেলে, বীর সাহসী ছেলে বলতে পারল নির্ভয়ে: তুই তো আমাদের হরে রে। অমনি হরিদাসই ভয় পেয়ে বাঘের ছাল ফেলে পালিয়ে গেল।

'তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই,
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ, অনেক ব্যবধান—
দুঃখসুখের অনেক বেড়া ধন জন মান।
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে দাও দেখা
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা ঘুচিয়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান লজ্জা শরম ভয়—
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।
এমন করে মুখোমুখি সামনে তোমার থাকা

কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার লোভের সীমা নাই
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে তোমায় দিতে ঠাঁই।'

সেই অসীম প্রেমের ভারবাহী শক্তিমান একাকী পুরুষই স্বামী বিবেকানন্দ।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্রাম করছে, কক্ষান্তরে মহারাজার নাচের আসর বসেছে। নগরের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বাইজী বীণা বাজিয়ে গান করছে। মহারাজা স্বামীজিকে চিরকুট পাঠাল। আসুন, গান শুনে যান, এমনটি আর শোনেননি কোনোদিন।

চিরকুটের অপর পৃষ্ঠায় উত্তর লিখে পাঠাল স্বামীজি: আমি সন্ন্যাসী, বাইজীর গান শুনতে আমার অভিরুচি নেই।

কথাটা বাহিত হল গায়িকার কাছে। সে মর্মাহত হল। বুঝল যেহেতু সে পতিতা, স্বামীজি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দুঃখ উথলে উঠল বুকের মধ্যে, হয়তো বা কণ্ঠস্বরে। বাইজী গান ধরল:

প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।

প্রভু, আমার দোষ তুমি ধোরো না। তুমি তো সমদর্শী, তুমি তো সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরপারে, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করবে? পুজোর ঘরের ফলকাটা বঁটি আর কসাইয়ের হাতের খড়্গ দুইই এক লোহায় তৈরি কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে দ্বিধা নেই, সে দুই লোহাকেই সোনা করে। গঙ্গায় অনেক জল পড়ে, ভালো জল মন্দ জল, নদী নালার জল, নোংরা নর্দমার জল, কিন্তু কলুষ-হারিণী গঙ্গার অন্তরে দ্বিধা নেই, সে দুই জলকেই পবিত্র করে। আমাকে যদি তুমিও নিরাশ্রয় করে রাখো তবে তুমি কিসের কী বাহাদুর?

সে গান স্বামীজির কানে ঢুকল। তক্ষুনি চমকে উঠে দাঁড়াল: 'এই, এই আমার সর্বভূতে অভেদদর্শন?'

ঠাকুর রতির মার মধ্যে কালীকে দেখেছিলেন। অভিনয়ে নটী বিনোদিনী চৈতন্য সেজেছিল। ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, মা, তোর চৈতন্য হোক। আর সেই আশীর্বাদের পুণ্যে সে কণ্টক-বৃক্ষ সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে গেল।

ঠাকুরের যখন খুব অসুখ তখন বিনোদিনী ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেনি তাঁকে দেখতে? একে স্ত্রীলোক তায় নটী, কোনো নিদর্শনেই তার অধিকার ছিল না

ঠাকুরের ঘরে দূরের কথা, সেই বাড়িতেই প্রবেশ করে। বিনোদিনী সাহেব সাজল। প্যাণ্টে কোটে হ্যাটে, হাতের ছড়িতে, চালে চলনে নিখুঁত সাহেব। ফুটফুটে ছোকরা। দ্বাররক্ষী সন্ন্যাসীকে দানাকালী বললে, ঠাকুরের নতুন ভক্ত ইংরেজ এক ছোকরা, ঠাকুরকে দেখতে চায়, পথ ছেড়ে দাও। কী ভাবল দ্বাররক্ষী, পথ ছেড়ে দিল। দিব্যি সাহেবের মত ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে, হয়তো বা শিস দিতে-দিতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল বিনোদিনী। ঠাকুরের ঘরের খোলা দরজার সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। পরে ঘরে ঢুকে মাথার হ্যাটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমস্ত চুল ঠাকুরের পায়ের উপর লুটিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। এ কী হয়ে গেছে শরীর!

ঠাকুর কিন্তু মহাখুশী। সবাইকে ঠকিয়ে ছলনা করে যে আসতে পেরেছে তাতেই তিনি আনন্দিত। ছলে বলে কৌশলে পেঁছুতে পারা নিয়ে কথা। জান্তে অজান্তে ভ্রান্তে নাম করতে পারলেই হল। তা ছাড়া এ উত্তাল ব্যাকুলতাকে কে রোধ করবে? কার সাধ্য?

সন্নেসীরা শুনল দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসেছে। তারা ভীষণ রুষ্ট হল, ঠিক করল দানাকালীর উপর এক হাত নেবে। কিন্তু ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখল বালক-স্বভাব ঠাকুর সাহ্লাদনয়নে হাসছেন। সমস্ত ব্যাপারটা শিশুর সারল্যে উপভোগ করছেন। সন্নেসী ভক্তরা চলে গেল।

একটা সামান্য গণিকাও ঠাকুরের গণনাতে গণ্য হয়েছিল। গণ্য হয়ে ধন্য হয়েছিল। আর এ আমি কী করলাম?

গাড়ী করে যাচ্ছেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যায় সেজেগুজে, দোতলার ঝুলবারান্দায় কতগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর তাদের দেখে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন। বললেন, 'মা, আনন্দময়ী আনন্দে থাকো।'

ম্যাক্সমুলারের কাছে একজন ভারতীয় ধর্মপ্রচারক এসেছেন।

ম্যাক্সমুলার বললেন, 'আপনি তো আগে শ্রীরামকৃষ্ণের খুব প্রশংসা করতেন, এখন সম্প্রতি তাঁর নিন্দা করছেন কেন?'

'আগে-আগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, পরে যখন দেখলাম গণিকারা তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করেছে—'

'করেছে? গণিকারাও আসতে আরম্ভ করেছে?' ম্যাক্সমুলার চেয়ার ছেড়ে

লাফিয়ে উঠলেন : 'তা হলে নিশ্চয়ই, আর সন্দেহ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণই যীশুখৃষ্ট। আমার একটা জায়গায় খটকা ছিল, এবার একেবারে নিঃসংশয় হলাম।'

আর আমি কিনা এখনো ভেদাভেদ মানছি? স্বামীজি মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। এই আমার সমদর্শিতা? এই আমার যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে?

তাড়াতাড়ি চলে এল কক্ষান্তরে। বাইজীকে উদ্দেশ করে বললে, 'মা, গান গাও, আমি শুনব।'

বাইজী স্বামীজির পায়ের কাছে প্রণামে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

'তুমি কোথায় থাকো?' আমেরিকা জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'কোথায় না থাকি? হাটে ঘাটে বাজারে বন্দরে। গাছতলায় ফুটপাথে। আস্তাবলে ভিখিরির আস্তানায়। এমন কি রাজপ্রাসাদে। যেখানে থাকি, বসি আর চলি, সর্বত্রই রামের অযোধ্যা।'

'শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বুদ্ধ্যা
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥"

'করো কী?'

'মাধুকরী। পঞ্চ দুয়ারে ভিক্ষা। অহঙ্কারকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্যে ভিক্ষা। আমার আচার্যদেব বলতেন ভিক্ষান্নই শুদ্ধান্ন।'

'জাত মানো?'

'মানি না। আমাদের দেশে যেটা জাতিভেদ দেখছ সেটা ধর্মের কথা নয়, একটা সামাজিক প্রথা মাত্র। যতই কেননা ভেদ দেখ কোথাও না কোথাও আমরা এক, আমরা সমান, আমরা অভিন্ন। সেই অভেদ বেদান্তে, দেবত্বে, ব্রহ্মভূমিতে। একটা চণ্ডাল সন্ন্যাসী হয়ে যাক না, শুদ্ধাচারী শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণও তাকে প্রণাম করবে। বেদান্তের মত এত মহৎ কল্পনা আছে তোমাদের দেশে আর কোথাও পশ্চিমে? তবু আমাদের একটা শাশ্বত মিলনের ক্ষেত্র আছে—আর, তোমরা? তোমাদের? তোমাদের যে জাতিভেদ তা আরো জঘন্য।'

'জঘন্য?'

'আরো জঘন্য। তোমাদের জাতিভেদ গায়ের রঙ নিয়ে, ডলারের চাকচিক্য

নিয়ে—কী কদর্য ব্যবহার করছ নিগ্রোদের সংগে ! ভাবছ ইতিহাস একদিন পাঠাবে না তার জলজ্যান্ত প্রতিশোধ ? ভারতবর্ষেও পাঠাবে, তোমাদেরও পাঠাবে। তাই বলি অপমানে সমান হওয়ার চেয়ে সম্মানে সমান হওয়া ভালো।

বিবেকানন্দের সাম্যবাদ, সেই সম্মানের সাম্যবাদ, অপমানের সাম্যবাদ নয়।

'বিয়ে করো নি কেন ?'

'কাকে বিয়ে করব ? যে মেয়ের দিকেই তাকাই তার মাঝে আমার জগন্মাতাকে দেখি।' স্ত্রিয়ঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।'

একটি নিগ্রো কুলি এগিয়ে এসে স্বামীজির করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। বললে, 'আমাদের কী গর্ব আমাদের জাতের মধ্যে আপনি একজন মস্ত লোক হয়েছেন। আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি।'

স্বামীজি কুলির হাতখানি নিজের হাতের উত্তপ্ত বন্ধুতার মধ্যে টেনে নিল। বললে, 'ভাই তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ।'

ঘুণাক্ষরে তাকে এতটুকুও আভাস দিল না যে তার অনুমানে ভুল হয়েছে। সব সময়ে সহাস্যরসিক, পরিহাস করেও বললে না, আমার গায়ের রঙ কি তোমার মত কালো ? আর আমার মুখ চোখ নাক ঠোঁটের আকৃতি ?

না, তুমি ঠিক বলেছ। আমি তোমার জাতের লোক। আমি তুমি এক সত্তা। এক ঈশ্বর।

দক্ষিণাঞ্চলে হোটেলে স্বামীজিকে ঢুকতে দিচ্ছে না, বলছে, নিগ্রোর এখানে স্থান নেই। নিগ্রোর দোষ কি ? গায়ের রঙ কালো। চুল কাটবার সেলুনেও তাই। আমরা কালো চামড়ার নিগ্রোকে কামাই না।

স্বামীজি ওসব হোটেল সেলুন ত্যাগ করল। আপনি কেন বলেন না যে আমি নিগ্রো নই, আমি ভারতীয়, আমি ইংরেজের প্রজা।

'তার মানে ওদের আমি বোঝাব যে আমি নিগ্রোর চেয়ে উঁচু নিগ্রোর চেয়ে মানী ? আমি অন্যকে ছোট করে বড় হব ? তারই জন্যে আমি এসেছি পৃথিবীতে ?'

'ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, মানুষ এবার ঈশ্বর হবে। মানুষকে ঈশ্বর করতেই আমার আসা।'

'শুধু শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা।' বলছে স্বামীজি, 'ইউরোপে বহু শহরে ঘুরে তাদের দরিদ্রদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যার্জন দেখেছি, দেখে আমাদের গরিবদের

কথা মনে পড়ে চোখের জল ফেলেছি। কেন এ পার্থক্য? একমাত্র উত্তর পেলাম—শিক্ষা। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের জাগরণ। আর আমাদের ব্রহ্ম ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউ ইয়র্কে দেখতাম আইরিশ ঔপনিবেশিকরা আসছে—ইংরেজ-পদ-পীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার আগায় ঝোলানো একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। তার চলন সভয়, চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আরেক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভুষা বদলে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয়-ভয় ভাব নেই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে ঐ আইরিশম্যানকে তার স্বদেশে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি-পরিবেশ তাকে একবাক্যে বলছিল, প্যাট্রিক, প্যাট, তোর কোনো আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবিও গোলাম। আজন্ম শুনতে-শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপ্নটাইজ—সম্মোহিত করে রাখলে সে অতি নীচ, অতি অপদার্থ—তার ব্রহ্মও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল, প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষই তো সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, সাহসে বুক বাঁধ্। প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো, সঙ্গে-সঙ্গে তার ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি-পরিবেশও ধুয়ো ধরল, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

বিবেকানন্দ কি শুধুই একজন দার্শনিক, বৈদান্তিক বা সমাজ-তান্ত্রিক? সে মানবচেতনার সর্বোচ্চ শিখর। সে ঈশ্বর-আরূঢ়, ঈশ্বরে ওতপ্রোত।

হাতরাশ রেল স্টেশনের এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশনমাস্টার শরৎগুপ্ত যখন স্বামীজির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইল সন্ন্যাস নিয়ে, তখন স্বামীজি আপত্তি করল: 'কেন, ঈশ্বর কি তোমার গৃহে নেই? নেই কি তোমার নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে?' 'আছেন।' বললে শরৎগুপ্ত, 'ঈশ্বর সর্বভূতে এ কে না জানে? কিন্তু যেখানে আপনি সেখানে ঈশ্বর বেশি প্রজ্বলন্ত।'

স্বামীজির ডাক সেই প্রজ্বলন্ত ব্রহ্মশ্রীতে—ব্রহ্মানুভূতিতে—যে অনুভূতিতে সে শিকাগো ধর্মমহাসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-বোন বলে সম্বোধন করেছিল, আর যে ডাক শুনে সাত হাজার শ্রোতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, উত্তাল হয়ে উঠল আনন্দে, চেয়ার বেঞ্চ টপকে ছুটল তার পোশাকটা স্পর্শ করতে।

রিজলি-ম্যানরে মিসেস ব্লজেটের ঘরের দেয়ালে স্বামীজির পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। জোসেফাইন ম্যাকলাউড জিগগেস করল, 'উনি কে ?'

সত্তর বছরের গাম্ভীর্য ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সমুন্নত হয়ে মিসেস ব্লজেট বললে, 'যদি এই পৃথিবীর মাটিতে কখনো কোনো ভগবান থেকে থাকেন তবে ইনিই তিনি।'

ডেট্রয়েটে একদিন বক্তৃতা শোনার পর মার্গারিট কুক অভিনন্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল স্বামীজির দিকে। স্বামীজি কিছুক্ষণ তার হাতখানি ধরে রইল। কী বলবে, কিছু বলার আছে কিনা ভেবে পেল না মার্গারিট।

কী পেলাম সেই স্পর্শে ? বলছে মার্গারিট, সেই স্পর্শে বুঝলাম কাকে বলে পবিত্রতা, কাকে বলে মহত্ত্ব। পাছে সেই স্পর্শের স্বাদ চলে যায় সেই ভয়ে তিন দিন হাত ধুইনি।

তিন দিন হাত ধোওনি ?

না। যেদিন ধুলাম সেদিন আমি আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে চেতনার ঝংকার চলছিল তা থেমে গেল।

সেই ঈশ্বরচেতনার ঝঙ্কারে সমস্ত জীবন আলোকিত রাখো এই তো বেদান্তের কথা। বেদান্তে বিশ্বাসই তো বীর্যলাভের উপায়। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। তরবারি আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না, প্রস্তর দীর্ণ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। আমিই সর্বাত্মা সর্বশক্তিমান। এই অভীঃ মন্ত্র বেদান্তেরই উচ্চারণ আর বেদান্তের প্রত্যক্ষ ফলই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য নেতিবাদ নয়, নঞর্থক নয়, বৈরাগ্য বৈরস্য নয় বৈমুখ্য নয় বৈতৃষ্ণ্য নয়—বৈরাগ্য হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি প্রবল প্রগাঢ় সক্রিয় অনুরাগ। আর তাকিয়ে দেখ চারদিকে, সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত—ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বিত্তে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে তর্কভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে যমভয়—সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। আর বিবেকানন্দের সাম্যবাদ সেই অভয়ে।

যাকে দেখে তাকেই হাত তুলে নমস্কার করে আর বলে, নারায়ণ। ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলকে নারায়ণ বলে নমস্কার করো। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ এই নমস্কারে। 'সর্বদেবোনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।'

৪

ভারতসাধক বিবেকানন্দ

দেশ কাল নিমিত্তের জাল সরিয়ে ফেললে সবই এক, এক অখণ্ড সত্তা, আর অখণ্ড স্বরূপই ব্রহ্ম। স্বামিজী বলছে। নির্বিকল্পে পেঁাছে আবার সে নেমে আসছে দেশে, কালে, নিমিত্তে। এও সেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গায়ক সা থেকে নি-তে ওঠে কিন্তু নি-তেই অবস্থান করে না, আবার সা-তে নেমে আসে। তেমনি দেশকালহীনতায় উঠে গেলেও আবার দেশে-কালেই ফিরে আসতে হয়। লোকে ছাদে ওঠে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করবার জন্যে যে যে-উপাদান দিয়ে তার ঘর মেঝে দেয়াল তৈরি, ঠিক সেই উপাদানেই ছাদ তৈরি। যা ব্রহ্ম তাই জীব। যা জগদতীত সত্তা তাই দেশ। ছাদে তো কেউ আর স্থায়ী বসবাস করে না, আবার ঘরে নেমে আসে। তেমনি জগদতীত সত্তা থেকে তোমার দেশে, ভারতবর্ষে নেমে এস।

দেশকে ভালো না বাসলে পৃথিবীকে ভালোবাসবে কী করে? 'যে ভাইকে তুমি দেখছ,' বলছে স্বামীজি, 'তাকে যদি ভালো না বাসতে পারো তবে যাকে কখনো দেখনি তাকে কী করে ভালোবাসবে? নিজের মাকে যদি ভালো না বাসো, তার জন্যে যদি কিছু না করো তবে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীকে ভালোবাসবে কি করে, তাকে দেবে কোন উপচার?'

'গাছ বাঁচে মূলে জল দিলে।
পৃথিবীরে ভালোবাসা যায় স্বদেশেরে প্রথমে বাসিলে॥'

'আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন', বলছে স্বামীজি, 'অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছুদিন ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই। আর-আর দেবতারা ঘুমুচ্ছেন। তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্রই তাঁর হাত পা কান চোখ—তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কোন অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ছুটেছ, আর তোমার সামনে তোমার চারদিকে যে দেবতাকে দেখছ সেই বিরাটের উপাসনা কেন করছ না? কেন পারছ না করতে? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হবে তখনই আর-আর দেবতার উপাসনায় তোমার যোগ্যতা আসবে। আধ মাইল পথ হাঁটতে পারো না, হনুমানের মত সমুদ্র পার হতে চাও?

সকলেরই যোগী হবার সাধ, সকলেই ধ্যান করতে, ধ্যানে বসতে উন্মুখ, যেন সন্ধ্যেবেলায় খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বার তিনেক নাক টিপলেই হয়ে যাবে। এ কি তামাসা? আসল দরকার—চিত্তশুদ্ধি। কিসে এই চিত্তশুদ্ধি হবে? চিত্তশুদ্ধি হবে পূজায়—বিরাটের পূজায়। তোমার সামনে তোমার চারদিকে যাঁরা রয়েছেন—তোমার স্বদেশবাসিগণ—তাঁদের পূজা। এ'দের পূজা করতে হবে—সেবা নয়, সেবা বললে আমার অভিপ্রেত ভাব ঠিক বোঝা যাবে না—পূজা-শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ পাবে। এই সব মানুষ ও পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রধান উপাস্য।'

দেখছ কী উন্নত-উজ্জ্বল পুরুষ! আমেরিকা বিস্ময়মুগ্ধ চোখে দেখছে স্বামীজিকে। যখন ঈশ্বরের কথা বলছে তখন যেন ঊর্ধ্বশিখ আগুনের মত জ্বলছে, আর লক্ষ্য করেছ যখনই দেশের কথা বলছে, তখনই কণ্ঠস্বর কেমন মেদুরার্দ্র হয়ে আসছে, সে যেন আর বীর্যবান সন্ন্যাসীর স্বর নয়, এক মাতৃগতপ্রাণ মাতৃময়জীবিত সন্তানের স্বর। হ্যাঁ, আমার দেশই আমার মা।

দেশমাতাই জগন্মাতা।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ—ভারতবর্ষে জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা উচ্চতর। ভারতে মা-ই নারীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। মা নাম করলেই সর্বশক্তিমত্তার ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিমতী বলে ভাবে—মা সব করতে পারে। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে পূজা না করে আমরা নিজেদের কখনো জানতে পারি না, জাগাতে পারি না।

ভারতে প্রথমে গৃহমাতা, ক্রমে দেশমাতা এবং শেষে জগন্মাতা।

সমস্ত ভারতবর্ষ খালি পায়ে হেঁটেছে, দেশের মাটিকে দেশের ধূলিকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করেছে, গায়ে মেখেছে, আস্বাদ করেছে মাটির সঙ্গে মানুষের মমতাময় আত্মীয়তা। গেরুয়া পরেছে ঠিকই, গেরুয়া রঙের নয়নসুখ পরেনি। লিখছে অখণ্ডানন্দকে: বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর হে প্রভু, রামকৃষ্ণ বলায় কোনো ফল নেই, যদি স্বদেশবাসী গরিবদের কিছু উপকার করতে না পারো। মধ্যে মধ্যে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে চলে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম উপাসনা জ্ঞান—এই তিন কর্ম করো তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে নতুবা সব ভস্মে ঘৃতার্পণ। অচ্যুতানন্দ এলে দুজনে মিলে রাজপুতনার গ্রামে গ্রামে গরিবদের ঘরে ঘরে ফের।

যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয় তদ্দণ্ডেই তা ত্যাগ করবে। পরোপকারার্থে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করা ভালো। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্যে নয়, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় দিতে হবে। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর—এরাই তোমার দেবতা হোক—এদের সেবাই পরমধর্ম।

স প্রত্যক্ষ একঃ সর্বেষাং প্রেমরূপঃ—তিনিই প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কী কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু! বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান, দয়া-প্রেমের পুজো হোক দেশে। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি। সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। লোক না পোক! অভীঃ, অভীঃ। বেদান্তবীর্যে প্রতিষ্ঠিত হও।'

এই বীর্যবত্তা সর্বৈক-ঈশ্বরসত্তার সাধনাই ভারতের সাধনা।

হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত হেঁটেছে। কাশী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাতরাস—হিমালয়। আবার রাজপুতানা, আলোয়ার, জয়পুর, আজমির, খেতড়ি, আহমেদাবাদ, কাঠিয়াওয়াড়, জুনাগড়, পোরবন্দর, দ্বারকা। তারপরে বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা, বেলগাঁও। দক্ষিণে বাঙ্গালোর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। যত মানুষের যত সমাজ আছে, অভিজাত থেকে অপজাত, যত ঘর আছে, অট্টালিকা থেকে কুটির, রাজপ্রাসাদ থেকে কুলিধাওড়া, সর্বত্র অতিথি হয়েছে। প্রত্যক্ষ করেছে দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য, প্রাচুর্য আর রিক্ততা—প্রত্যেক ধূলিকণাকে স্বীকার করেছে তীর্থ বলে। বাস্তবের কাঠিন্য ও রুক্ষতার মধ্যে আবিষ্কার করেছে দৈব সত্তার মহিমা।

প্রত্যক্ষ করল শাশ্বত ভারতের শিবমূর্তি। নিরন্ন দরিদ্র আর প্রাচুর্যফেনিল মহারাজ, অসুস্থ ভিক্ষুক আর বলগর্বিত মোগল—সবাই সেই একজন। বিচিত্র দেশে একের আনাগোনা—রঙ্গমঞ্চে একেরই প্রবেশ-প্রস্থান। যখন সেই একজনকে ভালোবাসি, তখন সকলকেই ভালোবাসি। তাই বিবেকানন্দ আস্তাবলে সহিসদের সঙ্গে শুয়েছে, শুয়েছে গাছতলায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে, আবার কখনো রাজপ্রাসাদে, সুখশয়নে। একবার তো মধ্যভারতে মেথরদের বস্তিতে কদিন কাটিয়ে এল। দেখল কোথাও ভেদ নেই, ব্যবধান নেই—ভস্মস্তুপের নিচে একই আত্মার হীরকখণ্ড। সর্বত্র এক, সমস্ত এক—এক ছাড়া দুই নেই কোনোখানে।

এই বেদান্তদৃষ্টি এই সমত্ববুদ্ধি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কার?

মেরী হেলকে লিখছে, 'প্রিয় মেরি, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে পুজো করেছে, আর সমস্ত দেশের ভেতর যেরূপ আদর-অভ্যর্থনার ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে এমনটি আর কারু হয়নি। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হত যে শান্তিরক্ষার জন্যে পুলিশের দরকার হত। তবু তোমাকে বলি নামযশ প্রতিষ্ঠায় আমার রুচি নেই, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা আমার প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি হয়ে গেছে। আমার শুধু এই প্রার্থনা, নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী সেই ভগবানের পুজোর জন্যে আমি যেন বার-বার জন্মগ্রহণ করি আর সহস্র-সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হোন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।

হে মূর্খ, যে সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত তাকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষ দেবতারই উপাসনা করো, আর-আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।'

বলো সোঽহং, শিবোঽহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরে দুস্তরে, অরণ্যে রণে দারুণে, পর্বতে সমুদ্রে—যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো, আমিই সেই, আমিই সেই। কোথায় আমার ভয়, কোথায় আমার পাপ, কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমিই নিত্যমুক্ত, নিত্য-পরিপূর্ণ, আমিই সেই স্বপ্রকাশ পুরুষ। আমি দেহ নই, জড় নই, আমি আত্মা, আমি ব্রহ্ম—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম।

বলো, হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্ম এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা কীর্তন করেছে? হ্যাঁ, আছে অনেক স্বার্থান্ধ ভেদবুদ্ধি, অনেক আসুরিক অত্যাচার কিন্তু তার জন্যে দায়ী ধর্ম নয়, দায়ী সমাজ, সমাজ-ব্যবস্থা।

কন্যাকুমারিকায় যখন এসে পেঁছিল, স্বামীজির ইচ্ছে হল সমুদ্রের মধ্যে অনতিদূরে যে শিলাখণ্ডটা আছে সেখানে যাবে। কিন্তু কী করে যাবে?

'একটা নৌকো করুন।' পারের লোক কে বললে।

'নৌকো?

'কেন, পয়সা নেই?'

স্বামীজি হাসল, বললে, 'গ্রন্থিও নেই।'

'তবে যাবেন কী করে?'

'কেন, সাঁতরে।'

'হাঙর-কুমির আছে যে—'

'কী করবে হাঙর-কুমির ? মেরে ফেলবে ? তার বেশি কিছু নয় তো ?' বলে স্বামীজি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। উত্তাল সমুদ্রকে সবল বাহুতে পরাভূত করে উঠল এসে শিলাখণ্ডে। সবাই জানে সেই শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজি ধ্যান করেছিল। কিন্তু ধ্যানে বসবার আগে সে ঊর্ধ্ব-উচ্ছ্রিত স্তবের মত দাঁড়াল শিলাখণ্ডে। দাঁড়াল ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে। দুই বাহু বাড়িয়ে দিল। এক বাহুতে পৌরুষ আরেক বাহুতে প্রেম। যেন গোটা দেশটাকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরল। জ্ঞান আর প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে কে আর এমন একাত্ম করে দেখেছে দেশকে !

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য, সর্বপ্রেম-মোহনাত্মা সুধাংশু।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের বক্তৃতায় বিবেকানন্দ কী বিশাল উত্তাল অভিনন্দন পেয়েছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে। বক্তৃতান্তে হোটেলে ফিরে এসে স্বামীজি কাঁদতে বসল। ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, অসাধ্যসাধন হল বলে নয়, মূককে বাচাল করলেন বা পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করালেন—তার জন্যেও নয়। কাঁদতে বসল ভারতবর্ষের কথা ভেবে। আর দেশ তো মাটি কিংবা জল বা পাথর নয়, দেশ হচ্ছে মানুষ। কাঁদতে বসল বঞ্চিত অধঃপতিত হৃতসর্বস্ব স্বদেশবাসীদের দুঃখের কথা ভেবে। আমার দেশের লোকের যখন এত দুঃখ এত দৈন্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে ? যদি দেশকে দেশবাসীকে টেনে তুলতে পারি তার অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে তবেই আমার সমাদর।

তোমার দেশ কী দিয়েছে ? কী শিখিয়েছে ?

শিখিয়েছে পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। ভারতবর্ষ কাউকে কোনোদিন পীড়ন করেনি, বরং পরকে আশ্রয় দিয়েছে, আবাস দিয়েছে, আরাম দিয়েছে। পরের জন্যে নিজের মুক্তি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। পরহিতে স্বার্থত্যাগ সর্বস্বত্যাগকেই বড় বলে মেনেছে।

সেবার কী হল ?

ডক্টর রাইট বস্টনে, স্টেশনে এসে স্বামীজিকে শিকাগোর ট্রেনে তুলে দিলেন। দেখলেন কামরায় তাঁর এক পরিচিত ধনকুবেরও চলেছে শিকাগোতে। স্বামীজির

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, এ এক হিন্দু সাধু নতুন আমেরিকায় এসেছে। চলেছে ধর্মসভায় যোগ দিতে। শিকাগোতে কাউকে চেনেনা-জানেনা, তুমি দয়া করে ওকে যথাস্থানে পেঁছে দিও।

তা নিশ্চয়ই দেব। ধনকুবের প্রতিশ্রুতি দিল।

সন্ধ্যার কাছাকাছি শিকাগোতে ট্রেন এসে দাঁড়াল। স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। স্বামীজি নামল। কিন্তু কোথায় সেই ধনকুবের। সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তার বয়ে গিয়েছে সাহায্য করতে। কে কোথাকার এক মাথায় বস্তাবাঁধা অদ্ভুত সন্ন্যাসী, একটা পরাধীন দেশের লোক, তার জন্যে মাথাব্যথা—সময়ের অপচয়।

স্বামীজি বললে, এইখানে—এইখানে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের তফাৎ। ভারতবর্ষ হলে কখনোই আতিথেয়তায় এমন দীন হত না, সাহায্য করতে না পারলেও সৌজন্য দেখাত, অন্তত একটু প্রিয় না হোক নম্র সম্ভাষণ করে যেত—এমনি করে একটা সর্বস্বান্ত হৃদয় দেখিয়ে পালাত না। বললে, ভারতবর্ষ চিরকাল পরের জন্যে করেছে পরের জন্যে লড়েছে—আর পশ্চিম ? চাচা আপন বাঁচা।

কী শিখিয়েছে ? শিখিয়েছে ঈশ্বরে আর আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদবুদ্ধি, অভেদদর্শনই সত্য আর ভেদবুদ্ধি, ভেদদর্শনই মিথ্যে।

যীশুখৃস্টের দিকে তাকাও, তাকাও বুদ্ধের দিকে।

যীশু ইহুদি ছিলেন আর বুদ্ধ ছিলেন হিন্দু। ইহুদিরা যীশুকে শুধু পরিত্যাগ করেছিল, তাই নয়, ক্রুশবিদ্ধও করেছিল। আর হিন্দুরা ? তারা বুদ্ধকে শুধু গ্রহণই করেনি, অবতাররূপে পূজা করেছে।

কিন্তু তোমরা দরিদ্র কেন ?

তাই বলে আমাদের ধর্ম দরিদ্র নয়। আমরা নিজেরা অধঃপতিত বলে আমাদের ধর্ম অধঃপতিত নয়। আমাদের দারিদ্র্যের জন্যে মূলে আমরাই দায়ী—মনে নিচ্ছি, কিন্তু ইংরেজকে তুমি কী বলবে ? যে নিজের স্ফূর্তির জন্যে আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। সহস্র হাতে আমাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে যাতে আমরা নিরন্নের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশুশক্তির নির্লজ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়েছে, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেরুদণ্ড।

'ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ ?' বলছে বিবেকানন্দ : 'হিন্দু রাজারা

রেখে গিয়েছে সৌধের পর সৌধ, আর ইংরেজ ? ইংরেজ কী রেখে যাবে ? রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যান্ডি-বোতলের স্তূপ।'

স্বামীজি কি জানে না তার দেশের কী দুর্দশা, কী দুর্গতির মধ্যে সে নিমজ্জিত ! তাই নিবেদিতাকে লিখছে :

'তোমাকে খোলাখুলি বলছি, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—সৎকাজে অনেক বিঘ্ন। ওদেশে এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার ও দাসত্ব যে কী রকম তা তুমি ধারণাও করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা ! ভয়েই হোক বা ঘৃণায়ই হোক তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে আর শ্বেতাঙ্গরাও এদের প্রাণপণ ঘৃণা করে। উলটে, শ্বেতাঙ্গরা তোমাকেই পাগল মনে করবে আর তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।

তা ছাড়া জলবায়ুও অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গায় শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত। আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদা আগুনের হলকা চলছে। শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাব।

কাজে ঝাঁপ দেবার আগে বিশেষভাবে চিন্তা কোরো আর কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কোনো কাজে যদি বিরক্তি আসে তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্যেই কাজ করো আর নাই করো, বেদান্তধর্ম ধরেই থাকো আর ছেড়েই দাও। 'মরদকী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভেতরে যায় না। খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

কিন্তু তাই বলে নিছক নিন্দা করে লাভ কী ?

আবার লিখছে : 'যে ব্যক্তি সত্যসত্যই জগতের দায় নেয় সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে-করতে আপন পথে এগিয়ে চলে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না—তার কারণ এ নয় যে জগতে পাপ নেই, আসলে তার কারণ এই যে সে নিজে তা কাঁধে তুলে নিয়েছে—স্বেচ্ছায়, নিজের গরজে। যে উদ্ধার করবে তাকে সানন্দেই পথ চলতে হবে, যারা উদ্ধার হতে আসবে তারা তোমার পথে আসুক আর নাই আসুক।'

তবু সমস্ত দোষ সমস্ত কলুষ সমস্ত মালিন্য সত্ত্বেও আমার জন্মভূমি গুণগরিষ্ঠা।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার আগে কিছুকাল স্বামীজিকে থাকতে হয়েছিল বস্টনে, শস্তার জায়গায়। সে শহরে এখানে-সেখানে আড্ডায়-আখড়ায় খুচরো-খাচরা বক্তৃতা দিতে হয়েছে স্বামীজিকে, স্থানীয়দের ফরমাস মত। পিছিয়ে যায়নি স্বামীজি। যত সব গোলমেলে বিষয়—তা হোক, ঠাকুরের কথায়, গোলমালের মধ্যে গোলও আছে, মালও আছে—গোল ছেড়ে দিয়ে মালটুকু নাও। অসারের থেকেই সারোম্ধার করে বিতরণ করব তোমাদের।

প্রথম বিষয় ছিল, হিন্দুদের জাতিভেদ।

জাতিভেদ, ভুল কোরো না, এসেছে সামাজিক প্রথা থেকে, কর্মবিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। কালের নিয়মে সমাজের বিবর্তন হবে, উঠে যাবে জাতিভেদ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে, কিংবা তারও আগে থেকেই প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ফলেই উঠতে থাকবে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম, যে ধর্ম বেদান্তের স্রষ্টা, তাকে কেউ নড়াতে পারবে না টলাতে পারবে না কোনোদিন। সে ধর্ম তো কোনো ব্যক্তিকে প্রচার করে না, আদর্শকে প্রচার করে। সেই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ঈশ্বরত্ব।

আর তোমাদের জাতিভেদ সম্পর্কে কী বলবে? কর্মের ভেদ নয় চর্মের ভেদ। যেহেতু গায়ের রঙ কালো সেইহেতু তার গায়ের চামড়া ছুলে নাও, তাকে জ্যান্ত পোড়াও। তোমরা কী নিদারুণ সভ্য তোমাদের হাতে মানব অধিকারবাদের কী অনবদ্য রূপায়ণ!

কিন্তু তোমাদের সতীদাহ। আরেক সভায় ধরল স্বামীজিকে।

সে-প্রথা তো উঠে গেছে। যা এখন আর চালু নয় তাকে টানো কেন? কিন্তু তবু বলি, এ প্রথার জন্ম হয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচ্ছেদ্য অনুরক্তি থেকে। যেমন রাজপুতরমণীদের জহর ব্রত এসেছে সতীত্বের প্রতি গভীর মর্যাদাবোধ থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক বিধবাকে জোর করে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হয়েছে—সে বর্বরতা অমার্জনীয়, কিন্তু যে প্রেমের থেকে মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী অভেদ এই সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে আত্মাহুতি দিল তাকে তুমি মূল্য দেবে না, তার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে দেখবে না প্রশংসার চোখে?

কিন্তু, যাই বলো, তোমাদের নারীদের সামাজিক দুর্গতি ভয়াবহ। সেই সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করো।

আরেক সভায় দাঁড়াল স্বামীজি। এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক সভায়।

অস্বীকার করব না যে দুর্গতি বর্তমান। কিন্তু তার কারণ পর্দা ও অশিক্ষা। পর্দার কারণ ঐতিহাসিক, অশিক্ষার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক। এ-সব তো সাময়িক সমস্যা, কালধর্মে দেখতে-দেখতে অদৃশ্য হবে। কিন্তু ভারতীয় নারীর যে মহিমা তা চির-অম্লান থাকবে। বলছে স্বামীজি, 'পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও তেমনি দেখলাম না।'

ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তার আরম্ভ মাতৃত্বেই তার শেষ। মাতৃত্বেই তার পরাকাষ্ঠা। আর পাশ্চাত্ত্যে নারী—স্ত্রীশক্তি। ভারতবর্ষের এই 'মা' দিয়েছে, ঈশ্বরকে আমরা মা বলে ডাকি। এর চেয়ে পবিত্র এর চেয়ে মধুর এর চেয়ে আন্তরিক আর কোনো ডাক নেই। মা-ই করুণা ও ভালোবাসার আদর্শস্বরূপ। স্বার্থলেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাময়ী মা—স্ত্রী তাঁর পশ্চাদনুসারিণী ছায়া। তোমাদের পরিবারে স্ত্রীই সর্বেসর্বা, মা যদি সেখানে থাকেন তিনি স্ত্রীর দাসী হয়ে থাকবেন। ভারতের পরিবার মা'র কর্তৃত্বাধীন। মা'র আগে যদি আমরা মরি—সেই মৃত্যুসময়েও স্ত্রী-পুত্রকে আমরা মায়ের স্থান অধিকার করতে দিই না—আমরা মায়ের কোলেই মাথা রেখে মরতে চাই। তোমাদের দেশে এমন ছেলে দেখলাম না যে মাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। কোন এক ছেলে টাকা রোজগার করে এনে কিছু অংশ তার মাকে দিয়েছে, সে কী হৈ-চৈ। আমাদের দেশে এ নিত্যকার ঘটনা। রোজগারের সমস্ত টাকাই সে মায়ের হাতে তুলে দেয়।

আমরা হিন্দুরা ঈশ্বরকে দেনেওয়ালা রাজা বলে মানি না, ঈশ্বরকে পিতা বলতেও আমরা ভয় পাই, দূর দূর মনে হয়, কেননা হিন্দু পিতারা ছেলেদের শাস্তি দেয় প্রহার করে। ঈশ্বর আমাদের মা, তোমাদের যীশুর যেমন ম্যাডোনা। আমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাকি, মায়ের মত ভালোবাসি। সে আমাদের অহেতুক ভালোবাসা। যে মা গরিব, কিছু দেবার-থোবার যার সাধ্য নেই, সঙ্গতি নেই, তাকেও তার ছেলে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। কিছু চায় না কিছু পায় না তবুও ভালোবাসে। এ রকম ভালোবাসা বাসতে পারো? ভাবতে পারো? ভালোবাসায় যদি মতলব থাকে, বলো তা হলে কি তাতে সুখ আছে?

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল স্বামীজি। শিষ্যকে বললে, 'দেখছিস

অন্ধকারের কী অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!' স্থির তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে গান ধরল :

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

গান সাঙ্গ করে বসল আর মা-কালী মা-কালী বলতে লাগল।

'আপনি যেন কী রকম হয়ে গেলেন অন্ধকার দেখে!' শিষ্য বললে।

স্বামীজি মৃদু হাসল। আবার গান ধরল : 'কখন কী রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।—কালী সুধা-তরঙ্গিণী।' গান থামিয়ে বলল, 'এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, সাপের চলা আর সাপের স্থির হয়ে থাকা—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এবারে ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব।' বলে উঠল স্বামীজি, 'রঘুনন্দন বলেছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ন হন, মা'র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

হিমালয়ে আছে স্বামীজি, অরুণোদয়ে দেখছে গিরিরাজকে। তুষারশীর্ষে প্রভাতের আলো পড়েছে।

নিবেদিতাকে বললে, 'ঐ দেখ। ঐ যে তুষারমণ্ডিত সুশুভ্র শৃঙ্গ—ও হচ্ছে শিব আর ওর উপরে যে রক্তিম আলোকচ্ছটা—ঐ হচ্ছে উমা। জগজ্জননী।'

অম্ভোরুহশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

'কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা?' আমেরিকা আবার প্রশ্ন করল।

অত বড় একটা প্রতীক, হিমালয়, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা করি কী। কিন্তু বলিহারি তোমার বুদ্ধি, আমরা বুঝি পুতুল পুজো করি? আমাদের প্রতিমা পুতুল নয়, সেই প্রতিমা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। যে ঈশ্বর অনন্ত তাকে তুমি কী করে কল্পনায় আনবে? একটা কিছু স্মারকচিহ্ন পেলে সুবিধে হয় না কি? তাই সীমাবদ্ধ ঘাটের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে। কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? আমি অনেক ভক্ত খৃস্টানকে জিগগেস করেছি, বুকে হাত দিয়ে বলো তো, উপাসনার সময় কী ভাবো? শূন্য? শূন্য কখনো ভাবা

যায় ? আমাকে কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রুশ, কেউ স্বয়ং যীশু। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে ? অক্ষর ছাড়া আর কী করে বাক্যকে ধরবে ? বাক্য ছাড়া কী করে ধরবে ভাবকে ?

সকলেরই জন্মগত পৌত্তলিকতা, আর সেটা যখন মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার তখন সেটাকে খারাপ বলো কী করে ? তোমরা কি এই জগৎরূপ প্রকাণ্ড পুতুলটার পুজো করছ না ? তোমরা তো জড়বস্তু নও, তোমরা তো চৈতন্যময়, অথচ নিজেদের কেবল শরীর বলে ভাবো, এই শরীরের কেবল ভোগ চড়াও—এ কি পৌত্তলিকতা নয় ? যখন বলো, 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না—সত্যি করে বলো। যদি শরীর-চিন্তা আসে তা হলে নিশ্চয় তুমি পুতুলপুজক।

ধর্ম, বলছে বিবেকানন্দ, বুদ্ধির কচকচি নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষানুভূতি। সে অনুভূতির জন্যে চিন্তা বা দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়—তার সামনে মূর্তি না শূন্য, কিছু এসে যায় না। শুধু আসক্তি ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আন্তরিক হয়েই পাওয়া যায় ঈশ্বরকে।

শ্রেষ্ঠ মূর্তিপুজককে দেখ, তার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি মূর্তিপুজার ফলে ঐ রকম অমৃতময় পুরুষ পাওয়া যায় তা হলে মূর্তিপুজাকে কেন নিন্দে করবে ?

আসলে হিন্দু ভাবতে চেষ্টা করে যে সে সোঽহং, সে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ভাবতে চেষ্টা করে সে দেশেকালে সীমাবদ্ধ নয়, সে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, তার পিতা নেই, মাতা নেই, জাতি নেই, সংসারে কোনো আত্মীয়বন্ধু নেই, সেই নির্বিকল্প নিরাকার।

> ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে মাতা নৈব মে জন্ম।
> ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

এই আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে সাধারণ মানুষ সক্ষম হয় না, তখন সে চোখ খোলে, বলে, প্রভু, আমার অসামর্থ্যকে ক্ষমা করো, তোমাকে আত্মস্বরূপে ধ্যান করতে পারলাম না, তাই সাকার মূর্তিতেই তোমাকে চিন্তা করি, প্রণাম করি, প্রার্থনা জানাই, আর আমার এই অসম্পূর্ণ পুজার জন্যে আমাকে অপরাধী করো না।

ব্যাসদেবের তো সেই প্রার্থনা, আমাকে ক্ষমা করো। হে জগদীশ্বর, তুমি

রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি বাক্যের অতীত অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থ ভ্রমণ করে তোমার সেই সর্ব-ব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতাদোষত্রয় মার্জনা করো।

কিন্তু ম্যাক্সমুলারের ভারতবর্ষের প্রতি কী অনুরাগ! ভারতবর্ষই আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। পঞ্চাশ বছরেরও উপর ভারতীয় চিন্তা-রাজ্যে বাস ও বিচরণ করছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল অরণ্যে ঘুরে ঘুরে আলোছায়ার খেলা দেখেছেন, ফল-ফুল কুড়িয়েছেন, আঘ্রাণ-আস্বাদে মাতোয়ারা হয়েছেন। এ কেমন করে হয়? শুধু তাই নয়, সুদূর বাংলার কোন এক অকিঞ্চিৎ গ্রামের এক দরিদ্র অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবন ও উপদেশ জেনে নিয়েছেন আদ্যোপান্ত। 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক শ্রদ্ধা-প্রেমদীপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। এ কী করে সম্ভব হল? তিনি কী করে টের পেলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। শ্রীরামকৃষ্ণই সমগ্র ভারতবর্ষ —অতীত ও বর্তমান।

অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে স্বামীজি।

কে কাকে দেখে? যেন বশিষ্ঠের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন।

ধর্মের উদ্দেশ্য কী? ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। কৃষ্ণদর্শনের ফল কী? কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন।

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' গীতায় ভগবান বলছেন, আমার ভক্তের যারা ভক্ত তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই আপনাকে আমার দেখতে আসা। আপনার কাছে আমার আসা তীর্থযাত্রীর সমান।

স্বামীজিকে পেয়ে ম্যাক্সমুলারের সে কী আনন্দ! কত যত্ন কত সেবা কত সহৃদয়তা! তাঁরা সহধর্মিণীও সেই এক ব্রতে সমাসীন।

স্বামীজি বললে, আজকাল হাজার হাজার লোক শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো করছে।'

রজতশুভ্র কেশ, ললাটে শৈশবের সারল্য প্রসন্ন মুখে ম্যাক্সমুলার বললেন, 'এমন লোককে পুজো করবে না তো কাকে করবে?'

অনেক কথার পর স্বামীজি জিগগেস করলে, আপনি ভারতবর্ষে কবে যাচ্ছেন?'

আশ্চর্য, ম্যাক্সমুলারের চোখে একবিন্দু অশ্রু এল, কিন্তু মুখে হাসি—

মৃদুভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হলে আমি আর ফিরব না। আমার মৃতদেহকে তা হলে সেখানেই দাহ করতে হবে।'

রেল-স্টেশনে স্বামীজিকে তুলে দিতে এলেন মুলার।

'ও কী, আপনি এই বৃদ্ধবয়সে কেন এত কষ্ট করলেন?' স্বামীজি ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মুলার স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তের সঙ্গে তো প্রত্যহ দেখা হয় না। যতক্ষণ সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষনই আনন্দ।'

তোমাদের মত আমরা পরধর্মনিন্দুক নই। তাকিয়ে দেখ মিশনারিদের দিকে। বলছে বিবেকানন্দ, কী পরিমাণ বিষ ঢালছে হিন্দু দেবদেবীর উপর! আমারই দেশে এসে আমারই পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত দিচ্ছে, আমার ধর্মকে গালাগাল করছে, আমার দেশের সবকিছুকে গর্হিত বলছে। মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে-যেতে বলছে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি।' হিন্দু নিরীহ, অহিংস, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় বলে যায়, মূর্খেরা যা বলবার বলুক। এই হল তাদের ভঙ্গি। তোমরা, যারা অন্যকে গালাগাল দেবার জন্যে কতগুলি মানুষকে শিক্ষিত করছ, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চিৎকার করছ, 'আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান আমরা ধনিশ্রেষ্ঠ, বিলাসশ্রেষ্ঠ, আমরা দুনিয়াশুদ্ধ লোককে গাল দেব শাপ দেব, যা কিছু বলব, কিন্তু আমাদের কাছে কেউ ঘেঁষো না, আমরা স্পর্শকাতর—যেন লজ্জাবতী লতা।'

শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো, তোমাদের ক্যাথলিক চার্চ, তোমাদের খৃস্টনীতি সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়েছিল কী করে? এক ফোঁটা রক্তপাত না করে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বলো তো—তলোয়ার ছাড়া খৃস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও—আমি দুটি চাই না। 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।' কেন? 'কারণ আমরা অন্যকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন। রোমানরাও ঐ কথা বলত। কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ঐ সব অহঙ্কারের নীতি পড়বে হুমড়ি খেয়ে। স্বার্থপরতার ভিত্তির উপর যা রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার একমাত্র লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস

হবেই। যদি বাঁচতে চাও, খৃস্টের কাছে ফিরে যাও। ফিরে চলো তাঁর কাছে যার মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না। পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গুহা আছে কিন্তু মানব-পুত্র যীশুর এমন একটি জায়গা ছিল না যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন। তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে, বিলাসের লোভ দেখিয়ে। ঈশ্বর আর ধনদেবতা ম্যামনকে একই সংগে সেবা করতে পারবে না। যদি পারো—সম্পদের সংগে খৃস্টের আদর্শকে মেলাও। যদি পারো মেলাতে, বেঁচে যাবে। নইলে, যদি না পারো, বরং সম্পদ ছেড়ে দাও, ফিরে চলো খৃস্টের কাছে। খৃস্টশূন্য প্রাসাদে বাস করার চেয়ে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খৃস্টের সংগে বাস করার জন্যে প্রস্তুত হও।

আমরা তো তোমার যীশুখৃস্টকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি, টেনে নিতে পারি কী, টেনে নিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার কৃষ্ণকে টেনে নিতে পারো? পারো না। বুদ্ধকে টেনে নিতে পারো? না, তাও পারো না। আমি একসংগে যীশু, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে প্রণাম করি।

তোমরা বলো আদিম পাপ, আমরা বলি আদিম পবিত্রতা। আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশ্বরত্ব। আর আমাদের ধর্ম হচ্ছে সেই ঈশ্বরত্বের উদ্বোধন।

তোমাদের মিশনারিরা কী বলতে চাইছে? আগে ঈশ্বর একদেহে অপবিত্র ছিলেন, খৃস্টান হবার পর সেই ঈশ্বর সেই দেহেই পবিত্র হয়ে উঠলেন! এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা শুধু সহনশীল নই, আমরা বহনশীলও। আমরা শুধু মেনে নিই না, টেনেও নিই। তোমরা বড় জোর এটুকু বলতে পারো, পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি। আমরা এর চেয়ে ঢের বেশি বলি। বলি, ভাই, কাছে এস, হাতের সংগে হাত মিলিয়ে হাত ধরাধরি করে চলি।

তোমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থকেন্দ্রিক। তোমাদের ভাষায়, ব্যাকরণে, প্রথম পুরুষ, ফার্স্ট পার্সন, আমি, I, অহং। ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার। আমাদের ভাষায়, আমাদের ব্যাকরণে প্রথম পুরুষ, সে, তিনি—আমি নই। আমাদের সৌজন্য, সৌশীল্য, বিনয়।

'আর আমাদের হিন্দুধর্ম এ শেখায়,' বলছে বিবেকানন্দ, 'সব ধর্মই সত্য, সব ধর্মই সমান মহান। সব ধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে, সব রাস্তাই রোমে। সব নদীই সমুদ্রে। পাত্র বিচিত্র জল এক। মত বিচিত্র মানুষ এক। মানুষের ঈশ্বর এক।'

এই তত্ত্বই আমার গুরু আমার দক্ষিণেশ্বর নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তোমাদের মত, অন্ধের মত, হাতি দেখেননি—একের অংশে হাত দিয়ে হাতি মুলোর মত কুলোর মত দড়ির মত থামের মত বলেননি। চোখ খুলে সমস্ত হাতিটাকে দেখেছেন। সমগ্র মানুষটাই ঈশ্বর।

'আমি যে হিন্দু এতে আমি সুখী।' ডেট্রয়টে বলছে স্বামীজি, 'রোমানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে তখন বহু সহস্র ইহুদি ভারতবর্ষে এসে বসবাস করে। আরবদের দ্বারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু সহস্র পারসিকও ভারতে আশ্রয় পায়। ভারতে কেউ নিপীড়িত হয়নি। ইংরেজ মিশনারিদের প্রথম দলকে ইংরেজ সরকার জাহাজ থেকে ভারতে নামতে বাধা দিলে, শুনলে আশ্চর্য হয়ো না, একজন হিন্দুই মিশনারিদের হয়ে দরবার করে তাদের নামতে সাহায্য করেন। হ্যাঁ, দোষ আর কুসংস্কার আছে আমাদের, কার নেই ? তবে এটা ঠিক, নানা দোষ ও কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা কখনো অন্যের উপর অত্যাচার করেনি। আর নানা দোষ ও কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুধর্মই বিশ্বজনীন মানুষের ধর্ম। আমি পূর্ব হতেই পূর্ণ, অনন্তকাল ধরে পূর্ণ, আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু—হিন্দু ছাড়া এ কথা কে বলতে পেরেছে ? তোমার শক্তিতেই সূর্য আলো দিচ্ছে, সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে, পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে। তোমার আনন্দেই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসছে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুমিই সকলের মধ্যে সর্বস্বরূপ হয়ে আছ। কাকে ত্যাগ করবে ? কাকে গ্রহণ করবে ? তুমিই যে সমুদয়। হিন্দু ছাড়া এমন উচ্চতানে কে সুর ধরেছে ?'

কিন্তু তোমাদের পুনর্জন্মবাদ ? ওটা সম্বন্ধে কী বলবে ?

'পুনর্জন্মবাদ ধর্মবিষয়ে আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়।' বলছে স্বামীজি, 'বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্যে আমার একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে। আমি যদি আমার ভাগ্যবিধাতা না হই তা হলে আমি স্বাধীন কোথায় ? আমার বর্তমান জীবনের দুঃখের দায়িত্ব আমি নিজেই স্বীকার করি, অন্ধ নিয়তির উপর ছেড়ে দিই না, পূর্বজন্মে যে অশুভ সঞ্চয় করেছি এ জন্মে আমি তা ধ্বংস করব, ধ্বংস করে শুভতর কর্মে পুণ্যতর জীবনে প্রবেশ করব। আমার ক্রমাগত উন্নতি হবে আর উন্নতিই নিয়ে যাবে পূর্ণতায়। পুনর্জন্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি এইখানে।

কিন্তু তোমাদের স্ত্রীজাতির দুর্দশা—

যা দুর্দশা দেখছ তা সামাজিক, তা প্রথাগত। কালধর্মে তার একদিন শোধন হবে। কিন্তু আমাদের আদর্শটা দেখ। বলছে বিবেকানন্দ। আমাদের আদর্শ সীতা, সীতাই মূর্তিমতী ভারতমাতা। পরমশুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। ভারতে যা কিছু শুভ যা কিছু পবিত্র যা কিছু পুণ্যময় সীতা-নাম তারই পরিচায়ক। ভোগ করে শক্তি দেখানো নয়, সহ্য করে শক্তি দেখানো। এত দুঃখেও কখনো রামের উদ্দেশ্যে একটিও কঠিন বাক্য উচ্চারণ করেননি। চরম অবিচারেও বিক্ষুব্ধ হননি। এত বড় তিতিক্ষা আর কোথায় আছে ? বুদ্ধ বলেছেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের কোনো প্রতিকার হয় না, ওতে নতুন একটি পাপের শুধু সৃষ্টি হয়। সেই অসম্ভব উচ্চাদর্শই সীতার প্রকৃতিগত। আমাদের মেয়েরা এই সীতার—মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা। ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে আছে ভারতীয় নারী—গার্গী, মৈত্রেয়ী। আর পরমব্রহ্মচারিণী সারদামণির জুড়ি কোথায় ? কী বলছে ম্যাক্সমুলার ? 'শরীরসম্বন্ধ না রেখে ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করে ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন এ দৃষ্টান্ত ইউরোপে নেই—একমাত্র হিন্দুতে আছে, রামকৃষ্ণে আছে।'

'কিন্তু জেনো আমি ধর্মপ্রচারক নই' বলছে বিবেকানন্দ, আমি শুধু সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। আর এ সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হয় তার পথ খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, পেয়েওছি সে পথ, কিন্তু আমার দেশবাসীরাই এ পথে কণ্টক আরোপ করছে। কিন্তু তবু আমার সেই দেশবাসীকেই আমি ভালোবাসি। আমার চরিত্রের যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে সে আমার দেশপ্রীতি—গভীর দেশপ্রীতি।'

'কিন্তু দেশপ্রীতিকে কর্মে রূপায়িত করা চাই। কিছু একটা করো পরহিতে, দেশহিতে। মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভালো। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশি বেঁচেই বা লাভ কী ? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে মরা ভালো।

একবার চোখ খুলে দ্যাখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্যে কী হাহাকারটা উঠেছে ! বিজ্ঞানের সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর। ঐ অন্ন-

বস্তের সংস্থান করবার জন্যেই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায়-চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কী করছিস ? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্ম-তৎপরতা দিয়ে ঐহিক ভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতর-সাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্ন-সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে তা কে বলতে পারে ?

দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও। দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্যে জীবন বলি দাও। যারা দিন দিন ডুবছে তাদের উদ্ধারে সর্বস্ব নিয়োগ করো।

লণ্ডন ছাড়বার আগে সেভিয়ারকে বলছে স্বামীজি : আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ। আমার মন শুধু ভারতের দিকে ধাবমান।

'প্রায় চার বছর কাটালেন পশ্চিমে,' বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সমৃদ্ধিমান সভ্যতার সঙ্গে, এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাগবে ? পদানত পরাধীন দেশ !'

'বলো কী !' গর্জে উঠল বিবেকানন্দ : 'যখন ছেড়ে আসি তখন সমস্ত দেশটাকেই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাব-মূর্তিরূপে, এখন আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসছি।'

মিস জোসেফাইন্ ম্যাকলাউড স্বামীজিকে জিগগেস করলে, 'স্বামীজি, আমি কী ভাবে আপনাকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারি ?'

স্বামীজি বললে, 'শুধু ভারতবর্ষকে ভালোবেসে।'

৫

ভক্ত বিবেকানন্দ

একটি ছ-সাত বছরের বালক হারিয়ে গিয়েছে। কত খোঁজাখুঁজি দৌড়া-দৌড়ি, কোনো পাত্তা নেই। কত থানা-পুলিশ বিজ্ঞাপন এস্তেলা কোনো সুরাহা নেই। মা-বাপ পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। আহার নেই নিদ্রা নেই, উদ্বেগে-দুশ্চিন্তায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যমে নিলে হয়তো প্রবোধ ছিল। কিন্তু এ কী হল, কোথায় গেল ?

ছ মাস পরে খবর পাওয়া গেল ছেলে পাওয়া গিয়েছে। এ জানলেই হল ? ছেলে পাওয়া গিয়েছে, ব্যস, এইটুকু জেনেই তৃপ্তি ? না, বাপ-মা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করবে, কোথায়, কোথায় পাওয়া গিয়েছে ?

যে তোমার পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রিয়, তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এটুকু জানলেই নিবৃত্তি হবে ? সে কোথায়— একবারও জিজ্ঞাসায় উদ্বেল হয়ে উঠব না ?

ছেলে পাওয়া গিয়েছে কোথায় ? বসিরহাটে।

বসিরহাটে। শুধু এ জানলেই হবে ?

না, হবে না। বসিরহাটে যেতে হবে। কবে যাবে ? একবিন্দু সময় দেরি করবে না, তক্ষুনি-তক্ষুনি যাবে। পাঁজি-পুঁথি দেখবে না, মঘা-অশ্লেষা মানবে না, দুর্যোগ হলে দুর্যোগকে উপেক্ষা করবে। আর—যাবে কী করে ? নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে নয়, মার্টিনের ছোট গাড়িতে ঢিকোতে-ঢিকোতে নয়, একটা বেগবান যান আশ্রয় করবে—একটা ট্যাক্সি নেবে।

বসিরহাটে পেঁছিলেই কি হবে ? ছেলেকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে, শুধু দেখলেই কি হবে ? না, হবে না। কী করবে ? বাবা-মা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুজনে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে কে আগে বুকে টেনে নেবে। তারপর বুকে টেনে নিয়ে ছেলেকে আবেগে আশ্লেষে আঘ্রাণে চুম্বনে সমস্ত সত্তার সঙ্গে অনুস্যূত করে নেবে। গভীরে-প্রগাঢ়ে তন্ময় হয়ে থাকবে। তার পরে অন্য কথা, কোথায় ছিলি, কী করে কাটিয়েছিলি দিন-রাত্রি ?

জ্ঞান—কর্ম—ভক্তি।

আগে জানো, তিনি আছেন। শুধু জানলেই চলবে না। বেগবান যান—বেগমান কর্ম আশ্রয় করে সেখানে গিয়ে পেঁছোও। শুধু পেঁছুলেও হবে না। আস্বাদে বিভোর হয়ে ওঠো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কাঠের মধ্যে আগুন আছে এ জানলেই কি ভাত রান্না হবে? হবে না। আগে কাঠের লুকোনো আগুনটা বার করো। কী করে করবে? আরেকটা কাঠ নিয়ে এস। বেগে ঘর্ষণ করো। আস্তে-আস্তে ঘষলে হবে না। দ্রুত দীপ্ত কঠিন আঘাত করো। তারপর আগুন বেরুলে আগুনটাকে কাজে লাগাও। ভাতটা রান্না করো। রান্না করে বা কী হবে? শুধু ভাত দেখলেই কি পেট ভরবে? না, খাও, আস্বাদ করো। অন্নময় অমৃতময় হয়ে ওঠ।

এই আস্বাদই শেষ কথা। এই আস্বাদই ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান কর্ম ভক্তি। স্বামী বিবাকানন্দও জ্ঞান কর্ম ভক্তি। দুইই এক, একই দুই। শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র, বিবেকানন্দ ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বাক্য, বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র, বিবেকানন্দ উচ্চারণ।

একই ভাব ধরেছেন দুইজনে। একই ভাব মানে দুই ভাব—অদ্বৈত আর দ্বৈত। অদ্বৈতে সোঽহং, দ্বৈতে দাসোঽহং, সন্তানোঽহং।

শ্রীগৌরাঙ্গেরও এই দুই ভাব। 'কখনো ঈশ্বরভাবে প্রভু পরকাশ। কখনো রোদন করে বোলে মুঞি দাস।' কখনো হুঙ্কার কখনো আর্তি কখনো বিষ্ণুখট্টায় বসে, কখনো আবার ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। কখনো ঘোষণা করে আমিই সেই, কখনো আবার ভক্তদের গলা ধরে বলে, কিসে আমার কৃষ্ণে মতি হবে। কখনো নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করে, আবার কখনো দন্তে তৃণ ধরে দাস্যযোগ মেগে বেড়ায়।

গায়ক সা থেকে নি-তে ওঠে, কিন্তু নি-তেই অবস্থান করে না, আবার সা-তে নেমে আসে। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে ছাদে ওঠে কিন্তু ছাদেই বসবাস করে না, আবার ঘরে নেমে আসে। সাধকেরাও নির্বিকল্পেই বন্দ হয়ে থাকে না, আবার জীবভূমিতে বিচরণ করে। বিবেকানন্দকেও শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভূমিতে পেঁছে দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকতে দেননি, মর্তে লোকসংসারে সেবা-প্রেমের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়? জ্ঞান দাঁড়াবে ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ঐ আমার মা—এই জেনে আমার লাভ কী, যদি আমি মা'র কোলে গিয়ে বসতে না পারি, যদি আমি কিছু করতে না পারি মা'র জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখতে এসেছেন।

ঠাকুর বললেন, 'কাশি বড্ড বেড়েছে গো।'

ডাক্তার সরকার পরিহাস করে বললেন, 'কাশিতে যাওয়াই তো ভালো।'

'সে তো মুক্তি গো।' ঠাকুর বললেন, 'আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই।'

কী ভক্তি? ইহলোক ও পরলোকের কামনা বর্জন করে ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি। ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা পরমপ্রেমরূপা। যে ভালোবাসা দিয়ে জগৎসংসারকে ঢেকে রেখেছি তা ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়ার নামই ভক্তি। ভক্তিই শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি। অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন, নিজেই আবার নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন: 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হয়ে যাই।'

আবার বলছেন, 'কাউকে কেয়ার করে না। আমাকেই কেয়ার করে না। কী গো, কী সব কথা হচ্ছে তোমাদের, জিগগেস করলুম সেদিন, আমাকে উড়িয়ে দিলে। বললে, বুঝবেন না, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না। পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

সেই নরেন নিদারুণ কষ্টে পড়েছে। বাপ মারা গিয়েছে, সংসারে আর আয় নেই, রেখেও যায়নি কিছু। তাতে ঠাকুরের আবার কষ্ট। বলছেন, 'আহা, শুধু দুঃখ ভোগ করছে। কোনো উপায় হচ্ছে না। তা কী করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'

নরেন আর রাখাল দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখল ঠাকুরের পিছু-পিছু রাখালও মন্দিরে চলেছে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছু-পিছু রাখালও প্রণাম করছে।

দেখে গায়ের রক্ত মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভঙ্গ। কথা দিয়ে এসে সেই কথার বিপরীত!

রাখালকে ধরে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নরেন ধমকে উঠল: 'এ তোমার কী কাণ্ড?

'কেন, কী হয়েছে ?' রাখাল হতভম্ব ।

'কী হয়েছে মানে ? এটা মিথ্যাচার নয় ?'

'কোনটা ?'

'এই মন্দিরে গিয়ে দেবদেবী প্রণাম করা ।'

রাখাল চোখ নামাল । কথা কইল না ।

'তুমি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সই করে দিয়ে আসোনি ? বলে আসোনি নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না ? মানবে না দেবদেবী ?'

তবু চুপ করে রইল রাখাল । কী করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে ? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের সব পুরোনো গ্রন্থি খুলে গিয়েছে । ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না । তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন ? তিনি যদি সর্বব্যাপক সর্বাবরক হন তবে তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন ? গোঁড়ামির অন্ধকূপ থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন মুক্তবায়ুতে, আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায় ।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না রাখাল । এত যার তেজ ও দীপ্তি সেই নরেনের সঙ্গে রাখাল পারবে না তর্ক করে ।

রাখাল চুপ করে থাকল বলে নরেন চুপ করে থাকবার পাত্র নয় । সে সটান ধরল ঠাকুরকে ।

'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে ? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী ?'

'করলেই বা ।' শিশুর সারল্যভরা মুখে ঠাকুর বললেন, ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু মূর্তিতেই থাকবেন না ?'

'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে ।'

'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না ? চিন্তার জগতে ওর স্বাধীনতা থাকবে না ?'

চিরস্বাধীন নরেন্দ্রনাথ থমকে গেল । কথা খুঁজে পেল না ।

'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে ।' বললেন ঠাকুর, তা কী করবে বলো ? যার যেমন ধাত । যার যেমন পেটে সয় । তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের । তোর জ্ঞানের ঘর, রাখালের ভক্তির । সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে ? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল ।'

সকলেই কি আর জ্ঞানে প্রদীপ্ত হতে পারে? কিন্তু ভক্তিতে মধুর কে না হতে পারে বলো?

'আজ্ঞে ভগবানের দয়া হবে নরেনের উপর।' ত্রৈলোক্য সান্যাল ঠাকুরকে আশ্বাস দেবার জন্যে বললে।

'আর কখন হবে!' ঠাকুর অভিমানভরা স্বরে বললেন, 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়িতে কেউ অভুক্ত থাকে না। কিন্তু যাই বলো কারু কারু সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।' নরেন কাছেই ছিল, তার দিকে তাকালেন ঠাকুর।

নরেন বলে উঠল: 'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।'

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই তো নাস্তিক। যে আত্মশক্তিতে দৃঢ়চিত্ত তার নাস্তিক্য কোথায়?

'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেন মিত্তির বললে, 'নইলে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলি কী করে?'

'সেই তো মায়া।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কী! ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে, পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছে। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে, খানিকক্ষণ পরে দেখে, ভীষ্ম কাঁদছে। কী আশ্চর্য, পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করল কৃষ্ণকে, পিতামহ অষ্টবসুর এক বসু, এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন? তারই জন্যে কী? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্ম বললে, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার জো নেই—'

তবু, অভ্যাসবশেই, সকালে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম করেন।

পাশের ঘর থেকে একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী, নরেনের মা। কেমন যেন অসহ্য লাগল। বলে উঠলেন, 'চুপ কর। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান ভগবান করলি—ভগবান তো সব করলেন!'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা, সহিষ্ণুতার প্রতিমা, তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কী করে? যিনি কল্যাণ করেন শুনেছি তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?

দরকার নেই, চাইনে করুণা। নোয়াব না মাথা, নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব আর মরব। কাউকে কেয়ার করি না।

এই যে নিঃশ্বাসটুকু ফেলছিস এই তো ঈশ্বরের করুণা। এই যে চোখ মেলে দেখছিস সমস্ত কিছু, বিশ্বসংসারটা রঙে-রূপে ঝলমল করছে, এইটেই বা কার কারিগরি ? তোর নিজের কর্তৃত্বের ? মনে যে তোর এই বোধ এই অনুভূতি এই জিজ্ঞাসা এটাই বা কার রচনা, কার কৌশল ?

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী।

মাও তা হলে ছাড়তে পারেননি ঠাকুরঘর। এত তিক্ত বিরক্ত হবার পর আবার একটু উপশমের আশায় বসেছেন নিভৃতে।

ভুবনেশ্বরীর পরনের চেলিটি শতচ্ছিন্ন। এমনিতে হয়তো বলতেন না, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়াতে বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ রে বিলে, আমাকে একখানা চেলি কিনে দিতে পারিস ?'

কোত্থেকে কিনে দেবে ? সংসার উপবাসের উপকূলে বাস করছে, এ সময় কিনা মা'র চেলির বিলাসিতা ! নরেন মাথা হেঁটে করে চলে গেল ম্লানমুখে।

কদিন পর কী মনে করে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর। বিকানিরের এক ভক্ত মাড়োয়ারি ঠাকুরকে এক থালা মিছরি ও একখানা গরদের কাপড় উপহার দিয়েছে। নরেনকে দেখে ঠাকুর মহাখুশি। বললেন, 'নরেন এসেছিস ? তুই এই গরদখানা নিয়ে যা।'

'সে কী ? আমি নেব কেন ?' নরেন থমকে গেল।

'তোর মাকে দিবি।'

'মাকে দেব কেন ?

'তোর মা'র চেলিখানা ছিঁড়ে গিয়েছে,' ঠাকুর কুণ্ঠিত হয়ে বলছেন, 'আহ্নিক করতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে, এ গরদখানা পরে আহ্নিক করবে।'

'আমার মা'র চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে এ আপনি কী করে জানলেন ?'

ঠাকুর অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাব করে, বলতে চান না এমনি সঙ্কোচ দেখিয়ে বললেন, 'ও আমি জানতে পারি।'

নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি অর্জন করে দেব। আমি তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে নেব কেন ? না, নেব না ভিক্ষে।'

নরেন প্রত্যাখ্যান করলে।

নরেনের তেজ দেখে ঠাকুর মহাখুশি। চলে গেলে বললেন, 'আমরা হচ্ছি নর আর ও হচ্ছে নরের মাঝে ইন্দ্র। কিন্তু জিগগেস করি শুধু কর্মযোগের ঔদ্ধত্যে

কি হবে যদি আমি আমার কৃপা না মিশ্রিত করি ?' রামলালকে ডাকলেন, বললেন, 'ও রামনেলো, তুই কাল ঠিক দুপুরবেলা গৌরমুখুজ্জের লেনে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবি। নরেন বেরিয়ে গেলে ঢুকবি বাড়িতে, গরদখানা ভুবনেশ্বরীকে পেঁাছে দিবি, বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখিস নরেনের সামনে যেন পড়ে যাসনে। নরেন যেন না টের পায়।'

যথাদিষ্ট রামলাল ভুবনেশ্বরীর হাতে গরদখানা পেঁাছে দিল। বললে, 'ঠাকুর আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'আমি এখানে কী বললাম আর তা টেলিগেরাপে দক্ষিণেশ্বর জেনে ফেললেন।'

শুধু জেনে ফেললেন না, ব্যবস্থা করলেন, পেঁাছিয়ে দিলেন। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং।'

আমি কেন প্রার্থনা করতে যাব ? আমি নিজেই ঈশ্বর।

ঈশ্বর যেমন তোমার ভিতরে তেমনি আবার তোমার বাইরে। তোমার ভিতরের ঈশ্বর পুরুষকার, বাইরের ঈশ্বর কৃপা। বাইরের ঈশ্বরের কাছে, কৃপার কাছে প্রার্থনা করো, আমার পুরুষকারকে জাগ্রত করো। আবার পুরুষকার না জাগলে কৃপা জাগবে কী করে ? তাই—তাই দুইই চাই। কর্মও চাই কৃপাও চাই। তেলও চাই পাত্রও চাই। বীজও চাই বৃক্ষও চাই। যোগও চাই যুদ্ধও চাই।

মামনুস্মর যুধ্য চ।

শুধু কর্মযোগের আস্পর্ধায় হবে না, একটু প্রার্থনা করো। তোমার কর্ষণের মধ্যেই তো বর্ষণ নেই। চাষ করো আর প্রার্থনা করো, হে মেঘ, জল দাও। চোখ মেললেই তো আর দেখতে পাও না যদি তিমিরহরণ আলোটি না জ্বলে। তাই চোখ মেল আর প্রার্থনা করো, হে আলোকময়, আলোটি দাও, আলোটি জ্বালো। শুধু অর্জুনে হবে না, কৃষ্ণকে ডাকো। শুধু কৃষ্ণেও হবে না, অর্জুন কোথায় ?

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।' নরেন গিয়ে ধরল ঠাকুরকে।

'কী বলব ?'

'মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না। ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, আমার একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয়, আপনার মা'র কাছে একটু সুপারিশ করুন।'

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে ?'

'আমার কে না কে তাতে কী আসে যায় ?' নরেন বললে, 'আপনার মা আপনি বলুন।'

'ওরে ওসব বিষয়কথা বলতে পারি না।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন নাছোড়বান্দার মত বললে, 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই।'

ঠাকুরের চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা নরেনের দুঃখকষ্ট দূর কর। নরেনকে টাকা দে।'

'বলেছেন ? আজ একবার বলুন আমার সামনে—'

'ওরে তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'সেইজন্যেই তো কিছু হয় না। সেইজন্যেই তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। বলেন, যার দুঃখ সে বলে না কেন ? সে বলতে পারে না ? শোন, আজ মঙ্গলবার। রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মা'র কাছে মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সত্যি ?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

মন্দিরে ঢুকে নরেন কী দেখল তা কে জানে। পুত্তলিকা না পাষাণপ্রতিমা, না, অখিল জগতের জননী, করুণাবরুণালয়া, দয়ার্দ্র-হৃদয়া।

তিন তিনবার ঢুকল মন্দিরে। প্রথমবার, কী চাইবে, কী আশ্চর্য, ভুল হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার কী রকম ভেবড়ে গেল, কী চাইবে মুখে জুটল না। তৃতীয়বার ? তৃতীয়বার চাইতে লজ্জা হল। এই প্রেম ও প্রসন্নতার নির্ঝরিণী পরমার্তিহন্ত্রী অখিলেশ্বরীর কাছে হীনবুদ্ধির মত কী তুচ্ছ লাউকুমড়ো চাইব !

'আর কিছু চাই না মা,' নরেন ভবতারিণীর সামনে প্রণত হয়ে পড়ল। 'আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।'

বাইরে এসে ঠাকুরকে বললে, 'আমায় মা'র গান শিখিয়ে দিন।'

'কোন্‌টা শিখবি ?'

'মা, ত্বং হি তারা—সেই গানটা।'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন :

'মা, ত্বং হি তারা, ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমিই আদ্যমূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা ॥'

সারারাত ধরে ঐ গান গাইল নরেন। ঘুমুতে গেল না। শুধু ত্বং হি তারা—

পরদিন, বেলা বেড়ে গেছে, তবুও নরেন ঘুমুচ্ছে। বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে। নরেনের সঙ্গে আলাপ নেই। কে একটা জোয়ান ছোকরা, প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে, খুবই আপত্তিকর মনে হল। বললে, 'এখনো ঘুমুচ্ছে যে।'

'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে। আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। মা'র কাছে টাকাকড়ি চাইতে গিয়েছিল, চাইতে পারল না, চাইতে লজ্জা করল।' ঠাকুর আনন্দ করতে করতে বলতে লাগলেন : 'বললে ফলফুল দিয়ে আমার কী হবে? মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—'তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা।' কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল : 'বেশ হয়েছে।'

আনন্দ করতে লাগলেন ঠাকুর : নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—বেশ হয়েছে। কেমন, তাই না?

কিন্তু সারদামণি, মাঠাকরুন কী চাইলেন?

মাঠাকরুনের ভাইঝি মাকু মাকে জিগগেস করলে, ঈশ্বরের কাছে কী চাইব, কী চাইবার আছে?'

জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য—নরেন্দ্রনাথ যা চেয়েছিল, তাও নয়, মাঠাকরুন বললেন, 'যদি কিছু চাও, যদি কিছু চাইবার থাকে, তা হচ্ছে নির্বাসনা। আমি কিছু চাই না এই আমি চাই।'

সারদামণি নিজেই নির্বাসনার প্রতিমূর্তি। নির্বাসনায় নির্বাসিতা।

কিছু চাই না, তবু তোমাকে ভালোবাসি এই হচ্ছে সমর্থতমা রীতি। অহেতুকী, অনিমিত্তা ভক্তি। গোপীভক্তি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্যে স্বামী পুত্র গৃহ কুল স্বজন ভবন ইহকাল পরকাল সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, ছিন্ন করেছে দুর্জরগৃহশৃঙ্খল—আর এই অনপায়িনী অব্যভিচারিণী ভক্তিতেই লাভ করেছে কৃষ্ণকে। উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'ঐ গোপবালাদের কী সম্বল ছিল ? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বুঝেছে আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ ভক্তিতে শরণ নাও, তা হলেই তুমি নির্ভয় পূর্ণকাম।'

কোথায় বনচরী গোপী, কোথায় শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ। কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। না জেনে খেলেও ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃত তার কাজ করে। পাত্রাপাত্র বিচার নেই, জ্ঞান-অজ্ঞান বিচার নেই, ভক্তি হলেই ফল ফলবে।

দ্বারকায় কৃষ্ণের অসুখ করেছে। এ রোগের চিকিৎসা কী, জিগগেস করল নারদ। কৃষ্ণ বললে, কোনো ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেয়, ভালো হতে পারি। যে নারদ এত বড় ভক্ত, সেও পিছু হটল। কৃষ্ণের মহিষীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত পাতল। সে কী কথা ? স্বামীকে কী করে পায়ের ধুলো দেব ? তাতে আমাদের পত্নীধর্ম নষ্ট হবে না ? না, পারব না ধুলো দিতে। নারদ তখন ব্রজে গেল। ব্রজাঙ্গনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের কৃষ্ণের অসুখ ? আমরা কি তার ভক্ত ? আমাদের ধুলোতে কি কাজ হবে ? তবু আমাদের কৃষ্ণ যদি ভালো হয়, দেব আমাদের পায়ের ধুলো। যদি পাপ হয়, অধর্ম হয় তো আমাদের হবে ! আমাদের পাপে আমাদের অধর্মেও যদি কৃষ্ণ সুখী হয়, আমরা সে পাপ সে অধর্ম করব হাসিমুখে। জীবনে আর আমাদের ব্রত কী ? সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করাই আমাদের ব্রত।

ভক্তিই শক্তি। ভক্তিমানই শক্তিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সে সম্ভোগে সুখ কোথায়, যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই ? সব সময়ে উদ্বেগ, সব সময়ে দুশ্চিন্তা—সুখ কোথায় ? কোথায় কী গেল, কোথায় কী হারালো, কোথায় কী হল না, কোথায় কী এল না, সব সময়েই হা-হুতাশ—সুখ কোথায় ? আমাদের শুধু সুখী হলে চলবে না, আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে। এ সংসারে নিশ্চিন্ত কে ? একমাত্র ভক্ত নিশ্চিন্ত। একমাত্র মায়ের কোলে চড়ে বসা শিশু নিশ্চিন্ত।

হ্যাঁ রে, জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছিস, বেগের রোমাঞ্চ, ভোগের রোমাঞ্চ, নিষেধের রোমাঞ্চ—একবার মায়ের কোলে চড়ে বসা নির্ভূষণ নিষ্কিঞ্চন শিশু

হবার রোমাঞ্চ নির্বিনে? কণ্টকিত বৃন্তে পুষ্পায়িত হবার রোমাঞ্চ? ছেড়ে দিবি? ঠকে যাবি?

না, ছাড়ব না, ঠকব না। প্রতি রোমকূপে নিয়ে যাব সেই শিহরণ।

আরেক নিশ্চিন্ত পুরুষ বিবেকানন্দ।

শিকাগো স্টেশনে খোলা ইয়ার্ডে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে শুয়ে আছে। শীতের রাত। তা হোক, এই ভাবেই কাটাবে, ঘুমিয়ে কাটাবে। আশ্রয় নেই, আহার নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই—সমস্ত অন্ধকারে যিনি দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই শ্রীরামকৃষ্ণই আছেন তাঁর শিয়রে। শ্রীরামকৃষ্ণই তো মা, মায়ের কোল। সমস্ত বিপদে আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে ওষধি, সমস্ত আঘাতে উপশম। এক তন্তু দুশ্চিন্তার কুয়াশা নেই কোথাও, মায়ের কোলে শুয়ে আছে, পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

এত ঘুমুল যে পরদিন সকালে রোদ উঠলে স্টেশনের কুলি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিল।

কোথায় যাবে ঠিক নেই। একটা হোটেলের ঠিকানা পর্যন্ত কেউ দেয় না। সরাসরি ভিক্ষে করতে বেরুল। নিশ্চিন্ত—নিরাসক্ত। যা হবার হবে। বক্তৃতা দিতে পারি দেব, না পারি দেব না। শ্মশান-ভবন সব সমান। আমি একজন ভালো লোকের উপর, আমার মা'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আছি, মা কি কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে?

বারেবারে ছিন্ন করলেও ইক্ষু মধুস্বাদু। বারেবারে ঘর্ষণ করলেও চন্দন চারুগন্ধ। বারেবারে দগ্ধ হলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। বারেবারে বিপন্ন হলেও ভক্ত ভক্ত, সন্তান সন্তান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তার মধ্যে জল ঢোকে না, আর সামান্য মাটির ঢেলার গায়ে একটু জল লাগলেই তা গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত তারা হাজার হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়। চকমকির পাথর শত বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারা মাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার-হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর পড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। যার গলা একবার সাধা হয়েছে তার সুরে শুধু সারেগামা এসে পড়ে।

ভক্তিই সুলভ, স্বতন্ত্র, স্বসম্পূর্ণ। ভক্তির সাধনে কিছু লাগে না, না জ্ঞান না বৈরাগ্য না অন্যতর অনুষঙ্গ। পরমপ্রেমময়ী তৃষ্ণা, ইষ্টে গাঢ় আবিষ্টতা—তারই নাম ভক্তি। ভক্তি দিয়েই শুধু জানা যায়, দেখা যায়, প্রবেশ করা যায় তত্ত্বে, স্বরূপের উদ্ঘাটনে। ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

'ভক্তেরও একাকার বোধ হয়।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'সে দেখে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। অনেক পিত্ত জমে যখন ন্যাবা লাগে তখন সবই হলদে দেখে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে তখন তার নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। ভক্তি থেকেই প্রেমে উত্তরণ।'

প্রেমের ভাব কী? হে প্রভু, হে কৃষ্ণ, তোমার জন্যে সব ছাড়তে পারি—অষ্টপাশের শেষ পাশ লজ্জা পর্যন্ত। আর আমার ইচ্ছা শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা। আমার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না, তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, তুমি সুখী হও, তুমি প্রীত হও। 'মথুরানগরে ছিলে তো ভালো, দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। সে সব দুখ কিছু না গণি, তোমার কুশলে কুশল মানি॥' শীতে কী করল গোপী? গায়ের উত্তরীয় কৃষ্ণকে দিয়ে নিজে রইল রিক্তগাত্রে। কৃষ্ণ যদি উত্তাপে থাকে তা হলে আর আমার শীত কোথায়?

অদ্বৈতজ্ঞানের তুঙ্গতম শৃঙ্গ থেকে বিবেকানন্দও নেমে এল দ্বৈত ভূমিতে—ভক্তিতে—সখ্যে, মধুরে, দাস্যে। শঙ্করাচার্যকেও নেমে আসতে হয়েছিল। 'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ।' 'নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।' 'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকারী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।' 'প্রসীদ ত্বং মাতঃ গুণরহিতপুত্রে অধিকদয়া।' 'নিরালম্ব-লম্বোদরজননী কং যামি শরণম্।' ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

লণ্ডন থেকে আমেরিকায় ফ্রান্সিস লেগেটকে চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'তুমি জেনে সুখী হবে আমি ক্রমশই সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতিতে উপনীত হচ্ছি। উদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও মনে হয় আমি দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরকে। যেভাবে এগুচ্ছি, মনে হয়, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তা হলে তাকে পর্যন্ত ভালোবাসতে পারব।'

আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন আমি ভীষণ গোঁড়া ছিলাম। আমার যারা বিরুদ্ধে ছিল তাদের সঙ্গে বনিয়ে চলা দূরের কথা, তাদের প্রতি আমার

বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কলকাতার রাস্তায় যে ফুটপাথে থিয়েটার দাঁড়িয়ে, সেই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতাম না। আমার এখন তেত্রিশ বছর বয়সে গণিকাদের সংগে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি, তাদের প্রতি একটাও কটু কথা বলবার কথা ভাবতে পারি না। আমি কি অধঃপাতে যাচ্ছি, না কি আমি পরমপ্রেমস্বরূপ ভগবানে বিকশিত হচ্ছি? শুনেছি মানুষ যদি তার চারপাশে পাপ দেখতে না পায় তা হলে সে মহৎ কাজ করতে পারে না— সে অদৃষ্টনির্ভর নিশ্চেষ্টতায় থেমে থাকে। আমার তো তা মনে হয় না। আমার তো মনে হয় এই প্রেমানুভব আমাকে দীপ্ততর দীর্ঘতর কর্মে প্রেরিত করছে। কোনো কোনো দিন আমি এক আনন্দিত অবস্থায় এসে উপনীত হই। ইচ্ছে হয় সকলকে ও সবকিছুকে আশীর্বাদ করি, ভালোবাসি, বুকে জড়াই। দেখি, মন্দ ভুল, পাপ ভুল। বলতে কি, ফ্রান্সিস, আমি এখন অমনি সেই আনন্দ-আবেশে আছি, আমার প্রতি তোমার ও তোমার স্ত্রীর দয়া ও ভালোবাসার কথা ভেবে আমি কাঁদছি, আনন্দে চোখের জল ফেলছি। ভাগ্যিস জন্মগ্রহণ করেছিলাম। জন্মদিনকে শুভবন্দনা জানাই। আমি আমার অনন্ত প্রেমস্বরূপের হাতের একটি খেলনা— তাঁরই সেবায় আমি আমার সর্বস্ব ছেড়েছি, ছেড়েছি আমার প্রিয়জনদের, ছেড়েছি সুখের আশা, জীবনের মায়া। সেই আমার লীলাসংগী, আমি তার খেলুড়ে। তার সৃষ্টির কোনো কারণ নেই, উদ্দেশ্য নেই। খালি তার খেলা, তার খামখেয়াল। ভীষণ মজা, তার খেলাভরা হাসি কান্নার রঙমহল।

দু-একটা জিনিস শুধু বুঝেছি, ভাব আর ভালোবাসা আর ভালোবাসার ধন সমস্ত যুক্তি, বিদ্যা ও বাক্যের বহুদূরে। হে সাকি, পেয়ালা ভরতি করো আর আমরা পাগল হয়ে যাই।

এ আরেক বিবেকানন্দ। ঐ বিবেকানন্দ মধুর, মধুরের অনুগত।

হিমালয়ের পথে যাচ্ছে স্বামীজি, সংগে নিবেদিতা। পার্বতী নদী আর নির্ঝরিণীতে জলের শব্দ হচ্ছে।

'আওয়াজ কী বলছে জানো?'

'কী?' নিবেদিতা দাঁড়াল স্থির হয়ে। কান খাড়া করে।

'শোনো, ভালো করে শোনো।' স্বামীজি বললে, 'বলছে হর হর বম বম। হ্যাঁ, অনাদি অনন্ত শিবধ্বনি। শিব—মহেশ্বর, শান্ত, মৌন, সুন্দর। জানো আমি শিবের ভক্ত।'

অমরনাথ দেখে এল।

বললে, 'হ্যাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছিলাম।'

'পায়রা দেখেছিলেন—শাদা পায়রা?' শিষ্য জিগগেস করলে, 'শুনেছি শাদা পায়রা দেখলে নাকি বোঝা যায় সত্য সত্য শিবদর্শন হল।'

'দেখেছিলাম তিন-চারটে শাদা পায়রা। গুহায় থাকে না কাছাকাছি পাহাড়ে থাকে কে বলবে।'

নিবেদিতাকে বললে, 'ঐ গুহায় অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন।'

অমরনাথ থেকে এল ক্ষীরভবানী।

বললে নিবেদিতাকে, 'আগে শিব মাথায় চড়েছিল, এখন মাকে দেখছি যেন ঘরের মধ্যে আছেন, চলাফেরা করছেন—'

'এই ঘরের মধ্যে?'

'হ্যাঁ, আর কথা বলছেন।'

ঘুমুতে পাচ্ছে না, বিশ্রামে রুচি নেই—সর্বক্ষণ সমস্ত চিন্তা সমস্ত উন্মুখতা সেই অশরীরী মাতৃবাণীর সন্ধানে। এও এক নিদারুণ যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা ছাড়া বুঝি অন্ধকারকে বিদীর্ণ করবার উপায় নেই।

'কে মা?' জিগগেস করল নিবেদিতা।

'এ আমার ভয়ঙ্করী মা। ভীমা মা।' বলে উঠল বিবেকানন্দ: 'তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রণা। তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী। কালী! কালী! কালী!'

অমরনাথ মহাদেবকে মুখোমুখি দর্শন করে এসে এ আবার কী আকূতি! কী প্রার্থনা!

'বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে
রূপে আলো করেছে দিগ্‌ দশে
কি করি রণে রে, হরেছে মনে রে,
প্রসাদ ভনে রে, চল কৈলাসে॥'

কিছু একটা লেখার উত্তেজনা, উদ্দাম উত্তেজনা, পেয়ে বসল স্বামীজিকে। দুর্বার আবেগে Kali The Mother কবিতা লিখে ফেলল ইংরাজীতে। মা আমার আয়, যদিও তুই ভয়ঙ্করী প্রলয়রূপিণী, তবু তুই আয়, আমার সামনে এসে দাঁড়া। তুই মৃত্যুরূপা, তাই তুই মাতৃরূপা। কিন্তু মৃত্যুরূপ মা কার কাছে আসে, কোন্ বীরবিক্রম সন্তানের কাছে ?

'কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ॥'

লেখা শেষ করেই আবেশতন্ময় স্বামীজি পড়ে গেল মেঝের উপর।

'আমার সঙ্গে কেউ এসো না।' স্বামীজি একা-একা চলে গেল ক্ষীরভবানী দর্শন করতে। জলরূপিণী দেবী—ক্ষীরভবানী। বিচিত্রবর্ণা।

সেখানে সাতদিন ক্ষীরভবানীর পুজো করল। হোম করল। প্রতিদিন এক মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিল।

এখন আর শিব-শিব নয়, হরি ওঁ নয়, এখন শুধু মা।

কদিন পরে নিবেদিতাদের হাউসবোটে দেখা করতে এল স্বামীজি। হাতে ক'টি গাঁদা ফুল। নিবেদিতা ও তার সঙ্গিনীদের মাথায় রাখল ফুল ক'টি। কাছে বসল। বললে গভীর গদ্গদকণ্ঠে, 'আর হরি ওঁ নয়। এখন শুধু মা।'

হৃদয় থেকে সমস্ত সংগ্রামের প্রেরণা যেন তখন চলে গিয়েছে, এখন যেন মায়ের কোলে সর্বসমর্পণের বাসনা। বললে, 'আমার দেশপ্রেমও কোথায় চলে গিয়েছে। কিছুই যেন থাকছে না। এখন শুধু মা, কেবল মা।'

আবার সেই কথা মনে করো। সারদামণিকে বলেছিল নরেন, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।'

সারদামণি স্নিগ্ধমুখে বললেন, 'দেখো আমাকে যেন উড়িয়ে দিয়ো না।'

'তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ?' নরেন বললে, 'যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায় ?'

গুরুপাদপদ্মই ভক্তি। ভক্তি ছাড়া জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায় ? জ্ঞানবৃক্ষ যে পল্লবিত হচ্ছে ভক্তিফল ধরবে বলে। জ্ঞান নৌকা, ভক্তিই তার বন্দর।

স্বামীজি আবার বললে, 'আমার মনে হয় আমি এখন এক নিশ্চিন্ত শিশু, মার কোলের উপর বসে আছি আর মা আমাকে আদর করছেন।'

এই একেবারে হুবহু শ্রীরামকৃষ্ণ। অদ্বৈতচূড়া ছেড়ে এসে মায়ের কোল। মায়ের চুম্বন!

মা'র কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই। তাই কোলে রাখলেও মা, ফেলে রাখলেও মা। ঘুম পাড়িয়ে রাখলেও মা, জাগিয়ে তুলে দিলেও মা। আর সন্তান —শান্ত হলেও সন্তান, দুরন্ত হলেও সন্তান। গুণবান হলেও সন্তান, অকৃতী অধম হলেও সন্তান।

থেকে-থেকে কালীর গান গাইছে। আর সবসময়েই সেই কালী, যে তার পূজকের বুকের উপর, হৃৎপদ্মের উপর, পা রেখেছে!

যেদিন দেহ ছেড়ে দেবে সেদিনও স্বামীজির কণ্ঠে মা'র গান : মা কি আমার কালো রে! বললে, 'সন্দেহ কী, শ্রীরামকৃষ্ণই কালী। আর আমার ব্রহ্মও কালী হয়ে দাঁড়াল! কালী! কালী!'

মা-মা করো। বলছেন ঠাকুর, ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো। মা-ই নাবালকের অছি। যদি কারু উপরে জোর চলে একমাত্র মায়ের উপর। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শিগগির ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়। মা ডাকে কখনো শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো, সব চেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মা'র কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ নিমেষে পবিত্র হয়ে যায়। চোখে জল আসে— অমল অশ্রু। অহঙ্কারের শেষ ধুলোকণা পর্যন্ত ধুয়ে যাবে। ঘুচে যাবে দোষদৃষ্টি। সমস্ত কিছুতেই মাকে দেখবে—দেখবে মা'র প্রসন্নতা। যন্ত্রণাও প্রসন্নতা।

মাকে ডাকো। মা বলে ডাকো। মা বলে ডাকলেই মনে হবে যেন পাশের ঘরে আছেন, আসবেন ব্যাকুল হয়ে। যদি রান্নাঘরেও থাকেন ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, ছুটে চলে আসবেন কোলে নিতে। মায়ের জন্যে কাঁদো, বালিশ ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদো, দেখি কেমন তাঁর উপশমভরা উষ্ণবক্ষে তোমাকে তুলে না নেন।

কিন্তু কে, কে জগজ্জননী মাকে, কালীকে মা ডাকতে পারে? যে তার নিজের মাকে ভালোবেসেছে, যে তার নিজের মায়ের জন্যে কেঁদেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখ। সে মাতৃভক্তির তুলনা নেই ত্রিভুবনে। সন্ন্যাসী হয়েও যিনি মাকে ছাড়েন নি। প্রত্যহের প্রথম প্রণাম রেখেছেন মা'র পায়ে। আগে চন্দ্রমণি

পরে ভবতারিণী। ঐ যে বুকের উপর কোঁচার খুঁটটুকু তোলা সে তোতাপুরীর থেকে সন্ন্যাস নেবার সময় পৈতে ফেলে দিয়েছিলেন বলে, পাছে রিক্ত-নগ্ন বুক মায়ের চোখে পড়ে, পাছে মা দুঃখ পান। যতদিন মা জীবিত ছিলেন মা'র কাছে বসে খেতেন। বৃন্দাবনে গেলেন শ্রীমতীর সাধন করতে, মায়ের মুখখানি মনে পড়েই 'ঈশ্বর-ফিশ্বর' সব ভুল হয়ে গেল। ফিরে এলেন মা'র কাছে দক্ষিণেশ্বরে। তারপর মা মারা যাবার পর মায়ের দুটো বুড়ো আঙুল ধরে এই বলে কাঁদলেন, মা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান। কে কাঁদছে, নিজেকে হতভাগ্য বলছে? আর কেউ নয়, সাধকচক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ। হেন সাধন নেই যিনি করেননি—নির্বিকল্প থেকে ধৌতিনেতি পর্যন্ত। হিন্দুর যাবতীয় সাধন তন্ত্র-মন্ত্র শাক্ত-বৈষ্ণব দাস্য-মধুর—সমস্ত। মুসলমান খৃস্টান—কী নয়। হতভাগ্য কেন—না, সন্ন্যাসী হবার দরুন মায়ের মুখাগ্নি করতে পারবেন না, শ্রাদ্ধ করতে পারবেন না। গঙ্গায় নামলেন মায়ের জন্যে তর্পণ করতে। গলিতহস্ত হয়ে গিয়েছেন, হাতে জল থাকল না, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল। কিন্তু চোখের জল? চোখের জল ঝরতে লাগল নির্বিরাম।

কিন্তু স্বামীজি? স্বামীজি তো তার মাকে ছেড়ে চলে গেল আমেরিকায়, ধর্মপ্রচারে, বেদান্তব্যাখ্যায়, ঈশ্বরসন্ধানে। কিন্তু, না, সেখানে, সেই সুদূরেও তার মাতৃচিন্তা। দেশে থাকতে, যতদূর সম্ভব, মা'র খোঁজখবর নিয়েছে আর আমেরিকায় পাড়ি দেবার আগে তার শিষ্য খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংকে বলে গিয়েছে কলকাতায় তার মাকে মাস-মাস একশোটা করে টাকা পাঠাতে। আর অজিত সিং তা পাঠিয়েছিলেন মাস-মাস।

বেলুড়ে ফিরে এসে আবার লিখছে অজিত সিংকে, আমি আমার মাকে অবহেলা করেছি। এখন যখন আমার পরের ভাই মহেন্দ্রও বিদেশে চলে গিয়েছে মা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। আমার শেষ সাধ বাকি কটা বছর আমি মা'র সেবা করি। মা'র সঙ্গে একত্র বাস করতেই আমার ইচ্ছা আর ইচ্ছা ছোট ভাইটার বিয়ে দিই যাতে বংশধারা না নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ হলে আমার আর আমার মা'র শেষ কটা দিন শান্তিতে যায়। আমার মা এখন একটা ঝাপড়ির মত বাড়িতে বাস করেন। বড় সাধ মাকে একখানা ছোট সুন্দর বাড়ি করে দিই—'

অজিত সিং জিগগেস করে পাঠাল : একখানা বাড়ি করতে কত টাকা দরকার?

বিবেকানন্দ উত্তর দিল : 'দশ হাজার টাকা। আর একটা অনুরোধ, যদি

সম্ভব হয় আপনি মাকে মাস-মাস যে একশো টাকা দিচ্ছিলেন সেটা স্থায়ী করে দিন। যাতে আমার মৃত্যুর পরেও, মা যদি তখনো বেঁচে থাকেন, তাঁর টাকাটা যেন বন্ধ না হয়। আর আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও দয়া ফুরিয়ে গেলেও আমার মা'র ভরণপোষণটুকু যেন ঠিক বজায় থাকে।'

এইবার মিলে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। নিজের মায়ের জন্যে বিবেচনা, নিজের মায়ের জন্যে ব্যাকুলতা। নিজের মায়ের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ।

'ভারতীয় নারীর আদর্শ'—এর উপর আমেরিকায়, কেমব্রিজে বক্তৃতা দিল স্বামীজি। মেয়েদের অনুরোধে মেয়েদের সামনে বক্তৃতা। হিন্দু মেয়েদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব, তিতিক্ষা ও পবিত্রতার কথা জেনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সব হীন কথাই না এতদিন প্রচার করেছে। 'আর আমার যেটুকু উজ্জ্বলতা যেটুকু উন্নতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন,' বললে স্বামীজি, 'সব আমার মায়ের জন্যে।' বলে ভাষণের শেষে তার মা'র উদ্দেশে প্রণাম করল স্বামীজি।

গৃহত্যাগী সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী তবু মা'র প্রতি কী ভক্তি, কী কাতর্য— বিদেশিনীদের দল অভিভূত হল। স্বামীজিকে না জানিয়ে স্বামীজির মাকে একখানা মাতা মেরী ও একখানা যীশুর ছবি পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে দিল একখানি পত্র: 'তুমিই বিশ্বজননী মেরী আর বিবেকানন্দ তোমারই নিষ্কিঞ্চন শিশু, যীশু।'

দেশে ফিরে এলে মা ভুবনেশ্বরী মনে করিয়ে দিলেন, কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিতে হবে। কিসের পুজো? স্বামীজির বাল্যকালে কী এক 'মানত' করেছিলেন সেই পুজো। মা বলেছেন—আর কি স্বামীজি চুপ করে থাকতে পারে? কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে ভিজে কাপড়ে মায়ের মন্দিরে ঢুকল। মাতৃবলে বলীয়ান, বিলেতফেরৎ জেনেও কেউ স্বামীজিকে বাধা দিল না। মায়ের পাদপদ্মের সামনে তিনবার গড়াগড়ি দিল, সাতবার প্রদক্ষিণ করল মন্দির। নাটমন্দিরের পশ্চিমে মুক্ত অঙ্গনে নিজেই হোম করল।

নিজের মাকে আপ্রাণ ভালোবেসেছিল বলেই ভালোবাসতে পেরেছিল 'জ্যান্ত দুর্গাকে', সারদামণিকে। 'আমি কোন নরাধম তাঁর সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে কথা বলব? তাঁকে আমার কোটি-কোটি প্রণাম দেবেন ও আশীর্বাদ করতে বলবেন যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয় আর যেন শিগগির এর পতন হয়।' 'মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী

মৈত্রেয়ী জন্মাবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরানী গেলেই সর্বনাশ।'

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভুতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

যা দিয়ে অজরব্রহ্মকে জানা যায় তাই বিদ্যা। মহামায়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও নিয়মনকর্ত্রী, তাই মা পরমা। মুক্তি ও বন্ধ দুয়েরই কারণস্বরূপ। মা-ই সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। তাই ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো।

মাতৃ-উপাসনা এক স্বতন্ত্র দর্শন। এ একমাত্র হিন্দুর। জগৎ-ব্যাপারের পিছনে একটা শক্তি কাজ করছে সেই ধারণা থেকেই মাতৃভাব উদ্ভূত। মাতৃশক্তিই অপক্ষপাত মহাশক্তি। ঋগ্‌বেদের সেই মন্ত্রটি স্মরণ করো—অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসুনাম্‌। অর্থাৎ মাতাই জগদীশ্বরী, সর্ববিধ ধনদায়িনী। তিনি আবার ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধীকে ধ্বংস করবার জন্যে ধনু বিস্তৃত করেন। স্বর্গ-মর্তের পরেও মা বর্তমান।

'মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে।' বলছে বিবেকানন্দ, 'তাঁর জন্যেই তাঁকে ভালোবাসো, ভয়ে নয়, কিছু পাবার আশায় নয়। তাঁকে ভালোবাসো কারণ তুমি সন্তান। মন্দে-ভালোয় সর্বত্র তাঁকে সমভাবে দেখা। সব কিছু মায়ের খেলা—এই অনুভবেই মনে সমত্ব ও শান্তি আসে। সমত্ব আর শান্তিই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভব না হয় ততদিনই দুঃখ আমাদের পিছু নেবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করতে পারলেই আমরা নিরাপদ।'

ঠাকুরের কাছে একবার নালিশ করেছিল নরেন: তোমার বুড়ি খেলতে চায় তো একা খেলুক। আমাদের হায়রানি করা কেন?'

ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, 'তোকে নিয়েই তো তার খেলা।'

কাশ্মীরে শেষ দিকে নিবেদিতাকে স্বামীজি বললে, 'জানো আমি সব সময়ে আজকাল মাকে, কালীকে দেখি।'

'কোথায়?' নিবেদিতা চমকে উঠল।

'সর্বত্র। এমন কি তোমাদেরও মধ্যে।'

স্বামীজি পুরোনো কথায় ফিরে গেল। আগে আগে কালীকে কী দারুণ ঘেন্না করতাম, তার হালচালও কেমন বেয়াড়া লাগত। ছ বছর লড়েছি মনের ওই অনীহার

সঙ্গে, কিছুতেই মানব না কালীকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, হেরে গেলাম। মা'র কাছে হেরে যেতে, ধরা পড়াতেও শান্তি।

কী করে কী হল ? নিবেদিতা কৌতূহলী হল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে কালীর কাছে সঁপে দিলেন। ক্রমে আমার এই বিশ্বাস হল—আর এখন তো আমার পূর্ণ বিশ্বাস, কালীই আমাকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে আর তার খুশিমত কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অথচ তার বিরুদ্ধে আমার কী মমতাহীন সংগ্রাম ছিল। আসল রহস্যটা কী জানো, আমি রামকৃষ্ণকে ভালোবাসতাম। সেই ভালোবাসাই আমাকে পরাস্ত করল। কী তোমার সাধ্য তাঁকে না ভালোবেসে পারো। তাঁর কী আশ্চর্য পবিত্রতা কী নিশ্ছিদ্র স্নেহ। তাঁর মহত্ত্ব তখনো আমি পুরোপুরি বুঝিনি। আগে-আগে তো তাকে এক হাবাগোবা শিশু ভাবতাম, মাথার দোষে ভুতপ্রেত দেখছে। পরে বুঝলাম, পরে—যখন তিনি পরম আশ্বাসে আমাকে কালীর কাছে সঁপে দিলেন। তখন কালীকে স্বীকার করে নিতে হল।

সে এক গোপন রহস্য। সে কাহিনী আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুপ্ত হবে। তখন আমার ঘোর বিপাক যাচ্ছে—আসলে সেই বিপাকই সৌভাগ্য—সোনার সুযোগ নিয়ে এল। কালী আমাকে তার ক্রীতদাস করে ফেলল। ঠিক বলছি, ক্রীতদাস। কম নয় বেশি নয়, একেবারে ক্রীতদাস।

ভবিষ্যৎ দেখো রামকৃষ্ণকে মা-কালী বলবে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কালীই তার কাজ করবার জন্যে শরীরী রামকৃষ্ণ হয়েছিল। বলো, মাকে, এমন মাকে না ভালোবেসে থাকা যায় ?

ব্রহ্ম অখণ্ড, একমাত্র সত্তা। তাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু শক্তি-রূপিণী মা, মৃত্যুরূপিণী কালী আমার কাছে স্পষ্টতর, নিকটতর। আর তাকে ভালোবাসা সহজের চেয়েও সহজ, স্বভাবস্ফূর্ত।

'মৃত্যু বা কালীকে পূজা করতে সাহস পায় ক'জন ?' আবার বলছে স্বামীজি, 'এস, ভয় কী, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি, দুঃখকে দুঃখ জেনেই বুকে তুলে নিই। ভয় কী, ঐ ভীষণা ঐ কঠিনা যে আমাদেরই মা।'

একবার মা ভাবলে আর ভয় নেই ভ্রান্তি নেই বন্ধন নেই। মা-ই অভয়, মা-ই অমৃত, মা-ই আনন্দ। মা-ই রাজরাজেশ্বরী।

মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা। বুড়ির খেলা করতেই আনন্দ। আর চোখ না বাঁধলে তো লুকোচুরি জমে না। তাই সংসারলীলায় মোহের প্রয়োজন। মায়ের ইচ্ছায়ই তুমি মোহাচ্ছন্ন। মা-ই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তিনিই আবার প্রসন্নবরদরূপে সন্নিহিত হয়ে তোমাকে জাগিয়ে দেবেন। যিনি বন্ধন তিনিই আবার মুক্তি। যিনি ভোগ তিনিই আবার অপবর্গ। যিনি মৃত্যু তিনিই আবার অনন্তজীবনজাগরণ।

সুতরাং ঈশ্বরকে মা বলে ডাকো। মা ডাকেই ভালোবাসা উথলে উঠবে। কিছু চাইবার থাকবে না। আর যা কিছু করবে, মনে হবে সবই মা'র পূজা। প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্‌॥

ঈশ্বরকে মা বলি কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা। ঈশ্বরকে মা বলি যেহেতু বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। ঈশ্বরকে মা বলি যেহেতু মায়ের উপরে জোর খাটে। যেহেতু অনুরক্ত করে না পারি বিরক্ত করে আদায় করে নিতে পারি। যেহেতু মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে মা মামলা ছেড়ে দেয়, হেরে যায়! 'মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥'

'আমি রাত্রে অন্ধকারে গঙ্গার পারে একা-একা বেড়াতুম, মা-মা বলে ডাকতুম', বলছেন ঠাকুর, 'আর বলতুম, মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক। আমি আর কিছু চাই না, আমি শুধু তোকে চাই।'

'শিখেরা বললে, ঈশ্বর কি দয়ালু!' আবার বলছেন, 'হ্যাঁ রে কোনো সন্তান কি বলে, আমার মা কী দয়ালু! বলে না। আমার মায়ের কৃপা স্বাভাবিকী। কেউ কি আগুনকে বলে, হে আগুন, আমাকে দাহ দাও, দীপ্তি দাও। বলে না। আগুনের দাহিকা আর দীধিতি স্বাভাবিকী। কেউ কি জলকে বলে, হে জল, আমাকে শীতল করো, নির্মল করো। জলের শৈত্যশক্তি ও নৈর্মল্যশক্তি স্বাভাবিকী। তেমনি গুণরহিত পুত্রে মা'র অধিক দয়া।'

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচত্বরে কেশব সেন বক্তৃতা দিচ্ছে। সে কী বাগ বিভুতি! হৃদয়রাম গদগদ হয়ে বলছে, আহা, কী মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!

ঠাকুরও ছিলেন সেই সমাবেশে। কতক্ষণ পরে উঠে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সবাই ভাবলে গেঁয়ো মুখ্খু বামুন, সাধ্য নেই এই বাকপতি বিবুধেশ্বরের

বক্তৃতা অনুধাবন করে। তাই সরে পড়েছে। কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল। তার মনে হল নিশ্চয়ই বলায় কোন ভুল হয়ে গেছে। তাই প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। জিগগেস করলে, আমার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে ?

'নিশ্চয়ই হয়েছে।' ঠাকুর সরাসরি বললেন, 'তুমি শুধু ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করছিলে। তুমি কি তা বলে শেষ করতে পারবে ? অনন্তকাল ধরে বললেও তার কণামাত্র পারবে না। কথাটা কী ! ঈশ্বর এত প্রতাপবান এত ঐশ্বর্যশালী, তিনি আমাকে কত কী দিয়েছেন, আরো কত কী দিতে পারেন, তাই—তাই তাঁকে ভালোবাসব ? ঈশ্বর যদি বেকার হতেন, বাউণ্ডুলে হতেন, যদি ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী হতেন, তাহলে কি তাঁকে ভালোবাসতুম না ? তাহলে বলতে চাও, বাবা যদি গরীব হয়, তাহলে ছেলে কি তাকে বাবা বলে ডাকবে না ?'

পরদিন কলকাতা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, 'দক্ষিণেশ্বরের গেঁয়ো মুখখু বামুন কেশবের মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে। বাবা গরীব হলে ছেলে কি তাকে বাবা বলবে না ?'

বাবুর ছেলের সঙ্গে ঝি-এর ছেলের ঝগড়া হয়েছে। বাবুর ছেলের শক্তি-প্রতাপ বেশি, সে ঝি-এর ছেলেকে দু'ঘা মেরে দিয়েছে। ঝি-এর ছেলেও নিঃসম্বল নয়। সে তার কোমরে হাত রেখে বুক ফুলিয়ে বলছে, আমি আমার মাকে বলে দেব। তার মা যে পাঁচ টাকা মাইনের দাসী সে-খবর রাখে না, সে-খবরে তার প্রয়োজন নেই। তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য, এই তার অশেষ।

বালকের বিশ্বাস। বালকের ব্যাকুলতা।

'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥'

'আমি বলব তবেই তুমি করবে এ-একটা কথাই নয়।' জগন্মাতাকে উদ্দেশ করে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'আমার বুকের ভেতরটা ব্যাকুল হবে তুমি তা জানতে পাবে না শুনতে পাবে না এ একটা কথাই নয়। তবে বলি কেন ? ডাকি কেন ? তুমি যেমন বলাও তেমনি বলি যেমন ডাকাও তেমনি ডাকি। ওরে মা যে আবার তার ছেলের কণ্ঠে মা-ডাক শুনতে চায়। ছেলে মাকে ডাকে না, মায়ের খোঁজ করে না, মা-ভোলা হয়ে থাকে, এ মায়ের ভালো লাগে না। তাই তো বারে বারে মাকে ডাকি, মা'র কাছে ছুটে-ছুটে আসি। মাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাই।'

শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের কণ্ঠেও এই মা ডাক। এই মায়ে বিশ্বাস। মায়ের জন্যে ব্যাকুলতা।

বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত মা-মা ডাকতে লাগল। তার ব্রহ্ম কালী হয়ে গেল। অদ্বৈতজ্ঞান থেকে সে চলে এল ভক্তিতে।

'ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে মেতেও বেশ আরাম।' বলছে বিবেকানন্দ, 'জ্ঞানমার্গ কী রকম? যেন একটা প্রবল-বলশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে তাড়াতাড়ি বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য। জ্ঞানমার্গ বলে, সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ করো। ভক্তিমার্গ বলে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করো। ভক্তির পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।'

ভক্ত কী বলে? বলে, প্রভু, চিরকালের জন্যে আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই করছ—'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।

আমার অর্থ নেই যে আমি দান করব। বুদ্ধি নেই যে শাস্ত্র শিক্ষা করব। সময় নেই যে যোগাভ্যাস করব। হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে দেহমন সমর্পণ করলাম।

ঈশ্বর বলে যদি কেউ নাও থাকে তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ় করে থাকো। কুকুরের মত পচা মড়া খুঁজে-খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করতে করতে মরা মহত্তর। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারাজীবন নিয়োজিত করো। মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্যে জীবনপাত করার চেয়ে বড় আর কিছু হতে নেই।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালোবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। কিন্তু ভক্ত বলে, ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন। তাই সে সব কিছুই গ্রহণ করে।

কাশ্মীরে নৌকা করে ধীরামাতা জয়া ও নিবেদিতার সঙ্গে বেড়াচ্ছে বিবেকানন্দ। গান ধরেছে:

'ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা॥'

আবার ধরল:

'মন কেন ভাবিস এত
যেন মাতৃহীন বালকের মত
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
কালেরও কাল যে মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত ॥'

শেষে, শিশু মায়ের উপর রাগ করলে যেমন অভিমানে কথা বলে তেমনি স্বরে গান ধরল স্বামীজি :

'শ্রীরামপ্রসাদ বলে নিদানকালে
কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে
বিমাতাকে মা বলিব ॥'

যা রামকৃষ্ণ তাই বিবেকানন্দ। শেষে দুজনেই 'শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।' দুজনেরই কণ্ঠে প্রেম-গদগদ মা-ডাক। 'এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা-প্রেমে না গলে। ওরে এ রসনায় ধিক ধিক কালীনাম নাহি বলে।'

ভোরবেলা মঠের নিচের তলায় বড় বেঞ্চির উপর বসে আছে স্বামীজি গঙ্গার দিকে মুখ করে। শরৎ চক্রবর্তী এসে তাকে পুজা করতে বসল।

ভক্তের অর্চনাকে স্বামীজি বাধা দিল না।

পুজা হয়ে গেলে স্বামীজি বললে, 'তোর পুজো তো হল কিন্তু বাবুরাম এসে তোকে এখুনি খেয়ে ফেলবে।'

'কেন, কী করেছি ?' শরৎ চমকে উঠল।

'তুই ঠাকুরের বাসনে, তাঁর পুষ্পপাত্রে আমার পা রেখে পুজো করলি।' বলতে না বলতেই স্বামীজি দেখল বাবুরাম দাঁড়িয়ে।

'ওরে দ্যাখ, শরৎ আজ কী কাণ্ড করেছে!' বাবুরামের উদ্দেশে স্বামীজি মুখর হয়ে উঠল : 'ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমার পুজো করেছে।'

বাবুরাম হাসতে লাগল। বললে, 'ঠিকই করেছে। তুমি আর ঠাকুর কি আলাদা ?'

কতক্ষণ পরেই বিবেকানন্দ বলে উঠল : মা, মা, কালী কালী।

'কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা।

গেল গেল কাল, বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল,

প্রসাদ বলে, ভালো, কালী কালী বল, দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা ॥'

নিবেদিতা বলছে, সবসময়েই মাতৃচিন্তায় তন্ময় স্বামীজি। আমি যেহেতু মা'র দুরন্ত ছেলে, দুর্দান্ত ছেলে, আমার প্রতিও মা'র দুর্জয় টান। এই স্বামীজির তর্পণ। জানবে আমার যত মন্দ আর দুর্ভাগ্য তাও মা'র হাতের উপহার। মা'র ডান হাতে অভয় বাঁ হাতে অভিশাপ। আহা, তাঁর অভিশাপও আশীর্বাদ। তাঁর প্রহারও প্রলেপ। চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা। তাঁর নিষ্ঠুরতাই তো শুভঙ্করী। তাঁর নিষ্ঠুরতা না হলে যে আমাদের জীবত্বের ঘুম ভাঙে না। খড়্গেই তো মা পরাসুন্দরী।

'আমি সেই পরাসুন্দরীকে পূজা করি। সেই ভয়ঙ্করীকে।' বলছে স্বামীজি, 'খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা ॥ সেই ভয়ঙ্করীই তো মনোহারিণী। নিত্যাক্ষরা সুধা। আমার মা মাতৃরূপা, আর মৃত্যুই তো মাতৃ-আলিঙ্গন।' পরে গম্ভীর স্বর স্নিগ্ধ হল স্বামীজির : 'সব মানুষই সৌভাগ্য-সম্ভোগ চায় এ ঠিক নয়। অনেক লোকের জন্ম হয় শুধু দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে। ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হবার জন্যে। ভয়ঙ্করকে আমরা ভয়ঙ্কররূপেই পুজো করব, মৃত্যুকেই মৃত্যুরূপে, মাতৃরূপে।'

'কিন্তু পশুবলি সম্বন্ধে কী বলবেন?' জিগগেস করল নিবেদিতা।

তর্ক নয়, তপ্ত-তিক্ত বক্তৃতা নয়, স্বামীজি নীরবে একটু হাসল। পরে বলল, 'চিত্রটাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটু-আধটু রক্ত হলে মন্দ কী।'

পরে আরো বিশদ হল স্বামীজি : মা আমার সমস্তে। হিংসায় দ্বেষে পাপে লজ্জায় ধ্বংসে শোকে বেদনায় বন্ধনে। শুধু সু-তে নয় কুতেও মা। মা-ই সর্বব্যাপিনী। সেই বিরাট ভাবটাকে কিছুতেই কোমল করা নয়, তরল করা নয়। আমার মা ভূমিকম্পে, তুষারঝড়ে, আগ্নেয়গিরির নিদারুণ বিদারণে। মা আমার প্রলয়বিলয়রূপিণী। প্রলয়ের মধ্যেও কি অনির্বচনীয় বাস করে না? কেন মা করুণাবরুণালয়া হবে। না, মা আমার সংহারিণী বলেই আমি তাকে পূজা করব, ভালোবাসব। কিছুতেই ভয় করব না। মা যখন, তখন আর ভয় কোথায়? পাপ কোথায়? মন্দ কোথায়?

'ওয় মূর্খ, মা'র গলায় মুণ্ডমালা দোলায়, তার পরে ভয় পায়।' বললে স্বামীজি, 'ভয়ে তখন মাকে করুণাময়ী বলে। মা করুণাময়ী হতে যাবেন কেন?

থাকুন মা নিধন-পীড়নের মূর্তি ধরে। তবু তাকে আমি ভালোবাসব। আমার ভালোবাসায় দোকানদারি নেই। কিছু লোভের মাল লাভ করবার আশায় তাকে করুণাময়ী বলে স্তুতি করব না। ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসব।'

আনন্দই মায়ের স্বরূপ। মা-ই নিত্য মধুমতী। মাকে দেখ সর্বত্রই মধু দেখবে। আমার রোগে শোকে দুঃখে ক্লেশে সর্বত্রই মা'র মধুপান। যেখানে মা'র আনন্দ সেখানে আমার সঙ্কোচ নেই, কার্পণ্য নেই, ভয়লেশ নেই। মা'র কোলে বসে মা'র খেলা দেখ। সবচেয়ে সুলভ বস্তু মা, মায়ের কোল। সবচেয়ে সহজ বৃত্তি মাকে ভালোবাসা। সেই পরানুরক্তিই ভক্তি।

যদি একবার মায়ের কোলে চড়ে বসা যায় তাহলে আর প্রশ্ন থাকে না, এ আমি কোথায় আছি? সুখে আছি না দুঃখে আছি? কণ্টকে আছি না কুসুমে আছি, কর্দমে আছি না কুঙ্কুমে আছি? আমি মায়ের কোলে আছি। মায়ের কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই।

কত বড় জোর, কত বড় নির্বন্ধন, মায়ের কাছে কিছু চাইতে হয় না। আমি খেটে যাই ডেকে যাই কেঁদে যাই, যা করবার মা করবেন। যদি কিছু নাও করেন তাতেও আমি সম্মত। যদি কোলে তুলে নেন তবুও মা, যদি ধুলোয় ফেলে রাখেন তবুও মা। আমি জানি সর্বসঙ্গই মা'র উৎসঙ্গ।

আরো কত সুবিধে, ভোগ বা নৈবেদ্য কিছু দিতে হয় না মাকে। ভোগ বা নৈবেদ্য বলে যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে অন্তরমধু, প্রীতিভক্তি। স্বামীজি বলছে, 'আমাকে প্রেম দাও, শুধু প্রেম—যে প্রেম অন্য কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না, প্রেম ছাড়া আর কিছু আকাঙ্ক্ষাও করে না।'

গ্রাম্য বাউলের গান শোনো :

'শোন রে মানুষ ভাই
প্রেমের কথা কয়ে যাই।
আমি জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে
প্রেমের ডাকে ভয় করি,
আমার আসন কাঁপে প্রেমের ডাকে
প্রেমাশ্রুতে হই উদয়॥'

শুধু ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসা। লণ্ডনে এক বক্তৃতায় স্বামীজি যুধিষ্ঠিরের কাহিনী শোনাল। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাচ্ছে, দেখল উত্তুঙ্গ পর্বত,

তার শৃঙ্গে রজতধবল তুষারের সমাবেশ। কী গম্ভীর লাবণ্যবিস্তার! তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল যুধিষ্ঠির। রাজ্য বৈভব ত্যাগ করে এসেছে, কোনো পার্থিব পদার্থে স্পৃহা নেই, চোখের সামনে প্রত্যক্ষগোচর তুষারশোভাই তার একমাত্র বন্দনীয়। গিরিশৃঙ্গকে সম্বোধন করে বলছে, গিরিবর, তোমার কাছে আমি কোনো কিছু প্রার্থনা করি না, আকাঙ্ক্ষা করি না, আমার সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু তোমার অপূর্ব গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে ভালোবাসার জন্যেই তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে দেখার জন্যেই তোমাকে দেখি। কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে নয়, বিচার করে নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে নয়। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার প্রাণ তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যেতে চাইছে। ফলাকাঙ্ক্ষা অতি তুচ্ছ জিনিস, ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসা—এই প্রথম ও এই শেষ কথা।

গভীর অনুভূতিতে স্পন্দিত হল শ্রোতৃদল।

স্বর্গের দরজা পর্যন্ত এসেছে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বারপাল বাধা দিল। বললে, 'আপনি পুণ্যাত্মা, আপনি স্বর্গে প্রবেশ করুন, কিন্তু আপনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা কুকুর চলে এসেছে, সে ঢুকতে পাবে না।'

'কেন?' যুধিষ্ঠির থমকে দাঁড়াল।

'কুকুর অস্পৃশ্য, তার স্বর্গপ্রবেশে অধিকার নেই।' বললে দ্বাররক্ষী, 'আপনি কুকুরকে ত্যাগ করে একলা ভিতরে চলে যান।'

'সে কী? কুকুর আমার আশ্রিত, কখন থেকে সে আমার সঙ্গ নিয়েছে, কত কষ্টে দীর্ঘ পার্বত্য পথ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, আমি কিছুতেই আমার আশ্রিত ভক্তকে ত্যাগ করতে পারি না।' বললে যুধিষ্ঠির, 'যদি ইচ্ছে হয় আমাদের দুজনকেই প্রবেশ করবার অনুমতি দিন, নচেৎ বলুন আমরা দুজনেই মর্তধামে ফিরে যাই। কুকুরকে, আমার আশ্রিতকে ছেড়ে, আমি একলা স্বর্গে যাব এ কিছুতেই হতে পারে না।'

দ্বারপাল খুলল না দরজা।

অগত্যা যুধিষ্ঠির কুকুরসহ ফিরে চলল। আমার ভক্তকে আশ্রিতকে কখনই আমি সঙ্গবিচ্যুত করি না।

তখন কুকুর তার স্বরূপ ধরল। যুধিষ্ঠির দেখল স্বয়ং ধর্মরাজ দাঁড়িয়ে।

ধর্মরাজ বললে, 'আমি এতক্ষণ ছদ্মবেশে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম।

কুকুরকে কে আশ্রয় দেয় ? কেউ দেয় না। শুধু তুমি দিলে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া রাজধর্ম, তুমি সেই রাজধর্ম পালন করলে। পথে তোমার স্ত্রী ও চার ভাই মরে পড়ে আছে, তবু তুমি, ঈশ্বরলাভে দৃঢ়সংকল্প, বিন্দুমাত্র বিচলিত হলে না। কিন্তু অস্পৃশ্য কুকুরকে ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বরলাভে সমর্থ হবে এ শুনতেই তুমি বিচলিত হয়ে পড়লে। ঈশ্বরলাভ না আশ্রিত-ত্যাগ কোনটা শ্রেয় এ নিদারুণ প্রশ্ন তোমার সামনে এসে দাঁড়াল। তুমি পলকে স্থির করলে স্বর্গলাভ তুচ্ছ, আশ্রিত রক্ষা করাই বরণীয়। এইজন্যে তুমি মর্তে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলে। দেখালে তুমি সব ত্যাগ করতে পারো, এমন কি স্বর্গসুখ পর্যন্ত, কিন্তু আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারো না। নিঃস্বার্থ ধর্ম কী তুমিই তার প্রমাণ। চলো, স্বর্গে যাবার তোমারই সর্বোচ্চ অধিকার।

মহিলারা বক্তৃতা শুনে খুব খুশি। তাদের অনেকেই কুকুর পোষে, কুকুরের জন্যে যে স্বর্গে যাওয়াও বাতিল করা যায় তাতে তাদের পূর্ণ সমর্থন।

তারপর স্বামীজি একদিন সেই তেঁতুলগাছের পাতা গোনার গল্প বললে।

গাছতলায় বসে একটা লোক গাঁজা টানছিল, নারদকে সে-পথে বৈকুন্ঠে যেতে দেখে লোকটা বললে, নারায়ণকে জিগগেস করে এস তো কত জন্ম পরে আমার নারায়ণ দর্শন হবে ?

নারদ ফিরে এল বৈকুণ্ঠ থেকে। লোকটা জিগগেস করলে, 'কি কত জন্ম পরে ?

'নারায়ণ বললেন, তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে তত জন্ম পরে।' নারদ বললে হতাশ মুখে।

লোকটা নৃত্য করতে শুরু করল।

'ও কি, তোমার এত ফুর্তি হল কিসে ?' নারদ তাকাল গাছের দিকে : 'গাছে কত পাতা আছে খেয়াল করতে পারো ? মনে রেখো তত জন্ম পরে।'

'হোক লক্ষ কোটি পাতা, লক্ষ কোটি জন্ম। তবু তো একদিন আমার নারায়ণ দর্শন হবে।' লোকটা উন্মাদের মত লাফাতে লাগল : 'আমারও হবে। আমি যে আমি আমিও নারায়ণ দর্শন করব। আমাকে তবে পায় কে, দেখে কে।'

নারদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নারায়ণের কাছে গিয়ে দিল সব বিবরণ।

ওর এত দৃঢ় ভক্তি! এত সুগভীর বিশ্বাস! তবে আর দেরি নয়। ওর এ জন্মেই মুক্তি হবে। এ জন্মেই ও দেখতে পাবে আমাকে।

বক্তৃতা শুনে সকলে আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকলেই বিশ্বাস করল একদিন না একদিন দেখতে পাবে সেই পরমপ্রিয়কে।

'এমন সুন্দর কথা আর কখনো শুনিনি।' শ্রোতার দল স্বামীজিকে বেষ্টন করে ধরল : 'তোমার রাজযোগের ধ্যান-ধারণার কথা, দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্রের কথা বড় কঠিন মনে হয় কিন্তু এ ভক্তিবিশ্বাসের কথা কী চমৎকার সোজা।

যেন একেবারে মা'র মত।

বাবা হচ্ছে জ্ঞান, মা হচ্ছে ভক্তি। বাবা কখনো ধুলো-কাদা-মাখা সন্তানকে কোলে নেন না, কিন্তু মা নেন। ভক্তি-পথে ধুলো-কাদা মেখেও মা'র কোলে ওঠা যায়।

যেমন গিরিশ ঘোষ উঠেছে।

'গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শোনবার দরকার হয় না। তবে এরকম ভক্তি-বিশ্বাস জগতে দুর্লভ।' বলছে স্বামীজি, 'গিরিশবাবুর মত যাদের ভক্তি-বিশ্বাস তাদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই, কিন্তু গিরিশবাবুকে অনুকরণ করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে।'

সেই গিরিশকে ভৈরব সাজাল স্বামীজি। যে ভক্তের ভক্ত সেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

বেলুড়ে ভাড়াটে বাড়িতে মঠ উঠে এসেছে আলমবাজার থেকে। ঠাকুরের তিথিপূজা হচ্ছে। মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামীজিকে যোগীবেশে সাজিয়ে দিল। কানে শঙ্খের কুণ্ডল, গায়ে কর্পূরগৌর বিভূতি, মাথায় জটা, বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলায় ত্রিবলীকৃত রুদ্রাক্ষমালা। বামহাতে ত্রিশূল—একেবারে সর্ববিশ্বৈকজেতা মহাদেব।

কতক্ষণ পরে সেখানে গিরিশ এসে উপস্থিত হল।

'এস জি-সি তোমাকে সাজিয়ে দিই।'

স্বামীজি নিজের বেশভুষা খুলে ফেলল। সাদরে নিজের হাতে সাজাতে বসল গিরিশকে। যেমনটি নিজে সেজেছিল ঠিক তেমনি। অবাধে অঙ্গ ঢেলে দিল গিরিশ। বিশাল দেহে ছাই মাখানো, মাথায় জটাপুঞ্জ, কানে কুণ্ডল, বাহুতে গলায় রুদ্রাক্ষ, হাঁতে ত্রিশূল—সে এক জগদ্দীপাকার শিব মূর্তি।

এততেও হল না। গেরুয়া পরিয়ে দিল।

'এই ঠিক-ঠিক ভৈরব সেজেছে জি-সি।' স্বামীজি বললে, 'আমাদের সঙ্গে ওর কোন প্রভেদ নেই।'

কালিকাপদ্মরাধিনাথকালভৈরবং ভজে।

আসল কথা কী জানো? বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হলেই ব্যাকুলতা।

'কেবল বিশ্বাসী হও! বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।' বলছে স্বামীজি, 'আর অগ্নিময় বিশ্বাস এলেই জাগবে অগ্নিময় ব্যাকুলতা।'

যীশুখৃষ্টের এই কথাগুলি মনে করো: 'চাইলেই তোমাকে দেওয়া হবে, অনুসন্ধান করলেই তুমি পাবে, করাঘাত করলেই খুলে যাবে দরজা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভগবানকে চায় কে? যদি সত্যি-সত্যি কেউ চায়, জলেডোবা লোক যেমন মুক্ত বাতাসকে চায়, তাহলে সে চরম লক্ষ্যে পেঁছুতে পারে। যদি ছেলে মাকে সত্যিই চায়, যদি চাপা-দেওয়া গায়ের বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্যিই কেঁদে উঠতে পারে, সে পেয়ে যায় মা'র কোল।

'ধরো, এ ঘরে একটা চোর আছে।' বলছে স্বামীজি, 'সে কোনোরূপে জানতে পেরেছে পাশের ঘরে একতাল সোনা আছে, আর দুঘরের মাঝে যে দেয়ালটা আছে সেটা খুব পাতলা। এ পরিস্থিতিতে চোরের কী অবস্থা হবে। তার ঘুম হবে না, সে আর কিছুই করতে ·পারবে না, কী করে ঐ সোনার তাল সংগ্রহ করবে সেই দিকে তার মন পড়ে থাকবে। মানুষ যদি সত্যিই বিশ্বাস করত তার পরম আনন্দ আর গৌরবের খনি স্বয়ং ভগবান এখানে রয়েছেন, তাহলে কি তা উপেক্ষা করে সাধারণ সাংসারিক তুচ্ছতায় লিপ্ত হতে পারত? কখনো না। সে ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে ফিরত। ভেঙে ফেলত তার এ-ঘর ও-ঘরের ব্যবধান।

বিশ্বাস করো পাশের ঘরেই তোমার সর্বাশ্রয়া মা আছেন। আর তুমি যদি তার শিশু হও দেখি কেমন তার জন্যে তুমি ব্যাকুল না হয়ে পারো।

মা-ই শ্রেষ্ঠা পূজনীয়া। মায়ের প্রসন্নতা ও ক্রোধ দুইই আমাদের মঙ্গলদায়ক। মায়ের ভ্রূকুটিকরাল কুপিত মুখশ্রী দেখে আমাদের ভয় নেই। মা'র প্রসন্নতায় যেমন, কোপেও তেমনি মাতৃস্নেহ। মা-ই প্রসাদসুমুখী। মা-ই সর্বত্র অভ্যুদয়দায়িনী।

মায়াবতীর জনৈক ব্রহ্মচারীকে স্বামীজি চিঠি লিখছে: 'তোমার মাকে পত্র লেখ না কেন? ও কি কথা? মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কল্যাণ।'[৮]

মাদ্রাজে একাউন্টেন্ট-জেনারেল মন্মথ ভট্চাজের বাড়িতে আছে, স্বামীজি একদিন স্বপ্ন দেখল, মা মারা গেছেন। আমেরিকায় যাওয়া ঠিকঠাক, এমন সময় এই দুঃস্বপ্ন! মায়ের শারীরিক কুশল জানতে না পেরে কী করেই বা রওনা হওয়া

যায়! ব্যাকুল হয়ে মন্মথবাবুকে বললে, কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দিতে। কিন্তু টেলিগ্রামের উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। মায়ের জন্যে এত অস্থির হয়েছে স্বামীজি।

মন্মথবাবু বললে, চলো তোমাকে এক সাধুর কাছে নিয়ে যাই, সে শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে।

চলুন। এক মুহূর্ত তর সইছে না স্বামীজির।

খানিকটা ট্রেন খানিকটা পায়ে-হাঁটা, মন্মথবাবু স্বামীজিকে একটা শ্মশানে নিয়ে এল। সেখানে বিকটাকার মিশ-কালো একটা ঢ্যাঙা লোক বসে আছে। দিশি ভাষায় তার অনুচররা জানাল এ শুধু সাধু নয় এ এক পিশাচসিদ্ধ মহাপুরুষ।

আলাসিঙ্গা সঙ্গে ছিল, দোভাষীর কাজ করে বোঝাল সাধুকে। এ সন্ন্যাসী তার মায়ের জন্যে ব্যাকুল। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হয়েও সে মাকে ছাড়েনি, মাকে ভোলেনি। যদি বলে দেন কেমন আছেন ওর মা।

সাধু কাগজে পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো হিজিবিজি আঁক পাড়তে লাগল। পরে মন একাগ্র করে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল।

তারপর মুখ খুলল। স্বামীজির নাম বললে, গোত্র বললে, চৌদ্দপুরুষের খবর বললে। আরো বললে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন।

'কিন্তু মা, আমার মা?'

ভালো আছেন। বাড়ি ফিরেই টেলিগ্রাম পাবে।

বাড়ি ফিরেই টেলিগ্রাম পেল। মা ভালো আছেন। তবে স্বামীজি নিশ্চিন্ত হল।

'বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা দরকার।' বলছে স্বামীজি, 'এতে পবিত্রতার উদয় হবে। আর মাতৃপূজায় মহাশক্তির উদ্বোধন হবে।'

মা আছেন একবার এই বিশ্বাস যদি জীবনে দৃঢ়মূল হয় তাহলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষনীয় থাকে না। তখন কোথায়ই বা চাঞ্চল্য কোথায়ই বা আসক্তি।

'কিছু পাবার চেষ্টা করো না।' বলছে স্বামীজি, 'কিছু এড়াবার চেষ্টাও কোরো না। যা কিছু আসে গ্রহণ করো, যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট হয়। কোনো কিছুতে বিচলিত না হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য করে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও।'

সেই ষাঁড়ের গল্পটা মনে করো।

একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের সিঙে বসেছিল। অনেকক্ষণ বসবার পর তার বিবেকবুদ্ধি জাগল, হয়তো ষাঁড়ের শিঙে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে! সে তাই ষাঁড়কে বললে, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমায় মাপ করো, আমি এই উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বললে, 'না, না তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙে বসবাস করো না—তাতে আমার কী এসে যায়!'

ঈশ্বরকে ভয় করা থেকে ধর্মের সূত্রপাত এর পর্যবসান প্রেমে। একমাত্র ভালোবাসাই ভয় মানে না। একমাত্র মা-ই তার শিশুকে বাঁচাবার জন্যে বাঘের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। সে কোনো উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নয়, সে নিজেই পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের সীমা কোথায়। কী তার আদর্শ? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ এই তার চরম সীমা। ঈশ্বরকে মানুষ কেন ভালবাসবে? এই 'কেন'-র কোনো উত্তর নেই যেহেতু ভালোবাসা কোনো অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে নয়। যদি ভালোবাসা আসে তাহলেই সমস্ত এসে গেল। ভালোবাসাই মুক্তি, ভালোবাসাই স্বর্গ, ভালোবাসাই পূর্ণতা। আর কী চাই? অন্য আর কী প্রাপ্তব্য থাকতে পারে? প্রেমের চেয়ে মহত্তর আর কী তুমি পেতে পারো?

নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে বর দিতে চেয়েছিল, কী বলেছিল প্রহ্লাদ? বলেছিল, আমি কি বণিক, আমি কি ব্যবসা করতে বসেছি? বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কোনো সুখের দ্রব্য পাব তাই তোমাকে ভালোবেসেছি, সহ্য করেছি অন্তহীন প্রহার-পীড়ন? না, কিছু চাই না, তবু তোমাকে ভালোবাসি। যদি একান্তই বর দিতে চাও তো এই বর দাও যেন আমার হৃদয়ে কোন কামনার উদ্রেক না হয়।

একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও সর্বত্র তাঁকে দেখা—এই মানুষের পরম স্বার্থ।

'আমি বিশ্বাস করি', বলছে স্বামীজি, যদি কোনো পুরুষ ও নারী পরস্পরকে যথার্থ ভালোবাসতে পারে, তবে যোগীরা যে সমস্ত বিভূতি লাভ করেছেন বলে দাবি করেন, তবে সেই পুরুষ ও নারীও সেই সকল শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হবে —যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং ঈশ্বর। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং সেজন্যে তোমাদের মধ্যেও এই ভালোবাসা আছে, তোমরা জানো বা না জানো।'

আবার বলছে, 'একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছিলাম। ঠিক করলাম যুবককে পরীক্ষা করবার এই উপযুক্ত অবসর। দেখলাম সে তার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূরশ্রবণের ক্ষমতা লাভ করেছে। ষাট কি সত্তর বারের মধ্যে যুবক একটিবারও ভুল করেনি—কিন্তু তরুণী ছিল দুশো মাইল দূরে। বলছে, 'এইভাবে ও সেজেছে', 'এই ও চলতে শুরু করেছে', 'এই ও দাঁড়িয়ে পড়েছে'—এমনি সমস্ত দৃশ্য তার যোগদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। বিশ্বাস করো আমি এ নিজের চোখে দেখেছি।'

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।। কোন্ মানুষটা বিচারশীল ? সকলেই পাগল। শিশুরা পাগল খেলায়, তরুণ পাগল তরুণীকে নিয়ে। বৃদ্ধ পাগল অতীতের চর্বিত-চর্বণে। কেউ পাগল টাকার জন্যে। কেউ বা নামযশ পদবীর জন্যে। তেমনি কেউ ঈশ্বরের জন্যেই বা পাগল হবে না কেন ?

স্বামীজি বলছে, 'জন জেনের জন্য যেমন পাগল হয়ে ছুটছে তেমনি ঈশ্বরের প্রেমের জন্যে তুমি উন্মাদ হও। কোথায়, এমন লোক কোথায় ? বলে, আমি কি এটা ছাড়ব ? অমুকটা কি এড়িয়ে যাব ? একজন জিগগেস করেছিল, বিয়ে করব না ? না, কোনো বিষয়ই ছাড়তে যেও না, বিষয়ই তোমাকে ছেড়ে যাবে। অপেক্ষা করো, তোমাকে সবই ভুলিয়ে ছাড়বে। রোম্যান ক্যাথলিকদের মধ্যে সে সব আশ্চর্য সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী কি দেখনি—যারা অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে একেবারে আত্মহারা! এমনি ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়াই প্রকৃত উপাসনা। এই প্রেমই লাভ করতে হবে যে প্রেম কিছু চায় না, কিছু অন্বেষণ করে না।'

গোপীপ্রেমের কথা ভাবো। নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন কী কী ? যখন সকল চিন্তা সকল বাক্য সকল কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবানকে স্বল্পক্ষণ বিস্মৃত হলেও যখন অতি গভীর দুঃখের উদয় হয়, যখন দেহরক্ষার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই দূরে যায়। নারদ বলেছে, এই প্রেম গোপীদের ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করলেও তাঁর ভগবৎস্বরূপ তারা কখনও বিস্মৃত হয়নি। এই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। মানুষের সব ভালোবাসার প্রতিদানে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, গোপীপ্রেমে এই আকাঙ্ক্ষার বাষ্পমাত্র নেই।

কিমলভ্যং ভগবতী প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ শ্রীনিবাস ভগবান প্রসন্ন হলে কী অলভ্য থাকতে পারে? তবু যে ভগবৎপরায়ণ সে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না।

ভগবানের সঙ্গে একায়ন, মানুষের এইই চরম লক্ষ্য।' বলছে স্বামীজি, 'মানুষের সব ভালোবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায় যেহেতু তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ।' ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।'

'এই হৃদয় আর কাকে ভালোবাসবে? ঈশ্বরের চেয়ে সুন্দর আর কে আছে?' বলছে স্বামীজি, 'তিনি ছাড়া আর কে স্বামী হবার উপযুক্ত? আর কাকে আমার ভালোবাসার পাত্র করতে পারি? সুতরাং তিনিই আমার স্বামী হোন, আমার পরমতম প্রেমাস্পদ হোন। মূর্খেরা কী করে বুঝবে এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা? হে প্রিয়তম, তোমার এই অধরের একটি মাত্র চুম্বন আমাকে দাও। যাকে তুমি একবার চুম্বন করেছ, তোমার জন্যে তার পিপাসা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তার সমস্ত দুঃখশোক চলে গিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর সব সে বিস্মৃত হয়েছে। প্রিয়তমের সেই অধরস্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হও—এই অমরস্পর্শই ভক্তকে পাগল করে দেয়, মানুষকে দেবতা করে তোলে। ভগবান যাকে একবার তাঁর অধরামৃত দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তার সমস্ত প্রকৃতিই বদলে যায়। তার কাছ থেকে জগৎ চলে যায়, চন্দ্র-সূর্য চলে যায়, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সেই এক অনন্ত প্রেমসমুদ্রে বিগলিত হয়।'

'অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'

মিলনে বাধা থাকলেই উৎকণ্ঠা বেশি। আর যত বেশি উৎকণ্ঠা তত বেশি আনন্দ-চমৎকারিতা। স্বকীয়া কান্তা অনায়াসলভ্যা, তার সঙ্গে মিলনে কোনো বাধা নেই, তাই উৎকণ্ঠাও নেই। আনন্দ থাকলেও আনন্দ-চমৎকারিতা নেই। পরকীয়া-মিলন দুর্লভ, দুঃসাধ্য, সর্বলোকের নিন্দনীয়। তাই বাধা আছে বলেই তাতে বেশি প্রাবল্য, বেশি মাধুর্য। শুধু আনন্দই নয়, আনন্দ-চমৎকারিতা। 'বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥'

নাগরীর বামতা, দুর্লভত্ব ও অভিভাবকদের নিবারণই পঞ্চশরের পরম আয়ুধের মত প্রেমিককে বিদ্ধ করে রাখে।

'প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিকের কাছে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও যথেষ্ট উন্মাদক নয়।' বলছে স্বামীজি, 'ভক্তেরা পরকীয়া প্রেমের ভাব গ্রহণ করে থাকেন, কারণ তা অত্যন্ত প্রবল। তার অবৈধতা তাঁদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে যতই তা বাধা পায় ততই তা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ, তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন নেই। সেইজন্যে ভক্তেরা কল্পনা করেন যেন কোনো নারী তার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, কিন্তু তার বাপ মা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধা পায় ততই তা দুর্বার হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করতেন, সকলে উন্মত্ত হয়ে কেমন তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর কণ্ঠস্বর বা বেণুধ্বনি শোনামাত্র গোপীরা—সেই অশেষ ভাগ্যবতী গোপীরা—সব কিছু ভুলে, জগৎ ভুলে, জগতের সকল বন্ধন ভুলে, সাংসারিক কর্তব্য সুখদুঃখ ভুলে—তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে আসত, মানুষের ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। মানুষ, তুমি ভগবৎপ্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়েও নিযুক্ত থাকো, তোমার মন-মুখ কি এক?' যেখানে রাম আছেন সেখানে কাম নেই। যেখানে কাম আছে সেখানে রাম নেই। রবি আর রজনী একত্র থাকতে পারে না।'

'অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ!
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥'

গোপীরা কী রকম? 'স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোনো দাগ।' তারা মূর্তিমতী নির্মলতা। মূর্তিমতী নির্বাসনা। তাদের স্বসুখবাসনা নেই, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে শুধু কৃষ্ণ সুখী হবে বলে। তাদের আত্মসুখদুঃখের বিচার নেই, তাদের সমস্ত কষ্টক্লেশ, সমস্ত মননচিন্তন কৃষ্ণসুখের উদ্দেশে। 'আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা, মনোব্যবহার ॥' কৃষ্ণের জন্যে তারা বেদধর্ম লোকধর্ম সব ছেড়েছে, শুধু সেবায়-ভালোবাসায় কৃষ্ণকে সুখী করার জন্যে। কৃষ্ণের বাইরে আর তাদের তৃষ্ণা নেই। কৃষ্ণপ্রেম অর্থই তৃষ্ণাত্যাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'গোপীদের ভাব নিতে না পারিস গোপীদের টানটুকু নে।'

সেই টানেই উচাটন হয়ে স্বামীজি শেষ পর্যন্ত চলে এসেছে ভক্তিতে, পরিপূর্ণ সমর্পণে। 'আমি ধন জন চাই না, সুন্দরী কবিতা চাই না, এমন কি

মুক্তি পর্যন্ত চাই না। এই শুধু চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি আমার যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' 'আমি ও আমার পিতা এক।' শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্যেই আমি পৃথক হয়েছি। কোনটি ভালো—চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া। চিনি হওয়া, তাতে আর কি সুখ? চিনি খাওয়া—এই হল প্রেমের অনন্ত উপভোগ। 'এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গলে? এ রসনায় ধিক ধিক, কালী নাম নাহি বলে।' 'নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, ওরে চিনি হওয়া ভালো নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি॥ ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥'

ঈশ্বরে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় মাতৃবুদ্ধি। মাতৃ-অঙ্কই সমস্ত মধুরের সুধাপদ্ম। তাঁর ব্রহ্মই কালী। কালীই ব্রহ্ম।

মহাচণ্ডযোগেশ্বরী গুহ্যকালী
করালী মহাডামরী সাট্টহাসা
জগদ্ভাসিনী চণ্ডিকা পালিকেতি
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
রুবন্তী শিবাভির্বহন্তী কপালং
জয়ন্তী সুরারীন্ বধন্তী প্রসন্না
নটন্তী পতন্তী চলন্তী হসন্তী
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

শ্রীনগরে মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাটিকে দেখে স্বামীজি ভারি মুগ্ধ হল। নিবেদিতাকে বললে, 'আমি এই কন্যাটিকে পূজা করব।'

'পূজা করবেন?'

'হ্যাঁ, উমারূপে পূজা করব।'

পূজা করল স্বামীজি। 'তুমি গৌরী, তুমি অনঘা, মহারজা, মহাশক্তিধরা। তুমি সৌম্যা, সুন্দরী, মঙ্গলময়ী, সর্বাভীষ্টসাধিকা। নারায়ণি নমোঽস্তু তে।'

যেদিন স্বামীজি শ্রীনগর ছেড়ে যাবে, সেই ছোট্ট মেয়েটি সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে একথালা আপেল নিজ হাতে বয়ে এনে টাঙ্গায় স্বামীজিকে উপহার দিল।

সেই মেয়েটিকে স্বামীজি ভোলেনি। একবার একটি নীলফুল হাতে নিয়ে সেই মেয়েটি একা বসে-বসে অনেকক্ষণ দোলাচ্ছিল আপন মনে সেই সুন্দর দৃশ্যটির স্মৃতি বারে-বারে তার মনে হয়েছে। কে বলবে এই অম্লানা কন্যাটিই তার উমা নয়?

একটি মুসলমান বালিকার মধ্যেও কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভবতারিণীকে দেখেননি?

হে দেবী! হে শরণাগতজনদুঃখহারিণী! তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরী, অখিল জগতের জননী, তুমি প্রসন্ন হও। তুমিই পরমা মায়া, তুমিই আবার পরমমুক্তিহেতুস্বরূপা। তুমি প্রসন্ন হও।

ক্ষীরভবানী দেখে স্বামীজির নিদারুণ ক্ষোভ হল। বিধর্মীরা এসে মায়ের মন্দির ভেঙে দিচ্ছে অথচ দেশের লোকগুলো তার কোনো প্রতিকার করল না? চুপ করে সহ্য করে গেল।

অশরীর দৈববাণী শুনল স্বামীজি: 'আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করেছে, আমার ইচ্ছে আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করব। ইচ্ছে করলে আমি কি এখুনি এখানে সপ্তদল সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কি করতে পারিস? তুই আমাকে রক্ষা করবি, না, আমি তোকে রক্ষা করব?'

শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী বলছে, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোনো সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সংকল্প ত্যাগ করেছি। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে।'

শিষ্য বুঝি একটু সন্দেহ প্রকাশ করতে চাইল। বললে, 'আচ্ছা আপনিই তো বলতেন দৈববাণী আমাদেরই ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনিমাত্র।'

স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা ভেতরেই হোক আর বাইরেরই হোক তুই যদি নিজের কানে আমার মতো ঐ রকম অশরীর কথা শুনিস তা হলে কি সেটাকে মিথ্যে বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যি-সত্যিই শোনা যায়, ঠিক যেমন আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি!'

'ভুতের কান্ড।'

'হ্যাঁ ভুতের কাণ্ড!'

'তা হলে ভুতপ্রেত আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। তুই যা না দেখিস তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস না বলে কি তাদের আর অস্তিত্ব নেই? তবে তোকে ও সব ভুতুড়ে কাণ্ডে মন দিতে হবে না, ভাববি ভুতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে—এই শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তুই মায়ের ছেলে, তুই বীর হবি—মহাবীর হবি—, 'ভাবো শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধো দিয়া ভক্তি দড়া।'

রাত্রির অন্ধকার দেখছে আর গম্ভীর গদগদকণ্ঠে বলছে স্বামীজি : 'মা, মা, কালী কালী।'

গঙ্গায় নৌকাতে বেড়াচ্ছে স্বামীজি। শূন্যমনে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। নৌকো মঠের ঘাটে এসে ঠেকল। স্বামীজি গান ধরল :

'কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥'

নিবেদিতাকে স্বামীজি বলতো তার ভবিষ্যতের কথা। কে তোমার স্বামীজি? সে গত ও মৃত। এখন আর কিছুই আশা করবার নেই, শুধু গঙ্গাতীরে এক পরিব্রাজকের জীবন, স্তব্ধ ও উলঙ্গ। কে সে স্বামীজি, কে জগৎকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেবে? কিসে তার সেই অধিকার? সমস্ত অনর্থক বাক্য, সমস্ত অহঙ্কার। স্বামীজিকে মায়ের প্রয়োজন নেই, মাকেই স্বামীজির প্রয়োজন। আমার আর কোনো কথা নেই, এই আমার শেষ কথা, আমি এখন শ্রান্ত শিশুর মত মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

যে শুক্রবার স্বামীজি দেহ রাখবে তার দুদিন আগে, বুধবার, নিবেদিতা এসেছে। সেদিন একাদশী, নিরম্বু উপবাস করে আছে স্বামীজি। কিন্তু নিবেদিতাকে খেতে হবে। স্বামীজি নিজেই তাকে থালায় ভাত বেড়ে দিল। আর খাওয়ার পর নিজেই জল ঢেলে নিবেদিতার হাত দুখানি ধুয়ে দিল মুছে দিল তোয়ালে দিয়ে।

'এ কী! এ সেবা তো আমারই আপনাকে করার কথা।' ভীষণ কুণ্ঠিত হল নিবেদিতা। বললে, 'আমার জন্যে আপনি এ করবেন কেন?'

স্বামীজি গম্ভীরস্বরে বললে, 'যীশুখৃস্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।'

সেই সেবা, সেই ভক্তিই বিবেকানন্দে।

'কিন্তু সে তো শেষ সময়ে!' উত্তরটা মুখে এসেছিল, নিবেদিতা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে গেল।

শুক্রবার রাত্রে এক গুরু-ভাই স্বপ্ন দেখল, শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার দেহ রাখলেন।

সংকলন

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

রচনাবলীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে অচিন্ত্যকুমারের জীবনী-গ্রন্থ 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (চার খণ্ড, 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' সংযোজিত হয়েছে। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে প্রথমেই অচিন্ত্যকুমারের রামকৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থ 'ভক্ত বিবেকানন্দ' সংযোজিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি স্বামী বিবেকানন্দ, সন্দেহ নেই। স্বদেশে যেমন কেশবচন্দ্র সেন, বিদেশে তেমনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত ও বাণীপ্রচারে পক্ষান্তরে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যদিও উভয়েই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তারপরেই সেই প্রচারকার্যের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করবেন বিবেকানন্দ। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্বে এবং পরে বিদেশ এবং স্বদেশের অগণিত মনীষীগণ বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেই সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি একত্রিত করলে মহাভারত হয়ে যাবে। রচনাবলীর সীমিত স্থানে তাই সেই সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি হতে কিছু কিছু অতঃপর উদ্ধৃত হলো।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(১) স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ও বন্দনা ঃ

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপ-ধর নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন অঘদূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাজ্ঞান বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভবসাগর চির-উন্মাদ প্রেমপাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ তারণ ভব-পার ॥
জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ সহায়।
নিরোধন সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ জগৎ-তারণ কৃন্তন কলিডোর ॥

বঞ্চন-কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ
ত্যাগীশ্বর হে নরবর। দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান ॥
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন-দুঃখ যায় ॥

* * *

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥

২

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতমব্‌হবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥

* * *

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেভ্যঃ।
নক্তংদিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১ ॥

ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
বক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ২ ॥

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণা
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৩ ॥

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৪ ॥

*　　　*　　　*

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

Friedrich Max Muller :

"...Pratap Chunder Mazoomder, the leader of the Brahma Samaj, and well-known to many people in England, tells me of the extraordinary iufluence which the Mahatma (Ramkrishna) exercised on Keshub Chandra Sen, on himself, and on a large number of highly educated men in Calcutta. A score of young men who were more closely attached to him have become ascetics after his death. They follow his teachings by giving up the enjoyment of wealth and carnal pleasure, living together in a neighbouring Matha (College), and retiring at times to holy and solitary places all over India even as far as the Himalayan mountains...

I know that I can trust the writer (Pratap Chunder), who is a freind of mine and has lived long enough in England and in India to be able to distinguish between the language of honest religious enthusiasm and the empty talk of professional imposters. The state of religious exaltation as here described has been witnessed again and again by serious observers of

exceptional psychic states. It is in its essence something like our talking in sleep, only that with a mind saturated with religious thought and with the sublimest ideas of goodness and purity the result is what we find in the case ot Ramakrishna, no more senseless hypnotic jabbering, but a spontaneous outburst of profound wisdom clothed in beautiful poetical language. His mind seems like a haleidoscope of pearls, diamonds, and sapphires, shaken together at random, but always producing precious thoughts in regular, beautiful outlines...

Any times the question has been asked of late what is a Mahatman, and what is a Sannyasin ? Mahalman is a very common Sanskrit word, and means literally great-souled, high-minded, noble. It is used as a complimentary term, much as we use noble or reverend ; but it has been accepted also as a technical term, applied to what are called Sannyasin in the ancient language of India. Sannyasin means one who has surrendered and laid down everything-that is, who has abandoned all worldly affections...

The late Ramakrishna Paramahansa was a far more interesting specimen of a Sannyasin. He seems to have been, not only a high-souled man, a real Mahatman, but a man of original thoughts. Indian literature is full of wise saws and sayings, and by merely wanting them a man may easily gain a reputation for profound wisdom. But it was not so with Ramakrishna. He seems to have deeply meditated on the world from his solitary retreat. Whether he was a man of extensive reading is difficult to say, but he was certainly thoroughly imbubed with the spirit of Vedanta Philosophy.

His utterances, which have been published, breath the spirit of that philosophy ; in fact are only intelligible as products of a Vedantic soil. And yet it is very curious to see how European thought, nay a certain European style, quite

different from that of native thinkers, has found an entrance into the oracular sayings of this Indian saint. It is difficult to say whether the Vedanta is a philosophy or a religion. It seems to be both, according to the disposition of its followers or believers. Nor is it possible to speak of the Vedanta without distinguishing between its two schools. These schools, though they adopt the same name and follow the same authorities, chiefly the Upanishads and the Brahma-Sutras, differ on points which from the very essence of any philosophy or religion...

But what is the most extraordinary of all, his religion was not confined to the worship of Hindu deities and the purification of Hindu customs. For long days he subjected himself to various kinds of discipline to realise the Mohammedan idea of an all-powerful Allah....For Christ his reverence was deep and genuine. He bowed his head at the name of Jesus, honoured the doctrine of his sonship, and once or twice attended Christian places of worship. He declared that each form of worship was to him a living and most enthusiastic principle of personal religion, he showed, in fact, how it was possible to unify all the religions of the world by seeing only what is good in every one of them, and showing sincere reverence to every one who has suffered for the truth, for their faith in God, and for their love of men...(Quoted from an article of the author 'A real Mahatman' published in August, 1896 of 'Nineteenth Century', London).

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজ্মদারের সংগে ম্যাক্সম্লারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে ম্যাক্সম্লারকে বিশেষভাবে অবগত করান। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হয়ে লণ্ডনে গেলেন তখন তাঁর সংগেও ম্যাক্সম্লারের ঘনিষ্ঠতা হয়। বিবেকানন্দ ইংরেজীতে অনুবাদ করা শ্রীরামকৃষ্ণের ৩৯৫টি বাণী সংগ্রহ করে ম্যাক্সম্লারকে পাঠিয়ে দেন। তার থেকে ৩১টি বাণী তিনি তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে সংযোজন করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর

মাসে ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থ 'Ramkrishna : His Life And Sayings' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত শ্রীরামকৃষ্ণের ৩৯৫টি বাণীই সংযোজিত হয়। ঠাকুরের ১৫০টি অমৃতবাণী রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত বাণীসকলের মধ্যেও কিছুসংখ্যক বাণী ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। অতএব ঐ ইংরেজি অনুবাদ হতে মাত্র কয়েকটি, নমুনা হিসাবে, নিম্নে উদ্ধৃত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্যের কিছুটাও নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"If we remember that these utterances of Ramakrishna reveal to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings, we may indeed feel hopeful about the future of that country. The consciousness of the Divine in man is there, and is shared by all, even by those who seem to worship idols. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of the future will be erected, in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme Spirit—who is not far from every one of us, for in Him we live and move and have our being...To my mind these sayings, the good, the bad, and the indifferent, are interesting because they represent an important phase of thought, an attempt to give prominence to the devotional and practical side of the Vedanta, and because they show the compatibility of the Vedanta with other religions. They will make it clear that the Vedanta also possesses a morality of its own, which may seem too high and too spiritual for ordinary mortals, but which in India has done good, is doing good, and many continue to do good for centuries to come.

...I received a complete collection of them from Ramakrishna's own pupil, Vivekananda, well-known by his missionary labours in the United States and England. I give them as

they were sent to me, with such corrections only seemed absolutely necessary.

*   *   *

Thou seest many stars at night in the sky, but findest them not when the sun rises. Can'st thou say that there are no stars, then, in the heaven of day ? So, O man, because thou beholdest not the Almighty in the days of thy ignorance, say not that there is no God.

*   *   *

As the same sugar is made into various figures of birds and beasts, so one sweet Mother Divine is worshipped in various climes and ages under various names and forms. Different creeds are but different paths to reach the Almighty.

*   *   *

God is one, but His aspects are different : as one master of the house is father to one, brother to another, and husband to a third, and is called by these different names by those different persons, so one God is described and called in various ways according to the particular aspect in which He appears to His particular worshipper.

*   *   *

Man is like a pillow-case. The colour of one may be red, another blue, another black, but all contain the same cotton. So it is with man—one is beautiful, one is black, another is holy, a fourth wicked ; but the Divine dwell in them all.

*   *   *

While a bell is being rung, the repeated ding-dongs can be distinguished one from the other but when we stop ringing, then an undistinguishable sound only remains audible. We can easily distinguish one note from the other, as if each distinct note had a certain shape ; but the continued and

unbroken sound when the ding-dongs have ceased is undistinguishable, as if formless. Like the sound of the bell, God is both with and without form.

* * *

As water when congealed becomes ice, so the visible form of the Almighty is the materialised manifestation of the all-pervading formless Brahman. It may be called, in fact, Sat-chit-ananda solidified. As the ice, being part and parcel of the water, remains in the water for a time and afterwards melts in it, so the Personal God is part and parcel of the Impersonal. He rises from the Impersonal, remains there, and ultimately merges into it and disappears.

* * *

Ornaments cannot be made of pure gold. Some alloy must be mixed with it. A man totally devoid of Maya will not survive more than twenty-one days. So long as the man has body, he must have some Maya, however small it may be, to carry on the functions of the body.

* * *

In the play of hide-and-seek, if the player once succeeds in touching the non-player, called the grand-dame he is no longer liable to be made a thief. Similarly, by once seeing the Almighty, a man is no longer bound down by the fetters of the world. The boy touching the Boori, is free to go wherever he wishes, without being pursued, and no one can make him a thief. Similarly, in this world's playground, there is no fear to him who has once touched the feet of the Almighty.

* * *

So long as the bee is outside the petals of the lotus, and has not tasted its honey, it hovers round the flower, emitting its buzzing sound ; but when it is inside the flower, it drinks its nectar noiselessly. So long as a man quarrels and disputes

about doctrines and dogmas, he has not tasted the nectar of true faith ; when he has tasted it he becomes still.

* * *

The moth once seeing the light never returns to darkness ; the ant dies in the sugar-heap, but never retreats therefrom. Similarly, a good devotee gladly sacrifices his life for his God by renunciation.

* * *

The darkness of centuries disappears at once as soon as a light is brought into the room. The accumulated ignorance and misdoings of innumerable births vanish before the single glance of the Almighty's gracious look.

* * *

Visit not miracle workers. They are wanderers from the path of truth. Their minds have become entangled in the meshes of psychic powers, which lie in the way of the pilgrim towards Brahman, as temptations. Beware of these powers, and desire them not.

* * *

Where does the strength of an aspirant lie ? It is in his tears. As a mother gives her consent to fulfil the desire of her importunately weeping child, so God vouchsafes to His weeping son whatever he is crying for.

*　　*　　*

WOULD'ST THOU SEE GOD ?

"God cannot be seen so long as there is the slightest taint of desire."

Sri Ramakrishna Paramahamsa

Would'st thou see God ? Is it thy life's desire
To graze with eyes of thine
Into his holy eyes, not fear their fire ?
To brook the light divine
That falls and flashes from his faultless face,
Searching the inmost nook
Of all thy being, with all-seeing look ?
Then learn of me how thou may'st gain that grace.
Would'st thou, indeed, see God ? Could'st thou endure
To stand, unrobed and bare
Body and soul, in His pure presence, sure
And unashamed ?—There ;
Where knowledge dwells of deeds that thou hast done ;
And where thine every though
Into the radiance of His light is brought ?
These lips of mine point out the way. 'Tis one.
One, and one only. Lo ! the path is plain ;
Love not the love of life ;
Love not the world nor any worldly gain ;
Play no part in the strife
For fame or high estate ; but these disdain,
And hold them of light worth.
Then shalt thou learn the lesson of new birth,
And, in his beauty, see the king, and reign.

Thus, while within these one desire shall stay
Of lesser, lower sort
Than God Himself, thou can'st not trace the way.
Awake ! Be not the sport
Of petty passions, little lusts or great.
Lilt up thy heart, and take
Control of all thy senses ; that they make
No slave of thee, their head. Then, fear no fate.

—Eric Hammond

(Extracted from The Brahmavadin, Madras)

* * *

THE SEA OF IMMORTALITY

A Psalm by Sri Ramakrishna

The Master sang a song of Love Divine ;
A song whose sweetness shall not know decline.
Dive deep, dive deep, dive deep !
Into the sea of seas.
Dive deep, Oh mind, nor creep
With hesitant, weak knees
On this great Sea's firm shore in fear.
Plunge thou, and, plunging, dare the dear
Delight of diving in its crystal clear.
Dive deep, Fear Not, Plunge thou.
The Sea of Beauty lies
Close by thee, Bathe thy brow,
Thy being, open thine eyes,
Undoubting, faithful. Thou shalt see
A gem, within these waters, on which He,

The God of Love, has set His imag'ry.
Dive deep, Let body go
And heart and mind and all.
Dive deep, and search, to know
The glory of thy fall
Into this sea wherein true knowledge lies ;
Wherein are spread the wondrous mysteries,
of life Immortal worshipped by the wise.
Drink deep this death of death.
Drink deep this light of light
No breaking of Life's breath
Is here ; but love and might,
Joy everlasting, bliss supreme ; no bar
Between God's soul and thine ; th' Eternal Star
Shining within thee, through thee ; not afar.
God speaks from out this sea.
Hear Him, and realise
His voice, His wishes ; be
One with thy Lord, and rise

To wisdom's height of heights. List thou, and learn, of him. Thine inner heart shall long and yearn Like His with flame of fadeless fire to burn.

—Eric Hammond

(Extracted from The Brahmavadin. 1.6. 1898)

* * *

ROMAIN ROLLAND :

To my Western Readers :

I am bringing to Europe, as yet unawre of it, the fruit of a new autumn, a new message of the soul, the symphony of

India, bearing the name of Ramakrishna. It can be shown (and we shall not fail to point out) that this symphony, like those of our classical masters, is built up of a hundred different musical masters, is built up of a hundred different musical elements emanating from the past. But the sovereign personality concentrating in himself the diversity of these elements and fashioning them, into a royal harmony, is always the one who gives his name to the work, though it contains within itself the labour of generations. And with victorious sign he marks a new era.

The man whose image I here evoke was the consumation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. Although he has been dead forty years, his soul animates modern India. He was no hero of action like Gandhi, no genius in art or thought like Goethe or Tagore. He was a little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident, outside the political and social activities of his time. But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods. It was a part of the very source of Energy, the Divine Shakti, ofwhom Vidyapati, the old poet of Mithila, and Ramprasad of Bengal sing.

Very few go back to the source. The little peasant of Bengal by listening to the message of his heart found his way to the inner Sea. And there was wedded to it, thus bearing out the words of the Upanishads :

> "I am more ancient than the radiant Gods. I am the first-born of the Being. I am the artery of Immortality."

It is my desire to bring the sound of the beating of that

artery to the ears of fever-striken Europe, which has murdered sleep. I wish to wet its lips with the blood of Immortality.

(Extract from his book : The Life of Ramakrishna. 1928)

* * *

Christopher Isherwood :

This is the story of a phenomenon.

I will begin by calling him (Ramkrishna) simply that, rather than "holy man", "mystic", "saint", or "avatar" ; all emotive words with mixed associations which may attract some readers, repel others

A phenomenon is often something extraordinary and mysterious. Ramakrishna was extraordinary and mysterious ; most of all to those who were best fitted to understand him. A phenomenon is always a fact, an object of experience. That is how I shall try to approach Ramakrishna.

···Just say yourself as you read : this, too, is humanly possible. Then later, if you like, consider the implications of that possibility for the rest of the human species.

(Extracted from his book : Ramakrishna And His Disciples. 1964)

* * *

Arnold Toynbee :

Sri Ramakrishna's message was unique in being expressed in action ··Religion is not just a matter for study, it is something that has to be experienced and to be lived, and this is the field in which Sri Ramakrishna manifested his uniqueness...His religious activity and experience were, in

fact, comprehensive to a degree that had perhaps never before been attained by any other religious genius, in India or elsewhere.

(Extracted from a Message)

* * *

C.H. Tawney :

Whatever may be thought of the culture of the Saint Ramakrishna it is impossible to read his sayings without conceiving a genuine respect for him. But the paramount importance of the work (Messages of Ramakrishna) seem to us to consist in the fact that it eontains the idea of a teacher who has profoundly influenced his educated fellow countrymen.

(Extracted from his article : "A Modern Hindu Saint" Jany. 1896)

* * *

William Digby :

During the last century the finest fruit of British intellectual eminence was, probably, to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they are mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ramakrishna of Bengal, who knowing naught of what we term 'learning', spake as not other man of his age spoke, and revealed God to weary mortals.

(Extracted from his book : 'Prosperous British India'. 1901)

* * *

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঃ

My mind is still floating in the luminous atmosphere which that wonderful man diffuses around him whenever and

wherever he goes. My mind is not yet disenchanted of the mysterious and indefinable pathos which he pours into it whenever he meets me. What is there common between him and me ? I, a Europeanised, civilised, self-centered, semi-sceptical, so-called educated reasoner, and he, a poor illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-idolatrous, friendless Hindu devotee ? Why should I sit long hours to attend to him, I who have listened to Disraeli and Fawcett, Stanley and Max Muller, and a whole host of European scholars and divines ? I who am an ardent disciple and follower of Christ, a friend and admirer of liberal-minded Christian missionaries and preachers, a devoted adherent and worker of the rationalistic Brahma-Samaj—why should I be spell-bound to hear him ? And it is not I only, but dozens like me who do the same. He has been interviewed and examined by many, crowds pour in to visit and talk with him. Some of our clever intellectual fools have found nothing in him, some of the contemptuous Christian missionaries would call him an impostor, or a self-deluded enthusiast. I have weighed their objections well, and what I write now I write deliberately.

The Hindu Saint is a man much under forty. He is a Brahmin by caste, he is well-formed naturally, but the dreadful austerities through which his character has developed have permanently disordered his system, and inflicted a debility, paleness, and shrunkenness upon his form and features that excite the deepest compassion. Yet, in the midst of this emaciation, his face retains a fullness, a child-like tenderness, a profound visible humbleness, an unspeakable sweetness of expression and smile that I have seen in no other

face that I can remember. A Hindu saint is always particular about his externals. He wears the *Garua* cloth, eats according to strict forms and is a rigid observer of caste. He is always proud and professes secret wisdom. He is always *guruji*, and a dispenser of charms. This man is singularly indifferent to these matters. His dress and diet don't differ from those of other men except in the general negligence he manifests towards both, and as to caste, he openly breaks it every day. He most vehemently repudiates the title of being called a teacher or *guru*, he shows impatient displeasure at any exceptional honor which people try to pay to him, and he emphatically disclaims the knowledge of secrets and mysteries. He protests against being lionised, and openly shows his strong dislike to be visited and praised by the curious. The society of the worldly-minded and the carnally-inclined he shuns carefully. He has nothing extra-ordinary about him. His religion is his only recommendation. And what is his religion? It is Hinduism, but, Hinduism of a strange type. Ramakrishna Paramahansa (for that is the saint's name) is the worshipper of no particular Hindu God. He is not a Shivaite, he is not Shakta, he is not a Vaishnava, he is not a Vedantist Yet he is *all these*. He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna, and is a confirmed advocate of Vedantist doctrines. He is an idolater and is yet a faithful and most devoted mediator of the perfections of the one, formless, infinite Deity whom he terms '*Akhanda Sachchidananda*'. His religion, unlike the religion of ordinary Hindu *Sadhus*, does not mean the maturity of doctrinal belief, or controversial proficiency, or the outward worship with flower and sandal,

incense and offering. His religion means ecstasy, his worship means transcendental perception, his whole nature burns day and night with the permanent fire and fever of a strange faith and feeling. His conversation is a ceaseless breaking forth of this inward fire, and lasts long hours. While his interlocutors are weary, he, though outwardly feeble, is as fresh as ever. He merges into rapturous ecstasy and outward unconsciousness often during the day, oftenest in conversation when he speaks of his favourite spiritual experiences, or hears any striking response to them But how is it possible that he has such a fervent regard for all the Hindu deities together ? What is the secret of his singular eclecticism ? To him each of these deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless Being Who is unchangeable in His blessedness and the Light of Wisdom...

Each form of worship which we have tried to indicate above is to the Paramahansa a living and most enthusiastic principle of personal religion, and the accounts of discipline and exercise through which he has arrived at his present state of devotional eclecticism are most wonderful, though they cannot be published. He never writes anything, seldom argues, he never attempts to instruct, he is continually pouring his soul out in a rhapsody of spiritual utterances, he sings wonderfully and makes observations of singular wisdom. He unconsciously throws a flood of marvellous light upon the obscurest corners of the Puranic Shasters, and brings out the fundamental principles of the popular Hindu faith and notions with a philosophical clearness which strangely contrasts itself

with his simple and illiterate life. These incarnations, he says, are but the forces (*Shakti*) and dispensations (*Lila*) of the eternally wise and blessed (*Akhanda Sachchidananda*) who never can be changed or formulated, who is one endless and everlasting ocean of light, truth and joy. When this singular man is with us, he would sometimes say the incarnations forsook him, his mother the *Vidya-Shakti Kali*, stood at a distance, Krishna could not be realized by him either as *Gopal* the child, or as *Swami* the Lord of the heart, and neither Rama, nor Mahadeo would offer him much help. The *Nirakar Brahma* would swallow everything, and he would be lost in speechless devotion and rapture. If all his utterances could be recorded they would form a volume of strange and wonderful wisdom. If all his observations on men and things could be reproduced, people might think that the days of prophecy, of primeval, unlearned wisdom have returned. But it is most difficult to render his sayings into English.

A living evidence of the sweetness and depth of Hindu religion is this holy and good man. He has wholly controlled and nearly killed his flesh. He is full of soul, full of the reality of religion, full of joy, full of blessed purity. As a siddha Hindu ascetic he is a witness of the falsehood and emptiness of the world. His witness appeals to the profoundest heart of every Hindu. He has no other thought, no other occupation, no other relation, no other friend in his humble life than his God. That God is more than sufficient for him. His spotless holiness, his deep unspeakable blessedness, his unstudied endless wisdom, his childlike peacefulness and affection towards all men, his consuming, all-absorbing love for his

God are his only reward. And may he long continue to enjoy that reward ! We cannot be like him. We must not be like him. Our ideal of religious life is different, but so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God ! (The *Theistic Quarterly Review*, October-December 1879, pp. 32-39).

Both in Keshub's Life and Teachings and in the old *Theistic Review*, I have frankly and warmly expressed my estimate of that saintly man and our obligations to him...and I would not withdraw a single word I wrote in his praise. Ramakrishna was not in the least a Vedantist, except that every Hindu unconsciously imbibes from the atmosphere around some amount of Vedantism, which is the philosophical backbone of every national cult. He did not know a word of Sanskrit, and it is doubtful whether he knew enough Bengali. His spiritual wisdom was the result of genius and practical observation.—(Letter to Max Muller, September 1895. Quoted in *Ramakrishna : His Life and Sayings*.)

* * *

শ্রীঅরবিন্দ :

The world could not bear a second birth like that of Ramakrishna Paramahamsa in five hundred years. The mass of thought that he has left, has first to be transformed into experience ; the spiritual energy given forth has to be converted into achievement. Until this is done, what right have we to ask for more ? What could we do with more ?

Religion always, in India, precedes national awakenings.

Sankaracharya was the beginning of a wave that swept round the whole country, culminating in Chaitanya in Bengal, the Sikh Gurus in the Punjab, Sivaji in Maharastra, and Ramanuja and Madhavacharya in the South. Through each of these, a people sprang into self-realisation, into national energy, and consciousness of their own unity. Sri Ramakrishna represents a synthesis, in one person, of all the leaders. It follows that the movements of his age will unify and organise the more provincial and fragmentary movements of the past.

Ramakrishna Paramahamsa is the epitome of the whole. His was the great super-conscious life which alone can witness to the infinitude of the current that bears us all ocean-wards. He is the proof of the Power behind us, and the future before us. So great a birth initiates great happenings. Many are to be tried as by fire, and not a few will be found to be pure gold; but whatever happens, whether victory or defeat, speedy fulfilment or prolonged struggle, the fact that he has been born and lived here in our midst, in the sight and memory of men now living is proof that

God hath sounded forth the trumpet
That shall never call retreat!
He is sifting out the hearts of men
Before His judgment seat;
Oh, be swift my soul, to answer Him;
Be jubilant, my feet!
While God is marching on!

[*Karmayogin*, 19th March 1910]

The passage you have quoted [from *Synthesis of Yoga*] is my considered estimate of Sri Ramakrishna.

"Nor would a successive practice of each of the yogas in turn be easy in the short span of our human life and with our limited energies, to say nothing of the waste of labour implied in so cumbrous a process. Sometimes, indeed, Hathayoga and Rajayoga are thus successively practised. And in a recent unique example, in the life of Sri Ramakrishna Paramahamsa, we see a colossal spiritual capacity first divine straight to the Divine realisation, taking as it were the kingdom of heaven by violence and then seizing upon one yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge." 3rd February 1932. (Quoted in Dilip Kumar Roy's *Among the Great*)

*   *   *

মহাত্মা গান্ধী ঃ

The story of Ramakrishna Paramahamsa's life is a story of religion in practice. His life enables us to see God face to face. No one can read the story of his life without being convinced that God alone is real and that all else is an illusion. Ramakrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned man but they are pages from the Book of Life. They are revelations of his own experiences. They therefore leave on the reader an impression which he cannot resist. In this age of scepticism Ramakrishna presents

an example of a bright and living faith which gives solace to thousands of men and women who would otherwise have remained without spiritual light. Ramakrishna's life was an object-lesson in Ahimsa. His love knew no limits geographical or otherwise. May his divine love be an inspiration to all···
(Foreword : *Life of Sri Ramakrishna,* Nov. 1924)

* * *

রবীন্দ্রনাথ :

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ॥

('উদ্বোধন', ফাল্গুন ১৩৪২)

To the Paramahansa Ramakrishna Deva
Diverse courses of worship
from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the Infinite
has given form to a shrine of unity in your life
where from far and near arrive salutations
to which I join mine own.

(*Prabuddha Bharat*, Feb. 1936)

* * *

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঃ

রামকৃষ্ণের মত মানুষ যে এখনও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ভারতবর্ষ যে নিকৃষ্ট দেশ নহে এবং ভারতীয়েরা যে নিকৃষ্ট জাতি নহে, তাহার অন্যতম প্রমাণ। পুস্তকলব্ধ বিদ্যা যাঁহার ছিল না, এরূপ একজন মানুষ যে-দেশে জন্মিয়া তাঁহার মত সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁহার মত জ্ঞান ভক্তি ও কর্মমার্গের উপদেশ দিতে পারেন, সে-দেশ সামান্য নয়। সেই দেশের অধিবাসী জাতিও সামান্য নয়। সামান্য হইলে সে-দেশের মানসিক ও আত্মিক পরিবেষ্টনে এরূপ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। ('প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪২)

* * *

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ ঃ

While the sayings of Ramakrishna did not penetrate so much into academic circles, they found their way into lonely hearts who have been stranded in their pursuit of pleasure and selfish desires. Under the inspiration of this great teacher there has been a powerful revival of social compassion...He has helped to raise from the dust the fallen standard of Hinduism, not in words merely, but in works also. (*The Cultural Heritage of India,* March 1937. Vol I, Introduction)

* * *

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ

From Vivekananda I turned gradually to his master, Ramakrishna Paramahansa Vivekananda had made speeches, written letters, and published books which were available to the layman But Ramakrishna, who was almost an illiterate man, had done nothing of the kind. He had lived his life and

had left it to others to explain it. Nevertheless, there were books or diaries published by his disciples which gave the essence of his teachings as learn from conversations with him. The most valuable element in these books was his practical direction regarding character-building in general and spiritual uplift in particular. He would repeat unceasingly that only through renunciation was realisation possible—that without complete self-abnegation spiritual development was impossible to acquire. There was nothing new in his teaching, which is as old as Indian civilisation itself, the Upanishads having taught thousands of years ago that through abandonment of worldly desires alone can immortal life be attained. The effectiveness of Ramakrishna's appeal lay, however, in the fact that he had practised what he preached and that, according to his disciples, he had reached the acme of spiritual progress.

The burden of Ramakrishna's precepts was—renounce lust and gold. This two-fold renunciation was for him the test of a man's fitness for spiritual life. The complete conquest of lust involved the sublimation of the sex-instinct whereby to a man every woman would appear as mother···I doubt if I have passed through a more trying period in my life than now. Ramakrishna's example of renunciation and purity entailed a battle royal with all the forces of the lower self. (*An Indian Pilgrim*, 1948)

* • * *

জওহরলাল নেহেরু :

Sri Ramakrishna Paramahamsa obviously was completely outside the run of average humanity. He appears to be in the

tradition of the great *rishis* of India, who have come from time to time to draw our attention to the higher things of life and of the spirit···One of the effects of Sri Ramakrishna's life was the peculiar way in which he influenced other people who came in contact with him. Men often scoffed from a distance at this man of no learning, and yet when they came to him, very soon they bowed their heads before this man of God, and ceased to scoff and 'remained to pray'. They gave up, many of them, their ordinary vocations in life and business and joined the band of devotees. They were great men and one of them, better known than the others, not only in India but in other parts of the world, is Swami Vivekananda. (*Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda*, 1949)

*　　*　　*

সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।—রামকৃষ্ণ কে। কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে এই সোণার বাঙলায় এমন সোণার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল। বনিতা-বিলাস-দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই। তাঁর যখন বিবাহ হয়—তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন ষোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণদেব ঐ লক্ষ্মীকেবিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয় —অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না— তেমনি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শী-পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য

সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত' একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণ-প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ কে। রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে বেদ পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—কেন না উহা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। উহা বোবার স্বপ্নের মত। যে দেখে সে-ই জানে—অপরকে উহা বলিতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কে। তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে—যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য শাক্তের ভৈরব-ভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন এমন কি—তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল-অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্যধর্মের পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদ-ভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈত-বিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ—কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী—ব্রহ্মবিজ্ঞানী—ভক্ত-চূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

... ...

ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রম-ধর্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদ বিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতালাভ করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্যবসিত হইতেছে। এখন

আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন শক্তির টানে নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে। কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণদত্ত মন্ত্রবলে এই ভেদবৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে।

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।......

১২৯৩ সালে পরমহংস রামকৃষ্ণের দেহোপরম হয়। দেহের উপরম হইল বটে কিন্তু তাঁহার শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাইতেছে ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ঃ 'স্বরাজ', ১০ চৈত্র, ১৩১৩)

*   *   *

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, 'এই তিনজনের ভিতর একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।' তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সংকীর্তনের পর আমি বলিলাম, 'আপনি কিছু খান।' তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'হাঁ; মা বলিয়া

দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ি থেকে একখানি জিলিপি খেয়ে আসিস।' আমি একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাৎ করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, 'দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন 'কেশবের বাড়িতে যাইতেছ, একটি কুল্‌পী বরফ খেয়ে এসো।' তখন সেখানে কুল্‌পীওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্‌পী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্‌পীওয়ালা আসিল; একটি কুল্‌পী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন, 'দেখ্ মা তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন, 'দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে, আর বলে, এই দিকটা তোর আর ওই দিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক্ করে না।' আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন, 'দ্যাখ্, মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।' এইরকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।' (যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সম্পাদিত 'কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' হইতে উদ্ধৃত)

* * *

এইরূপে একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্মসাধনের জন্য অনেক ক্লেশস্বীকার

করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি এমন সময় 'মিরার' কাগজে দেখিলাম যে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ-স্বীকার করিয়াছেন কি না জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি ; এমন কি অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক ; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম ; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটীতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশুখ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন ?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন,—ঈশ্বরের অবতার কিরূপ ? কৃষ্ণাদির মত ?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন ?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জান ? আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল ; ধরবার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন। (শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ 'আত্মচরিত' হইতে উদ্ধৃত)

* * *

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলিকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সে বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ ছিল...ইহার পর একদিন তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সংগীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)।...তৃতীয়বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইকপাড়ার নিকটবর্তী সিঁথির এক উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল। রাধাবাজারে তাঁহার এক দোকান ছিল। প্রতি বৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত।... পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁহাকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরি-ভোজনের আয়োজন হইত। পরমহংসদেব নানা গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অনেকের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি খাইতে পারিতেন।

আহারান্তে ধর্মপ্রসঙ্গ হইত। একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, "মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" এই কথাটা এখনও আমার মনে আছে। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমার মনে নাই।" ('প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৪২)

"আচার্য কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মগণই রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির অজ্ঞাত কক্ষ হইতে জনসমাজের নিকট আনয়ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "পরমহংস" উপাধি দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে লোকে তাঁহাকে কালীবাড়ির পুরোহিত বলিয়াই জানিত।

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সরল ও ভক্তিপূর্ণ জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসের শিষ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই শিষ্য গুরুকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটির ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব দাসের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটির উৎসবে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সুমিষ্ট ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করিয়াছি। "কত ভালবাস গো মানবসন্তানে"—ব্রহ্মসংগীতের এই গানটি তিনি এমন তন্গত হইয়া গাহিতেন যে সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মকৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন "ওঁ ওঁ", বহুক্ষণ এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞালাভ করিতেন।

তাঁহার এই সমাধির অবস্থা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি ব্যাকুলচিত্তে ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন এবং প্রেমে উন্মত্ত হইতেন। (কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' হইতে উদ্ধৃত)

* * *

একদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজে যখন উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই উপাসনা-স্থলে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তির ফাত্না ডুবিয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রহ্মে

তন্ময় হইয়াছেন। এই ঘটনাটির কিছুকাল পরে আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কলুটোলায় শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। কলুটোলার বাড়িতে আসিয়া শুনিলেন যে, বেলঘরিয়ার সাধনকাননে তিনি ব্রাহ্ম সাধকদের সঙ্গে উপাসনা করিতে গিয়াছেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া একটি গাড়িভাড়া করিয়া বেলঘরিয়ায় যান। সেখানে উভয়ের মধ্যে ধর্মালোচনা চলিতে লাগিল। তিন-চার ঘণ্টা এইরূপে কাটিল। এই ধর্ম-প্রসঙ্গের ভিতর উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যোগের পর ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কথা, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার কথা কাগজে লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের লেখা পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের মুখে তাঁহার বিশেষ ধর্মভাবের কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাঁচবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইয়াছি এবং প্রত্যেক বার চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি। সে-সকল কথা সব স্মরণ নাই। তবে বিশেষ বিশেষ কথাগুলি কিছু কিছু মনে আছে।

আমাদের আলোচনা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া আরম্ভ হইত। তিনি প্রথম আলাপনের দিনে বহুবার জোড়াসাঁকোর কথা বলিলেন; অর্থাৎ শ্রীকেশবচন্দ্রের মুখে উপাসনার সময় যে একটি অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিলেন।

দ্বিতীয় দিবস বেলঘরিয়ার সাধনকাননে যে-সকল কথা হইয়াছিল, তাহারও কয়েকটি কথা যাহা স্মরণ আছে, তাহা এক্ষণে নিবেদন করিতেছি।

পরমহংসদেব বলিলেন যে, "আমি বেলঘরিয়ায় গিয়া দেখি যে কেশবচন্দ্র উপাসনা শেষ করিয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে, তুমি নাকি ব্রহ্মকে দেখ এবং তাঁহার কথা শ্রবণ কর? সে কিরূপ? কেশব বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম-দর্শনের কথা, তাঁর কথা, শুনিয়া আমার মনে হইল যে, কেশব একজন বিশেষ ব্যক্তি, কেশবের কথা শুনিয়া আমার ভাবাবেশ হইল। আমার মর্মকে স্পর্শ

করিল। একবার কেশব বলে আমি শুনি, একবার আমি বলি, কেশব শুনে, এইরূপে চার পাঁচ ঘণ্টা কাটিল।" পরমহংসদেব কমলকুটীরে প্রায়ই আসিতেন, সেখানেও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি আসিলেই আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি জিলাপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন বহু ব্রাহ্ম সাধকদিগের নিকট বলিলেন, "যে সত্য কথা বলে না তার ধর্ম হয় না, ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" এই কথার পর প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজনের শেষভাগে একটি জিলাপি লইয়া মুখের সম্মুখে নাড়িতে লাগিলেন। তাহার পূর্বে তিনি বলিয়াছেন, আমি আর খেতে পারব না, পেটে জায়গা নাই। কিন্তু জিলাপি দেখিয়া তিনি বলিলেন, একখানা দাও। ত্রৈলোক্যবাবু একটু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, আপনার সত্যকথা রক্ষা পাইল না। পরমহংস বলিলেন, যখন কোন মেলায় মানুষ যায়, গাড়িতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ি এলেই রাস্তায় জায়গা হয়, এখন পেটে জিলাপির জায়গা হবে, এতে সত্যরক্ষায় ব্যাঘাত হবে না।

তিনি যে কিরূপভাবে সত্যরক্ষা করিতেন তাহার একটি কথা শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে। একদিন আমি কয়েকটি বন্ধু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। নানা বিষয়ে কথাবার্তার পর তিনি বলিলেন যে, দেখ আমি যদি বলি যে আজ দু-বার শৌচে যাব, তা হ'লে আমার সন্ধায় বেগ না হ'লেও আমি সত্যরক্ষার জন্য শৌচে যাই।

তিনি ছিলেন খাঁটি লোক, কঠোর সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ধর্মের নামে কোন আড়ম্বর করাকে ঘৃণা করিতেন। বাহিরে গৈরিকধারণ, মালা পরিধান ও তিলক ফোঁটা প্রভৃতি আড়ম্বর দেখিলে খুব গ্রাম্য ভাষায় তাহার নিন্দা করিতেন।

ধর্মের জন্য তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। ভগবানকে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা এত অধিক ছিল যে, একবার মুসলমানদিগের ধর্মসাধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পাঁচবার উপাসনা করিতেন, মুসলমানী খাদ্য গ্রহণ করিতেন, মুসলমানী পরিধান পরিয়া ব্রহ্ম-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এইরূপ সাধনের পর তিনি একটি ভিজ্যান (vision) দেখিলেন, যে, মুসলমানী বেশ ও মুসলমানী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক মূর্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইল।

ইহাতে তাঁহার সাধনা বিপথে যাইতেছে অনুভব করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। আরও এইরূপ অদ্ভুত ও উৎকট সাধন তিনি করিয়াছেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র যে তাঁহার সহসাধক ছিলেন আমরা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেলঘরিয়ায় দেখা হইবার পর মাঘোৎসবের সময় তিনি কীর্তনের দিবস প্রায়ই কমলকুটীরে আসিয়া যোগদান করিতেন এবং শ্রীকেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহাকে পাইলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। একদিন কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, যে, 'তুমি শ্যাম আমি রাধা', অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা।'

তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় একজন হিন্দু সাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্তিত হইয়াছিল। একদিন কমলকুটীরে আসিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিলেন, দেখ কেশব, তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দ-পোয়া কালী নুনের পুতুলের মত গলে যায়, আমি নিরাকারবাদী হই।' তিনি ব্রাহ্মদের শ্রদ্ধা করিতেন। কেশবচন্দ্রের উপর পরমহংসের কোন কোন বিষয়ে প্রভাব যেমন পড়িয়াছিল, সেইরূপ পরমহংসদেবের উপর শ্রীকেশবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। দু-তিনবার পরমহংসদেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "ব্রাহ্মদের ভিতর কেশব একজন বিশেষ লোক, কেশব বইয়ের কথা বলে না, নিজের ব্রহ্মদর্শনের ও ব্রহ্মশ্রবণের কথা বলে।"

উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইত। চুম্বক যেমন লোহকে আকৃষ্ট করে ইঁহারা উভয়কে এইরূপে আকৃষ্ট করিতেন।

শেষ বয়সে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ উৎসবে যোগদান করা তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন আসিয়া বলিলেন, "কেশব, তুমি যদি চলে যাও, আমি কার সঙ্গে কথা কইব?"

শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানে তিনি বিশেষভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। (কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ: 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪২)

* * *

In 1881, Keshab Chandra Sen, accompanied by a fairly large party, went on board a steam yacht belonging to his

son-in-law, Maharaja Nripendra Narayan Bhup of Kuch Behar, to Dakshineswar to meet Ramakrishna Paramahansa. I had the good fortuue to be included in that party. We did not land, but the Paramahansa, accompanied by his nephew, Hriday, who carried a basket of parched rice and some *sandesh* for us, boarded the steamer, which then steamed up the river towards Somra. The Paramahansa was wearing a red-bordered *dhoti* and a shirt, unbuttoned. We all stood up as he came on board, and Keshab took the Paramahansa by the hand and made him sit close to him. Keshab then beckoned to me to come and sit by their side, and I sat down almost touching their feet. The Paramahansa was dark-complexioned with a beard, and his eyes, never wide open were introspective. He was of medium height, slender almost to leanness and very frail looking. As a matter of fact, he had an exceptionally nervous temperament, and was extremely sensitive to the slightest physical pain. He spoke with a very slight but charming stammer in very plain Bengali, mixing the two 'yous' frequently. Practically all the talking was done by the Paramahansa, and the rest, including Keshub himself, were respectful and eager listeners. It is now more than forty-five years ago that this happened, and yet almost everything that the Paramahansa said is indelibly impressed on my memory. I have never heard any other man speak as he did. It was an unbroken flow of profound spiritual truths and experiences, welling up from the perennial spring of his own devotion and wisdom. The similes and metaphors, the apt illustrations, were as striking as they were original. At times, as he spoke, he would draw a little closer to Keshab until part of his body

was unconsciously resting on Keshab's lap, but Keshab sat perfectly still and made no movement to withdraw himself.

After he had sat down, the Paramahansa glanced round him and expressed his approval of the company sitting around by saying, 'Good, good ! They have all good large eyes'. Then he peered at a young man wearing English clothes and sitting at a distance on a capstan. 'Who is that ? He looks like a Saheb.' Keshub smilingly explained that it was a young Bengali who had just returned from England. The Paramahansa laughed, "That's right. One feels afraid of a Saheb.' The young man was Kumar Gajendra Narayan of Kuch Behar, who shortly afterwards married Keshub's second daughter. The next moment he lost all interest in the people present and began to speak of the various ways in which he used to perform his. *sadhana*. 'Sometimes I would fancy myself the Brahminy duck calling for its mate.' There is a poetic tradition in Sanskrit that the male and female of a brace of Brahminy ducks spend the night on opposite shores of a river and keep calling to each other. Again : 'I would be the kitten calling for the mother cat, and there would be the response of the mother'. After speaking in this strain for some time, he suddenly pulled himself up and said with the smile of a child : 'Everything about secret *sadhana* should not be told ; he explained that it was impossible to express in language the ecstasy of divine communion when the human soul loses itself in contemplation of the deity. Then he looked at some of the faces around him and spoke at length on the indication of character by physiognomy. Every feature of the human face was expressive of some particular

trait of character, he said. The eyes were the most important, but all other features, the forehead, the ears, the nose, the lips and the teeth, were helpful in the reading of character. And so the marvellous monologue went on until the Paramahansa began to speak of the *Nirakara* (formless) *Brahman*. He repeated the word *Nirakara* two or three times, and then quietly passed into *samadhi*, even as the diver slips into the fathomless deep. While the Paramahansa remained unconscious, Keshub Chunder Sen explained that recently there had been some conversation between himself and the Paramahansa about the *Nirakara Brahman*, and that the Paramahansa appeared to be profoundly moved.

We intently watched Ramakrishna Paramahansa in *samadhi*. The whole body relaxed and then became slightly rigid. There was no twitching of the muscles or nerves, no movement of any limb. Both his hands lay in his lap, with the fingers lightly interlocked. The sitting posture of the body was easy but absolutely motionless. The face was slightly tilted up, and in repose. The eyes were nearly but not wholly closed. The eyeballs were not turned up or otherwise deflected, but they were fixed and conveyed no message of outer objects to the brain. The lips were parted in a beatific and indescribable smile, disclosing the gleam of white teeth. There was something in that wonderful smile that no photograph was ever able to reproduce.

We gazed in silence for several minutes at the motionless form of the Paramahansa, and then Trailokya Nath Sanyal, the singing apostle of Keshub Chunder Sen's church, sang a hymn to the accompaniment of a drum and cymbals. As the music

swelled in volume the Paramahansa opened his eyes and looked around him as if he were in a strange place. The music stopped. The Paramhansa looking at us, asked, 'Who are these people ?' And then he vigorously slapped the top of his head several times, and cried out, 'Go down, go down !' No one made any mention of the trance. The Paramahansa became fully conscious and sang in a pleasant voice : 'What a wonderful machine Kali the Mother has made !' After the song the Paramahansa gave a luminons exposition on how the voice should be trained for singing and the characteristics of a good voice.

It was fairly late in the evening when we returned to Calcutta after landing the Paramahansa at Dakshineswar. No carriages could be had at Ahiritola Ghat, and Keshub had to walk all the way to Musjidbari Street to the house of Kali Charan Banerji, who had invited him to dinner.

After seeing and hearing Ramakrishna I went to see Mahendranath Gupta, who who was related to me and was my senior by several years, and told him everything and urged him to go to Dakshineswar. This he did the following year, and he was so much impressed by the Paramahansa's manner of speaking that he began keeping a diary in which he jotted down everything the saint said. He told me that what he had heard in one day took him three days to set down in writing. He had to work for a living and was a teacher and a professor. In the Ramakrishna Mission he is known as Master Mahasay. These diaries were the beginning of *The Gospel of Paramahansa Ramakrishna according to 'M'*. In the original Bengali it is known as *Sri Ramakrishna-kathamrita*—the 'Nectar of the

Words of Ramakrishna'. This is the only authentic and, to a certain extent, complete record of the sayings of Ramakrishna. Mahendranath could not go every day, nor could he stay constantly with the Master, and it is quite possible there were other valuable and luminous sayings that were never recorded.

Shortly after I had seen and heard Ramakrishna, I was called away to the other end of India, to Karachi I never saw him again in life, but I happened to be in Calcutta when Paramahansa Ramakrishna passed into his final rest on August 16, 1886. As I was going out of the house in the afternoon, a printed slip was handed to me announcing that Paramahansa Ramakrishna had passed into the final *Maha-samadhi*. I drove straight to the garden house at Cossipore where the august patient had passed his last days, surrounded and tended with unremitting love and devotion by his disciples, admirers and worshippers. There he lay on a handsome bed covered with a fresh white sheet and flowers, in front of the portico of the house, under the open sky. He lay on his right side, a pillow under his head and another between his legs. The lips which had never ceased teaching even during the months he had been suffering from the intolerable agony of cancer of the throat were stilled in the silence of death. The final serenity, the calm, the peace and the supreme majesty of death were on the face, now smooth and relaxed in its last repose. The smile on the lips showed that the spirit had pasted in the rapture of *samadhi*. Narendranath (Vivekananda) Mahendranath and other disciples, Trailokya Nath of the New Dispensation Church of the Brahmo Samaj and others were

seated on the ground. As I sat down beside them and looked at the ineffable peace of the face before us, the words of Ramakrishna came back to me, that the body is merely a sheath and the indwelling real Self is difficult of realization. And as we sat in the waning afternoon, waiting for the remains to the cremation ground, a single cloud passed overhead and a small shower of very large drops of rain fell. Those present said this was the *pushpavrishti*, the rain of flowers from heaven, of which the ancient books write, the welcome of the immortal gods to a mortal man passing from mortality to immortality, one of the great ones of earth and heaven.

I am convinced that length of years has been granted to me in order that I may be able to bear testimony in the sight and hearing of men that I have seen Ramakrishna and heard him speak in life, and that I have seen him in the peace and serenity of death. Nagendra Nath Gupta, (*Reflections and Reminiscences*, 1947)

* * *

বরিশালের খ্যাতনামা দেশসেবক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য যখন কলিকাতায় বাস করিতাম তখন তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসিয়া দুই এক দিন অবস্থান করিতেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদি করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল এবং এমন আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত এই ভক্তপ্রবরের জীবন সম্পর্কে গল্প করিতেন যে আমাদের চিত্ত তাহাতে একেবারে গলিয়া যাইত।

অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন কেমন করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের "জাদুর" ভিতর পড়িয়া যান। একবার তাঁহার অগ্নিময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি এত বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে ঐ অল্প বয়সেই ধর্মপ্রচার করবার জন্য নগ্নপদে কলিকাতা হইতে যশোহর চলিয়া যান।

অশ্বিনীকুমারের মুখে আমি কেশব-জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর কথাই

শুনিয়াছি। যে দুটি কাহিনী আমার প্রাণকে খুব বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। অশ্বিনীকুমার একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। পরমহংসদেবের কুটীরে গিয়া দেখিলেন যে তিনি একখানা কালপেড়ে ফিন্‌ফিনে ধুতি পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন কি জন্য অস্থির।

তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন, আবার বাহিরে গিয়া কি যেন দেখিয়া আসেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে সহসা শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কয়েকটি বন্ধুসহ হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেবের মুখপদ্ম ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। স্নেহময়ী মা তাঁহার অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বহুকাল পরে দেখিয়া যেমন সুখে বিহ্বল হইয়া পড়েন, শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল: তাঁহার প্রিয়তম কেশবচন্দ্র কাছে আসিবামাত্রই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রাণে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম যে তুমি বুঝি আর আসিবে না। তাই আমার মনে বড়ই উদ্বেগ হইতেছিল।" ভক্তের প্রাণ ভক্তের জন্য কিরূপ আকুল হয় এবং তাঁহাদের সম্মিলনে কি যে মহাপ্রেমের আবির্ভাব হয় তাহার জীবন্ত প্রমাণ লাভ করিয়া অশ্বিনীকুমার বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে পরমহংসদেবের প্রাণ পূর্বে কেন এত অস্থির হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেশব! কিছু হবে কি?" কেশবচন্দ্র উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন —"হাঁ হবে বৈ কি!" হাস্যরসপ্রিয় অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের এই সকল সঙ্কেত-বাক্য শুনিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ! বুঝিয়াছি, তবে এখন উঁহাদের সেই বস্তুটি সেবন করিবার সময় উপস্থিত। যেই কথা, সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল! ঘন রোলে খোল কর্তাল বাজিল! হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরাপানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্তধারণকরতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

২। একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র দলে বলে জাহাজে চড়িয়া হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। এ যে কি স্বর্গীয়

ব্যাপার তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। পোতখানি নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ও পতাকায় ভূষিত করা হইয়াছিল। প্রকৃতিদেবীও যেন তখন আপনার রাজ্যের অতুল শোভা খুলিয়া দিয়াছিলেন। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ আলোকের মুক্ত সঞ্চরণ। ভক্তগণের কথা আর কি বলিব? তাঁহাদের অঙ্গে গৈরিক, কণ্ঠে ফুলহার, মনে উৎসাহের আগুন, হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ, মুখমণ্ডলে আনন্দের জ্যোতি! ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশবচন্দ্রকে তাঁহারা মাঝখানে রাখিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন! মধুর হরিনাম গান, গঙ্গার কুলু কুলু তান, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, বাষ্পীয় পোতের গভীর গর্জন, —সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া এক মহাসঙ্গীতপ্রবাহে দূর দূরান্তরে ছুটিয়াছে।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে আপনার কুটীরে বসিয়া কয়েকটি ধর্ম-পিপাসু লোকের সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে আলাপ করিতেছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্রসঙ্গ বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমুখে ভক্তিতত্ত্ব-কথা! কেনই বা না চিত্তাকর্ষক হইবে? সহসা পরমহংসদেবের কথা থামিয়া গেল, তিনি একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ যে হরিনাম করিতে করিতে কেশব আসিতেছেন!" কেহ কেহ তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ আরও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তোরা কি বুজিব রে? কেশবের দল ছাড়া ঐভাবে কীর্তন আর কি কেউ করতে পারে?"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহির হইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সুসজ্জিত পোত কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলকে নিয়া ঘাটে লাগিল। তখন হরিনামের মহা রোলে চতুর্দিক কম্পিত হইতেছিল। পরমহংসদেবকে আর ধরিয়া রাখে সাধ্য কার? তিনি জাহাজে উঠিবার জন্য পাগল হইয়া গেলেন। তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য যখন "ও ঠাকুর আপনি কোথা যান?" এই বলিয়া তাঁহাকে থামাইতে গেল, তখন তিনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এই অদ্ভুত বাণী মাত্র উচ্চারণ করিলেন,—"তোরা যা! রাধা তাঁর শ্যামের কাছে যায়!"

বলা বাহুল্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টীমারে উঠিয়াই শ্রীকেশবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা," তখন ভক্তির বন্যা শতগুণ তেজের সহিত সকলের প্রাণের ভিতর দিয়া বহিতে লাগিল। স্বর্গ আর কাহাকে বলে?" (শ্রীমতিলাল দাস 'ধর্মতত্ত্ব,' ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)

সমকালীন সাময়িক-পত্রে
রামকৃষ্ণ-কথা

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিম্বা একাদশ তখন হইতে ইঁহার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যেখানে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী দেখিতে পাইতেন সেইখানে গিয়া ইনি বসিয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণের পিতাও একজন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতেন পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। লেখাপড়া শিখিলে পৌরোহিত্য ব্যবসায় করিতে হইবে এই ভয়ে সে দিকে কখন যাইতে চাহিতেন না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রামকৃষ্ণ কিছুদিন তাঁহার নিকটে ছিলেন। যৎকালে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন* তখন রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের ঔদাস্যভাব দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিছু-দিন পরে কালীদেবীর মন্দিরে তাঁহাকে পরিচারকের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণ এইরূপে কিছুদিন থাকেন, পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজান আর ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ ভক্ষণ করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে স্পৃহা বা স্বার্থপরতা তাঁহার ছিল না। একদিন কালীপূজা করিতেছেন, করিতে করিতে নৈবেদ্য, ফুল, চন্দন ঠাকুরের মাথায় না দিয়া আপনার মাথায় দিতে লাগিলেন। কখন বা কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। মথুরবাবু একদিন ইহা দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার রামকৃষ্ণের উপর আরও ভক্তিবৃদ্ধি হইল। তদনন্তর এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটীর পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটি রমণীয় স্থান আছে তথায় তিনি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের জন্য ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন স্ত্রীলোকের বেশভুষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতিবোধ না হইলে রিপুজয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখন সখীভাবে কখন বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য বলেন, দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। কালী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা পর্যন্ত জপ করিয়াছেন।

শরীররক্ষার ভার হৃদয় নামক উক্ত শিষ্যের উপর ছিল, তিনিই আহার করাইয়া দিতেন। এখনও তিনি ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণের ধর্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা শাল স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসারবাসনাশূন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখন সর্বদা ধর্মভাবেতেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। এতদিন পর্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তকথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিতভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় সে সকল তিনি অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন শরীরের সকল অংগই সমান, তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? সংগীত ও সঙ্কীর্তনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বর অতি সুমিষ্ট। ব্যবহারে কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সরলভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই একটি গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় না। ধর্মবিষয়ে মতামত তাঁহার যাহাই হউক, তিনি একজন সরল সাধক এবং প্রেমিক ভক্ত। উৎসাহ এবং ভাবুকতা যথেষ্ট আছে। এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্বদা বিভুগুণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তথাপি যথেষ্ট উৎসাহের ভাব আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। তাঁহার স্বভাব অতি বিনম্র ও সরল, দেখিতে পাগলের ন্যায় অথচ ধর্মবুদ্ধি বিলক্ষণ উজ্জ্বল। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনের অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন মাখিয়া বাতাস করিতে হইত এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সংগে আবার কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, ধ্যান করিতে গেলেই মূর্চ্ছা হয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছে। সংসার এবং সাংসারিক

লোকের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি বলেন, অনেকে আমার নিকট পূর্বে আসিত, কিন্তু ধর্মের জন্য কেহই ব্যাকুল নহে, সকলের মধ্যেই গোলযোগ দেখিতে পাইলাম। মনুষ্যের সাধনের বল এবং ঈশ্বরের করুণাবল সম্বন্ধে তাঁহার একটি দৃষ্টান্তকথা আমরা প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সে বিড়ালের বাচ্চা, আর সাধনের বলের উপর যাহার নির্ভর সে হনুমানের বাচ্চা। বিড়ালের বাচ্চা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে তাহা সে জানে না। আর যে হনুমানের বাচ্চা সে মাতৃবক্ষস্থল প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে পেটের নীচে রাখিয়া যেখানে সেখানে দৌড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণ বলেন আমি বিড়ালের ছানা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানি। আর একটি উৎকৃষ্ট কথা এই যে, শিশু যখন রাঙ্গা লাঠি পাইয়া ভুলিয়া খেলা করে মাতা তখন কার্য করিতে থাকেন, যদি সে কাঁদিয়া উঠে অমনি মাতা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। সংসারাসক্ত মনুষ্য বালক সমান, ঈশ্বর তাহার জননী, যাই সে মাতার জন্য কাঁদিবে অমনি তিনি তাহাকে দেখা দিবেন। যখন সে সংসাররূপ রাঙ্গা লাঠি লইয়া খেলা করিতেছে তখন মাতা বলেন—ও খেলা করিতেছে করুক, আমি এখন অন্য কাজ করি। একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মত একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই। (ধর্মতত্ত্ব ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক, ১৪ মে, ১৮৭৫)

* * *

৯ই [২১ জানুয়ারি ১৮৭৮] সোমবার—প্রাতে আচার্যভবনে উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়া বেলঘরিয়ার উদ্যানে গমন করেন। এখানে সে দিন পরমহংস রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম-প্রসঙ্গ চিরদিনই নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হয়েন। বিশেষতঃ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ যাঁহারা

ইঁহাকে কখন দেখেন নাই তাঁহারা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থিতি করিয়া সকলে নগরে প্রত্যাগমন করেন। [ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই মাঘ ১৭৯৯ শক ; ২৮এ জানুয়ারি ১৮৭৮]

* * *

[The *Indian Mirror*, 15 June 1879]

A Visit To The Yogi, Of Dakshineswar—Ramakrishna is not educated in the English sense of the term. His views may be anything but pleasant to hear and his notions of gallantry or propriety are such as will probably shock the fastidious tastes of Western critics. I can assure the reader, however, if the Yogi is not gallant, is pure. If there is not warmth in his feelings about a woman, the place which he assigns her in the kingdom of God is far higher than any which the passions of men might reach. Our good hermit thinks that any extended scale of devotion or communion is impossible so long as there is lust to distract or a woman to seduce the heart from the way of heaven. Every devotee should be absolutely proof against any influence of the kind. In that the mind being free from every sort of distracting influence, may proceed uninterruptedly to its earnest search of the Almighty : but how to be thus free, how to be proof against lust ?

The method is to resort to the most violent pains for the purpose of extinguishing lust. If I am asked to state my opinion as to whether the mode alluded to is practicable or beneficial I shall say that I do not know. For surely it has been feasible in one or two cases, or why was it resorted to at all ? But to enforce it as a rule in all cases would be the

height of absurdity. The same remark perfectly applies to Sri Ramakrishna's method. But let us see what it is I have to only recall the figure used in my last letter, *viz.* that the door-keeper at the mansion of heaven is a woman ; now in what way is one to overcome the superior power of this being ? Sri Ramakrishna says there are three ways of doing it.

The first is what is called the "heroic" method—and its principle is the defeat of sin brought on by indulgence in sin. Let a man go straight to the door-keeper and attain satiety and complete reaction by indulging in every sort of sexual pleasure. This is the most hideous principle which depraved imagination has invented for the purification of the heart. Yet it is a melancholy fact that hundreds, thousands of depraved men and women are pursuing this suicidal course at the time of the day.

The second method consists in assuming the female nature. If a man puts on a woman's dress, imitates her manners and cultivates the tenderest feelings of female nature and in this way forgets his own manhood, verily he cannot look on woman with evil eyes. He greets her as his handmaid and in this way gets access to heaven.

The third is called the "filial" method and it means that the devotee is to learn to call a woman by the name of Mother ; for if he is a son he cannot possibly commit lust in his heart. Now this may appear to most readers as transcending God's evident intentions and violating nature's beneficent laws. But the fact is there. Ramakrishna owes much of his success to the last mentioned method. The trial and temptations which he voluntarily underwent are marvellous to those who :

"since it is hard to combat learn to fly." He was tempted in a hundred different ways—but from every blast of the furnace he came out and shone as the purest and brilliant metal. (Indian Mirror, 15th, June, 1879)

* * *

বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নামগান করেন, কখন তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়! তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথাসকল বলিতে বলিতে এবং সংগীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাবদর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়। ৬ই রবিবারে অপরাহ্নে আচার্য মহাশয়ের ভবনেও পরমহংস মহাশয় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সে দিনও তাঁহার সুমিষ্ট স্বরের মধুর ভাবের সংগীতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সে দিন সমাধির অবস্থায় তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দঘন এই নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। (সংবাদ)

*   *   *

গত বুধবার [১৩ কার্ত্তিক] শারদীয়া পূর্ণিমা উপলক্ষে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্বাহ্নে মন্দিরে উপাসনা হয়, অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম বিদ্যমান, অন্নঃ ঈশ্বরের সত্তা ও স্নেহ দয়া প্রকাশ করিতেছে এ বিষয়ে জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করা যায়। একখানা বজ্‌রা ও ৬খানা ভাওয়ালিয়া ২খানা ডিঙ্গি প্রায় আশিজন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকদিগের মধ্যে ১০।১২ জন ব্রাহ্মিকা ছিলেন। বজ্‌রা পতাকা ও পুষ্পপল্লবালংকৃত হইয়াছিল। খোল, করতাল ও ভেরীর ধ্বনি-সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পঁহুছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর, বজ্‌রায় আসিয়া প্রমত্তভাবে "জাহ্নবী-তীরে হরি ব'লে কে রে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ডদলন হতেছে" এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েক দল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-রূপানন্দ ঘন" সকলে এই সঙ্কীর্তনটি করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরম-হংস মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইল। সমাধিভঙ্গ হইলে পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্বনাশ বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বান্ধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন তাহাতে ব্রহ্মপ্রেমের গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের মধুর ভাবে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। উপদেশশ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নূতন রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। "মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়।" সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না। এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান অবস্থায় পুনর্বার সমাধিপ্রাপ্ত হন। রাত্রি ৮টার

সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল। (সংবাদ)

* * *

Sadhu Sanga ; or the companionship of saints and devotees, is justly regarded as one of the essential means of sanctification, and we are gratified to find among our brethren a desire to avail themselves of such means whenever an opportunity presents itself. Dayananda Saraswati, the great Vedic reformer the Paramahansa of Dakshineswar, the Shikh Nagaji of Doomraon and the Pahari Baba of Ghazipur are, so far as we know, the four distinguished ascetic saints whom our friends have from time to time duly honoured, and in whose company they have sought the sanctifying influences of character and example. May we respect and serve with profound reverence and humility every ascetic saint whom Providence may bring unto us ! The impure become pure in the company of *Sadhus*.

* * *

There was a large gathering of our friends at Dakshineswar, on Tuesday last, to pay their respects to the Venerable Paramahansa. The party proceeded in a steamer, and reached the place at about 5-30 p. m. Others had assembled earlier. Althogether there were more than eighty persons present. The conversation, which was deeply spiritual and instructive, lasted over an hour, and was followed by hymns chanted by

our Singing Apostle. As the shades of the evening gathered, the garden and the river-side looked most romantic and charming, and eminently fitted for devotion. The party returned, some in carriages, some by rail on the other side of the river, while the rest walked all the distance. It was a pleasent evening, and showed how highly the Paramahansa is esteemed by all classes of the Native community. His liberality is indeed a great attraction. One of the most noteworthy things he said the other day was that he believed in the identity of Janak and Nanak. After the death of the former the Lord blessed his spirit, and expressed His joyful appreciation of the Rishi's life. Greatly pleased, He said to him to the following effect,—'Well done, good Rishi. Thou hast sanctified many by thy purity and asceticism, and by the noble example of a self-denying king thou hast set. So good a teacher, thou shalt not sleep in heaven, but thou shalt go again into the world. Thy services, O Janak, are required in the Punjab. Go there, harmonize the scriptures, and draw together hostile sects. O thou apostle of union and reconciliation." In this anecdote one cannot fail to notice the doctrine of unity which forms the corner-stone of the New Dispensation. (The New Dispensation, 26th May, 1881)

* * *

In the course of an animated conversation with our devotees, the Paramahansa of Dakshineswar lately expounded the Hindu doctrine of Trinity. He spoke of "Bhagaban", "Bhagavat" and "Bhakta" as three entities, yet one in

essence,—the mysterious three in one. The first signifies the Godhead ; the second, Scripture or Word ; the third, Devotee or Saint.

* * *

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস :

পাঠকগণ উপরিউক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কি না সন্দেহ। যোগ-বলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন, কখন মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার মনে প্রবল হয় তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান আর রাখিতে পারেন না। একখানি তক্তার মতন তাঁহার সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই। কিন্তু তিনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, মাটীর হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাঁহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময়, কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটি চিন্ময় ভাব-রূপ লহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি

বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে কাল বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে তিনি মা'র কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মা'র কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন। কখন কখন আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এইভাবে থাকিতেন, তাঁহার আহারাদি বাহ্যক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এইভাব কমিলে তিনি আপন পরিচারককে বলিতেন, এইবেলা আমাকে আহার দেও, সে ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে ভগবান তাঁহাকে লইয়া নানাভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার ষ্টীমারে বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবীণ আনিয়া তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলেন ; তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখন আমার মন ব্রহ্মের ভিতর ডুবিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিষ যে তাঁহার ভিতর হইতে মন উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর দিব। পরমহংস মহাশয়ের নিকট আমরা এত উচ্চ উচ্চ এবং নূতন নূতন কথা শুনিতে ও ভাব দেখিতে পাই যে তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই 'সুলভ' পরিপূর্ণ হয়। অদ্য আমরা তাঁহার উপরিউক্ত কয়টী কথা উপহারস্বরূপ পাঠক মহাশয়দিগকে দিতেছি, ভরসা করি এগুলি গ্রাহ্য হইবে। (সুলভ সমাচার, ১৬ শ্রাবণ, ১২৮৮)

* * *

Lessons Gathered.—That beloved child of God, and child-like, the Paramahansa of Dakshineswar, honoured the minister's Asram with another visit, on Tuesday last, and, as usual,

spoke wisdom and love, sang and danced with joy. Rich and varied were the illustrations which he used. Some of these we shall cite for the reader's benefit. (1) The young lady in the house is kept employed in all manner of household drudgery from morning till night, and has no rest. When she is about to become a mother she is gradually relieved of all work, and is allowed to remain quiet. When the child is born, she not only manifests a distaste for work, but she day and night does little besides caressing and kissing the little baby, and finds happiness in it alone. So the soul works and seeks salvation in work. But as soon as it becomes fruitful it gives up all outward work. When true wisdom is born, there is an end to the religion of dry work and the soul rejoices in wisdom, the fruit of all spiritual culture. (2) The hidden magnet in the depths of the sea suddenly loosens all the iron nails and screws of the vessel, and at once it breaks into pieces and is lost. So by true wisdom the bonds and chains of the vessel of life, selfishness, pride, lust, anger etc., are instantaneously cut, and the solid mass so well-fastened melts away in Divine love and resignation. (3) Ego is no substance. It is only coating over coating, like onion. Remove the coats one after another, and you see nothing is left. So by stripping humanity of its outer and inner coat you find nothing left of man. What remains is Divinity. By unfolding self I find Him. (4) All, all is Narayan or Divinity, said the Guru to the diseiple, and the latter blindly accepted the doctrine. A big elephant led by its *mahut* or driver was passing through the streets; the disciple happening to come in the way, the driver warned him to move, but in spite of

repeated warnings he persisted in standing unmoved where he was. At last the huge animal moved on, took the man by the trunk, and flung him away. He was bruised and hurt, and he argued within himself,—"How can this be ? I am Narayan, the elephant too is Narayan. How can the two clash ? Why should I come to grief by following the Narayan in me ? Let me go to my Guru." On his representing fully what had happened, the Guru remarked,—"You must remember, as I said to you, that all is Narayan. Self-Narayan and Elephant-Narayan, you do well to acknowledge, but why deny the Mahut-Narayan ? Did he not dissuade you and give you timely warning ? You have come to grief because you disregarded his warning." (The New Dispensation, 9 Sept. 1881)

* * *

Editorial Notes.—Friday was the day set apart for our autumnal festival. So we went to Dakshineswar to pass a few hours in a friendly talk with the good Paramahansa with whom our readers have become probably quite familiar by this time. More than fifty gentlemen were present on the occasion. The first thing that as usual edified us was the sight of this holy person in a trance. Ramakrishna is a man marvellously susceptible of religious impressions and whenever he hears somebody speak lovingly and genuinely of the Lord, he is so much moved that he cannot contain himself and much against his own will is literally lost in rapture of his emotional pleasures. He loves our minister and whenever we accompany

the latter to Dakshineswar on a visit to the good man, the first thing that greets our eyes is a profonud, respectful, sincere and affectionate bow on each side and then the complete immersion of the saint in a few minutes' trance That is the work of *love*. He regains his consciousness little by little and when he is half awake begins the conversation as edifying in its nature as it is marked by all the humour and humility that characterizes a genuine son of God. One thing is remarkble about his discourses He never states many propositions, but the largest portion of what he says is taken up with illustrations. And what illustrations they are ! Facts drawn from the commonest incidents of life, familiar sights and commonplace details are combined and enlarged upon with such infinite sagacity and humour as suffice to suggest, as soon as you have taken your seat before him for a few minutes, that you are before no ordinary person. The subject of our talk on Friday last was the renunciation of self—a topic which he always likes to descant upon. Two obstacles, according to him, lie in the path of spiritual regeneration—the love of woman and the love of money, and on this day he discussed whether it was possible for a regenerated man to live in the world and yet be above it. Those who affect piety are not necessarily above the world, for, like vultures and kites they soar very high, heavenward as they presume and yet their hearts are towards the drains and ditches where lie the carcasses they feed upon. But one who is freed from self remains in the world like a cord that is burnt : the similitude of the cord is seen, but the least wind disperses the ashes, like the boiled paddy that seems like the

grain and is yet unable to produce other grain; in other words the liberated soul moves about in its affairs, and retains every semblance of the ego, and yet it is not in reality the ego, but something above it. It is possible for such a soul to remain here in activity and yet be unsullied and unaffected by the passing impurities, as it is possible for a flint stone to remain immersed in water and when brought out, to give the same sparks of fire that came from it when it had not touched water. The flint does not lose its fire by being immersed, and so the liberated soul does not lose its heavenly warmth even when it is compelled to touch the impurities of the world. (Indian Mirror, 9 Octo. 1881)

* * *

সাপ্তাহিক সংবাদ।—দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ় গূঢ় ধর্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকট রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপ বুঝাইলেন যে, রামচন্দ্র পরমাত্মাসদৃশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার অনুরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপ লক্ষ্মণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না; যখনই

সীতা একটু পাশ দেন তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দরভাবে বুঝাইলেন; তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লৌহশলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে কিন্তু লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের যেমন কোন বল খাটে না, তদ্রূপ আত্মা কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুর দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনাপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়। (সুলভ সমাচার, ৩ পৌষ, ১২৮৮)

*　　*　　*

Hopeful Signs—Those who have watched the later phases of religious thought and life in Calcutta must have been struck to find how the venerable Paramahansa of Dakshineswar is serving as a marvellous connecting link between the Hindus and the Brahmos of the New Dispensation. There have been a series of religious meetings of late in the house of respectable Hindus, in which the representatives of the two communities were harmoniously blended together so as to form a unity of thought and devotion, which was alike striking and interesting. The proceedings of these meetings generally embrace hymns and discourses by the Paramahansa, questions and answers, and kirtan of a most enthusiastic character. Ladies of high caste Hindu families congregate behind the *purdah* in the upper veranda, and listen with the deepest interest. Learned pandits, educated youths, orthodox Vaishnavas and yogis gather in numbers, some from curiosity,

some for the sake of *Sadhu Sanga* or good company, others for acquiring wisdom and joining the kirtan. We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience. The effect is wonderful. Theological differences are lost in the surging wave of love and rapture. What this spiritual fusion and loving union may lead to in the end who can divine ? The ways of the Lord are past finding out. (The New Dispensation, 8 Jan, 1882)

* * *

On Thursday last there was an interesting excursion by a steam launch up the river to Dakshineshwar. The Rev. Joseph Cook, Miss Pigot, and the apostles of the New Dispensation together with a number of our young men embarked at about 11 o'clock. The revered Paramahansa of Dakshineshwar, as soon as he heard of the arrival of the party, came to the riverside, and was taken on board. He successively went through all the phases of spiritual excitement which characterizes him. Passing through a long interval of unconsciousness he prayed, sang and discoursed on spiritual subjects. Mr. Cook watched him very closely and seemed much interested by what he saw. Mr. Cook represented the extreme culture of Christian theology and thought. The Paramahansa represented the extreme culture of Indian Yoga and Bhakti in short the traditional piety of the East. And the

apostles of the Brahmo Samaj in bringing together the two proved that they combined both in the all-inclusive harmony of the New Dispensation. (The New Dispensation, 26 Feb. 1882)

* * *

TWO GREAT MINDS.—The venerable Paramahansa lately paid a visit to the eminent philanthropist and scholar, Vidyasagar. Why did he call ? What earthly or unearthly advantage did that recluse expect from such a visit ? The Paramahansa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate. Now he is off to see a lion. Now his heart is bent on witnessing steam force as it propels a steam launch up the river. He is impatient to have a look at a cathedral with its prayerful thousands. And as among beasts and things inanimate he would honour the great, so also among the human species. Curiosity alone, deep and impulsive, led the devotee of Dakshineswar to Vidyasagar's house in Calcutta. No prospect of earthly good actuated him.

Eminent sage, said the devotee, I come as a little muddy stream into the vast deep sea ['sagar.']

Yes, replied Vidyasagar, but you must remember, venerated sire ; that the sea is full of salt water, and if a fresh water stream mixes with it, it too becomes salt, and loses all its sweetness.

It is not *avidya* sagar, which indeed is to be shunned, but *vidya* sagar that draws me into its welcome waters ;—was the rejoinder.

But the sea hath its dangers and perils, said Vidyasagar, and thousands of monsters hide themselves in its treacherous waters.

Are there not pearls in the deep water of the sea ? In search of those pearls I am here. The sea is famous for its hidden treasures. Great is your value, Vidyasagar. So said Paramahansa. (The New Dispensation, 3 Sept., 1882)

* * *

অনেকেই জানেন, দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন আচার্যদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্বে পরমহংস মহাশয় হঠাৎ কমলকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আচার্যদেব নিদ্রিত, পরমহংস মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও অসুস্থতাবৃদ্ধি হইবে ভয়ে কেহই তাঁহাকে জাগ্রৎ করিতে সাহসী হইলেন না; প্রায় অর্ধঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া আচার্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে লাগিলেন 'যদি তিনি এখন না আসিতে পারেন যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন সেই ঘরটি আমায় দেখাইয়া দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই, তাঁহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।' আচার্যদেব গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন, পরমহংস মহাশয়ও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন 'ওগো বাবু আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দাও, আমি আর থাকিতে পারি না। আচার্যদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং পরমহংস মহাশয়কে প্রণাম করিলেন,

উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন স্পষ্ট প্রতীতি হইল, দুইটি অশরীরী আত্মা যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদের সম্মিলনে যেন আগুন উঠিল, দুই জনেই শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে কিরূপ গভীর সৎপ্রসঙ্গে ডুবিয়া গেলেন তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন কেবল তাঁহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচার্যদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, প্রায় অর্ধঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাঁহার পীড়ার কথা হইল না। এ সম্বন্ধে তিনি এইমাত্র বলিলেন যে 'সময়ে সময়ে মালী ভাল বস্‌রাই গোলাপবৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার মাটি দিয়া তাহা পূর্বমত পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে গাছে খুব ফুল ও তেজ হয়। তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, এ তোমার পীড়া নয়, তুমি মার বস্‌রাই গোলাপগাছ, মা তোমার গোড়া খুঁড়িয়া দিয়াছেন, কার্যসিদ্ধি হইলে আবার পূর্বমত করিয়া দিবেন।' তিনি আরও বলিলেন 'মাকে পাকারকম পাইতে গেলে, শরীরে এক একবার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার উপযোগী করিয়া লইবার সময় একবার খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লন। আমারও একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়া ঘটি ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত আমার যক্ষ্মা হইয়াছে আর বাঁচিব না।' তিনি আরও বলিলেন 'সে-বার যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, নিদ্রা হয় নাই, মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মা যদি কেশব না থাকেন তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিব?' অর্ধ ঘণ্টা কথোপকথন করিয়া আচার্যদেবের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

(ধর্মতত্ত্ব, ১৪ জানুয়ারী, ১৮৮৪)

* * *

মহাত্মা রামকৃষ্ণ।—গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, বনের শোভাবর্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি আদি যে সকল উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণতঃ পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধলাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে২ তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাতে২ যায় নাই। লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন। মধ্যে২ তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময়২ অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুল শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত হইয়াছিলেন; দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের ভাব, চেষ্টা ও চরিত্র বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, 'তুম্ ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? য়হ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? য়হ তো রোটী বনানে কী খেল হ্যায়?' রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে২ চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকাদর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রাণী রাসমণি জাহ্নবীতটে কলিকাতার সমীপবর্তী

দক্ষিণেশ্বরে কালিকামূর্তি স্থাপন করিলে, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন; ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিসহ এই অপূর্ব চিন্ময়ী মূর্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন, রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে! আর কি সাধক বাহ্যজগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন! রিপুমদমর্দিনী রঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরেই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্রসাধনে শরীর, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি আদি সকলে এক একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কালনিবারিণী তরবারিদর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎপদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তি-সোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, তিনি বিষ্ঠা, মূত্র মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উল্লম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অচল অটল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া জানিল, বহু-দিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল; সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে

কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে আবার বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাট-বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল। তাঁহার পাগলামিতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎমাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক এক দিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, আর বলিতেন, মা! আমাকে ভক্তি দাও! আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি ভক্তির জন্য প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ ভক্তির মূল্য বুঝে না, জগতের চক্ষু এ ভক্তির সৌন্দর্য দেখিতে জানে না। ভক্তির মাধুরী, ভক্ত! তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকটে বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি-উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি; যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে২ তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত-চলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনালাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে, তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনার দ্বারা কামিনী ও কাঞ্চনকে বস্তুতঃই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার

শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপাদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি, যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাঁহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায়, যে বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থ-বিশেষ কল্যাণ-প্রার্থীমাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার আছে। অদ্য স্থানাভাবে তাহা আর প্রকটিত করিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। (ধর্মপ্রচারক, ৬ আগষ্ট, ১৮৮৪)

* * *

সংবাদ।··আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের অত্যন্ত সংকট রোগ। তাঁহার কণ্ঠনালীর ভিতরে ক্ষত হইয়া বক্ষোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সময়ে সময়ে রক্তবমন করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন দুই সের আড়াই সের রক্ত মুখ দিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়াছে। দুই তিন মাস ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়াছেন, সম্প্রতি আর কোনরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। দিন দিনই অবস্থা মন্দ দেখা যাইতেছে। পরলোকের জন্য তাঁহাকে এইক্ষণ বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। কিছুকাল হইতে তিনি কাশীপুরস্থ এক বাগানবাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক সেই বাটীতে অবস্থান করিয়া পরম যত্নে ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। প্রতি মাসে প্রায় দুই শত টাকা তাঁহার সেবাশুশ্রূষাতে ব্যয়িত হইতেছে। পরমহংস

মহাশয় স্বীয় যোগ ভক্তিপ্রবণ পবিত্র উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্তে নরনারীর হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সাধুভক্তির আশ্চর্য দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের আচার্যদেবের অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। পরমহংসজীও তাঁহার নামে অশ্রুপাত করেন। বর্তমান সময়ে ইঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ এদেশে নাই। বঙ্গদেশের উপর কি অভিসম্পাত হইয়াছে, ইনিও বুঝি অচিরেই যাত্রা করিবেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। (ধর্মতত্ত্ব, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৬)

জীবনী-সাহিত্য



বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড

"আমরা হচ্ছি নর, ও নরের মধ্যে ইন্দ্র। পাতাল-ফোঁড়া শিব বসানো শিব নয়। যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশি আসে না, সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"ত্যাগী না হলে তেজ হয় না। সকলে ভাবো, আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দেখি কি বল বেরোয়। কিসের দীনহীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ কিসের ভয় কিসের অভাব? নিজের মনে মনে বলো, আমি আত্মা, আমি পূর্ণ, আমার আবার রোগ কি। বলো ঘণ্টাখানেক দুচার দিন। সব রোগবালাই দূর হয়ে যাবে।"

বিবেকানন্দ

"পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করেনা, মানুষকে দেবতা করেনা তাকি আবার ধর্ম?"

বিবেকানন্দ

ভূমিকা

ক্লৈব্যের দেশে অনন্ত বীর্য, জাড্যের দেশে অমিত কর্ম, মূঢ়তার দেশে জ্বলন্ত জ্ঞান, বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলেন বাংলাদেশে পুরুষসিংহরূপে। নয়নে বিভাবসু কণ্ঠে পাঞ্চজন্য। এসে ডাক দিলেন ঘরে ঘরে বজ্রের মত উদাত্তনির্ঘোষঃ উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না চরমতমকে প্রাপ্ত হও ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হয়ো না নিবৃত্ত হয়ো না। বীজের মধ্যে সংহত ভাবে নিগূঢ় ভাবে রয়েছে যে বনস্পতি তাকে পত্রেপুষ্পেফলে স্বাদেগন্ধেশোভায় উচ্ছ্বসিত করো।

'আমি এক ধর্ম মানি, তার নাম পরোপকার।' বললেন স্বামীজি। আর সেই পরোপকার শুধু দুর্গতের দুর্দশামোচনই নয় মানুষকে তার আত্মার অবমাননা থেকে উদ্ধার করা। দীনহীন ভাগ্যের কার্পণ্যে মানুষ যে ক্ষুদ্র-খর্ব নয়, নয় সে যে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ অধম পঞ্চম, সে যে তেজোময় অমৃতপুরুষ, তার অমোঘ মহিমা যে অমর জ্যোতিতে উদ্‌বারিত মানুষকে সেই সুমহান অধিকারে আরূঢ় করা। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা আবিষ্কার করা অভ্যর্থনা করা। বিশ্বের বিস্তারই বিষ্ণু। অকিঞ্চনের মধ্যেও অনন্ত-ঐশ্বর্য নারায়ণ। তাই স্বামীজি সোহহং বলে নিজের কাজ গুছিয়ে সরে পড়েননি, মানুষকে তার পরমতম সত্তায় পৌঁছে দেবার সাধন করেছেন। মানুষ তো শুধু অন্নের প্রত্যাশী নয়, পরমান্নের প্রসাদেরও অংশীদার। তাই বিবেকানন্দের আদর্শ জীবসাম্য নয়, শিবসাম্য।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের জ্বলন্ত সমন্বয়। কর্ম সন্ধান জ্ঞান-প্রাপ্তি ভক্তি আস্বাদন আর ভক্তির পরিপক্ব, প্রগাঢ় অবস্থাই প্রেম। কর্ম আদিকাণ্ড উত্তরকাণ্ড প্রেম। কর্ম ছাড়া জ্ঞান নেই জ্ঞান ছাড়া ভক্তি নেই ভক্তি ছাড়া প্রেম নেই। আর বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে। স্বামীজি একদিকে সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য, আরেকদিকে সর্বপ্রেমমোহনাত্মা সুধাংশু।

কিন্তু আমাদের কি হবে? আমাদের ত্যাগ নেই যোগ নেই জ্ঞান নেই ভক্তি নেই। শুষ্ক কাষ্ঠের অন্তর থেকে কি করে মুক্তি দেব অব্যক্ত অগ্নিকে? স্বামীজি বললেন, তুমিও নিঃস্ব নও, তোমারও অস্ত্র আছে, তার নাম কর্ম। শারীরং কেবলং কর্ম। কর্ম করেই জাগাও পুরুষকারকে। পুরুষকার জাগলেই জাগবে ঈশ্বরকৃপা, প্রজ্ঞানচক্ষু। আর সেই জ্যোতির্ময় জ্ঞান থেকেই শুদ্ধা ভক্তি। যতক্ষণ মলয় হাওয়া না আসে, পাখা চালিয়ে যাও। যতক্ষণ জল না পাওয়া যায় ততক্ষণ খুঁড়ে যাও মৃত্তিকা।

এ বই সেই জল পাবার জন্যে খননের চেষ্টা।

অচিন্ত্যকুমার

১

'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে।' বাবা হঠাৎ জিগগেস করলেন।

বাবার চোখের দিকে তাকাল একবার বিলে। বললে, 'কোচোয়ান হব।'

তার মানে, গাড়ি চালাব। চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাব। কিসের চাবুক? চেতনার চাবুক। ঘোড়া দুটো কে-কে। ধর্ম আর কর্ম। আর গাড়ি! গাড়ি হচ্ছে আমাদের এই অলস দেশ। গাড়ি তো নয় গাধাবোট।

সাত বছর বয়সে অমনি একটা স্বপ্ন দেখেছিল ঐ ছেলে। শিবপূজো করে তাকে পেয়েছেন বলে মা তার নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। সেই থেকেই দাঁড়িয়ে গেল বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নতুন নামকরণ হল। নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তার নাম আবার কী হবে ও ছাড়া!

স্নেহভরে বলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ: 'ও আমাদের গ্রাহ্যই করে না। কেনই বা করবে বলো! আমরা হচ্ছি নর, আর ও হচ্ছে আমাদের ইন্দ্র, আমাদের রাজা, আমাদের অধিপতি।'

ভালো নাম নতুন হল বটে কিন্তু ডাক-নাম থেকে গেল ঐ বিলে।

ঠাকুর বলেন, 'নরেন!'

বাপ বিশ্বনাথ দত্ত, মা ভুবনেশ্বরী। বাপ হাইকোর্টের এটর্নি, দেদার রোজগার। দানেধ্যানে মুক্তহস্ত। গানে-বাজনায় উৎসাহী। বাইবেল পড়েন আর হাফেজ আবৃত্তি করে শোনান। আর মা? রামায়ণ-মহাভারত পড়েন, সংসারের জাঁতা ঘোরান আর পুত্রের আশায় শিবপূজো করেন। স্বয়ং শিব এসে জন্মালো তাঁদের ঘরে। গৌর মুখার্জি লেনের বাড়িতে। পৌষ মাসের শেষ দিনে, মকর সংক্রান্তিতে। সোমবারে। সূর্যোদয়ের ছ'মিনিট আগে।

বাঙলা সাল বারোশ উনসত্তর। ইংরেজি সাল আঠারোশ তেষট্টি। তারিখ ১২ই জানুয়ারি।

শিব নয় তো কি। দুর্দান্ত ছেলে। তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে সংসারে। এ জিনিস ভাঙছে, ও জিনিস ছুঁড়ে ফেলছে। সব এলোমেলো তছনছ করে দিচ্ছে। আদর দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। বাড়ির লোকজন সবাই হাক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মা ভুবনেশ্বরী বলছেন বিরক্ত হয়ে, 'শিব চাইলাম, এ যে দেখছি এক ভূত এসে জন্মালো।'

কি করে ঠাণ্ডা করা যায়! কি করে বন্ধ করা যায় এই উদ্দণ্ড নৃত্য!

এক উপায় শুধু আছে। কি করে মাথায় এল ভুবনেশ্বরীর। 'শিব' মন্ত্র আউরে খানিকটা ঠাণ্ডাজল ছেলের মাথায় ঢেলে দিলেন। ব্যস, ফুসমন্তরে ঠাণ্ডা। আর চীৎকার নেই, জিনিস ছোঁড়াছুঁড়ি নেই। একেবারে ভালোমানুষ ভোলানাথ।

'এমনি ধারা দুষ্টুমি যদি করিস, শিব তোকে নিয়ে যাবে না কৈলাসে।' মা তাকে ভয় দেখান।

এ একটা সত্যি ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। কেননা বিলের ভারি শিব হবার ইচ্ছে। শিব হয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে কৈলাস বেড়ানো। এক টুকরো গেরুয়া কাপড় পরে সেদিন বসেছে চুপচাপ। বসেছে আসন-পিঁড়ি হয়ে, চোখ বুজে। কি যেন ঘটবে অভাবনীয়।

মা চমকে উঠে জিগগেস করলেন, 'এ কী হচ্ছে রে বিলে ?'

বিলে নিশ্চিন্তকণ্ঠে জবাব দিলে, 'আমি শিব হয়েছি।'

কে ওকে বলে দিয়েছে শিরদাঁড়া খাড়া করে চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়! শুধু গজায় না, গাছের শেকড়ের মত মাটির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। থেকে-থেকে চোখ মেলে তাকায়, কত বড় জটা না-জানি নামল পিঠ বেয়ে।

'মা এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই ?' মার কাছে এসে অভিযোগ করে।

মা বলেন, 'তুমি ধ্যানই করো বাপু শান্ত হয়ে, তোমার জটায় কাজ নেই।'

সাধু-সন্তরা আসে ভিক্ষে করতে। কারু মাথায় মস্ত জটা। তাদের দেখে বিলে মহাখুশি। কৈলাসের খবর জিগগেস করে। এই শীতে শিবই বা কেমন আছেন। যদি ভিক্ষে-টিক্ষে না দাও খোকাবাবু, কি করে কৈলাসের ভাড়া জোটাই! ঠিকই তো! মূল্যবান কী জিনিস আর বিলে দিতে পারে, পরনে আছে একখানা ছোট নববস্ত্র, তাই দিয়ে দিলে অকাতরে।

'কাপড় কি হল রে বিলে ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে মা জিগগেস করলেন।

'সাধুকে দিয়ে দিয়েছি।' পুলকিত বিস্ময়ে বললে বিলে, 'জানো মা, কাপড় বেচে পয়সা পাবে। পয়সা জমিয়ে কৈলাসের টিকিট কাটবে—'

এ আরেক নতুন বিপদ হল দেখছি। তাই দোরগোড়ায় সাধু এসে দাঁড়ালেই মা তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। মা'র একার সাধ্যি নেই পারেন তার সঙ্গে, তাই তাকে শাসন-দমন করবার জন্যে দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছেন বিশ্বনাথ। তিনজনের সঙ্গে সে একা কি করে এঁটে উঠবে ? ঘরের মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শেকল লাগিয়ে দেয় অনায়াসে। তা দিক। কিন্তু ঘরের জানলা তো খোলা আছে। তারই মধ্যে দিয়ে ঘরের জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বাইরে, কৈলাসগামী সাধুদের উদ্দেশে! নাও তোমরা সব কুড়িয়ে, জামা-কাপড় থালা-গেলাশ বই-খাতা—সব তোমাদের ভিক্ষে দিচ্ছি। তখন খুলে দাও দরজা। শিব বলে মাথায় আবার জল ঢালো।

বাড়িতে এক রাজ্যের পোষা প্রাণী। দুধেল গাই, ছাগল, ময়ূর, খরগোশ। নানা রঙের পাখি, নানা জাতের পায়রা। একটা বাঁদর। যত ভাব এদের সঙ্গে। আর ভাব, বাবার গাড়ি হাঁকায় যে কোচোয়ান সেই কোচোয়ানের সঙ্গে। মাথায় পাগড়ি, হাতে চাবুক, কেমন স্বপ্নের মত চেহারার সে লোকটা! কেমন জ্বলজ্বলে। শিব তো ষাঁড়ের উপর চড়ে, চলে ঢিমে-তেতলায়। তার চেয়ে কোচোয়ান অনেক ভালো। আমি কোচোয়ান হব। বেগবান ঘোড়া ছোটাব।

মার কাছে বসে রামায়ণ পড়ে। রামকে বড় ভালো লাগে। মাটির একটি রাম-সীতার যুগল মূর্তি কিনে এনেছে মেলা থেকে। তাই নিরালায় বসে পুজো করে তার খেয়ালমত।

শুধু কোচোয়ানের সঙ্গে নয়, সইসের সঙ্গেও তার বন্ধুতা। কিন্তু সইসের বড় কষ্ট। কেন, কী হল তোমার? আর কি হবে, সংসারের ঝামেলা। কি কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলুম, বিয়ের থেকেই সংসার, আর তার থেকেই যত দুঃখ, যত ঝকমারি!

ঠিকই তো। রাম-সীতারও যত দুঃখ সব এই বিয়ে হয়েছিল বলে। তবে? চলবেনা রাম-সীতা, যারা দুঃখ পাবার জন্যে জেনে-শুনে বিয়ে করে চলবেনা তাদেরকে ভালোবাসা। আস্তাবলের সইস বিলের মন খাঁটি করে দিয়েছে—বিয়ে ভালো নয়, বিয়ে ঝঞ্চাটে।

চলবেনা যুগল মূর্তি। তার চেয়ে শিব ভালো, একাকী শিব।

রাম-সীতার মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। এতটুকু দ্বিধা করল না। তার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে সে এমনি করেই নস্যাৎ করতে পারে। স্বপ্ন ভেঙে গেল বলে আফসোস করেনা। হোক তা মধুর হোক তা স্বর্ণময়, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। মুক্তি চাই সমস্ত আসক্তি থেকে। বিলে যে নিজেই শিব।

ঠাকুর বলেন, 'বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁড়া শিব।

২

জাত যাবে, জাত গেল—এই কেবল কানে আসে। জাত যে কি জিনিস, কি করে কোন পথ দিয়ে যে চলে যায় ভেবে পায় না বিলে। ও কি টাকা-কড়ি যে হারিয়ে যায়? না, ও কি জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়? চামড়ার মতন ও কি গায়ে লেগে থাকে?

নানা জাতের মক্কেল আসে বাবার কাছে। বৈঠকখানায় তাদের জন্যে আলাদা-আলাদা হুঁকো। এটা বামুনের, এটা শুদ্দুরের ওটা মুসলমানের। এ যদি ওরটাতে মুখ দেয় তাহলেই জাত যায়। ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায় বোধহয়। জানতে ভারি কৌতূহল হল বিলের। আমি তো কায়েত, মুসলমানের হুঁকোতে টান দিলে জাত নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে মুখ দিয়ে, কিংবা নাক দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে। দেখি বেরুবার সময় আবার তাকে ধরতে পারি কিনা।

মুসলমানের হুঁকোতেই টান দিলে সটান।

'ও কি হচ্ছে রে বিলে?' বাবা কখন ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়!'

বিশ্বনাথ তো থ। জাত যায় না। জাত বলে কিছু নেই। যাকে ছোট করে

রেখেছি, যাকে ছুঁইনা, সেও আমাকে ছোট করে রেখেছে, সেও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু যদি তাকে ছুঁই, সে আমার হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রদেশ তখন দেশ আর দেশ তখন মহাদেশ হয়ে ওঠে।

প্রতিরাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে বিলে। চোখ বুজলেই দু-ভুরুর মাঝখানে একটা আলোর বিন্দু ফুটে ওঠে, সেটা ক্রমশ ঘোরে, বড় হয়, ফেটে পড়ে অসহ্য ঔজ্জ্বল্যে সর্বদেহ স্নান করিয়ে দেয়। ঘুম আসবার এইটেই বুঝি স্বাভাবিক রীতি, এই প্রথমটা মনে হয়। সমবয়সীদের জিগগেস করে, হ্যাঁ রে, ঘুমোবার সময় কপালের মধ্যে আলো দেখিস? ঘুম মানেই তো অন্ধকার, অন্ধকার দেখি। এ আরেক ভাবনা ধরল। কে এর উত্তর দেবে?

'নরেন, ঘুমিয়ে পড়বার আগে আলো দেখিস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তুমি কি করে জানলে?'

'যে করেই জানিনা কেন, দেখিস কিনা?'

'দেখি।'

উৎফুল্ল হলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর এমন চক্ষু তুই দেখবিনে?

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলে বিলে। একটা খেলা হচ্ছে ধ্যান ধ্যান খেলা। তার মানে, সবাই চোখ বুজে বসে পায়ের উপর পা মুড়ে, আর কৈলাসবাসী শিবের কথা ভাবে। কতক্ষণ পরে বিলের কাছে তা আর খেলা থাকে না, একটা অপূর্ব তন্ময়তায় তা সত্য হয়ে ওঠে। আসন ছেড়ে আর উঠতেই চায় না। সেদিন একটা সাপ এসেছে সামনে। 'সাপ—'বলে ভয় পেয়ে সঙ্গীরা সব ছুট দিলে, কিন্তু বিলে নির্বিচল! নাগ যার শিরোভূষণ সেই মহাদেব আকর্ষণেই এসেছে বুঝি এই বিষধর। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সাপ আবার চলে গেল এঁকে-বেঁকে।

'সবাই ছুটে পালাল, তুই উঠলি না যে?' বাবা জিগগেস করলেন।

'কে জানে! সাপ যে এসেছে শুনতেই পাইনি। আমি এক আনন্দসাগরে ডুবে ছিলাম।' চারপাশে তাকালো একবার বিলে। 'কিন্তু কই, সাপ আমাকে কিছু করল না তো!'

ছ-বছর বয়সে বাবা পাঠশালায় পাঠিয়েছে। কিন্তু ছেলের মুখে বকাটে বকুনির আভাস পেয়ে বিশ্বনাথ প্রমাদ গুণলেন। ছাড়িয়ে আনলেন ইস্কুল থেকে। দরকার নেই আর যার-তার সঙ্গে মিশে যা-তা কথা শিখে। বাড়িতে মাস্টার রাখলেন। একা-একা পড়বে কি, পাড়ার কটি ছেলে জোটালো। দল বেঁধে পড়তে না পেলে সুখ নেই! যা কিছু করো দল বেঁধে করো। দলের দলপতি হয়ে করো।

আরেক রকম খেলা ছিল বিলের, তার নাম 'রাজা-উজির' খেলা। বাড়ির পুজোর দালানের সব চেয়ে উঁচু যে সিঁড়ি সেইটে হচ্ছে সিংহাসন। আর, সন্দেহ কি, সেখানে বিলে ছাড়া আর কারু বসবার অধিকার নেই। তার মানে সব সময়ে বিলেই হচ্ছে রাজা, আর সকলে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-যন্ত্রী, সৈন্য-সেনাপতি।

সিংহাসনে বসে ফরমান জারি করছে, বিচার করছে, দণ্ড-মুণ্ডের ব্যবস্থা করছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটাচ্ছে, সন্ধি-শান্তি করছে। আর সবাই বিলের হুকুমে ছুটোছুটি করছে, খাটছে-পিটছে, বিলে সিংহাসনে দৃঢ়াসীন। সে দীন-দুনিয়ার মালিক, সমুদ্রাম্বরা পৃথিবীর সম্রাট।

অন্তত বাড়ির মাস্টারের কাছে তাই। যা একবার শোনে তাই অবিকল মুখস্থ বলে দেয় বিলে। সাত বছর বয়সে, প্রায় সমস্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তার ওষ্ঠাগ্রে। রামায়ণের অনেক কান্ড মহাভারতের অনেক পর্বও তাই। রামায়ণ গান করে এমন এক দল একবার এসেছিল বাড়িতে। গাইছে আপন মনে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিলে তাদের সংশোধন করলে। বই খুলে দেখালে তাদের ভুল হচ্ছে পাঠে। গাইয়ের দল তো অবাক্। কে এ শ্রুতিধর! কে এ স্মৃতিমান!

খেলতে-খেলতে পুজোর দালানের বারান্দা থেকে পড়ে গেল বিলে। পড়ে গেল নিচে, একটা পাথরের উপর। পড়ে কপাল ফেটে গেল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডান চোখের উপরে কপালে ছিল সেই কাটা দাগ।

ঠাকুর বললেন, 'ঐ আঘাতে ওর শক্তি বাধা পেয়েছে, নইলে ও জগৎসংসার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত!'

আমি নিজেকে, নিজের অহংকে চূর্ণবিচূর্ণ করব। নেব তোমার মধ্যে মহৎ আশ্রয়, পরম আশ্রয়।

'এই দ্যাখ্, দেখেছিস আমার হাতের রেখা!' সঙ্গীদের সামনে নিজের ডান হাত মেলে ধরে বিলে। 'বল তো এ রেখার মানে কি?

কি মানে কে জানে! সবাই তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

'এ রেখার মানে হচ্ছে আমি সন্নেসী হব।' কত বড় গর্বের কথা, চোখেমুখে দীপ্তি নিয়ে বলে। সন্নেসী হওয়া মানে যেন কত বড় দিগ্বিজয়ী হওয়া। হ্যাঁ, তুই সন্নেসী হবি? তাহলেই হয়েছে। সঙ্গীরা টিটকিরি দেয়। বাপ মস্ত এটর্নি, আছিস রাজার হালে, কুসুমের বিছানায়। ফুলের ঘায়ে যারা মূর্ছা যায়—

'ছাই জানিস। কিচ্ছু জানিস না।' গর্জে ওঠে বিলে। আমার ঠাকুরদা দুর্গা চরণ দত্ত সন্নেসী হয়েছিলেন। তোদের বংশে আছে কেউ সন্নেসী?

মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে রেখে দুর্গাচরণ চলে গেলেন বিবাগী হয়ে। সেই দুর্গাচরণের নাতি আমি। আমি বীরেশ্বর। আমি জগজ্জয় করব না তো কে করবে!

সব নিচু ক্লাসে ভর্তি করে দিল বাবা। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিন্তু পড়ায় বিশেষ মন নেই, গল্প-গোলমাল করতে পারলেই বেশি খুশি। পাশের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইছে, মাস্টার হঠাৎ পড়া জিজ্ঞেস করে বসল। সব চুপ। কারু মুখে রা নেই। পড়ার এক বর্ণও কানে ঢোকেনি। খালি আড্ডা, খালি গুলতানি। দাঁড়াও বেঞ্চির উপর।

'তুমি বলো—' বিলেকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করতে লাগল মাস্টার।

একটার পর একটা। যা-ই জিজ্ঞেস করে ঠিক ঠিক জবাব দেয় বিলে। কাঁটায়-

কাঁটায় এতটুকু ভুলচুক নেই, এদিক-ওদিকে নেই। মাস্টার নিজে হতভম্ব। শাস্তি দেওয়া আর হয়ে ওঠে না বোধ হয়। কি করে দেবে! বিলের দু-মুখো মন। এক মন দিয়ে গল্প করে আরেক মন দিয়ে পড়া শোনে।

তেমনি, এক মন দিয়ে কাজ করো, আরেক মন ঈশ্বরে ফেলে রাখো। এক মন দিয়ে অভিনয় করো, আরেক মন দিয়ে দেখ কেমন করছ তোমার অভিনয়।

'যাক, তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না।' মাস্টার হার মানলো।

না, দাঁড়াব। সঙ্গীদের সমদুঃখভাগী হব। ওরাই শুধু গল্প করেনি, আমিও করেছি। গোলমালের জন্যেই শোনেনি ওরা পড়া। সে গোলমালে আমারও অংশ আছে। সুতরাং আমিও ওদের দলে। এক বেঞ্চিতে। নিজের থেকেই উঠে দাঁড়াল বেঞ্চির উপর।

ঐ মাস্টারটি তবু ভালো, গোলমাল করলে বা পড়া না পারলে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিন্তু এ মাস্টার যা এসেছে, একেবারে কালাপাহাড়। কি দেখে বিলে হেসে উঠেছে তাই দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা। দোহাত্তা চড়-চাপড় চালাতে লাগল। বল্ আর হাস্‌বিনে। বল্ আর অবাধ্য হবিনে। কিছুতেই বলবে না বিলে। কিছুতেই ঘাড় নোয়াবে না। তখন চড়-চাপড় ছেড়ে মাস্টার কান ধরল। ধরে এমন জোরে টান মারল যে খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় মারমুখো হয়ে উঠল বিলে। তুমি মারবার কে! কেন তুমি আমার কান ধরবে? খবরদার, আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

গোলমাল শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছুটে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব বললে বিলে। বললে, এ ইস্কুলে আমি আর পড়ব না। বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির মুখে।

বিদ্যাসাগর তাকে কাছে টেনে নিলেন। নিয়ে গেলেন তাঁর আপিস-ঘরে। অমিয় বচনে শান্ত করলেন। বললেন, ইস্কুলে চলবে না আর শারীরিক শাসন, তারই ব্যবস্থা করছি।

ছেলের দশা দেখে ভুবনেশ্বরী তো অভিভূত। এ কি অমানুষের মত ব্যবহার! কাল থেকে তোকে আর পাঠাব না ইস্কুলে।

কে কাকে পাঠায়! পর দিন যেমন-কে-তেমন ইস্কুলে চলেছে বিলে। সদানন্দ, সুপ্রসন্ন। কালকের মারের কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে। যেমন রাতের অন্ধকার আকাশ থেকে মুছে ফেলেছে সূর্য। কানের পিঠে এখনো দগদগে ঘা, কিন্তু মনের মধ্যে তিলমাত্র জ্বালা নেই। গত দিবসের দুঃখের কথা নতুন দিনের প্রভাতে কে আর মনে রাখে।

শোন্, সন্নেসী হবার কি মজা! মুক্ত আনন্দে সহপাঠীদের কাছে গল্প করে বিলে। স্বপ্নের সোনা-মাখানো বানানো গল্প। হিমালয় দেখেছিস? তারই ওপারে কৈলাস। বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর গুহা আর গহন জঙ্গলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর মহাদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যদি মহাদেবকে দেখতে চাস তবে আগে চেলা হতে হবে সাধুদের। কি করে হবি?

আগে সাধুদের পায়ে খুব মাথা খুঁড়তে হবে। তাতে যদি ওদের দয়া হয় তবে ওরা পরীক্ষা নেবে। ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। ইস্কুলের পড়া বলা তো তার কাছে জল। কি রকম জানিস? প্রত্যেককে একখানি বাঁশ দেবে সাধুরা। আর সেই বাঁশের উপর শুয়ে ঘুমুতে হবে সারা রাত। পারবি? নট-নড়নচড়ন। পড়ে গেলেই ফেল। কিন্তু যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস, তা হলেই সন্নেসী। প্রথম নম্বরের চেলা। আর, একবার চেলা হতে পারলেই কৈলাসে শিবদর্শন। কি রে, যাবি একবার হিমালয়?

হিমালয়ের কোলে বিরাট এক অশ্বত্থ গাছের নিচে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে বসেছেন। সঙ্গে সহচর অখণ্ডানন্দ স্বামী, পূর্ব নাম গঙ্গাধর গাঙ্গুলি। ধ্যানের পর বলছেন বিবেকানন্দ: 'গঙ্গাধর, জীবনের একটি অমূল্য মুহূর্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সমস্ত সমস্যার উত্তর পেয়ে গেলাম।'

কি উত্তর জানতে চাইল না গঙ্গাধর। পরে স্বামীজির ডায়রি খুলে দেখলে। দেখলে লেখা আছে: যা ক্ষুদ্র পরমাণু তাই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। দুইই এক। আর, সবই আমার এই দেহের মধ্যে, তৃণখণ্ড থেকে সূর্যপিণ্ড। আমি ক্ষুদ্র নই খর্ব নই অল্প নই অকিঞ্চন নই—

এইই ভারতবর্ষ। ইউরোপ-আমেরিকা পরমাণুর মধ্যে ধ্বংসের মারণাস্ত্র দেখে, ভারতবর্ষ দেখে ছন্দোময় বিশ্বসংসার।

৩

শুধু কল্পনা নয়, বিজ্ঞানেরও চর্চা-চেষ্টা করে। একটা কিছু কল্পনা করে নিয়েই তো বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আজ যা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে, গত কাল তাই ছিল নিছক কল্পনা। কলকাতায় নতুন গ্যাসের আলো বসেছে। তাই বিলেরও চাই গ্যাস বানানো। কে বললে হবে না? পুরোনো দস্তার নল নিয়ে আয় কতগুলো, এনে দে একটা মেটে হাঁড়ি আর এক গোছা খড়। চোখের সামনে জ্যান্ত গ্যাস বানিয়ে দেব।

বার-বাড়ির উঠোনে গ্যাস-ঘর বসিয়েছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে খড়। নল দিয়ে ধোঁয়া যাচ্ছে উপরে। বিলে মহা খুশি। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলছে বুক ফুলিয়ে, দ্যাখ, এরই জোরে সারা শহরের আলো জ্বলছে। যদি কারখানা বন্ধ করে দি, দিগ্‌বিদিক অন্ধকার। কতক্ষণ পরেই বলছে আবার নিজের মনে, নাঃ, এ কিচ্ছু হচ্ছে না। সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলছে, আরো আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা, গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে—

পুরোনো কল-কব্জা টিন-কেনেস্তারা দিয়ে রেলগাড়ী বানাচ্ছে। গ্যাস দিয়ে শুধু আলো জ্বলছে না, গাড়ি চলছে। স্তব্ধতার গাড়ি চলছে চৈতন্যের আগুনে।

নতুন সোডা-লেমনেড এসেছে কলকাতায়। তবে তারও একটা কারখানা খুলে

ফেল। আঙ্গুলের একটা চাপ দিলে অমনি ঠাণ্ডা জল ভস্ করে উঠল। তাই তো চাই। কখন কোথায় একটা কল টিপে দেব অমনি বন্দী নিজীব জল বেগোচ্ছল হয়ে উঠবে।

সেই মন্ত্র নিয়েই তো এসেছি। মন্তরকে ত্বরান্বিত করব। নিশ্চেষ্টকে উদ্যমময়। যা দেখছ মৃত তাই উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

আমি সেনাপতি। ছটি সৈন্য আমার অনুচর। তাদের নামগুলি শুনে রাখো, টুকে রাখো। তারা হচ্ছে কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে।

পদার্থ কি? ঈশ্বর কে? সৃষ্টি কবে? স্বর্গ কোথায়? জন্ম কেন? মৃত্যু কেমন করে? মোট কথা, ঘাড় কাত করে মেনে নেব না কিছুই। স্বচক্ষে প্রতক্ষ্য করব। প্রশ্নের সদুত্তর নেব। ভাবের হাটে ফিরি করব না, বুদ্ধির দোকানে যাচাই করে জিনিস কিনব। অনুমানের ধার ধারব না, প্রমাণের মান রাখব।

পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে! তার ডালে চেপে দোল খায় বিলে। বসে-বসে নয়, পায়ের সঙ্গে ডাল জড়িয়ে, মাথা নিচু করে। গেল, গেল বুঝি গাছটা। বাড়ির বুড়ো মালিক হাঁ-হাঁ করে ওঠে। গাছ না যাক, ছেলেটা যাবে। পড়বে মুখ থুবড়ে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই বিলের। ডানপিঠের মরণ গাছের আগায়।

ছেলেটাকে কি করে নিবৃত্ত করা যায় বুদ্ধি আঁচলো বুড়ো। মুখ গম্ভীর করে একদিন বললে, 'ও গাছটায় উঠিস নে।'

'কি হয় উঠলে?' সাফ প্রশ্ন করে বিলে।

'ও গাছে ব্রহ্মদাত্যি আছে।'

'তাই নাকি?' কি রকম দেখতে ব্রহ্মদাত্যি?

'ওরে বাবাঃ ভয়ঙ্কর দেখতে।' বাড়ির মালিক চোখ বড় করলে। 'নিশুতি রাতে শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'তাই নাকি? তবে রাত করে আসতে হবে একদিন। গাছে চড়ে ব্রহ্মদাত্যি দেখব।'

'কি সর্বনাশ!' বাড়ির মালিক মাথায় হাত দিলে। 'দিনের বেলায়ই ফেলে দেয় গাছ থেকে। রাতে চড়লে তো তার কথাই নেই। ঘাড় মটকে দেবে।'

ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু রাত করেই এসেছে আজ বিলে। বড় ইচ্ছে ব্রহ্মদাত্যির সঙ্গে একটু মোলাকাত হয়। শতহস্তে বারণ করতে লাগল সঙ্গীরা। নিঘ্ঘাত মারা যাবি। পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াবি বেঘোরে।

'দিনের বেলা কিছু করতে পারল না, দেখি না এবার তার রাতের কেরামতি।' বিলে দিব্যি গাছে চড়ে বসল। আর সব ছেলেরা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ওরে কি হল বিলের? পরদিন পরস্পরের মুখে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ছেলেরা। ওরে, ভালো আছে তো! ঘাড় সিধে আছে?

মেরুদণ্ড সিধে আছে। সুস্থ আছি বুদ্ধির খররৌদ্রে। সেখানে কুসংস্কারের কুয়াশা নেই।

লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে? বলে কিনা, বইয়ে লেখা আছে। বইয়ে লেখা থাকলেই মানতে হবে নির্বিবাদে? কখনো না। নিজে বাজিয়ে দেখব, খাঁটি কি মেকি নিজে নেব যাচাই করে। সত্য কি এতই সোজা? আমেরিকা আছে এ বললেই বিশ্বাস করব? যেতে হবে আমেরিকা। সংশয়ের সমুদ্র পেরিয়ে আবিষ্কার করব মহাদেশ।

রান্নায় ওস্তাদ হয়েছে বিলে। নিয়ে আয় যার যা সম্বল, চাল, ডাল, তেল, নুন, আমি নবীন স্বাদের ভোজ্য তৈরি করে দেব। গোলমরিচের গুঁড়ো একটু বেশি হবে তাতে। ঝাল হবে। বেশ তো, পরের মুখে ঝাল খাবি না, নিজের মুখেই ঝাল খাবি।

শুধু বনভোজন নয়, থিয়েটার পার্টি খুলল বিলে। হল-ঘরে স্টেজ বাঁধল। এবার লেগে যা পার্ট মুখস্থ করতে। কেষ্ট-বিষ্টু সাজতে। কিন্তু হায়, বেশি দিন নয়, তার কাকা এসে ভেঙে দিলে স্টেজ। যাক গে স্টেজ, কুস্তির আখড়া করব। পলোয়ান হব। প্রতিকূলকে পরাভূত করব। উঠোনের এক পাশে খুলব ব্যায়ামাগার। লাভের মধ্যে হল এই, এক খুড়তুতো ভাইয়ের হাত ভেঙে গেল। খুড়ো এসে ভেঙে দিল আড্ডাখানা। ব্যায়ামের সাজ-সরঞ্জাম দিল দূর করে। যাক গে বাড়ির আখড়া, পাড়ায় নবগোপাল মিত্তিরদের যে আখড়া আছে তাতে ঢুকব সকলে।

আমাদের সকলকে বীর-বলবান হতে হবে। রুক্ষ মাটি খুঁড়ে আনতে হবে পানীয়ের জল। শুকনো কাঠ থেকে বার করতে হবে নিহিত আগুন। অন্তর-গুহায় ঘুমিয়ে আছে যে সিংহ, জাগাতে হবে সে কেশরীকে। শুধু মস্তিষ্কে বলবান হব না, হৃদয়ে বলবান হব না—শরীরেও বলবান হব।

'তোমরা আমাদের একটু সাহায্য করবে?' নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েই পাড়ে দেখতে পেল দুজন গোরা সৈন্য! হাতে ছোট লাঠি, তাই ঘুরোতে-ঘুরোতে হাওয়া খাচ্ছে। একটুও ভয় পেলনা বিলে। সামনে এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগগেস করলে স্পষ্ট।

কে এই অকুতোভয় ছেলে। আশ্চর্য দীপ্তি চোখে-মুখে। সৈন্য দুজন অবাক হয়ে গেল। একে সাহেব তায় সৈন্য—এতটুকু ভড়কাল না! আর, ঐ তো স্কুলে যাওয়া ছোট একটা ছেলে, স্পর্ধা দেখেছ?

কি হয়েছে বলো তো! উপেক্ষা করে সরে যেতে পারল না। সৈন্য দুজন দাঁড়াল নিষ্ক্রিয়ের মত।

বন্ধুদের নিয়ে যাচ্ছিলুম মেটিয়াবুরুজ, নবাবের চিড়িয়াখানা দেখতে। নৌকোয় যাওয়া-আসা। ফেরবার পথে একটি বন্ধুর অসুখ হয়ে পড়েছে। বমি করে ফেলেছে। মাঝিরা বলছে আমাদের পরিষ্কার করে দিতে। আমরা বলছি দ্বিগুণ ভাড়া দিচ্ছি, আমাদের রেহাই দাও। আমাদের কথায় কান দিচ্ছে না। এখন পাড়ে এসে বলছে, নামতে দেবেনা কাউকে। মার-ধোরের ভয় দেখাচ্ছে। কি জুলুম বলো তো। আমি লাফিয়ে পালিয়ে এসেছি। বন্ধুদের এখন উদ্ধার

করা চাই। তোমরা একটু আসবে এদিকে?

দুর্ধর্ষ সৈন্যের কর্কশ হাতের মধ্যে নিজের ছোট হাতটি গুঁজে দিল বিলে। সাধ্য নেই সে স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। চলো, দেখি, কোথায় তোমার নৌকো।

কি সর্বনাশ! ওরে, দু-দুটো সৈন্য নিয়ে এসেছে। কি হবে! আর এগিয়ো না বাবারা, ছেড়ে দিচ্ছি, এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

অবাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিল ছেলেগুলোকে। মুহূর্তের ইঙ্গিতে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল।

থিয়েটারে যাচ্ছিল সৈন্য দুজন। বিলেকে জিগগেস করলে, যাবে আমাদের সঙ্গে? না, ধন্যবাদ। স্নিগ্ধ হাস্যে বিদায় নিল বিলে। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিললে।

গঙ্গার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল দেখে আসি। কি করে যাবি? ছাড় লাগবে যে। বড় সাহেবের দস্তখতী ছাড়।

কেন, চাইলে দেবে না আমাদের?

ওরে বাবা, কে দাঁড়াবে ঐ লালমুখো জাঁদরেলের কাছে? হুমকে উঠলে হাত-পা সেঁধিয়ে যাবে পেটের মধ্যে। আদার বেপারীর জাহাজের খোঁজে দরকার নেই।

না, পেছপা হব না। দেখি চেষ্টা করে। চেষ্টার অসাধ্য কি।

নিজের হাতে একটা দরখাস্ত লিখল বিলে। চৌরঙ্গিতে আপিস। ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ঠিক গিয়ে হাজির হল দরজায়। তেতলায় সাহেবের দপ্তর। বিলে লক্ষ্য করে দেখল সব লোক ঐ তেতলায় গিয়ে জড় হচ্ছে। আমিও সোজা উঠে যাব তেতলায়। পেশ করব দরখাস্ত। যদি কিছু প্রশ্ন করে, ঠিক-ঠিক জবাব দেব। আমি তো শুধু নিজের জন্যে চাইছি না, বন্ধুদের জন্যেও চাইছি।

কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপেই উদ্দণ্ড বাধা। চাপরাশ পরা খোট্টাই দারোয়ান। তুমি কে হে বাপু? নেংটি ইঁদুর হয়ে হাতি চড়বার সখ! দেখছ না যারা হোমরা-চোমরা, সমাজের কেষ্ট-বিষ্টু, তারাই শুধু উপরে যাচ্ছে! তুমি কোথাকার পুঁচকে ছেলে, তোমার আস্পর্ধাকে বলিহারি।

ফিরিয়ে দিল বিলেকে। তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ফেরবার পাত্র আর যেই হোক, বিলে নয়। বলে না পারি কৌশলে আদায় করব।

তাকিয়ে দেখল, বাড়ির পিছন দিকে লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সন্দেহ কি, ও-পথে চাকর-বাকররা যাতায়াত করে। সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে কেমন হয়। ধরা পড়লে মার না দেয়! চোর না ভাবে! কুছ পরোয়া নাই। ছাড়পত্র আদায় করতে যাচ্ছি। যে ভাবেই হোক, আমার আদায় করা নিয়ে কথা।

ঠাকুর বলেন, অনুরক্ত করে আদায় করতে না পারিস বিরক্ত করে আদায় করে নে। সেধে-কেঁদে না পারিস ধরে-বেঁধে উশুল কর তোর হিস্‌সা।

তেতলায় উঠে গেল সটান। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল আলগোছে। টেবিলের

উপর ঝুঁকে পড়ে একমনে সই করে চলেছে সাহেব। মুখ তুলে তাকাবারও সময় নেই। একের পর এক, আর সকলের মত, ছাড়পত্র সই করিয়ে নিল বিলে।

পলকের জন্যে চোখ তুলল বুঝি সাহেব। আর কি, আদায় করে নিয়েছি। তুমিও নাও এবার আমার চকিতদীপ্ত চক্ষুর প্রসন্নতা।

সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামল এবার বুক ফুলিয়ে। এ কি তুমি কি করে গিয়েছিলে? দারোয়ান অবাক হয়ে বললে।

বিলে হাসল গর্বভরে। বললে, 'আমি জাদু জানি।'

কি মনে হয় আমাকে দেখে? আমি বাজিকর। মড়ার হাড়ে ভেল্‌কি দেখাতে পারি। শুকনো কাঠে পারি ফুল ধরাতে, পাথর ভেদ করে আনতে পারি দুগ্ধধারা। এই যে দেখছ মরা নদী এতে আনতে পারি দুর্দান্ত জলোচ্ছ্বাস। যা বাঁকা তাকে সোজা করতে পারি। জড়ত্বের মধ্যে আনতে পারি গতিদ্যুতি। যা জীবন্মৃত তাকে করতে পারি প্রাণচঞ্চল।

৪

বিপদে আমাকে রক্ষা করো এ আমার প্রার্থনা নয়। বিপদে আমি যেন নির্ভয়-নির্বিচল থাকতে পারি এই আমার প্রতিশ্রুতি।

নবগোপাল মিত্তিরের আখড়ায় ডন-বৈঠক করে বিলে। সঙ্গে অনুবর্তী বন্ধুরা। এত প্রতাপ-উত্তাপ বিলের, তারই উপর আখড়ার ভার ছেড়ে দিলেন নবগোপাল। শুধু ডন-বৈঠক কি, ট্রাপিজ খাটাও। দোলনায় দুলতে দুলতে কসরৎ দেখাও। বন্ধুরা ধরলে এসে বিলেকে। শুধু স্থলে-জলে নয় অন্তরীক্ষেও বলশালী হও। সেই ট্রাপিজ খাটাতেই সেদিন মহা বিপদ উপস্থিত। গুরুভার ফ্রেম কিছুতেই খাড়া করতে পারছেনা ছেলেরা। খানিকটা খাড়া করে তো পায়ের দিকের গর্ত ফসকে যায়—আগে গর্তে পায়া ঢোকাতে চাও তো সাধ্য কি ফ্রেমটাকে উপরে তোলা। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে ছেলেদের কাণ্ড দেখবার জন্যে। অথচ কেউ এগিয়ে আসছেনা সাহায্যে। এ যেন এক বিনি পয়সার সার্কাস।

লক্ষ্য করে দেখল বিলে, ভিড়ের মধ্যে একজন জোয়ান ইংরেজ দাঁড়িয়ে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে জাহাজের লোক। সরাসরি তার কাছে এসে বিলে জিগগেস করলে, তুমি একটু হাত লাগাবে?

ইংরেজ নৌ-কর্মচারী এক কথায় রাজি হয়ে গেল। পরের উপকার করা মানেই তো ঈশ্বরের উপাসনা করা।

এবার দড়ি বেঁধে টেনে তোলো এই দারু-দৈত্যকে। পা দুটো সাহেব গর্তে ঢোকাবে, তোমার মাথাটা টেনে তোলো। হেঁইয়ো হো, হেঁইয়ো হেঁা—

দড়ি ছিঁড়ে গেল সহসা। দারু-দৈত্য ছিটকে পড়ল ভূতলে। আর পড়বি

তো পড়, একেবারে সাহেবের মাথার উপর।

সর্বনাশ হয়েছে। সাহেবের মাথায় কাঠ পড়েছে না ছেলেগুলোর মাথায় বাজ পড়েছে। যার যে দিকে চোখ যায় ছুটে পালাল সবাই। এখুনি পুলিশ আসবে, কে জানে চামড়া ছুলে নিয়ে ডুগডুগি বানিয়ে ছাড়বে। চাচা আপন বাঁচা।

কিন্তু বিলে অচঞ্চল। আহত বন্ধুর জন্যে মন চঞ্চল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান থেকে ভ্রষ্ট হল না। আহতকে পরিত্যাগ করে নিজেকে নিরাপদ করা কাপুরুষের কাজ। আহতকে নিরাপদ করাই পরমধর্ম। কোনো গুরুর কাছ থেকে পাঠ নেয়নি বিলে, অন্তরে যে একজন সদাজাগ্রত গুরু আছেন তিনিই বলে দিলেন।

নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল বিলে। নিজের হাতে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ। চোখে মুখে জল ছিটোতে লাগল। কোত্থেকে একটা পাখা চেয়ে এনে বসল হাওয়া করতে। জ্ঞান হয়েছে সাহেবের। চোখ চেয়েছে।

উঠোনা, উঠোনা, ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি। এখান থেকে তোমাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি সামনের ইস্কুলে। সেখানে ব্যবস্থা করেছি তোমার বিছানার। ডাক্তার তোমাকে ছুটি দিলেই চলে যেও আস্তানায়।

সাত দিন লাগল সাহেবের ভালো হতে। কে এক বিদেশী নাবিক, সাত দিন অক্লান্ত তার সেবা করল বিলে। সুস্থ করে তুলল। প্রসন্নমুখে সাহেব বললে, এবার আমি বাড়ি যাই।

দাঁড়াও, তোমার জন্যে ছোট্ট এই একটি টাকার থলে সংগ্রহ করেছি।

বলো কি? বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল সাহেব।

কত না জানি ক্ষতি হয়েছে তোমার এত দিনে। আমাদের জন্যে কত তুমি কষ্ট পেলে। আমাদের ভালবাসা, আমাদের কৃতজ্ঞতা কি করে তোমাকে জানাতে পারি বলো। কণা-কণা মধু সংগ্রহ করে রচনা করেছি এই মধুচক্র। তুমি তোমার করপুট ভরে নাও।

প্রাণপুট ভরে নিয়েছি। বন্ধু, তুমি কে?

টাকার থলে গ্রহণ করল সাহেব। অনেক দূর সমুদ্রে তাকে পাড়ি দিতে হবে, ধূসর দিগন্তরেখা অতিক্রম করে, জানেনা কোথায় তার বন্দর, কোথায় তার যাত্রা শেষ। কিন্তু আজ এক পরম পাথেয় সে লাভ করল জীবনে। যাত্রা অনির্দেশ্য হোক, পাথেয়ও তার অক্ষয়। সে ভারতবর্ষের একটি বালকের ভালোবাসা।

সেবা আর প্রেম। এতেই আমি সব্যসাচী।

জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। শিখিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দয়া করবি, তোর স্পর্ধা কি! কাকে দয়া করবি? যাকে দয়া করবি ভাবছিস সে তো শুধু জীব নয়, সে শিব। সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সে কি ছোট, সে কি অকিঞ্চন যে তাকে দয়া করবি? সে ঈশ্বরের প্রতিভাস। তাকে তোর সেবা করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসায় স্নান করিয়ে দিতে হবে। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের আরাধনা। মানুষকে ছোঁয়াই ঈশ্বরকে ছোঁয়া। আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।

বাইরে কোথাও নাই।

মায়ের সঙ্গে রায়পুর যাচ্ছে বিলে। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর। বাবা আগেই গিয়েছেন। এখন মাকে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে বিলের উপর। কি রে পারবি নে ?

সবে থার্ড ক্লাসে উঠেছে তখন বিলে। তেরো-চৌদ্দ বছর মোটে বয়স। ঘাড় হেলিয়ে বললে, খুব পারব। অনায়াসে। আমি থার্ড ক্লাশের ছাত্র বটে কিন্তু একেবারে থ র্ড-ক্লাশ নই।

কি কঠিন রাস্তা তখন রায়পুরের। নাগপুর পর্যন্ত ট্রেন হয়েছে, তাও এলাহাবাদ আর জব্বলপুর হয়ে—তারপর গরুর গাড়ি। ঢালা, টানা গরুর গাড়ি। প্রায় পনেরো দিনের রাস্তা। যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, উঁচু-উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে। অজানা বিপদের মুখ দেখে-দেখে। আসুক না চোখের সামনে, বিপদকে বিলে কানাকড়িরও কেয়ার করে না।

একটা গাড়িতে বিলে একেবারে একা। আরেকটাতে মা আর ভাইয়েরা। গাড়ি চলেছে তো চলেছে। চলেছে বিন্ধ্যপর্বতের রহস্যরাজ্যে। এই সেই বিন্ধ্য যে সূর্যকে প্রতিরোধ করবার জন্যে মাথা তুলেছিল ! গুরু অগস্ত্য এল দেখা করতে। গুরুকে প্রণাম করবার জন্যে নত হল বিন্ধ্যাচল। গুরু বললে, যতক্ষণ না ফিরি থাকো এমনি ভাবে। তথাস্তু। অগস্ত্য আর ফিরল না, বিন্ধ্যও রইল তেমনি নত শিরে।

এই সেই হেঁটমুণ্ড পাহাড়। তবু, চোখ যায় না এত উঁচু ! আর গা-ভরা কত বনশোভা। কঠিন যেন কোমলের নামাবলী পরে রয়েছে। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখি। কে এসব এঁকে রেখেছে, কার জন্য ! কে এসে দেখবে এই ফুল, কে এসে শুনবে এই কাকলী ! আর, যখন এসে দেখবে ফুলটিই দেখবে ? যখন এসে শুনবে, কূজনটিই শুনবে ? দেখবে না আর কারু আনন্দচক্ষু, শুনবে না আর কারু গভীরগুঞ্জন ? একবারও ভাববে না কে এসব করেছে ? কে এসব মেলে ধরেছে চোখের সামনে ?

হঠাৎ একটা মৌচাকের উপর চোখ পড়ল। কি আশ্চর্য, পাহাড়ের প্রায় চূড়া থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত বিরাট একটা ফাটল, আর তারই গা জুড়ে প্রকাণ্ড এই মৌচাক। অজানা পাহাড়ে কি করে মধু-র সংবাদ পেল এই মক্ষিকারা ! কিসের আকর্ষণে এসে পড়েছে দলে-দলে ! মক্ষিকার অক্ষৌহিণী। প্রত্যেকের শ্রমে প্রত্যেকের আহরণে গড়ে তুলেছে এই মধুসৌধ ! তিল-তিল শ্রম, কণা-কণা আহরণ ! কত শক্তি, কত সংগ্রাম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা ! অনন্তের ভাবে ডুবে গেল বিলে।

রায়পুরে ইস্কুল নেই, কোথায় তবে পড়ি এবার ? ভালোই হল, বাবা পড়াতে বসলেন ! নিজের চিন্তাকে উস্কে দেবার জন্যে পড়ানো, পরের চিন্তাকে চাপিয়ে দেবার জন্যে নয়। তেমনি করেই পড়াতে লাগলেন বিশ্বনাথ। ভালোই হল, বিদ্যেবুদ্ধি কতদূর হল কে জানে একটি জাগ্রত মনের সংস্পর্শে এসে দীপ্ত

বুদ্ধির স্বাদ পেলাম !

আচ্ছা, আমার এমন কেন হয় বলতে পারো ? এক জায়গায় গিয়েছি, নতুন জায়গা, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনে হয়েছে, এ আমার চেনা, কোন দিন যেন এসেছিলাম এখানে ! ভেবে আর কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। এ যেন সেই বাড়ি সেই গাছপালা, সেদিনও যেন এমনি ধরনেরই হয়েছিল কথাবার্তা ! কিন্তু কবে বলো তো ? এখানে আবার কবে এসেছিলাম এর আগে !

এপারের বাতাসে ওপার থেকে চেনা দিনের গন্ধ ভেসে আসছে।

দুবছর পরে ফিরলেন বিশ্বনাথ। তখন বিলেকে ইস্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে মুশকিল ! তিন বছরের পড়া এক বছরে সেরে দিল বিলে। তখন আবার নিলে তাকে ইস্কুলে। প্রথম বিভাগে পাশ করলে এণ্ট্রান্স। সারা ইস্কুলে সেই একমাত্র প্রথম বিভাগ।

কি নিবি রে বিলে ? খুশি হয়ে বাবা দিতে চাইলেন পুরস্কার।

বিলে বললে, আপনার যা ইচ্ছে।

বাবা একটি ঘড়ি দিলেন। সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মেলাও। জীবনের চলার ছন্দকে মেলাও তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে।

ইস্কুল ডিঙিয়ে ঢুকল এসে কলেজে। প্রথমে প্রেসিডেন্সি, এক বছর পরে জেনারেল এসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে বা স্কটিশ চার্চ কলেজে। অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি ইংরিজি পড়াচ্ছেন। পড়াচ্ছেন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে কবির যে তন্ময়তা এসেছিল আর তন্ময়তা থেকে যে ভাবাবেশ, তারই বর্ণনা করেছেন কবি। ছেলেরা কিছুই বুঝছে না। কাকেই বা বলে তন্ময়তা, কাকেই বা ভাবাবেশ !

ঐ অবস্থা আসে ধ্যানমগ্নতা থেকে। আর তেমনি ধ্যানে আবিষ্ট হতে হলে চাই মনের ঐকান্তিক বিশুদ্ধি। তেমনি দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না আজকাল। ছেলেদের বোঝাচ্ছেন হেস্টি-সাহেব। একমাত্র একজনকে জানি, একজনকে দেখেছি, যিনি পেঁচেছেন সেইখানে। সেই অত্যুজ্জ্বল পবিত্রতায়। তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।

কে রামকৃষ্ণ ? কোথায় দক্ষিণেশ্বর ?

৫

ইস্কুলে থাকতে একবার বক্তৃতা দিয়েছিল বিলে। পুরোনো মাস্টার চলে যাচ্ছে বিদায় নিয়ে, সেই উপলক্ষে সভা। সভাপতি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ নেতা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, বানান পালটে শুরেন্দ্রনাথ। এখন তাঁর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলো কেউ ছেলেরা ! ছেলেরা লজ্জায় মরে গেল, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অথচ ছেলেদের তরফ থেকে কেউ না

বললেও ভালো দেখায় না। তাদের শিক্ষক চলে যাচ্ছেন চিরদিনের মত, এতটুকু কৃতজ্ঞতাও কি তাদের নেই ?

তুই বল। তুই বল। ঠেলাঠেলি করতে লাগল এ ওকে। কিছু লিখে এনে বলতে বললে বরং হত! এ একেবারে এক্ষুণি-এক্ষুণি বলা, বিন্দুমাত্র তৈরি হবার সময় না পেয়ে। তাও কিনা মাতৃভাষায় নয় রাজভাষায়। বাঙলায় নয় ইংরিজিতে।

কোনো ভয় নেই। উঠে দাঁড়াল বিলে। সুরু করল বক্তৃতা। কি উদাত্ত গম্ভীর সে কিশোর কণ্ঠস্বর। দাঁড়াবার কি সে তেজ ঋজু ভঙ্গি। কি সে সাহস-সহজ ভাষা।

প্রায় আধ ঘণ্টা বললে একটানা। প্রথমে শিক্ষকের গুণবর্ণনা করলে, পরে বললে নিজেদের বিচ্ছেদদুঃখের কথা। বক্তৃতার মধ্যেও একটি গঠনশিল্প আছে। যোলো বছরের ছেলে দেখালে সে কৌশলকলা।

মুগ্ধ হলেন সুরেন্দ্রনাথ। মুগ্ধ হল শ্রোতৃমণ্ডলী। সবাই দেখলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের রূপকার দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।

বিশ্বনাথ দত্ত উদার হাতে খরচ করেন টাকা-পয়সা। কে একজন আত্মীয় শিখিয়ে দিল বিলেকে, এমনি করে যদি টাকা ওড়ান, কি রেখে যাবে তোদের জন্যে ? যা, গিয়ে জিজ্ঞেস কর বাবাকে।

তাই করল বিলে। কি রেখে যাচ্ছেন আমাদের জন্যে ?

বিশ্বনাথ দত্ত একবার তাকালেন পুত্রের দিকে। বললেন, 'আরশিতে নিজের চেহারা দ্যাখ্। তাহলেই বুঝবি কী তোকে দিয়ে গেলাম।'

দেয়ালে ঝুলছে লম্বা আয়না। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েও দেখল না বিলে। বুঝতে পেরেছে সহজে, বাবা কি বলতে চান। বলতে চান, দিয়ে গেলাম তোকে বলদৃপ্ত ভঙ্গি সাহসবিস্তৃত বুক, দৃঢ়োন্নত মেরুদণ্ড। দিয়ে গেলাম তোকে পাহাড়-টলানো শক্তি, আঘাতবিজয়ী নিষ্ঠা, পৃথিবী-জাগানো ভালোবাসা। আর চেয়ে দ্যাখ তোর চোখ দুটির দিকে। একেই বলে পদ্মপলাশলোচন। তুই পদ্মপলাশলোচন হয়ে অখিললোকলোচনকে দেখবি।

ঠাকুর বললেন, 'নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার।'

আবার বললেন, 'ও বড় ফুটো-ওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। আর সকলে কাঠিবাটা, নরেন রাঙাচক্ষু রুই।'

শুধুই কি বাবার জন্যে ? মা ছাড়া কি কোনো ছেলে বড় হতে পেরেছে ? চন্দ্রমণির জন্যে রামকৃষ্ণ, ভুবনেশ্বরীর জন্যে নরেন্দ্রনাথ।

রাগের মাথায় বিলে মাকে কি একটা কটু কথা বলে ফেলেছিল। কথাটা কানে উঠল বিশ্বনাথের। অন্য কোনো শাসন করলেন না বিশ্বনাথ, ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন, নরেনবাবু এই কটু বাক্য বলেছেন তাঁর মাকে। তোমরা, বন্ধুরা, যারা আসো নরেনের কাছে, দেখে যাও নরেনের কীর্তি।

মর্মদাহ আর কাকে বলে! লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না বিলে। মাগো, তুমি মধুময়ী, জীবনে আর কটু বলব না তোমাকে।

তখন বিলে অনেক ছোট, মার কাছে একদিন কেঁদে পড়ল, মাগো, হনুমান তো এখনো এলো না—

ভুবনেশ্বরী প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'সে কি কথা? হনুমান আসবে কী!'

'বা, এই যে বললেন কথকঠাকুর, কলাবাগানে খোঁজ গে, দেখা পাবি। কত খুঁজলুম, কত বসে রইলুম, কই এলো না তো—'

ব্যাপারটা বুঝে নিলেন ভুবনেশ্বরী! সারা রামায়ণে হনুমানের মত আর কাউকে অত ভালো লাগে না বিলের। শুধু বীর নয় মহাবীর হনুমান। সাগর লাফালো লঙ্কা পোড়ালো সূর্যকে বগলদাবা করল, গন্ধমাদন পাহাড় আনলে মাথায় করে। চিরব্রহ্মচারী, মৃত্যুহীন হনুমান। কথকতা শুনতে গিয়েছে বিলে, কথায়-কথায় হনুমানের প্রসঙ্গ এসেছে। বিলে কান খাড়া করে রইল। হনুমানকে নিয়ে রঙ্গরসের ঢেউ তুললে কথকঠাকুর। কত বা তার অঙ্গভঙ্গি। যাও না ঐ সামনের কলাবাগানে, দেখতে পাবে মুঠোয় চেপে কলা খাচ্ছে হনুমান। কথক-ঠাকুরের কথা, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করল বিলে। বাড়ির পাশে বাগান, সেখানে এক কলাগাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। কখন না জানি আসবে সেই বায়ুনন্দন। কিন্তু বৃথাই বসে থাকা। এলো না।

সেই দুঃখই মার কাছে নিবেদন করছে বিলে। মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আজ হয়তো রামের কাজে আর কোথাও গিয়েছে, আরেকদিন আসবে। তুমি বসে আছ, আর সে আসবে না?'

কোথায় সেই হনুমান? সেই বলকান্তিমান মহাতেজা?

'দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালিয়ে।' সিংহবিক্রমে হুংকার দিলেন বিবেকানন্দ: 'দুর্বল বাঙ্গালী জাতের সামনে এই মহাবীর্যের আদর্শ তুলে ধর্। দেহে বল নেই, হৃদয়ে তেজ নেই—কি হবে এইসব জড়পিণ্ডগুলো দিয়ে ঘরে-ঘরে মহাবীরের পূজা লাগা।'

বি-এ পরীক্ষার মোটে একমাস বাকি, গ্রীন-এর "ইংরেজ জাতির ইতিহাসের" এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি। পড়বে কি, একখানা বইও বিলের নেই। কষ্টেসৃষ্টে একখানা যোগাড় করল এক সহপাঠীর থেকে অনেক চেয়ে-চিন্তে। মাত্র তিন দিনের কড়ার। তাই সই। তিন দিনেই ঘুরে আসব তিন-ভুবন। দরজা বন্ধ করল বিলে। আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করবার আগে বেরুচ্ছিনা ঘর থেকে। শুধু চোখের সামনে তিনবার সূর্যকে উঠতে দেখব আকাশে আর তিনবার নামতে দেখব অস্তাচলে। এর মধ্যে দু-চোখের পাতা আর এক করব না।

কী সুন্দর হয়ে উঠছে দেখতে। আনন্দসুন্দর নরেন্দ্রনাথ। সবল-সুঠাম দেহ, বিশাল দুটি চোখ, শানিত দীপ্তির সঙ্গে ভাবভোর স্নিগ্ধতা। বীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের কোলাকুলি। যেন একটি নির্মল-নির্ধূম শিখা জ্বলছে ব্রহ্মচর্যের।

তারপর কী সুন্দর গান গায় বিলে। ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর চেলা বেণীগুপ্ত, সেই তার গানের গুরু। তারপর মৃদঙ্গ বাজায়, সেতার বাজায়, তানপুরা তো আছেই। শুধু তাই? নাচে। যেন মহাকাল মহাদেবের নৃত্য। তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

বাড়িতে বড় গোলমাল, তাই নিরিবিলি পড়াশুনা করতে চলে এল মামাবাড়ি। রামতনু বোসের গলিতে, দোতালায় একটি ছোট্ট চোরকুঠুরিতে। দিব্যি ফাঁকা বাড়ী, কোন ঝামেলা নেই। আর এই চোরকুঠুরি তো নয় যেন মন্দিরের মণিকোঠা। ঘরের নাম দিয়েছে টঙ। আট হাত লম্বা, চার হাত চওড়া। সরু একটা ক্যাম্বিশের খাট, মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর, ময়লা বালিশ, দুটো বাঁয়া-তবলাও গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাঁয়া কখনো বা খাটিয়ার নীচে, কখনো বা তা বিলেরই বসবার চেয়ার। একপাশে সেতার-তানপুরা, আরেকপাশে থেলো হুঁকো, গুল আর ছাই ঢালবার সরা, তামাক-টিকে-দেশলায়ের সরঞ্জাম। আর বই? বই সর্বত্র। তাকে, খাটের উপর, খাটের নিচে। এখানে-সেখানে। দেওয়ালে ঘড়ি টাঙানো, একখানি কাপড়, একটা জামা, আরেকটা চাদর ঝুলছে। মলিন, ছিন্নপ্রায়।

বেশে-বাসে আরামে-বিলাসে লক্ষ্য নেই। কি যেন একটা অসাধ্যসাধন করবে সেই তপস্যায় সমাসীন।

অন্য গোলমাল নেই, কিন্তু বন্ধুদের ভিড় আছে। বেলা এগারোটা, খেয়েদেয়ে এসে পড়ছে একমনে, কোথেকে আড্ডাধারী বন্ধু এসে হাজির। ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।

গানের কথা একবার বললেই হল! নে, তবে বাঁয়াটা নে। বই ঠেলে ফেলে সেতার তুলে নিল বিলে। নে, ঠেকা দে।

'ওরে বাবা, তোর সঙ্গে বাঁয়া ধরব আমি?' বন্ধু কুঁকড়ে গেল। 'কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে সত্যি-সত্যি কি আর বোল ফোটাতে পারি?'

বেশ করে দেখে নে। বাজনার বোল তোকে বলে দিচ্ছি। এমন কিছু শক্ত নয়।

গলা ছেড়ে গান ধরল বিলে। শোকস্তব্ধ দেশে নেমে এল যেন আনন্দের নির্ঝরিণী। আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্। এই বিষণ্ণ-বিবর্ণ দেশকে নিয়ে যাব আনন্দের বন্দরে। দিন যে কোনখান দিয়ে চলে গেল খেয়াল নেই কারুর। খেয়াল নেই কখন চাকর মিটমিটে দ্বীপ রেখে গেছে এক কোণে। রাত দশটার সময় খেয়াল হল খিদে পেয়েছে৭ আর, যাই বলো, খিদের কাছে আর গান নেই।

আজ বি-এ পরীক্ষার প্রথম দিন। সূর্য ওঠবার আগেই উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, হঠাৎ কি খেয়াল হল, চোরবাগানে এসে উপস্থিত। বন্ধু দাশরথি আর হরিদাসের বাড়ী। তারা তখনো ঘুমে, তাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিলে। উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল:

"অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা—
সকল তরুরাজি সাজি, ফুলে ফলে গাও রে—"

কার কণ্ঠস্বর? ধড়মড় করে উঠে বসল বন্ধুরা। বাইরে ছুটে এল। তুই, নরেন? আর একখানি গা। আর একখানি ধর।

সুরের সুরধুনী নেমে এল পাষাণী মাটিতে। সুরের আগুন লেগে গেল পুষ্পে-পর্ণে, পক্ষিকাকলীতে। বিলে আবার গান ধরল:

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপতিঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।"

কোথায় সকলে উঠে পড়বে, তা নয়, গান ধরেছে। কি হবে পড়ে-শুনে যদি তা না ঈশ্বররহস্যের মীমাংসা করে? পড়ে ইতিহাস বুঝব, অঙ্ক বুঝব, কিন্তু বুঝব কি ঈশ্বরকে? আর ঈশ্বরকে না জানা পর্যন্ত জ্ঞান নেই।

সেই এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কিশোর গদাধর যখন এসেছে প্রথম কলকাতায়, তার দাদা রামকুমার তাকে টোলে ভরতি করে দিতে চাইলেন। বললেন, এবার একটু লেখাপড়া কর।

লেখাপড়া? লেখাপড়া করে কি হবে?

বা, রোজগার করতে হবে না? কিছু শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়ে নিলে অন্তত পুরুত-গিরিটা তো করতে পারবি।

'দাদা, চালকলা-বাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?' বললে সেই সরল-তরল গদাধর।

তার মানে? তবে তুই কী চাস?

আমি চাই জ্ঞান। সেই একটা মহান আবিষ্কারের উদার আনন্দ। যিনি আকাশের তারায় থেকেও আবার চোখের তারায় আছেন, সূর্যে থেকেও আছেন আবার শিশিরে, কে তিনি? যাঁর গুনে সবাইকে সুন্দর বলে দেখি, প্রিয় বলে ভালোবাসি, তিনি না জানি কত সুন্দর-প্রিয়! একবার জানতে হবে না তাঁকে? যিনি গভীরের চেয়েও গভীর নিবিড়ের চেয়েও নিবিড় তাঁর ঠিকানাটা একবার খুঁজে নেব না? এ জীবনটা বয়ে যেতে দেব? বাজে-খরচে উড়িয়ে দেব পুঁজিপাটা?

আবার গান ধরল বিলে:

"হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে,
একবার লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদো রে।"

'এ কী, আজ পরীক্ষা না?' পাশের বাড়ি থেকে আরেক সহপাঠী এল ছুটে। কোথায় সকালবেলা ফুটোফাটা একটু ঝালিয়ে নেবে, তা নয় উলটে ফুর্তি ওড়াচ্ছে!'

'তাছাড়া আবার কি। মাথাটা সাফ রাখছি।' নরেন বললে দরাজ গলায়: 'ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। তেমনি গান গেয়ে শরীর-মনকে শান্তি দিচ্ছি।'

৬

কিন্তু ঈশ্বর বলে সত্যি কি কেউ আছেন? চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ধরা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না এমন কি কেউ থাকতে পারে? থাকতে পারে তো কোথায়? কোন সমুদ্রে, কোন পর্বতে, কোন অটবীতে?

তোমার মনের মধ্যেই একটি মৌনী সমুদ্র আছে। আছে একটি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। একটি গহন কান্তার। সেখানেই তাকে সন্ধান করো।

ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে মিশেছে নরেন। সেখানে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের কিনারা করতে চায়, শুধু অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে নয়, তাদেরকে তার ভালো লাগে। কঠোর ব্রহ্মচারীর মত দিন কাটায়। মাটিতে শোয়, নিরামিষ খায়, পরনে থান ধুতি ও গায়ে চাদর, এর বেশি আর পোশাক নেই। সমাজে গান গায়। প্রার্থনা করে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যানে নিশ্চল হয়ে থাকে।

তবু, কই সেই ঈশ্বর? সাড়া নেই শব্দ নেই, নিথর সমুদ্রে এতটুকু বুদ্বুদ ফোটে না। রন্ধ্রহীন অন্ধকার। আলোক-কণিকার আভাস নেই এতটুকু।

কি করে থাকবে? যদি তার হাতে সত্যিই প্রদীপ থাকত একবার অন্তত দেখতে পেতুম তার মুখ!

দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে নরেন। কে তাকে সন্ধান দেবে, কে দেবে সিদ্ধান্ত। কে জানান দেবে সেই মহা অজানার।

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সৌম্যসহাস্য বদান্য জীবন বড় আকর্ষণ করেছে নরেনকে। নরেনের মনে হল যদি ঈশ্বরসন্ধান কেউ দিতে পারে তো তিনি। তার এই উন্মাদ জিজ্ঞাসার পরম নিবৃত্তি তাঁর হাতে।

গঙ্গার উপর নৌকোয় বাস করছেন মহর্ষি। একদিন হঠাৎ তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হল নরেন। যেন দৈত্যের মত কি-এক অতিকায় প্রশ্ন তাকে তাড়া করেছে, সমাধানের আশ্রয় তাকেই নিতে হবে। আর বহুশাখাবিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের মত এত বড় আশ্রয় আর কে আছে মহর্ষি ছাড়া?

শান্ত মনে চোখ বুজে উপাসনা করছিলেন মহর্ষি। উত্তেজিত ঝড়ের মত তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়ল নরেন। জিগগেস করল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

মহর্ষির ধ্যান ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, নরেন। দুটি বিশাল-বিশদ চোখ যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জ্বলছে।

এই যে তোমাকে দেখছি চোখের সামনে এই কি ঈশ্বরকে দেখা নয়? এই যে জ্যোতিরাত্মা সূর্য, গভীরাত্মা সমুদ্র, গহনাত্মা পর্বত এ কি ঈশ্বরের প্রকাশ নয়?

এই যে ফুল হয়ে ফোটা তারা হয়ে ফোটা এটি কি নয় ঈশ্বরের প্রস্ফুটন? পত্র-পুঞ্জে এই যে সমীরমর্মর, এই যে কলিতললিত বিহগকূজন এইটিই কি নয় ঈশ্বরসঙ্গীত? হৃদয়ে যে একটি আনন্দের বাসা এইটিই কি তাঁর সুগন্ধ নয়? আর এই যে নদী-নির্জনে পরিব্যাপ্ত একটি প্রশান্তির অনুভব এইটিই কি নয় তাঁর স্পর্শস্নান?

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

অপূর্ব প্রশ্ন। ভাগবতী মতী না হলে কি এই জিজ্ঞাসা কারু কণ্ঠে ফোটে? মহর্ষি উদারনেত্রে হাসলেন। কিন্তু হাঁ-না সরাসরি উত্তর দিলেন না। তার অর্থ হয়তো এই, আমি দেখলে তোমার কী লাভ? তোমাকে নিজে দেখতে হবে। খনির অন্ধকারে দেখবে সেই শিহরণ-মণি।

তাই বললেন, 'কি সুন্দর উজ্জ্বল তোমার দুটি চোখ! যেন যোগীচক্ষু!

যোগীচক্ষু নয়, চর্মচোখে দেখতে চাই তাঁকে। দেখাতে পারেন?

কেউ দেখাতে পারো?

এখানে-ওখানে ঢুঁড়তে লাগল নরেন, খুড়তে লাগল মাথা। মন্ত্র-যন্ত্র ইন্দ্রজাল নয়, একেবারে স্পষ্ট, সুপ্রত্যক্ষ, দেখাতে পারো ঈশ্বরকে? জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখ খুলে দিতে পারো কেউ?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?

আমি কেউ নই, কিছু নই। আমি এক মুখখু গেঁয়ো পুজুরী ব্রাহ্মণ।

পুজো করো তুমি?

আমি শুধু মা-মা বলে কাঁদি। মাকে ভালোবাসি। ভালোবাসাই আমার পুজো। কান্নাই আমার সে-পুজোর গঙ্গাজল।

'ওরে বিলে, বাড়ী আছিস?'

কে যেন ডাকছে বিলেকে।

কে? পাড়ার সুরেশ মিত্তির দরজায় দাঁড়িয়ে। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

গান গাইতে সব সময়েই নরেন গলা বাড়িয়ে আছে। তবু উপলক্ষ্যটা কি!

'আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন। নাম শুনেছিস তো? সেই রাসমণির বাগানে দক্ষিণেশ্বরে যিনি থাকেন। কেশব সেন যাঁর কথা লিখেছেন কাগজে।'

অমন কত লোক লেখে! ভূ-ভারতের সাধুসন্নেসীর কি কোনো অভাব আছে? এসেছেন তো এসেছেন তাতে আমার কি।

'ওরে গান গাইবি। তিনি বড় ভজন শুনতে ভালোবাসেন। ভালো গাইয়ে কাউকে যোগাড় করতে পারিনি। শেষে তোর কথা মনে পড়ল।' কাঁধের উপর অনুনয়ের হাত রাখল সুরেশ। 'চল দু'খানা গাইবি চল।'

এ কে! চমকে উঠলেন রামকৃষ্ণ। যেন আগুনের সঙ্গে বারুদের দেখা হল,

চুম্বকের সঙ্গে লোহার। পূর্ণিমার চন্দ্রের সঙ্গে ফেনিল-নীল জলনিধির। কোথায় একে আগে দেখেছি বলো তো ?

দেখেছি এক জ্যোতির্ময় স্বপ্নে। সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে। আকাশের সেই সাত তারা। অত্রি অঙ্গিরা ক্রতু পুলস্ত্য পুলহ মরীচি আর বশিষ্ঠ। যে জ্যোতিমণ্ডলে এরা বসে আছে তারই কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে ছোট একটি দেবশিশুর আকার নিলে। দেবশিশু একজন ঋষির কোলে চড়ে দু' হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল মৃদু-মৃদু। ঋষি চোখ মেললেন। শিশু বললে, আমি চললুম, তুমিও এস।

রামকৃষ্ণ দেখলেন, এ যে সেই ঋষি। শিশুর টানে ঠিক চলে এসেছে পৃথিবীতে। শিশুর টান মানে রামকৃষ্ণের টান। রামকৃষ্ণই সেই শিশু। শিশুর মত সরল। শিশুর মত পবিত্র। শিশুর মত শরণাগত। আর বিবেকানন্দ ঋষির মত যোগী, ঋষির মতো তেজস্বী। পরিপূরক হিসেবে আরেকজনকে চাই। রথী আর সারথী। ভাব আর রূপ। দেহ আর আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন। বুদ্ধদেব আর আনন্দ। গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ।

ওরে কোথায় ছিলি তুই এতদিন ? কি করে ভুলে ছিলি আমাকে ? মনের ভাব মনে রেখে শান্ত হয়ে গান শুনলেন রামকৃষ্ণ। কি সুন্দর গায়। কাদের বাড়ির ছেলে ? কোথায় থাকে ? কে ডেকে আনল ?

'ও সুরেশ, ওকে আরো একখানা গাইতে বলো।'

আরো একখানা গাইল নরেন। তন্ময়, বিভোর হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। গান শেষ হলে কাছে এগিয়ে এলেন ব্যাকুল হয়ে। তৃপ্ত চোখে দেখতে লাগলেন দেহলক্ষণ। কী সুন্দর দেখতে ! যেন রামায়ণের রামের মত। দুই হাতে সেই হরধনুভঞ্জন বিপুল বিক্রম। আবার দুই চোখে সেই কমলকোমল শিশিরশান্ত করুণা। কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বললেন, 'একবারটি যাবে দক্ষিণেশ্বরে ? আমি বড় একা। আমার দিন আর কাটেনা।'

কি মিষ্টি করে কথা বলে এই সাধু। সলজ্জ মুখে হাসল নরেন। বললে, 'যাব।'

যাব বললে, কই আর এলো না তো ! তখন কেন কাপড়ের খুঁটে বেঁধে আনলাম না ? বাঁধতে চাইলেই যেন বাঁধা যেত ! আমি তার কে ! আমাকে সে মানবে কেন ? কোন সুখে সে ধরা দেবে ?

কোনো খোঁজ নিইনি, রাখিনি কোনো ঠিকানা। কার ছেলে তুই, কত তোর বাড়ির নম্বর। তোকে দেখেই আর সব হিসেব আমার ভুল হয়ে গেল। এখন কাকে পাঠাই, কোথায় পাঠাই, কোন দেশ থেকে ডেকে আনি। তুই নিজের থেকে একবার আসতে পারিস না দয়া করে ? আমি মুখখু বামুন, আমার বাইরে কোনো জৌলুস নেই, কিন্তু শোন, তোকে বলি অন্তরে আমার অনন্ত স্নেহ। সে সমুদ্র কি তুই শুকিয়ে দিবি ? তুই কি তাতে স্নান করবিনে ? করবিনে সন্তরণ ?

ওরে, একবার আয়। এক জীবন মা'র জন্যে কেঁদে মরেছি—এখন বুঝি তোর জন্যে ফের কেঁদে মরব। তুই তো ঐ পাষাণীর মত কঠিন নোস, তুই তো রক্ত-মাংসের, তবে তুই কেন সাড়া দিবিনে ?

যেমন গামছা নিংড়োয় তেমনি বুকের ভিতরটা কে যেন মুচড়ে দিচ্ছে হাত দিয়ে। এদিক-ওদিক তাকান রামকৃষ্ণ, এই বুঝি সে এল। ঐ বুঝি তার পায়ের শব্দ। অন্ধকারে চোখ খুললেই যেন দেখতে পাব সেই নয়নলোভন ভুবন-শোভনকে। রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যেন সে এসেছে।

গা ঠেলে তুলে দিল ঠাকুরকে, বললে, ওঠো, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি—

এসেছিস ? সত্যি ? এত রাত্রে ? কিন্তু কই, কোথাই তুই ? অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান রামকৃষ্ণ। গঙ্গার ব্যথিত কলকলস্বর ভেসে আসে বাতাসে—সে নেই, সে আসেনি, সে এসে আবার চলে গেছে।

শেষকালে মার মন্দিরে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। মা, কৃপা কর, মুখ তুলে চা। একবারটি তাকে এনে দে। তার মুখখানি একবার দেখি। দেখি সেই তার অরবিন্দ নেত্র দুটি। তোর কাছে কিছু চাইনি, আর কিছু চাইওনা। রাজ্য চাই না, রত্ন চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু একবারটি ওকে এখানে নিয়ে আয়। ও নইলে আমার প্রাণের কথা বুঝবে কে ? আর কাকেই বা তা কইব প্রাণ খুলে ?

তুই সব জানিস, সব বুঝিস, আর এটুকু বুঝবি নে ?

৭

কি ঘুরছিস তুই এখানে-সেখানে ? যদি মূর্তিমান ধর্মকে দেখতে চাস চলে যা দক্ষিণেশ্বর। দেখে আয় রামকৃষ্ণকে। সুদক্ষিণকে।

বিলেকে বললেন একদিন রাম দত্ত। দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বিশ্বনাথের ঘরে থেকেই মানুষ।

যাব বললেই কি যেতে পারি ? তুমি যদি না টানো। তুমি যদি না পথের সন্ধান দাও !

নতুন গাড়ি কিনেছে সুরেশ। গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি। একদিন বললে এসে বিলেকে, ওরে, যাবি দক্ষিণেশ্বর ?

যাব।

কেন যাবে বিচার করেও দেখল না। ও কি একটা যাবার মত জায়গা ? কে না কে এক সাধু সেখানে আস্তানা গেড়েছে—গাছতলায় বসা সাধু নয় তো পেটবোরেগী—তার কাছে যাবার এত তাড়া কিসের ? বোলে-চালে কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। শাস্ত্রদর্শন দূরের কথা, এক অক্ষর লেখাপড়া শেখেনি বলেই তো শুনেছি। কী সে দেবে, কী বা পারে সে দিতে ? জীবনের এত সব জটিল দুরূহ রহস্যের উপর কী করবে সে আলোকপাত ?

তবু, এক কথায় নিজেরও অজানতে বলে উঠল বিলে, 'যাব।'

চোখ দুটি যেন ভরে আছে ভালোবাসায়। সেই আলোকপাতেই যেন সমস্ত জীবন-রহস্যের অর্থোম্মোচন হবে।

তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মন উড়ে চলেছে কোন সুদূরের সন্ধানে। মাথার চুল অগোছালো, বেশবাস উদাসীন, শুধু ময়লা একখানি চাদর গায়ে। পরিচিত সংসার থেকে যেন আলাদা হয়ে এসেছে। যেন সংসারই বিদেশ, চলেছে অন্য নিকেতনে, নিজ নিকেতনে।

মনকে শান্ত হতে বললেন রামকৃষ্ণ। ওরে, এসেছে। এত ডেকেছি এত কেঁদেছি, না এসে কি পারে? তুই চঞ্চল হোসনে, উদ্বেল হোসনে। আগে ওর গান-টান শুনি। মুখখানি দেখি তৃপ্তি করে।

এসেছিস? আয়—

সঙ্গে আবার কটা ছোকরা বন্ধু নিয়ে এসেছিস কেন। একা-একা আসতে পারলিনে?

মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বললেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, ধ্যান। ধ্যানে যেন আরূঢ় হয়ে আছে নরেন। উন্মুক্ত, উদাত্ত গলায় গান ধরল :

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥

ষোল-আনা মন-প্রাণ-ঢালা গান। শুনে ঠাকুর আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। উঠে নরেনের হাত ধরলেন, হাত ধরে টেনে আনলেন উত্তরের বারান্দায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

শীতকাল বলে উত্তর দিকের থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। সুতরাং ঘরের দরজা বন্ধ হতেই বেশ একটু নিরিবিলি হল জায়গাটা। কারুর কিছু দেখবার জো নেই। নরেন ভাবল সাধু বুঝি কিছু উপদেশ দেবেন। ঝুলি ঝাড়বেন মামুলি কথার। ঠাকুর, ও সব ঢের শুনেছি। মুখের কথা পচে গিয়েছে। ছাপার অক্ষরও ঝাপসা হয়ে মুছে গিয়েছে এত দিনে।

কিন্তু এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন! অঝোরে কাঁদছেন। যেন কত পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ, এমনি অনুযোগের সুরে বলছেন, 'ওরে, আমাকে ছেড়ে এত দিন কোথায় ছিলি?'

নরেন তো নিস্তব্ধ, নির্বাক।

'এত দিন পরে আসতে হয়? তোর জন্যে কত দিন ধরে আমি বসে আছি একবারও ভাবলিনে সে কথা? তুই এত নির্মম? একবারও মনে পড়ল না আমাকে?'

এ কি পাগলের প্রলাপ? কিন্তু, পাগল তো, কাঁদে কেন এমন করে?

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে-শুনে আমার কান দগ্ধ হয়ে গেল। এবার, আয়,

তোর মুখে একটু হরিকথা শুনি। আমার কান জুড়োক, আমার প্রাণ জুড়োক। শুধু শুনব না, বলব। তোকে কত কথা আমার বলবার আছে। কত কথা। মনের কথা, প্রাণের কথা। সে সব কথা বলতে না পেয়ে এই দ্যাখ আমার পেট ঢাক হয়ে রয়েছে—'

হাসবে না কাঁদবে কে বলে দেবে নরেনকে।

'শেষকালে মা'র কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। মা, ওকে একবারটি এনে দে। অমনিধারা শুদ্ধ ভক্ত না পেলে বাঁচব কি করে? কার সঙ্গে কথা কইব? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি হল জানিস না বুঝি?'

পাথুরে চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'মাঝরাতে তুই আমার ঘরে এলি। হ্যাঁ, তুই, স্পষ্ট তুই। এসে আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি—'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' কৌতূহলের অলস একটি হাসির রেখা ফুটল বিলের মুখের উপর: 'আমি তো তখন আমার কলকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো তবে আর কে জানে।' বলে অকস্মাৎ হাত জোড় করে দাঁড়ালেন সামনে। যেমন লোকে মন্দিরে দেবতার সামনে দাঁড়ায়। গাঢ়-গদ্‌গদ স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই পরমনিধান, তুমিই সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি জীব-জগতের দুঃখ হরণ করতে আবার শরীর ধরেছ—'

আমি এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, কলেজে বি-এ পড়ছি, সামান্য ছাত্র— আমাকে এ সব কথা! আমি কি পৃথিবীতে আছি, না কি চলে এসেছি গন্ধর্বনগরে?

'তুই একটু বোস, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন। এ কে, কাকে সে দেখতে এসেছে? এক মুহূর্তের পরিচয়, তাইতে এত ভালোবাসা! ভেবেছিলুম, পাগল। কিন্তু পাগল কি ভালোবাসে? মধুর করে কথা কয়? সুধাসমুদ্রের ঢেউ তোলে অন্তরে?

চকিতে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। হাতে সন্দেশের থালা।

হাতে করে নরেনের মুখের কাছে সন্দেশ তুলে ধরলেন। বললেন, 'নে খা, হাঁ কর।'

মুখ সরিয়ে নিল নরেন, বললে, 'সে কি, সঙ্গে আমার বন্ধুরা রয়েছে। থালাটা আমার হাতে দিন, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

থালা ছাড়বার পাত্রই কিনা রামকৃষ্ণ। জোর করে সন্দেশ মুখে পুরে দিতে লাগলেন: 'ওরা পরে খাবেখন। তুই আগে খা। কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। নে, হাঁ কর—'

'অত পারবনা খেতে।'

'তা পারবেনা বৈ কি!' জোর করে খাইয়ে দিলেন সমস্ত।

পরক্ষণেই নত হলেন মিনতিতে। বললেন, 'বল, আবার আসবি?'

কণ্ঠস্বরের কাকুতি মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করল। না করে এমন শক্তি যেন খুঁজে পেলনা শরীরে। বললে, 'আসব।'

'আর দ্যাখ, শিগগির করে আসবি।'

'তাই আসব।'

'আর শোন্', একটু যেন গলা নামালেন রামকৃষ্ণ: 'একা-একা আসবি। অত বন্ধুবান্ধবের কি দরকার।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল নরেন। বন্ধুদের নিয়ে ফিরে এল কলকাতা। ফিরে এলেই কি চলে আসা যায়? মন যে পড়ে থাকে। দূরে এলেও মন যায় উড়ে-উড়ে।

কিন্তু এ সে কী দেখে এল দক্ষিণেশ্বরে? একজন মাত্র সাধু, না আর কিছু? যদি শুধু একজন মাত্র সাধু, তবে এমন করে টানে কেন? কত সাধু দেখেছে সে গাছতলায়, মঠে-মন্দিরে, হাটে-বাজারে। দেখে বরং বিতৃষ্ণা হয়েছে। কিন্তু এর মুখের দিকে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ মনোহর চোখ দুটির দিকে। কি যেন আছে যা পৃথিবীর আর কিছুতে নেই। আর কিছুতে দেখিনি। না সূর্যে না চন্দ্রে না সমুদ্রে না নীলাম্বরে। তবে কি পাগল? পাগল কি এত আনন্দে ভরা থাকে? এত লাবণ্যে? এত স্নিগ্ধতায়? তবে কী দেখে এলাম? স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল?

বা, এমন সে কী করেছে? সন্দেশ খাইয়েছে আর বলেছে, 'তত্ত্বমসি', অর্থাৎ তুমিই সেই ঈশ্বর। এতে এমন আর কী বাহাদুরি! প্রত্যেক মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, ঈশ্বরের প্রতিভাস। সেইটেই একটু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন শুধু।

শুধু কি তাই? শুকনো কাঠে যে আগুন ঘুমিয়ে ছিল তাকে যেন চকিতে জাগিয়ে দিয়েছে। অব্যক্তকে প্রকাশিত করেছে। নিহিতকে নিষ্কাশিত। তুমি শুধু সাড়ে তিন হাত লম্বা মাংসপিণ্ডময় সামান্য দেহ নও, তুমি অনন্তের আয়তন, তুমি অমিতবলশালী পরমাত্মা। নিয়ে এসেছে সে বৃহতের সংবাদ, মহতের সংবাদ। একটি শঙ্খের মধ্যে ধ্বনিত করেছে উদার সমুদ্রকে। তুমি অল্প নও, তুমি অতিশয়। তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি অপরিমেয়। তুমি অনৃতের সন্তান নও, তুমি অমৃতের সন্তান।

দূর ছাই, কি হবে অত ভাবনা ভেবে! আমার কলেজের পড়া পড়ে রয়েছে, তাইতে মন দিই। আমি কে তা জেনে আমার কী এসে যাবে? এদিকে পাশ করতে না পারলে সব ফক্কা! বিলে বই নিয়ে বসল।

কিন্তু, কি সর্বনাশ, আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। শুধু সন্দেশ খেয়ে আর স্তব শুনে চলে এলাম, যা জানতে গিয়েছিলাম তাই জানা হল না? সব ভুল হয়ে গেল?

কী জানতে চাস ? স্মিতস্নিগ্ধহাস্যে সেই দুইটি মনোহর চোখ মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেখা যায় ঈশ্বরকে ?

তিনি যখন আছেন, তখন তাঁকে আর দেখা যাবে না ? যেকালে তিনি আছেন দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।

আছেন ?

জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। প্রাণরঙ্গশালায় এত যে দীপ জ্বলছে সেখানে নেই কেউ নাট্যকার ? এত যেখানে শ্রী আর শৃঙ্খলা সেইখানে নেই কেউ শিল্পী ? এত যেখানে সুর আর ছন্দ সেখানে নেই কেউ কাব্যকর্তা ? নিয়ম আছে নিয়ামক নেই ?

দূর ছাই, পড়ার বই ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলে। কথা দিয়ে এসেছি যাই আরেকবার। তাকে দেখে আসি। নিয়ে আসি প্রথম প্রশ্নের শেষ উত্তর।

ওরে আয়, দেখা দে। এদিকে কাঁদছেন বসে রামকৃষ্ণ। সেই যে আসব্রি বলে গেলি আর এলিনে। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি—জানি, সব জানি, তবু তুই আয়। দেখা দে।

৮

সেদিন গাড়িতে গিয়েছিল, আজ চলেছে হেঁটে। গাড়িতে গিয়েছিল বলে পথের দূরত্ব ঠিক বুঝতে পারেনি সেদিন। এ যে পথ আর ফুরোয় না। আর কত দূর ? আরো উত্তরে যা। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর।

সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছেন। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্তব্ধ হয়ে। মুহূর্ত গুনছেন। ঘরে লোকজন আর নেই যেন সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বসে আছেন একজনের জন্যে। উদাস, উচ্চকিত।

নরেন এসে দাঁড়াল সামনে।

ওরে, এসেছিস ? শিশুর মত আহ্লাদে ফেটে পড়লেন রামকৃষ্ণ। তোর জন্যে বসে আছি কখন থেকে। আয় আয় বোস আমার পাশটিতে। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি ?

নরেন একটু দূরে সরে বসল কুণ্ঠিত হয়ে। একটু কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। পাগল আবার হঠাৎ কি করে বসে কে জানে।

তোর কুণ্ঠা, আমার অকার্পণ্য। তোর নিষেধ, আমার আবরণ। তোর ভয়, আমার অভয়-প্রসন্নতা। তুই দূরে বসিস, আমি কাছে আসি সরে-সরে।

ঠাকুর সরে-সরে কাছে এগুতে লাগলেন। এবার বুঝি ধরে ফেলবেন নরেনকে।

কি-এক অঘটন ঘটিয়ে দেবেন না জানি।

ঠিকঠাক কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই তার গায়ের উপর ডান পা তুলে দিলেন রামকৃষ্ণ। মুহূর্তে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মনে হল দেয়াল-ছাদ সব যেন উড়ে গিয়েছে, ঘরে লোক নেই, শুধু আকাশময় নিঃসীম শুভ্রতা। সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতায় যেন মিশে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথ। আমি বলে যে একটা আলাদা অস্তিত্ব তা যেন আর থাকছে না। বিশ্বময় একটিমাত্র চেতনার মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই শরীরাবন্ধ সংকীর্ণ চেতনা। এই বোধ হয় মৃত্যু।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল নরেন : 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা আছেন, বাবা আছেন—'

খল খল করে হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ও, তাই আছেন নাকি? তোর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল জিগগেসও করিনি, তুই কার ছেলে, তোর বাপের নাম কি, কি করে, তোর কে-কে আছে? কী দরকার আমার ও-সব খোঁজ-খবরে? তুই আছিস, তুই এসেছিস, এই তোর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে কত আম গাছ আছে কত তার শাখা-প্রশাখা এ হিসেবে আমার কী হবে? আমটি খাব আর তার সংবাদটি দিয়ে যাব জনে-জনে।

নরেনের আর্তস্বর কি-রকম যেন বাজল বুকের মধ্যে। পা সরিয়ে নিলেন তার গা থেকে। স্নেহসুধাসিঞ্চিত কোমল হাতখানি বুকের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'তবে থাক, এখন থাক। একবারে হয়ে কাজ নেই। আস্তে আস্তে হবে। কালে হবে। কালের ফলের মত মিষ্টি আর কি আছে!'

নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। ছাদ-দেয়াল ঠিক-ঠিক বসল এসে যে-যার জায়গায়। জিনিসপত্র ফিরে পেল তাদের আগের অস্তিত্ব, আগের অবস্থান। গাছপালা নদী-মাঠ সব আবার চিত্রাঙ্কিত হল। ফিরে এল আবার সহজের সুষমা। তবে এটা কী হয়ে গেল পলকের মধ্যে? ভেলকি? ভোজবাজি? তাছাড়া আবার কি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উড়ে গেল চোখের সামনে? সাধু নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক জানে। ব্ল্যাক আর্ট। নয়তো বা হিপনটিজম!

বললেই হল? আমি একজন সুস্থ-সমর্থ দৃঢ়কায় যুবক, এত আমার মনের জোর, এত প্রবল আমার ব্যক্তিত্ব, এত সহজে আমাকে অভিভূত করে ফেলবে? কে জানে কি, অভিভূত তো করল, চক্ষের সামনে ঘটালো তো দৃশ্যান্তর, জন্মের মধ্যে জন্মান্তর—দরকার নেই ওঁর কাছে এসে। ঘরের ছেলে ঘরে পালাই। কখন কি ভেলকি লাগিয়ে দেয় ঠিক নেই। পরক্ষণেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। যদি ভেলকিই হয় বের করে দিতে হবে সে বুজরুকি। যদি পাগলামিই হয় প্রমাণ করতে হবে সে উন্মত্ততা। ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিচার-বিশ্লেষণ করে পৌঁছুতে হবে স্থির সিদ্ধান্তে।

ওরে, আমি পাগল। শিশুর চেয়ে সরল, ফুলের চেয়েও শুচি, জননীর চেয়েও স্নেহময়—সেই আত্মভোলা সাধু যেন বলছে নরেনের কানে-কানে। পাগল না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? লোকে টাকার জন্যে পাগল, নাম-যশ প্রভাব-

প্রতাপের জন্যে পাগল, একবার ঈশ্বরের জন্যে পাগল হতে দোষ কি। আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।

শোন, আরো শোন। আমি ভেলকি জানি। মরা নদীতে বান ডাকাই। শুকনো কাঠে ফোটাই বসন্তমঞ্জরী। যে তুচ্ছ তাকে অসামান্য করি। যে ম্রিয়মাণ তাকে অমিতজীবনের আস্বাদ দিই।

যাই কেননা বলো, ঠিক ধরে ফেলব। তাই সাবধান হয়ে আবার গিয়েছে নরেন। দূরে-দূরে থেকে লক্ষ্য করতে হবে। আর যদি ব্যাকুল হয়ে স্পর্শও করে অমনি একেবারে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। রূঢ়, দৃঢ় থাকব।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছেই, প্রায় গা-ঘেঁষে, যদু মল্লিকের বাগান-বাড়ি। বেড়াতে-বেড়াতে সেখানেই সেদিন ঠাকুর নিয়ে এসেছেন নরেনকে। কত কথা বলছেন তার ঠিক নেই। কত আনন্দের কথা, ভালোবাসার কথা।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ-কথা বলার মত আনন্দ আর কি আছে? যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, জগতের জনকে জনে-জনে জানাতে পারি সে-কথা। তবে সে আনন্দ দেশহীন দিকহীন আদি-অন্তহীন। অবধি-পরিধিহীন। বল জগতে এসে তুই এই বড় আনন্দটা থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত রাখবি?

যদু মল্লিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছেন ঠাকুর। পাশে নরেন। এই ভুবন-লোভনের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে সরে বসে নরেনের সাধ্য কি।

কখন আবার তাকে ছুঁয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। কত অবহিত কত ধীর-স্থির করে রেখেছিল নিজেকে, বেঁধেছিল কত অটুট শাসনে, সব এক নিঃশ্বাসে নস্যাৎ হয়ে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বুদ্ধি বিজ্ঞানের অহংকার। আবার ঘটল সেই দৃশ্যান্তর, উঠে গেল ইন্দ্রিয়ের যবনিকা। কি ঘটল কে জানে। খানিক পর চর্মচক্ষে চেয়ে দেখল ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সিঞ্চন করছেন করুণার ধারাপাত।

আসল কথাই জিগগেস করা হয়নি এতদিন। সেদিন তাই সেই সরাসরি প্রশ্নই করে বসল বিলে: 'এত যে মা-মা করো মাকে দেখতে পাও তুমি?'

'দেখতে পাই কি রে!' অগাধ সারল্যে ঠাকুর হেসে উঠলেন: 'তার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মার পাশটিতে ছোট্টটি হয়ে ঘুমুই—'

বিলেও হেসে উঠল। হেসে উঠল বিদ্রূপে। এ কখনো সম্ভব হতে পারে? একটা পাথরের পুতুল, ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, বোবা অন্ধ একটা জড়পিণ্ড, সে নড়ে-চড়ে হাঁটে-চলে এ নিছক আজগুবি। কায়াহীন কাব্যকথা। শুধু হাঁটে-চলে না, কথা কয়, হাসে, এমনকি টাকরায় জিভের শব্দ করে খায় নাকি তারিয়ে-তারিয়ে। গাঁজাখুরি আর কাকে-বলে? আর, মায়ের ওই তো একটুখানি খাট, তার মধ্যে জড়সড় হয়ে শোন কি করে ঠাকুর?

কিন্তু তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতেও জোর পায় না। এমন যার লাবণ্যঢালা মুখ সে কি মিথ্যে কথা বলতে পারে? কোথাও কি ছলনার এতটুকু তন্তু আছে, কুয়াশার এতটুকু রেখা?

তাই বলে তো বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিতে পারিনা। ষোলআনা যাচাই করে নেব। যুক্তির শানের উপর আছড়ে ফেলে বারে-বারে বাজিয়ে তবে দেখব খাঁটি না মেকি। ছেড়ে কথা কইব না।

'ও তো একটা পাষাণের পুত্তলি। স্থবির জড়পিণ্ড।'

'জড়পিণ্ড!' ঠাকুরের বিন্দুবিসর্গ রাগ নেই। 'ওরে জড় তো চৈতন্যের ছদ্মবেশ। আর জীব তো ঈশ্বরের প্রতিরূপ।'

'বললেই হল? সব ঈশ্বর?'

'সমস্ত। ধূলিকণা থেকে নক্ষত্রকণা।'

'ঘটি বাটি থালা গ্লাস—সব?' পরিহাসের ঝাঁজ আর লুকোতে চাইলনা বিলে।

ঠাকুর স্নিগ্ধহাস্যে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়। ঘটি বাটি থালা গ্লাস—সমস্ত।'

হয় এ লোক জেগে-জেগে ঘুমোয় নয়তো ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও দেখে। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তার চেয়ে হাজরার সঙ্গে দুটো কথা কই। পুরো নাম প্রতাপ হাজরা। বাড়িঘর ছেড়ে দক্ষিনেশ্বরে এসে বসেছে, মতলব ঠাকুরকে ধরে যদি কিছু সুরাহা হয়। ঠাকুর বলেছেন, রাজার বেটা হ, মাসোহারা পাবি। রাজার বেটা হবার দিকে ঝোঁক নেই, হাজরার লক্ষ্য মাসোহারার দিকে।

কেন থাকবেনা লক্ষ্য? সব পরিশ্রমেরই পুরস্কার আছে আর এই যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করছি, আসনে বসে এত জপতপ, এত মালাফেরানো, এর বাবদ কোনো মুনফা মিলবেনা? বড়লোকের খোসামুদি করে কত কিছু আদায় করা যায়, আর সকলের যিনি বড় লোক তাঁকে স্তবস্তুতি করে মিলবেনা কিছু চালকলা, দুটো নেহাৎ আলুমুলো? নইলে খাটনি পোষাবে কেন?

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দেন ভক্তদের। 'ওর কথা শুনিসনে। ও জপতপ করে আবার দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে।'

বিনিময়ে মুখের বস্তু একটা পাব তার জন্যে ডাকব ঈশ্বরকে? আমি যে ঈশ্বরকেই পেতে চাই—সর্বোত্তম যে সুখ, পরমতম যে প্রাপ্তি। সোনার বদলে গিলটি দিয়ে মন ভোলাব? মণির বদলে কাচ? সোনা ফেলে গ্রন্থি দেব অঞ্চলে? ঈশ্বর পাওয়ার মানে কি? ঈশ্বর হওয়া। নদী কি সমুদ্রকে পায়? নদী সমুদ্র হয়। ঈশ্বর হওয়া যায় কি করে? মানুষ হয়ে। মানুষ বলে প্রমাণিত হয়ে। সে প্রমাণ হবে কিসে? বড় হয়ে ও ভালো হয়ে। বৃহৎ হয়ে ও মহৎ হয়ে। যখনই মানুষ বৃহৎ আর মহৎ তখনই মানুষ ঈশ্বর।

অত তত্ত্বকথার ধার ধারিনা। হাজরা যা বলে মন্দ বলে না। নরেনের তাই অভিমত। জুটবেনা নগদ বিদায়, হা-পিত্যেশ করে মরব, এমন রাজার দুয়ারে মাথা কুটতে যাব কেন? খাটিয়ে নেবে অথচ জুটিয়ে দেবেনা এ কেমনতরো কারিগর? শুধু ঘষা পয়সা আর পাঁচহাতি একখানা ঠেঁটির বদলে করব না

পুরুতগিরি।

ঠাকুর পরিহাস করে বলেন, 'হাজরা হচ্ছে নরেনের ফেরেণ্ড।'

বারান্দায় বসে হাজরা তামাক সাজছে। তার পাশে এসে বসল নরেন। টিকে ধরিয়ে হুঁকোটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। টানতে লাগল নরেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'শুনেছেন, বলছে কী অসম্ভব কথা!'

'কী বলছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল প্রতাপ।

'বলছে, ঘটি বাটি থালা গ্লাস সব নাকি ঈশ্বর। ইট কাঠ লোহা লক্কড়—সমস্ত।'

'পাগলে কি না বলে!' হুঁকোর জন্যে হাত বাড়াল হাজরা।

'শুধু তাই নয়। আমি আপনি—রাস্তার ঐ লোক, নৌকোর ঐ মাঝি—সব নাকি ঈশ্বর।'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল হাজরা। যেন কী এক অলীক অসার কথা বলেছে এক অর্বাচীন। সেই ব্যঙ্গের হাসিতে যোগ দিল নরেন।

ঠাকুর ঘরে ছিলেন, সেই ব্যঙ্গের হাসি তাঁর কানে ঢুকল। নিমেষে তিনি একটি বালকের মতন হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রইলনা। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কি বলছিস রে নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে ছুঁয়ে দিলেন নরেনকে। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সর্ব-অঙ্গে শিউরে উঠল নরেন, নিগূঢ়তম শিরাতন্তুতে। যেমন বসন্তস্পর্শে পুষ্পতরু। অন্ধকারের স্পর্শে তারা-ফুটে-ওঠা ধূসরাম্বর।

বুঝি একেই বলে স্পর্শমণি। লোহার সোনা হয়ে ওঠা। মৃত্তিকার হয়ে ওঠা স্বর্গ।

যেন চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা সরে গেল। দুই চর্মচক্ষু বুজে গিয়ে জেগে উঠল অমর্তচক্ষু, অমৃতচক্ষু। চেয়ে দেখল সমস্ত কিছু প্রাণময় গতিময় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সমস্ত কিছু একটা দীপ্ত সত্তায় উচ্চারিত। সমস্ত কিছু ঈশ্বরময়, ঈশ্বরঝঙ্কৃত। একেই বুঝি বলে মুক্তি। দৃষ্টির মুক্তি। অন্তরের সুইচবোর্ডে অজানা একটি সুইচ টিপে দিল কে, নবীন আলোকে অদেখা আলোকে সমস্ত কিছু আলোকময় হয়ে উঠল। নতুন চেতনায় নতুন চাঞ্চল্য। নতুন পরিধেয়ে নবতন পরিচয়।

দেখল নিজেকে। দেখল ঈশ্বরকে। দেখল ঈশ্বরছাড়া কিছু নেই। ঘটি বাটি থালা গ্লাস হুঁকো কলকে হাজরা দত্ত সব ঈশ্বর। মাঝিমাল্লা মুটে মজুর কামার ছুতোর জেলে জোলা সব ঈশ্বর। ব্রাহ্মণ-আচণ্ডাল। আব্রহ্মস্তম্ব। এমনিতরো দেখাই বুঝি ঈশ্বরকে দেখা।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল নাকি? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। সেই চৈতন্যদ্যুতি। হাজরা রইল সেই শুকনো কাঠ হয়ে, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন। পথঘাট গাড়িঘোড়া সব যেন জ্বলন্ত

প্রাণস্রোত। অনন্তযাত্রার বেগোচ্ছ্বাস।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ কড়ি বরগা দরজা জানলা কিছুই আর জড়বস্তু নয়, সব প্রাণচঞ্চল, বেগচঞ্চল। খাট চৌকি চেয়ার টেবিল বিছানা বালিশ—সমস্ত। সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরই বসে আছেন, ঈশ্বরই নড়ছেন-ফিরছেন। কোনো কিছুকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করে নেওয়া যাচ্ছে না। সব কিছু ঈশ্বর-বহমান ঈশ্বর-ভাসমান।

মা খাবার দিয়ে গেলেন। নরেন খেতে বসল। আশ্চর্য, ডাল-ভাত মাছ-তরকারি, তার মধ্যেও ঈশ্বর বসে আছেন।

'কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা তাড়া দিলেন।

কে পরিবেশন করছে? কে খাচ্ছে? কাকেই বা খাচ্ছে? সব সেই ঈশ্বর। দাতা ঈশ্বর, ভোক্তা ঈশ্বর, ভোগ্যভোজ্যও ঈশ্বর।

বিরাট একটা অনুভূতির দেশে চলে এল নরেন। যেন ডাঙায়-ওঠা মাছ নেমে পড়ল তার আপন সরোবরে। স্বধাম-সরোবরে।

কিন্তু এ কি আনন্দ, না, যন্ত্রণা? নাকি যন্ত্রণাময় আনন্দ?

পরদিন সকালে রাস্তায় নেমেও সেই দশা। ঐ যে গ্যাসপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে ও কি শুধু গ্যাসপোস্ট? ও তো ঈশ্বর, ও তো আমি। ঐ যে গাড়ি আসছে ছুটে ওই তো ঈশ্বর ছুটে আসছে, আমাকে, ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরতে। যে মারে আর যে মরে সব ঈশ্বর। হাড়িকাঠ বলি খড়্গ ঘাতক—সমস্ত। বিনাশও ঈশ্বর উদয়ও ঈশ্বর। বিনাশের পৃষ্ঠপটে অবিনাশী আবির্ভাব।

বিকেলে বেড়াতে এসেছে হেদোয়। লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন। আর আর্তনাদ করছে, বল তুই কে? তুই কি ঈশ্বর? তুই কি আমি?

৯

যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদতে বসেছেন ঠাকুর। ওরে আয়, দেখা দে। সেই যে চলে গেলি আর এলিনে। তোকে না দেখলে যে চোখ ব্যথা করে। বুকটা শূন্য ঠেকে। ক্ষুধা-নিদ্রা উড়ে পালায়। ওরে আয়। বিনিদ্র চোখে শীতলবাহিনী সুষুপ্তির মত। শোকার্ত বুকে সন্তাপনাশিনী সান্ত্বনার মত। ওরে আয়, শুকনো মাঠে যেমন আকাশঢালা বৃষ্টি নেমে আসে।

আশেপাশে লোক বিদ্রূপ করে ঠাকুরকে। 'কে না কে এক কায়েতের ছেলে তার জন্যে এত আকুলিব্যাকুলি।'

সত্যিই তো, কার ছেলে, বাপ কি করে, কেমন অবস্থা, কোথায় ঠিকানা, কিছুই তো জিগগেস করিনি। কি আশ্চর্য, ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। এমন ভুলও হয় মানুষের!

কি করব, ও যে সব-ভোলানো! কী হবে জেনে আমার ওর নামগোত্র, ওর

কুলকোষ্ঠী, ও আপনাতেই আপনার পরিচয়। নিজের কীর্তিতে নিজের দীপ্তিতে চরিতার্থ। নিজের অস্তিত্বে অর্থান্বিত। ওকে দেখলেই সব দেখা, শেষ দেখা হয়ে গেল। ও যে আর কিছু দেখতে দেয় না।

'কি যে বলেন মশাই তার ঠিক নেই।' আরেকজন টিপ্পনী কাটে : 'ঐ তো ওর সামান্য পড়াশুনো, দুটো মোটে পাশ করেছে। ওর জন্যে অধীর হওয়া কি সাজে?'

তোর জন্যে অধীর হব তুই কী পড়াশুনো করেছিস তার বিচার করে? লোকে যখন কাঁদে তখন কি শাস্ত্র-ব্যাকরণের খবর নেয়?

সামান্য পড়াশুনো? বলো কি তোমরা? ওর জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে ত্রিসীমায়? যেমন গাইতে-বাজাতে তেমনি বলতে-কইতে তেমনি আবার লেখায়-পড়ায়। এতটুকু মেকি নেই ওর মধ্যে, বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং টং করছে। তাছাড়া জানো আসল খবর? রাতভোর ধ্যান করে ও। ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। ও কি হেঁজিপেঁজি? ও ব্রহ্মময়ীর বেটা।

কিন্তু যার জন্যে এত মমতা এত আকুলতা তার এতটুকু করুণা নেই। সেদিন যদি বা এল, বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ সব তোমার মনের ভুল।'

আবার সেই কথা? হ্যাঁ, আবার সেই কথা। ঘুরে-ফিরে আবার সেই সন্দেহ। বারে-বারে পড়ি, বারে-বারে উঠি। একবেলা মানি তো আর একবেলা মাথা ঠুকি। এক ঢেউয়ে আরেক ঢেউয়ে তলিয়ে যাই।

'সে কি রে? নিজের চোখে দেখি যে সব। শুনি সব স্বকর্ণে। নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?' শিশুর সহজ সারল্যে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুর।

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন।' জোর গলায় বললে নরেন, প্রায় নিষ্ঠুরের মত, 'হাওয়ায় কোথায় কি শব্দ হয় আর ভাবেন ছায়া কথা কইছে!'

'তুই বললেই হল?'

'আর আপনি বললেই বা হবে কেন? প্রমাণ কি?' নরেন রুখে দাঁড়াল।

প্রমাণ কি! ঠাকুর তাকিয়ে রইলেন আবিষ্টের মত। কি হলে, কেমন করে হলে প্রমাণ হয়? সামনে যে ওটা একটা গাছ কি করে প্রমাণ করবে? বৃক্ষরূপে ও যে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে নেই তাই বা তোমাকে কে বললে?

'পশ্চিমের বিজ্ঞান হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছে চোখ-কান অনেক জায়গায় ভুল দেখে, ভূত দেখে।' বললে নরেন। 'আপনি যা সব দেখছেন-শুনছেন সব আপনার সেই চোখ-কানের ভুল। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল তা কি করে নড়বে-চড়বে?'

আমার মধ্যে তো প্রাণ আছে। বের করে দেখাও সেই প্রাণ। না দেখেও সেই প্রাণকে তো স্বীকার করছ। আমার মধ্যে তো মন আছে। কত সে উড়ছে-ঘুরছে, দশদিগন্ত পার হয়ে কত দেশ-দেশান্তর। সে মনকে স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত করো। মন আবার ব্যথা পায়, মন আবার তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। প্রমাণিত করো

সেই মন, দেখাও তার আকার-প্রকার। পারো, পারো দেখাতে?

ওধার থেকে হাজরা আবার ফোড়ন দেয়: 'শুধু হাঁটে-চলে নয়, হাত বাড়িয়ে সন্দেশ-কলা খায়। নূপুর বাজিয়ে নাচে।'

'সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।' বলে চলে গেল নরেন।

সব যেন ফাঁকা মরুভূমি হয়ে গেল। এ কখনো হতে পারে? যা তিনি এতদিন দেখে এসেছেন চোখের উপর, অনুভব করেছেন স্পর্শের মধ্যে, সব ভুয়ো, ভিত্তিহীন? মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন ঠাকুর। মা, নরেন যা বলে গেল এ সত্যি? তুই শুধু পাথরের পুতুল? তুই বোবা, কথা কইতে পারিস না? তুই কালা, শুনতে পাস না আর্তনাদ? তুই অনড়, অচল, তুই শুধু আলস্যের পিণ্ড?

মা নড়ে উঠলেন। কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? যাক না কিছুদিন, ও নিজেই একদিন দেখতে পাবে আমাকে। মন্দিরে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে। কিছু ভাবিসনে। আজ কঠিন হয়ে আছে, থাক, দেখবি কদিন পরেই নেই আর কাঠিন্য। বিশ্বাসে ঘনীভূত, ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে।

তাই বলো। আশ্বস্ত হলেন ঠাকুর। আসুক আরেকবার, সোজা তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। যাকে মানে না, গ্রহণ করে না, তার কাছে আসা কেন?

ঘনঘোর দুর্যোগের রাত্রে এসেছে এবার। তাও নৌকোয় করে, আকাশজোড়া বিপদ-বাধা মাথায় নিয়ে।

ধাপ্পাবাজি বলে তো চলে এলাম, কিন্তু আগাগোড়া বুজরুকি এই বা প্রাণে ধরে বলতে পারি কই? সত্যের দ্বারা বাক্যের শোধন হয়। এঁর যা বাক্য এ তো দহন-উত্তীর্ণ সোনার মত পরিশুদ্ধ, ধূমলেশহীন আগুনের মত পরিচ্ছন্ন। এর মধ্যে অপলাপের ছায়া কোথায়? তাই বলে আবার খটকা লাগে নরেনের, তাই বলে একটা প্রস্তরপুত্তলি হাঁটে-চলে তাই বা সশরীরে বিশ্বাস করি কি করে? নিশ্চয় কোনো গোপন-রহস্য আছে। সে রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। নইলে সুখ নেই, স্থৈর্য নেই।

এই দুর্যোগের রাত্রিই সেই আবিষ্কারের সুবর্ণক্ষণ। নিশ্চয়ই এখন কেউ নেই ঠাকুরের আশেপাশে। তার মত ডানপিটে আর কে আছে যে ঝড়জল মাথায় করে চলে আসবে অসময়ে? শয্যার আরাম ছেড়ে? একলাটি আছেন ঠাকুর, চুপিচুপি উঁকিঝুঁকি মেরে এবার ঠিক দেখে নেব কাণ্ডখানা, জারিজুরি ধরে ফেলব।

ঠাকুর ঠিক টের পেয়েছেন পায়ের শব্দ। 'কে?'

নরেন চুপ।

'কে, নরেন?' ডেকে উঠলেন ঠাকুর। 'আয় ভিতরে আয়।'

কত বড় আশ্রয়ের ডাক। অমৃতনির্ঝর। কেন সংশয়সন্দেহের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস? আয় আমার এই স্নেহচ্ছায়ানিবিড় পক্ষিনীড়ে। দরজা খোলা। ঢুকে পড়ল নরেন।

আসনে বসে আছেন ঠাকুর। কোথায় কি ভোজবাজি, কোথায় কি ভানুমতীর খেলা, সহজ আনন্দে বসে আছেন তন্ময় হয়ে। যা সহজ তার রহস্যভেদই বোধহয় সব চেয়ে কঠিন। যা সরল তার কে পরিমাপ করবে? বিরক্তির ভাব দেখিয়ে ধমকের সুরে ঠাকুর বললেন, 'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন?'

সত্যি তো, কেন আসি? চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ, কেন আসিস? উত্তর দিতে হবে তোর। কোথাকার কে এক মুখখু পুজুরী বামুন, দক্ষিণেশ্বরের কালীঘরে পড়ে থাকে, সে কী করে না করে, কী দেখে না দেখে, তাতে তোর কী মাথাব্যথা? আরো কত হয়তো পুজুরী বামুন আছে এখানে-ওখানে, তাদের কাছে যাস, না, তাদের ঘরে গিয়ে উঁকি মারিস? কী এমন তোর দায় যে দুর্যোগ মাথায় করে আসতে হবে? বাড়ির কাছের গলি নয়, বা কিছু এক-ডাকের পথ, তাও এই রাতে, নৌকা করে! কিসের গরজ, কিসের কি! আমি কার সঙ্গে কি কইলুম বা না কইলুম, কার নড়াচড়া দেখলুম কি না-দেখলুম তাতে তোর কি এসে গেল? যাকে বিশ্বাস করিস না তার কাছে কেন আসিস? কেন?

যে প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল ঠিক সেই প্রশ্নেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে হল নরেনকে। দাঁড়াতে হল উত্তরের জন্যে! সে উত্তর ঠাকুরকে নয় তাকেই এখন দিতে হবে। ঠাকুরের রহস্য নয়, তার নিজের রহস্যেরই উন্মোচন চাই। সত্যি, সে কেন আসে? কেন এসেছে এই দুর্যোগের নদী পেরিয়ে? যার সঙ্গে মতান্তর তার প্রতি আবার মমতা কেন? যাকে সে মানেনা সেই আবার টানে কি করে? যাকে তাড়িয়ে দেয় আবার গিয়ে তারই পায়ে পড়ে? যে আক্রমণ সয় তারই এত আকর্ষণ? উত্তরের জন্যে অন্ধকার হাতড়াতে লাগল নরেন। অন্তরের অন্ধকার। সত্যি, কেন আসি?

চুপ করে থাকতে দেব না। দেব না পাশ কাটাতে। সোজাসুজি মুখোমুখি উত্তর দে। কেন এই অসাধ্য-আয়াস? এত কষ্টক্লেশ? এত ছুটোছুটি। কেন আসিস? আমাকে নিসনা, মানিস না, তবু আসিস কেন?

'কেন আসি?' উত্তর পেয়েছে নরেন। চোখে জল এসে গিয়েছে। গদগদভাষে বললে, 'কেন আসি? আসি, তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

ভালোবাসা। মহাশক্তি, অনন্তশক্তি, ভালোবাসা। জানিনা তবু টানে। মানিনা তবু টানে। এক ফোঁটা চাঁদ, বিশাল বারিধিকে উত্তাল করে তোলে। এতটুকু একটা ছুরির আঘাত, সমস্ত রক্তকে নিরর্গল করে দেয়। আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। দু বাহু মেলে বুকের উপর জড়িয়ে ধরলেন নরেনকে। বললেন, 'আর সকলে স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে ভালোবাসে বলে!'

অহেতুক ভালোবাসা। কিছু চাই না, তবু ভালোবাসি। এই ভালোবাসার টানেই রাজপুত্র সিংহাসন ছেড়ে চলে যায় বনবাসে। এই ভালোবাসার স্পর্শেই সমুন্ধত পাহাড় একতাল নবনী হয়ে যায়। মেদুরমধুর নবনী।

ওরে, এই অহেতুক অকপট ভালোবাসার নামই ভগবান।

বিনা মেঘে বাজ পড়ল। বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্নে এসেছে নরেন। খেয়েদেয়ে রাত্রে ঘুমিয়েছে, খবর এল, বাবা হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

আরামশয্যা থেকে কে সহসা উপড়ে তুলে আনল নরেনকে। প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গেল। বাবা নেই? এই দেখে এলাম স্পষ্ট সতেজ, সুস্থসমর্থ, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই নেই? এ কখনো হতে পারে? হতে পারে কি, হয়েছে।

মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দিয়েছে, জীবনের কত নিকটতম সে প্রতিবেশী। সুদূরতম নয়, নিকটতম। কেউ অপেক্ষাও করেনা, দুয়ারে এসে দেখা দেয় অতিথির মত। ভিক্ষার ধন আদায় করে নিয়ে যায়। কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না, প্রস্তুত নই বলে শোনেনা কোন কাকুতি-মিনতি। কালাকালের ধার ধারেনা। ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ছিনিয়ে। শুধু তাই? মৃত্যুর মানে শুধু এইটুকু? জানা-র দিগন্তরেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার বাইরে যেন আরেক জগৎ আছে, অজানা-র জগৎ, সে জগৎ দিগন্তহীন। জানা-র রঙ্গমঞ্চে যেখানে শেষ পর্দা পড়েছে, মৃত্যু এসে সেই পর্দা একটু সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিয়ে দেখাল অজানা-র নেপথ্যলোক। অনন্ত জগৎ, অনন্ত যাত্রা। জন্ম-মৃত্যু আছে বলেই একটি ছন্দোবন্ধ কবিতা আছে। সমমাত্রিক কবিতা। আর, কবিতা যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তার একজন রচয়িতা আছেন। সে রচয়িতার নামই ঈশ্বর।

অনেক ভাবে বোঝান, আমি আছি। শেষে মৃত্যু হয়ে বোঝান।

তুমি তো আছ, বুঝলাম, কিন্তু আমার এখন গতি কী হবে! কি করে সংসার চালাব? ছোট ভাইবোনদের খাওয়াব কি! মায়ের মুখের দিকে চাইব কোন মুখে?

প্রথমটা মূঢ়ের মত হয়ে গেল নরেন। শেষে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল যখন জানল বাবা এক পয়সাও রেখে যাননি। কিন্তু মাটিতে বসে পড়বার ছেলে নরেন নয়। সে উঠে দাঁড়াল। আর কিছু না থাক, তার দুই দৃপ্ত বাহু আছে। আর আছে ক্লান্তি-না মানা নগ্ন দুই পা। পরাঙ্মুখ মাটিকে পরাভূত করে খুঁজে আনব তৃষ্ণার পানীয়। হটবনা, হারবনা কিছুতেই।

পায়ে জুতো নেই, গায়ের জামাটা ছেঁড়া, চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল নরেন। এ অফিস থেকে ও অফিস। এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বত্র এক জবাব। নো ভেকেন্সি। স্থান নেই, সংস্থান নেই। অন্যত্র পথ দেখ। নেই ভিক্ষান্নমুষ্টি। দারিদ্র্যের দাবদাহে নেই এতটকু করুণার মেঘখণ্ড। বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সুখীরা অনুকম্পা দেখায়। আর উদাসীন জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। মায়ের অসহায় মুখখানি মনে পড়ে। ছোট-ছোট ভাইগুলির আর্ত অবোলা চোখ চোখে ভাসে।

হা ঈশ্বর, তুমি আছ? আছ তো, তোমাকে লোকে দয়াময় বলে কেন?

উপবাসী শিশুর মুখ দেখেও যার মন গলেনা, সে দয়াময় ?

শূন্যের দিকে চেয়ে কার কাছে প্রার্থনা করব ? কে সে তা কে বলবে ? সে কানে শোনে কিনা চোখে দেখে কিনা তারও বা ঠিক কি। তার চেয়ে নিজের কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি আত্মশক্তির কাছে। আমি যেন না ভেঙে পড়ি, আমি যেন না ক্ষান্ত হই, আমি যেন না হার মানি কিছুতেই।

'এ কি স্নান করে উঠেই চললি কোথায় ?' সকালবেলা মা এসে দাঁড়ালেন পথের সামনে। 'খাবিনে ?'

চোখ নামাল নরেন ? বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।' বলে শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল।

মনে কেমন খটকা লাগল ভুবনেশ্বরীর। তবে কি নরেন ছলনা করল ? ঘরে আজ যথেষ্ট খাবার নেই, ছোট ভায়েদের স্বল্প গ্রাসে ভাগ বসাবেনা তারই জন্যে কি মায়ের চোখে ধুলো দিল ? তবে কি নরেন সারা দিন অনশনে থাকবে ?

খালি পায়ে ঘুরে-ঘুরে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। এখন একটু বিশ্রাম না করলে আর নয় ! গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিচে একটু বসেছে নরেন। কিন্তু একটু নিরিবিলি থাকবে তার সাধ্য নেই। কোত্থেকে এক বন্ধু এসে হাজির। সুখী, ধনী বন্ধু। যখন দেখতে পেয়েছে নরেনকে তখন নিশ্চয়ই দুটো সহানুভূতির কথা বলবে। সব সহ্য হয়, অসহ্য শুধু ধনী বন্ধুদের সমবেদনা। ধার-করা ভদ্রতার বুলি।

কিন্তু এ বন্ধুটি অভিনব। গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছে। 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—'

শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল নরেন। বললে, 'রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস। যারা খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে আছে তারাই বলতে পারে, বুঝতে পারে ব্রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে, ভাবতে পারছে ব্রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি। আর যার মা-ভাইয়েরা উপোস করে আছে, দোরে-দোরে ঘুরে যে আজ পর্যন্ত একটা চাকরি জোটাতে পারল না, তার কাছে আর ব্রহ্মনিশ্বাস নেই, যা আছে তা বজ্রনিশ্বাস।'

বন্ধুর গান বন্ধ করে দিল নরেন। যার পেটে ভাত নেই তার আবার ভগবান কি ! যার ভাত নেই তার জাত নেই, তার ভগবানও নেই। এখন অন্নের কথা বলো। তারপরে শোনা যাবে অন্যকথা।

ঠনঠনের ঈশান মুখুজ্জেকে ধরেছেন ঠাকুর। বললেন, 'হ্যাঁ গা, নরেনকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো ? বাপ মারা গেছে, আঁধার দেখছে চারদিক। কত ঘোরাঘুরি করছে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

নরেনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কত যুগ হয়ে গেল আর আসেনা এদিকে। এসে কি করবে ? একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ? তোমার মা তো কত শক্তি ধরেন শুনি, একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন না ? তবু কি ভেবে গেল ঠাকুরের কাছে। প্রণাম করে পাশটিতে এসে বসল।

ঠাকুর তাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে-কানে বলার মত বললেন, 'ওরে আর ভাবনা নেই। তোর কথা ঈশানের কাছে বলেছি। বহুৎ লোকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু শিগগিরই যোগাড় হয়ে যাবে দেখিস—'

নরেন হাসল। এমন কত আশ্বাস কত জনে দিয়েছে। মৌখিক একটা আশা দিতে আর পরিশ্রম কি? কিন্তু ঈশানের কাছে কেন? তোমার ঈশানীকে একটু বলতে পারো না?

কত লোককে যে সাধছেন নরেনের জন্যে তার লেখাজোখা নেই। ওগো, আমার নরেনকে দেখেছ? দেখ দেখি কেমন সে হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। তার গৌর তনু কালো হয়ে গেল! এক পা ধুলো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, পরনের কাপড়খানি ময়লা। সারাদিন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পথে-পথে। ওগো তোমরা ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো না? যাতে ও একটু শান্তি পায়, সুদিনের মুখ দেখে।

শেষ পর্যন্ত নরেনের বন্ধু অন্নদা গুহকে ধরলেন।

'তোমরা তো নরেনের সব বন্ধুবান্ধব—'

অন্নদা থমকে দাঁড়াল। অন্নদার সঙ্গে নরেন মেলামেশা করে বলে ঠাকুর খুশি নন। অন্নদা ভাবল, সেই সূত্র ধরে কিছু তিরস্কার করবেন বোধহয়। না, তিরস্কার নয়, অনুনয়। প্রার্থনা।

'তোমরা নরেনের সব বন্ধুবান্ধব, যদি তার এই অভাবের দিনে কিছু-কিছু সাহায্য করো তো বেশ হয়।'

কথাটা কানে উঠল নরেনের। শেষকালে, আর লোক পেলেন না, অন্নদার কাছে সাহায্য চাইলেন। তেড়েফুঁড়ে চলে এল ঠাকুরের কাছে। বকতে লাগল। 'আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই, অন্নদা—অন্নদাকে বলতে গেলেন? দুনিয়ায় আর আপনি লোক পেলেন না?'

ঠাকুরের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। বললেন, 'ওরে তোর জন্যে যে আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে করতে পারি।'

যাই বলো, ঠাকুরের কাছটিতে এসে বসলে মনপ্রাণ ঠাণ্ডা হয়, দেহের ক্লান্তি উড়ে পালায়। অভাবের কথা মনে থাকে না। মনে হয় অপারেরও বুঝি পার আছে। কষ্টের উপলখণ্ডের মধ্যেই আছে কৃপার নির্ঝরধারা। ঠাকুর বললেন, একটা গান গা।

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—' গান ধরলে নরেন।

পঞ্চবটীতে নরেনকে ডেকে নিয়ে এলেন ঠাকুর। নির্জনে নিরালয়ে। নিম্নগাঢ়স্বরে বললেন, 'শোন, তোকে একটা কথা বলি।'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন।

'শোন আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয়েছে। আমি তোকে তা দিয়ে দিতে চাই। নিবি?'

এ নিলে বোধহয় সব অভাব অনটন মিটে যায়। সংসার বোধহয় স্বাচ্ছন্দ্যে

হেসে ওঠে। সুখের জোয়ারে আবার সবাই গা ভাসাই।

'কিন্তু', নরেন বললে, 'ও নিয়ে কি আমার ঈশ্বরদর্শন হবে?'

'না, তা হবেনা। ঈশ্বরদর্শন ছাড়া আর সব কিছু হবে। যা তুই চাস।'

'চাই না।' অর্থ যশ শক্তি প্রতিপত্তি সব থু করে দিল নরেন। 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরদর্শন হবে না তা নিয়ে আমার লাভ কি?'

যা নিয়ে আমি অমৃত হতে পারবনা তা দিয়ে আমি করব কি!

গৌরবে ভরে উঠলেন ঠাকুর। এই না হলে নরেন! ওরে আমরা হলুম নর আর ও নরের মধ্যে ইন্দ্র!

১১

'কোথায় চলেছেন!' পথের মধ্যে কে যেন হঠাৎ ডেকে উঠল চেনা সুরে।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল নরেন।

এই যে, আসুন না, আমার গাড়িতে—'

ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ান। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে এদিক দিয়ে। অনেক দিনের চেনা। অনেক দিনই ভাড়া খেটেছে নরেনের। নিয়েছে ভাড়ার উপরে ভারি হাতের বকশিশ।

মিছিমিছি হেঁটে-হেঁটে চলেছেন কেন? আমার গাড়ি যখন খালি—আসুন, আসুন, আকুল হয়ে ডাকতে লাগল কোচোয়ান।

আমার পকেটও খালি। জামার পকেট দুটো উলটো করে দেখাল নরেন।

'তাতে কি? আপনার পয়সা লাগবেনা গাড়ি চড়তে। অনেক নিয়েছি, অনেক খেয়েছি আপনার—'

তা হোক। তুমি এগোও, অন্য সোয়ারী ধরো। আমি হেঁটে-হেঁটেই কিনারা করব এ পথের। আর যদি কোনদিন গাড়ি পাই, সোয়ারী হব না, তোমার মত কোচোয়ান হব। বাঁ হাতে লাগাম আর ডান হাতে চাবুক তুলে নেব। কর্ম আর ধর্ম দুই ঘোড়া ছুটিয়ে দেব দুর্জয় উৎসাহে। ছ্যাকড়া গাড়ি এ দেশ, শুধু জাড্যের জড়পিণ্ড, তাকে নিয়ে যাব রাজসিকতার রাজধানীতে। ঘোড়ার খুরে-খুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে দারিদ্র্য আর পরাধীনতার পাথর।

আমি এমনি হেঁটে-হেঁটেই চলে যাই।

কথাও কানে হাঁটে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ভাসতে-ভাসতে এসে পৌঁছল একদিন ঠাকুরের কাছে। কি কথা?

নরেন বকে গিয়েছে। সংসারের দুঃখদুর্দশা ভুলতে বিপথে পা বাড়িয়েছে। আরেক পা এগুলেই জাহান্নম।

ভবনাথ এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। বললে, 'এমন যে হবে স্বপ্নেরও অগোচর।'

'কি হয়েছে ?' ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন।

'নরেন যে এমন সর্বনাশ ঘটাবে—সেকি, আপনি শোনেন নি ?'

'চুপ কর্। ফের নরেনের বিরুদ্ধে কোনো কথা কইবি তোদের মুখ দেখবনা বলে দিলুম।'

রাত্রে চলে গেলেন মন্দিরে মায়ের কাছে। নরেনের জন্যে কাঁদতে, প্রার্থনা করতে। আরো একবার গিয়েছিলেন। তখন তার বাপ বেঁচে। কোথায় কোন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নরেনের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন ঠাকুরের কানে এসেছে। তাহলে কি হবে, নরেনও যদি বাঁধা পড়ে যায়! চুপিচুপি মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। মা, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলে-বলে জিভ জ্বলে গেল, নরেন আর ভবনাথের মত গোটাকয়েক ছেলে বেখে দে আমার জন্যে, যাদের সঙ্গে কইতে পারি দুটো প্রাণের কথা, যাদের শুনে স্নিগ্ধ হতে পারি অমৃতে—

মা বলে দিয়েছিলেন, ভয় নেই। হবেনা বিয়ে।

আবার তেমনি কেঁদে পড়লেন মায়ের কাছে। মা, নরেন আমার এমন রাঙা চক্ষু রুই, ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে বড় দীঘি, সে কখনো বকে যেতে পারে? যে খাপখোলা তলোয়ার, তাতে কখনো ধরতে পারে মর্চে? সংসারে এমন কি মোহবন্ধন থাকতে পারে যে তাকে বশীভূত করবে? জলগুল্ম দিয়ে কি বাঁধা যায় হাতিকে? মা, তুই বলে দে—

মা বলে দিলেন, ভয় নেই। নরেন নির্মল, নির্মুক্ত প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্য। ধোঁয়া ছাদ-দেয়াল মলিন করতে পারে কিন্তু আকাশের কি করবে? পাশবদ্ধ জীব নয় ও, পাশমুক্ত শিব।

কে এক ধনীর সুন্দরী মেয়ে নরেনকে পতিরূপে বরণ করতে চায়। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে নরেনের দুর্দিনের চিরন্তন দাক্ষিণ্য। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল নরেন।

কিন্তু সেই মেয়ে দেখা করতে এল গোপনে। হয়তো সাক্ষাৎদর্শনে ফল ফলবে এই ভেবে। নরেন বিচলিত হলনা। কাঁদতে বসল মেয়ে। নরেন বিগলিত হবার নয়।

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।

আমি জানিনা ও কে! ও সপ্তর্ষির এক ঋষি। ওর পুরুষের সত্তা, অখণ্ডের ঘর। ও স্বতঃসিদ্ধ। কেশবের যদি একটা শক্তি থাকে নরেনের তেমনি আঠারোটা শক্তি আছে। কেশবের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে আর নরেন স্বয়ং জ্ঞান-ভানু। আর সকলকে সেবা করতে দিই, নরেনকে দিই না। ওরে আমিই যে তার সেবক, তার দাসানুদাস। সবই জানি, তবু মাকে জিজ্ঞেস করে পাকাপাকি নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু নরেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই?

এটা-ওটা অনুবাদ করে সামান্য কিছু মাঝে-মধ্যে রোজগার করছে বটে, কিন্তু তাতে সংসারের বিরাট গ্রাসের আচ্ছাদন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারি, কেন তবে জন্মালুম মানুষ হয়ে?

ঠাকুর বলেন, কে মানুষ ? যে মান-হুঁস সেই। অর্থাৎ নিজের মান সম্বন্ধে যে সচেতন সেই মানুষনামবাচ্য। আর, মান অর্থ যেমন সম্মান তেমনি আবার পরিমাণ। অর্থাৎ দুই অর্থেই যে সজ্ঞান সেই মানুষ। অর্থাৎ যে জানে সে কে, সে কতটা। সে যে ছোট নয়, তুচ্ছ নয় সে যে অমৃত সে যে অনন্ত এই বোধে যে উদ্বোধিত। সে যে শুধু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নয়, সে যে স্বয়ং বিশ্বনাথ এই সংজ্ঞায় যে চৈতন্যময়।

পরনে শতচ্ছিন্ন চেলী, পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। বললেন, 'আমাকে একখানা চেলি কিনে দিতে পারিস ? ওটা পরে আর পুজো করা যায় না।'

নরেন চোখ নামাল। দু মুঠো ভাত যোগাড় করতে পারছে না, সে চেলি কিনে দেবে! না বললেও পারতেন, মনে হ'ল ভুবনেশ্বরীর। কিন্তু কেন কে জানে, মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে এল কথাটা। এখন আর প্রতিকার নেই। ছেলের মনে ঘা দিলেন অকারণে।

এর দিন দুই পর দক্ষিণেশ্বরে এক ভক্ত মাড়োয়ারী এসে উপস্থিত। ঠাকুরের জন্যে এক থালা মিছরি এনেছে সঙ্গে। মিছরির উপরে একখানা গরদের কাপড়।

আর, সেই দিনই বলা-কওয়া নেই, নরেন এসে হাজির।

নরেনকে দেখে ঠাকুরের খুশি আর ধরে না। বলে উঠলেন, 'ওরে, নরেন এসেছিস ? আয়। আয় আমার কাছটিতে।'

পাশে এসে বসতেই ঠাকুর বললেন গলা নামিয়ে, 'শোন, এই গরদের কাপড় আর মিছরির থালা তুই বাড়ি নিয়ে যা।'

নরেন হেসে উঠল। মিছরির থালা নিয়ে আমি করব কি ? আমি কি কচি খোকা ?

'বেশ, তবে শুধু গরদখানা নিয়ে যা।' ঠাকুর পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

আরেকবার হাসির রোল তুলল নরেন। বললে, 'আমি গরদ পরব নাকি শেষকালে ?'

'ওরে তুই না। তোর মা পরবেন। পরে আহ্নিক করবেন।'

'মা ?' নরেনের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

'হ্যাঁ রে, তোর মার পুজোর চেলিখানা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'আপনি কি করে জানলেন ?' চমকে উঠল নরেন। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'যে করে হোক পেরেছি জানতে।' ঠাকুর উড়িয়ে দিতে চাইলেন কথাটা। বললেন, অনুনয় মিশিয়ে, 'তুই নিয়ে যা। তোর মাকে গিয়ে বল, আমি দিয়েছি।'

'আপনি দিলেই বা তা নেব কেন ?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল নরেন।

'তার মানে ?'

'মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি যখন সক্ষম হব উপার্জন করে কিনে দেব

মাকে। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে যাব কেন?'

আহা, এই না হলে নরেন! তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহ! একবার না বলেছে তো, না! শুনলে একবার মরদের মত কথাটা! তোমার বলে নিতে পারবো না আমার বলে নেব। যাচঞা করে নেব না, নেব অর্জন করে। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্য।

পরদিন রামলালকে ডেকে বললেন, 'শিগগির করে খেয়ে নে। আর খেয়ে উঠেই এই গরদ আর মিষ্টান্নর থালা শিমলেয় গিয়ে নরেনের মার হাতে দিয়ে আয়। খবরদার, আর কারু হাতে যেন না পড়ে, স্বয়ং নরেনের হাতেও যেন নয়। ওরে শুধু কর্মের স্পর্ধায় হবে না, কৃপা চাই।'

যেমন বলা তেমনি করা। দুপুরের রোদে গৌর মুখার্জি স্ট্রিটে গ্যাসপোস্টের নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রামলাল। নরেন যেই বেরিয়ে গেল অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা ঢুকতে পারল বাড়ির মধ্যে। আর ঢুকেই সটান ভুবনেশ্বরীর এলেকায়। থালাশুদ্ধ গরদ ভুবনেশ্বরীর হাতে পেঁছে দিয়ে রামলাল বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন ভুবনেশ্বরী। বললেন, 'এইখানে ছেলেকে কি বললুম তা দক্ষিণেশ্বরে তক্ষুনি টেলিগ্রাফ হয়ে গেল!'

প্রার্থনার মধ্যে যখনই আর্তির আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগে, নির্ভুল শুনতে পান অন্তর্যামী। না, নরেনের আর অভিমান নেই। সে শুকনো মাঠ কর্ষণই করতে পারে কিন্তু আকাশ ভেঙে করুণার বর্ষণ যদি নেমে আসে সে তা ঠেকাবে কি করে?

আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর জানেন নরেন তামাক খায়। নিজের ছোট হুঁকোয় তাকে তামাক খেতে দিলেন। ওরে খা, খা, লজ্জা নেই, আমি দিচ্ছি—

'মশাই, এত ভালবাসার কি হয়েছে?' কে একজন টিপ্পনী কাটল। 'এদিকে আপনার হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল। ও যে হোটেলে খায়, ওর এঁটো কি খেতে আছে?

'ওরে শালা, তোর কি রে?' ঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন। 'নরেন হোটেলে খাক বা যাই খাক তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলেও খায় তাহলেও তুই নরেন হতে পারবিনে।'

তারপর নরেনকে ডেকে এনে শুধোলেন, 'তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ, হাতি চলে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চেঁচায়। কিন্তু হাতি ফিরেও তাকায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দে করে তুই কি মনে করবি?'

'মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'

ঠাকুর হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'না রে, অত দূর নয়, অত দূর নয়।'

শুধু ভালোবাসায় গলে গেলে চলবে না। বাজিয়ে নিতে হবে। যাচাই করে

নিতে হবে। সহজে ছেড়ে দেব না। শুধু মন খুশি হলেই হয়ে গেল তা হবে না, চর্মচক্ষুকেও প্রসন্ন করা চাই।

এক হাতে টাকা আরেক হাতে মাটি নিয়ে গঙ্গার পারে বসেছিলেন ঠাকুর। টাকা মাটি মাটি টাকা বলছিলেন বার-বার। কোন্ হাতে যে টাকা আর কোন্ হাতে যে মাটি, আলাদা আর কোনো চেতনা ছিল না। দুইই এক। সমতুল্য তো বটেই, সমমূল্য। দুইই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গায়। সেই থেকে ঠাকুর টাকাকড়ি ছুঁতে পারেন না। কামনা আর কাঞ্চন দুইই ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু মুখের কথা মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দেখতে হবে পরীক্ষা করে। ধরতে হবে কোথায় রয়েছে কপটতা। চুপিচুপি চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরটিতে উঁকি মেরে দেখল ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে। এইই উপযুক্ত সময়। কেউই জানতে পারবে না নরেনের কারসাজি। ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করল নরেন। রুপোর টাকা। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। কেউ দেখতে পায়নি তো? না, কেউ নেই ধারে-কাছে। সন্তর্পণে তারপর সরে পড়ল নরেন। সে তল্লাটেই আর রইল না। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী।

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। তাঁকে দেখে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। ভালোমানুষের মত মুখ করে নরেনও এসে দাঁড়াল এক কোণে। মনে-মনে আস্ফালন করতে লাগল এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। যত লম্বাই-চওড়াই।

ঘুণাক্ষরে কিছুই জানেন না ঠাকুর। যেমন নিত্য বসেন তেমনি বসলেন তাঁর বিছানায়। কিন্তু মুহূর্তমাত্রমধ্যে এ কী হল! যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে বসেছেন এমনি আর্তনাদ করে উঠলেন। লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। এ কি, বিষাক্ত কিছু হঠাৎ দংশন করল নাকি? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। কই কিছু দেখছি না তো কোথাও। নরেনই শুধু নড়ল না এক চুল।

একজন সহসা ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং-টং করে একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা কি ছিটকে পড়ল? একটা টাকা না? আশ্চর্য, বিছানায় এল কি করে? তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল নরেন। পলকে বুঝতে পারলেন ঠাকুর। নরেন আমাকে পরীক্ষা করছে। কোথায় বিরক্ত হবেন, তা নয়, আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

এই তো চাই। মুখের কথায় মেনে নিবি কেন? শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি যেমন করে শানের উপর আছড়ে-আছড়ে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ন চোখে দেখে নেয় মালের দোষত্রুটি। ভক্ত হয়েছিস তো বোকা হবি কেন? কেন পরের মুখের ঝাল খাবি? নিজে দেখে-শুনে বুঝে-সমঝে নিবি। হয় এসপার নয় ওসপার। সন্দেহ রাখবিনে। হয় স্বীকৃতি নয় প্রত্যাখ্যান। চলে আয় সত্যের স্থৈর্যে। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

এসে দেখলে ঠাকুরের বিছানা ময়লা। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

ঠাকুরের মাথায় যেন কে লাঠির বাড়ি মারল। টাকার কথা শুনে প্রায় মুহ্যমান হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বললেন, 'তুমি যদি অমন কথা আর মুখে আনো তাহলে আর এসো না এখানে। জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই। কাছে রাখবারও জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তখন আরেক বুদ্ধি ফাঁদল। বললে, 'বেশ তো, আপনি না রাখুন, আপনার ভাগ্নে হৃদয়ের কাছে রেখে যাই। সেই নাড়বে-চাড়বে, খরচ করবে।'

'তোমার কি বুদ্ধি! হৃদয়ের কাছে রাখা যা আমার কাছে রাখাও তাই।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তাকিয়ে রইল বোকার মত।

'হৃদয়ের কাছে থাকলে একে দে, ওকে দে, আমাকেই বলতে হবে।' ঠাকুর প্রাঞ্জল করলেন কথাটা। 'আমার কথা মত না দিলে আমি হয়তো রেগে উঠব, নানারকম বিকার শুরু হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস থাকলেই ছায়া পড়বে। ও সব হবে না। ও সব মুখে এনো না খবরদার।'

দশ-দশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিলেন অক্লেশে। মথুরবাবু তালুক-মুলুক দিতে চেয়েছিলেন, হ্যাক-থু করে দিলেন। অথচ সামান্য কটা টাকার জন্যে নরেন হা-পিত্যেশ করছে। দোরে-দোরে ঘুরছে হন্যের মত। এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। যে করে হোক ধরতে হবে জোর করে। আদায় করে নিতে হবে। নইলে তিনি আছেন কি করতে? তিনি আপনার লোক থাকতে নরেনকে সইতে হবে অনটন?

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

'কি বলব?' যেন কত অসহায় এমনি করে তাকালেন ঠাকুর।

যাতে আমার টাকা পয়সার কিছু সংস্থান হয়, স্থায়ী একটা চাকরি-বাকরি জোটে! মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের মত।

'ওরে ওসব বিষয় বলতে পারি না মাকে।'

'ও সব বাজে কথা। আপনি বললে নিশ্চয়ই মা মুখ তুলে চাইবেন। বলতেই হবে আপনাকে।' নরেন পিড়াপিড়ি সুরু করল। 'নইলে ছাড়ব না আজ কিছুতেই। আপনার পা ধরে পড়ে থাকব।'

ঠাকুরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি মা, নরেনের দুঃখ কষ্ট দূর কর্। নরেনকে টাকা দে। চাকরি দে—'

'বলেছেন?'

'কতবার বলেছি।'

'কী বললেন আপনার মা?'

'বললেন, তোমার ডাকে হবে কেন ? যার অভাব সে এসে বলুক। সে এসে চা'ক।'

'সে কি, আমাকে বলতে হবে ?'

'হ্যাঁ, তুই গিয়ে একবার বল। মার কাছে বসে মাকে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'সে জন্যেই তো হয় না কিছু। তার জন্যেই তো এত কষ্ট। তুই মাকে মানিসনা বলে মা আমার কথাও কানে নেন না। শোন্।' নরেনের কাঁধে হাত রাখলেন ঠাকুর। 'আজ মঙ্গলবার। শুভদিন। রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মার কাছে মা দিয়ে দেবেন।'

'সত্যি ?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

এত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা ! শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ ! এতেই ইন্দ্রত্বলাভ !

রাত্রি এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর নরেনকে পাঠিয়ে দিলেন মন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর্। তারপর চা প্রাণ ভরে।

মন্দির নির্জন। চার দিক নিস্তব্ধ। নরেন ভবতারিণীর সামনে দাঁড়াল মুখোমুখি। ভুবন আলো করে আছেন মা। সমস্ত অঙ্গ থেকে যেন ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা। স্নেহপরিপূর্ণ বিশাল দুটি চোখে চেয়ে আছেন। যেন কোথাও শোকদুঃখের লেশ নেই, নেই অভাবের মেঘচ্ছায়া। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন। তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

হাসিমুখে সম্ভাষণ করলেন ঠাকুর। 'কি রে, গিয়েছিলি মার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি ?'

'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল।' তন্ময়ের মতই বললে নরেন।

'ভুল হয়ে গেল কি রে! যা যা ফের যা। গিয়ে ফের প্রার্থনা কর।' ঠাকুর আবার তাকে ঠেলে দিলেন, 'কেন ভুল হবে ? মাকে গিয়ে বল্, মা, আমাকে চাকরি দে, সুখৈশ্বর্য দে।'

নরেন আবার গিয়ে দাঁড়াল ভবতারিণীর সামনে। যেন চোখের উপর চোখ রেখে তাকালেন ভবতারিণী। যেন হাসলেন মৃদু মৃদু। দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুছে গেল দৈন্যকালিমা।

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে, চেয়েছিলি ?'

'পারলুম না। বেরুলনা মুখ দিয়ে।' মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন।

'তুই তো আচ্ছা বোকা দেখ্ছি।'

'মাকে দেখামাত্রই চোখে কেমন ঘোর লাগে। কি যে চাই তা আর মনে করতে পারিনা।'

'দূর ছোঁড়া। ঘোর লাগলেই বা তুই ঘুরে পড়বি কেন ? নিজেকে সামলে

নিবি। মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি যা চাইবার। যা, আরেকবার যা। ঘাবড়াসনে—'

আরেকবার গিয়ে দাঁড়াল নরেন। দেখল চোখের সামনে সর্বকামবরদা বসে আছেন। যা চাইব তাই দিয়ে দেবেন অকাতরে। আর দাঁড়াল না, আভূমি নত হয়ে পড়ল নরেন। বললে, মা, 'মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' প্রণাম করতে লাগল বারে-বারে।

'কি রে চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন ঠাকুর।

মাথা নত করল নরেন। বললে, 'চাইতে লজ্জা করল।'

'লজ্জা করল। লজ্জা করল।' আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'যা, কিছু ভয় নেই। মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবেনা কোন দিন।'

সারা রাত কালীর গান গাইল নরেন। ঘুমুতে গেল সকালবেলা, দুপুর পর্যন্ত ঘুম।

'মাকে আগে মানতনা, কাল মেনেছে।' পরদিন বৈকুণ্ঠকে বলেছেন ঠাকুর। 'কষ্টে পড়েছিল বলে পাঠিয়েছিলুম মার কাছে। টাকাকড়ি সুখসম্পদ বলে দিয়েছিলুম চাইতে। কিন্তু পারল না, লজ্জা করল! চেয়ে নিল জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য! কি মজা! কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে—'

১২

মা মেনেছে নরেন। অরণ্যকুটিল পাহাড়ের দেশে হাঁটতে-হাঁটতে তার মিলে গিয়েছে ঝরনা। স্বচ্ছচক্ষু স্নিগ্ধগাত্রী প্রবাহিনী। জ্ঞান-তর্ক-সন্দেহ-বিচারের দেশে মিলে গিয়েছে তার ভক্তি, অচলা ভক্তি। বিগলিত তরলতা।

আর কি চাই! মা আছেন আর আমি আছি।

নির্ভর্ষণ নিষ্কিঞ্চন শিশু হয়ে মায়ের কোলে চড়ে বসেছে নরেন। ক্ষেমংকরীর খাসতালুকের প্রজা হয়েছে। এবার কে উচ্ছেদ করে! কে নামায় কোল থেকে! কোল থেকে নামাবেই বা কোথায়! যেখানে নামবে সেখানেই মায়ের কোল। মায়ের কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই।

কলকাতার চাঁপাতলায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের একটা শাখা বসেছে। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে সে ইস্কুলে হেডমাস্টার হল নরেন। বি-এ পাশ করেছে, ভাবলে এবার আইন পড়ি। কালসাপ সরিকের দল পৈত্রিক বাড়ি-ঘর কেড়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিতে হবে সেই ন্যায্য স্বত্ব। লড়তে হবে আইনের জোরে। নির্মূল করতে হবে বে-আইনি।

কিন্তু কী হবে শুধু শুকনো কথার বোঝা বয়ে? ঠাকুর বলেছিলেন না, চাল-কলাবাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমি কী করব? আর মৈত্রেয়ী বলেছিল না, ভারতবর্ষের সেই শাশ্বতী বাণী, যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?

'আমি পঞ্চবটীতে বসে সাধন করব।' একদিন বললে এসে ঠাকুরকে।

'সে কি রে? সস্নেহ কৌতূহলে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, এ জন্ম বয়ে যেতে দেব না। যখন খবর একবার পেয়ে গেছি, যে করেই হোক বার করব তাঁকে। এ দেহের খনির ভিতর থেকেই উদ্ধার করব সেই স্পর্শমণি।'

দীপ্ত চোখে হাসলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে দিবি?'

'ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে আরো কিছু বেশি চাই।'

'সে আবার কি!'

'দেবেন, একটা ওষুধ দেবেন আমাকে?' হাত পাতল নরেন।

'কেন, কি হল তোর?'

'এমন একটা ওষুধ যা খেয়ে সব ভুলে যেতে পারি। এ পর্যন্ত যা-কিছু পড়েছি যা-কিছু শিখেছি—সমস্ত। পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু যা-কিছু এতদিন জেনেছি-শুনেছি তা ছাড়ি কি করে? না ছাড়লে যে প্রাণ বাঁচে না।'

পঞ্চবটীতে ধুনি জেবলে সাধন করে নরেন। বাইরে যেমন আগুন অন্তরেও তেমনি। পাবক শুধু জবলে না পবিত্র করে। শুধু দগ্ধ করে না দীপ্ত করে। অদৃশ্যকে দর্শন করায়। মাস্টারি ছেড়ে দিল নরেন। ছেড়ে দিল আইন-পড়া। সিদ্ধিও চাই না, ঋদ্ধিও চাই না, শুধু তোমার দর্শন চাই। তুমি আমার চোখের জিনিস আমার স্পর্শের জিনিস হয়ে থাকো। চোখের জিনিসে তুমি জ্ঞান, স্পর্শের জিনিসে তুমি ভক্তি। তোমাকে শুধু দেখে ষোলআনা সুখ নেই। পরিপূর্ণ আনন্দ তোমাকে ধরে।

আরেক দিন ছুটে গেল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন।'

ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'যেমন শুকদেবের হত। এক-নাগাড়ে পাঁচ-ছ দিন সমাধিতে ডুবে থেকে শরীর রাখবার জন্যে খানিকটা নেমে আসতেন। আবার তক্ষুনিই উঠে যেতেন উপরে। তেমনি ইচ্ছে করে আমার। দেহটাকে কোনো রকমে টিঁকিয়ে রেখে সমাধিতে ডুবে যাই।'

মুখের উপর ধিক্কার দিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! তোর এত ছোট নজর!'

স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তুই শুধু তোর নিজের মুক্তি চাস? আর এই যে সব অসংখ্য অসহায় জনগণ, তাদের কি হবে? তারা কোথায় যাবে?'

চুপ করে রইল নরেন।

'ভেবেছিলুম তুই বিশাল একটা বটগাছের মত হবি আর তোর ছায়ায় হাজার-হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা তোর কিনা এই ছোট নজর! আর সবাইকে

বঞ্চিত করে নিজে শুধু রাজভোগ খাবি? সেই রাজভোগের ভাগ দিবিনে আর সবাইকে?'

নরেনের মুখে কথা নেই।

'শোন, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপূজন—বৈষ্ণবধর্মের এই সারকথা। কিন্তু জীবে দয়া আমি বলতে পারব না। দয়ার মধ্যে একটা অহঙ্কারের ভাব আছে। যে অর্থী সে নিচে দাঁড়িয়ে আর যিনি দাতা তিনি যেন টঙে ব'সে। দূর শালা! কীটানুকীট, তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর কিসের স্পর্ধা?' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর অনুরাগে গাঢ় হল ঠাকুরের: 'না, না, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা জীবে প্রেম জীবে সেবা। শুধু অমনি-অমনি সেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। তখন সে সেবা পূজা, সে সেবা আরতি!'

ঠাকুরের নতুন সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হল নরেন। মানুষকে অন্নের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে সমান করা নয়, অমৃতের ক্ষেত্রে উন্নীত করে সমান করা। শুধু পঙক্তির সাম্য নয়, পাত্রের সাম্য। সকলে আমরা অমৃতের সন্তান, ঈশ্বরের বিত্তে আমাদের সমান অংশ, এই সাম্যবাদ।

ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজছ, বললেন তাই বিবেকানন্দ। বহুরূপে তোমার চোখের সামনেই তিনি বিরাজ করছেন। এদেরকে উপেক্ষা করে কোথায় খুঁজছ সেই অশরীরীকে? হাতের কাছে রয়েছে যেসব দুঃখ আর দুর্গত, পীড়িত আর বঞ্চিত, তাদের সেবা করো, ভালোবাসো, হাত ধরে টেনে তোলো দুঃখ আর দারিদ্র্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে। সেই সেবা সেই ভালোবাসাই ঈশ্বরপূজা।

দয়া নয়, দ্বেষ নয়, দম্ভ নয়—ভালোবাসা! আর, সংসারে কে না জানে ভালোবাসতে? সে শুধু নিজেকে ভালোবাসা, নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে ভালোবাসা। এবার একটু পরকে ভালোবাসতে শেখো। পরই পরম। পরকে ভালোবাসা মানেই পরমকে পূজো করা। যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়—এ গানটা একদিন গেয়েছিলি না? আবার গা সেই গান। সব তিনি। কাঠে-মাটিতে তিনি থাকতে পারেন, রক্তে-মাংসে থাকতে পারবেন না? প্রতিমায় তাঁর আবির্ভাব হয় মানুষে হবে না? তিনি-কে তুমি কর্। তিনি হচ্ছেন জ্ঞান, তুমি হচ্ছে ভালোবাসা। মানুষকে যখন ভালবাসতে পারবি তখনই তিনি তুমি হয়ে উঠবেন। আমিই সেই, এ-কথা নয়। ও-ই সেই, এ কথাও নয়। তুমিই সেই এইটিই আসল সাধন।

নরেন গান ধরল।

শুনতে-শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ। বলেন, 'নরেনের গান শুনলে আমার ভিতর যিনি আছেন তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

'নরেন আমার নিত্যসিদ্ধ।' বলছেন ঠাকুর, 'জন্মে-জন্মে ঈশ্বরভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু-একটু ভক্তি হয়, নরেনের আজন্ম ভক্তি।'

সেই ধ্রুবের কথা মনে করো। বিষ্ণুকে দর্শন করে বালক ধ্রুবের বড় অহঙ্কার হয়েছিল। ভাবলে, এই একটু ডেকে এমনি কম সাধনায় ঈশ্বর পাওয়া যায়? এমন সময় নারদ এসে হাজির। এসো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে চলো। হাঁটতে-

হাঁটতে দুজনে চলে এল একটা পাহাড়ের কাছে। মস্ত উঁচু পাহাড়। শাদা ধবধব করছে। ধ্রুব জিগগেস করলে, ওটা কি? নারদ বললে, হাড়ের পাহাড়। কার হাড়? মানুষের? হ্যাঁ, তোমার। বললে নারদ, যতবার আসা-যাওয়া করেছ সংসারে ততবারের হাড় ওখানে জমা আছে। এত? ধ্রুবের মুখে আর কথা নেই। আমি এতবার জন্মেছি-মরেছি? মাথা হেঁট করল ধ্রুব। ধুলো হয়ে গেল তার অহঙ্কার। কিন্তু লক্ষ জন্মেও নরেনের ভয় নেই।

'লাখ জন্ম হলেই বা আমার ভয় কি।' বললে বিবেকানন্দ, 'আমি ভক্তি নিয়ে থাকব। ভালোবাসার বেসাতি করব। আকণ্ঠ পান করব প্রেমসুধা।'

আবার বললে, আমি হব বৃষ্টিবিন্দু। বারে-বারে ঝরে পড়ব। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে নয়। সমুদ্রে পড়লে আমি তো লুপ্ত হয়ে যাব, সিন্ধুর মাঝে লয় হয়ে যাবে আমার বিন্দুসত্তা। আমি নির্বাণ চাই না, চাই না বিলুপ্তি। আমি ঝরে পড়ব শুকনো-মলিন ধুলির উপর। মুছে দেব তার দাহ, মিটিয়ে দেব তার তৃষ্ণা। আর্দ্র করব স্নিগ্ধ করব পবিত্র করব।

ঠাকুর বললেন, 'নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি? কেবল ফুলের উপর বসে মধু পান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস আস্বাদন করে বেড়ায় বিষয়রসের দিকে যায় না।'

'নরেন আমার খানদানী চাষা', বললেন আবার ঠাকুর, 'বারো বচ্ছর অনাবৃষ্টি হলেও খানদানী চাষা চাষ ছাড়ে না। মা-ভাইয়ের কষ্ট শুনে বলি, যা, কালীঘরে যা, যা চাইবি মা তাই দেবে। তা টাকাকড়ি চাকরি-বাকরি না চেয়ে চাইলে কিনা বিবেক-বৈরাগ্য!'

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর, 'মা তোমাকে একটি শক্তি দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি।'

নরেন তো অপ্রস্তুত, কিন্তু কেশব মহা খুশি। পরশ্রীতে আনন্দিত হওয়াই ঈশ্বরভক্তি।

কেশবের বাড়িতে 'নব বৃন্দাবন' নামে নাটক হচ্ছে। তাতে এক সাধুর পার্ট নিয়েছে নরেন। ঠাকুর দেখতে এসেছেন। সাধুর সাজে কেমন না জানি দেখতে হয়েছে নরেনকে।

'ঠিক হয়েছে। এই ঠিক হয়েছে।' রঙ্গমঞ্চে নরেনের আবির্ভাব হওয়ামাত্রই ঠাকুর তাঁর সিট ছেড়ে লাফিয়ে সোল্লাসে বলতে লাগলেন, 'এমনটিই সেদিন দেখিয়েছিল মা। এমনি হুবহু।'

নেমে আসতে সংকেত করলেন নরেনকে। সংকেতে কিছু হবে না। সোজাসুজি ডাকতে লাগলেন চেঁচিয়ে, 'ওরে নেমে আয়, কাছে আয় আমার, তোকে একটু দেখি ভালো করে।'

এমন অবস্থায় কখনো নামা যায় নাকি? নরেন রাজি হল না।

তখন কেশব পিড়াপিড়ি করতে লাগল। যাওনা নেমে উনি যখন বলছেন অত করে।

নেমে এল নরেন। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুর তার হাত চেপে ধরলেন। বললেন,

'দ্যাখ তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। এই আলখাল্লা এই পাগড়ি এই লাঠি.। ঠিক-ঠিক মিলে গেছে। আহা, কী সুন্দর তোকে দেখতে হয়েছে নরেন !'

১৩

কই, নরেন কই ? নরেনকে দেখছি না কেন ? সিমলেয় মধুরায়ের গলিতে রাম দত্তের বাড়ি এসেছেন ঠাকুর। একঘর লোক অথচ নরেন নেই। একথালা ব্যঞ্জন কিন্তু নুন নেই। সেই তীক্ষ্ণতম আস্বাদটি নেই।

'তার মাথার অসুখ করেছে। বললে রাম দত্ত।

'সে কি ?'

'মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে বাড়িতে। ভীষণ যন্ত্রণা।' কে আরেকজন বললে, 'আলোয় চোখ খুলতে পারছে না।'

'ওরে তাকে কেউ এখানে ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কাতর মুখে বললেন, 'তাকে না দেখে যে থাকতে পারছি না।'

কালিপ্রসাদ আর নিরঞ্জন—ঠাকুরের আর দুই ভক্ত—গেল নরেনের বাড়ি। সত্যিই তো। নিচের ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে তক্তপোষে শুয়ে আছে নরেন। মাথায় গামছা বাঁধা। মুখে অস্ফুট আর্তনাদ।

'রামবাবুর বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন।' বললে কালীপ্রসাদ। 'তোমাকে দেখতে চাইছেন একবার।'

'আমার প্রণাম জানিও তাঁকে।' বেদনাচ্ছন্ন স্বরে নরেন বললে। 'বোলো আমি মাথা তুলতে পারছি না। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সাধ্য নেই উঠে বসি।'

'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি।'

'কিন্তু কি করে যাই। আলোয় তাকাতে পারছি না। আলোয় চোখ খুললে আরো বেশি যন্ত্রণা !'

'কিন্তু ও সব আমরা শুনছি না।' দুই বন্ধু পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'ঠাকুর যখন তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন তখন তোমাকে যেতেই হবে। যে করে হোক নিয়েই যাব তোমাকে।'

'চোখ খুলতে না পারলেও ?'

'হ্যাঁ। থাক না তোমার চোখ বাঁধা, আমরা দুজনে তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব রাস্তা দিয়ে।'

নরেন উঠল। চোখের উপর দিয়ে আঁট করে বাঁধন দিল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ধরো।'

কষ্টের মধ্যে দিয়ে ডাকলে, হাঁটিয়ে নিয়ে চললে কণ্টকের উপর দিয়ে। কিন্তু আমি জানি এই কষ্টই তোমার কৃপা, এই কণ্টকেই তোমার কুসুমের অঙ্গীকার। অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে হাঁটি বা মোহান্ধের মত খোলা-চোখের অহঙ্কারে, জানি, প্রভু, তোমারই ডাকে চলেছি, চলেছি তোমারই দুয়ারে। পথ জানি আর না জানি, পথই আমাকে পথ দেখাবে। পথে যখন একবার নেমে পড়েছি তখন

জানি তুমিই পথ ভেঙে আসবে এগিয়ে, পথের দৈর্ঘ্য কমাবে, ক্লান্তি কমাবে। তুমি তো শুধু পথের শেষে নও, তুমি যে পদে-পদে।

নরেনকে দু-বন্ধু হাজির করল ঠাকুরের কাছে। সামনাসামনি বসিয়ে দিল।

'কি রে, কি হয়েছে তোর মাথায়?' পদ্মহাতখানি সস্নেহে তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। ভোজবাজি হয়ে গেল। সকল যন্ত্রণা উড়ে গেল কর্পূরের মত।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল নরেন, 'এ কি, কি আশ্চর্য, আমার মাথায় আর বেদনা নেই।' টান দিয়ে খুলে ফেলল গামছা। 'সত্যি, আলোর দিকে তাকাতে পারছি। সব দেখতে পারছি সহজে। এতটুকু কষ্ট নেই। ভার নেই। হালকা হয়ে গেলাম মুহূর্তে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। তবে আর কি। এবার আমার তানপুরোটা নিয়ে এস। মুক্তকণ্ঠ বিহঙ্গের মত আমি গান গাই। ভবভারহরণ আমার সর্বক্লেশ বিমোচন করেছেন। আর্তনাদকে রূপান্তরিত করেছেন সঙ্গীতে।

তিন-তিনঘণ্টা পুরো গান গাইল নরেন।

চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও চুম্বককে টানে। চুম্বক কি করবে যদি লোহাকে না পায়! গুরু কি করবে যদি তার শিষ্য না জোটে। যদি রসিক পাঠক না থাকে তবে কবির দাম কি। ভগবানও ব্যর্থ যদি তাঁর ভক্ত না মেলে! কৃপা যিনি ঢালবেন তিনি কী করবেন তাঁর অকৃপণ ভাণ্ডার নিয়ে যদি তাঁর না জোটে কৃপাপাত্র। আমি-তুমি ছাড়া আর সেই কৃপাপাত্র কোথায়! দিতে কৃপা নিতে প্রসাদ!

'নরেন আমার খানদানী চাষা। বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।' বারে বারে বলেন ঠাকুর: 'কত ভক্ত কত কামনামাখানো জিনিস নিয়ে আসে আমার জন্যে। খেতে পারি না। আর কাউকেও দিই না, পাছে কামনার ছোঁয়ায় ভক্তির উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু নরেনকে দিই। নরেনের ঘর আলাদা থাক আলাদা। ও হচ্ছে জ্বলন্ত দাবানল। জ্ঞানের দাবানল। কামনা-টামনা সব পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। দেখছিস না ধ্যানের আবেশে চোখের মণি উপর দিকে উঠেই আছে। ঘুমোলেও দেখেছি একেবারে বোজে না। ওর লক্ষণ সব মহাযোগীর মত। আহা, তাইতেই তো এত আদর করি।'

পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। আর ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ। ধ্যান নয় যেন আগুনের শিখা। কোথাও হাওয়ার রেখা পর্যন্ত নেই, একেবারে অচঞ্চল। গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যায় জানতেও পারেনা। মাথায় পাখি এসে বসে খেয়াল নেই। ব্যাধ পাখি মারবার জন্যে তাক করছে, লক্ষ্যও নেই কাছ দিয়ে রোশনাই-বাজনা গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে বরের শোভাযাত্রা চলে গেল। বর দেখলে? কোথায় বর? আমি শুধু আমার বরেণ্যকে দেখছি। আমার ঈপ্সিতকে। আমার লক্ষ্যস্থলকে।

চক্র আবর্তিত হচ্ছে একটি ধ্রুব বিন্দুকে আশ্রয় করে। স্থির বিন্দু, কিন্তু নির্লক্ষ্য। সেই স্থির বিন্দুর নামই ঈশ্বর। সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধরে ঘুরছে এই বিশ্বচক্র। ঠাকুর বললেন, যদি এমনি ঘোরো হাত ছেড়ে

দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, কিন্তু একটা খুঁটি ধরে ঘোরো, পড়বেনা। বিশ্বসংসারও এই খুঁটি ধরে ঘুরছে। খুঁটি ধরে ঘুরছে বলেই পড়ছে না ছত্রখান হয়ে। এই খুঁটিই ভগবান।

কি দেখছ? দ্রোণাচার্য জিগগেস করলেন অর্জুনকে। চারদিকে এই যে বন-বনানী প্রান্তর-কান্তার, তা দেখছ? অর্জুন বললে, না। রাজা-রাজড়ারা এসেছেন, তাঁদের দেখছ? উত্তর হল, না। চক্র দেখছ? না। পাখি দেখছ? না। তবে কী দেখছ? পাখির চক্ষু দেখছি।

যেই পাখির চক্ষু দেখল অমনি লক্ষ্যভেদ করল অর্জুন।

তেমনি যদি জীবনের লক্ষ্যভেদ করতে চাও তো ঈশ্বরকে তাক করো।

কী জীবনের উদ্দেশ্য? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হেসে-খেলে বয়ে যাওয়া? তার মানে যে কটা দিন বেঁচে আছি স্ফূর্তি করে যাওয়া? বেশ, মেনে নিলুম, আনন্দই জীবনের উদ্দেশ্য। আনন্দই যখন জীবনের উদ্দেশ্য তখন প্রতি মুহূর্তে অধিকতর আনন্দই জীবনের নিশানা। এক শৃঙ্গ থেকে আরেক তুঙ্গতর শৃঙ্গ। কোথাও থামা নেই, আর নয় আর নেই বলে বসে পড়া নেই। মাত্রাহীন যাত্রা। আরো চাই আরো চাই। আরো আলো আরো সুখ। অধিকতরোর সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও এক অধিকতম এক পরমতমকে সংকেত করছি। অধিকতম সুখ, পরমতম শান্তি। তার নাম দিবিনে একটা? সেই অধিকতম সুখ সেই পরমতম শান্তির নামই ঈশ্বর।

তবে জীবনের উদ্দেশ্য, এক কথায়, ঈশ্বরলাভ।

ঈশ্বর কি বাইরের জিনিস যে তাকে পাব? ঈশ্বর ভিতরের জিনিস, তাকে উদ্ধার করব, উদ্ঘাটিত করব। ঈশ্বর পাব না, ঈশ্বর হব। হওয়াই পাওয়া। একটুখানি হওয়া মানে আরো একটুখানি পাওয়া। আরো একটুখানি হওয়া মানে আরো একটুখানি পাওয়া। বড় হওয়া ভালো হওয়া। বৃহৎ হওয়া মহৎ হওয়া। বৃহতের ও মহতের শেষ সীমাই ঈশ্বর।

'অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন বড় দীঘি, যেন হালদার পুকুর।' বললেন ঠাকুর, 'অন্যেরা কলসী ঘটি, নরেন জালা।'

কেউ কলায়ের ডালের পোর, কেউ নারকোলের পোর, কেউ বা ক্ষীরের পোর। নরেন আমার ক্ষীরমোহন।

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।'

সন্ধের পর সেদিন ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। কিন্তু গাড়ি যোগাড় হচ্ছে না।

'তাই তো কার গাড়িতে যাই!' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করছেন ঠাকুর।

সে একটা ব্যবস্থা হবেই। ঠাকুর যদি মনস্থ করে থাকেন কলকাতায় যাবেন তা কখনো অপূরণ থাকবেনা। প্রদীপ জ্বালা হল ঠাকুরের ঘরে। মন্দিরে শুরু হয়েছে আরতি। রশুনচৌকি বাজছে। এসেছে শ্যামসুন্দর সন্ধ্যা। নামকীর্তন করছেন ঠাকুর। ছোটখাটটিতে বসে মায়ের ধ্যান করছেন। আরতির ঘণ্টা থেমে

গেল। ঠাকুর উঠে পাইচারি সুরু করলেন। অনেক ভক্ত এসেছে, মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন দু-একটা। আর থেকে-থেকে মাস্টারকে বলছেন, কই, গাড়ি কই ?

গাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, না, আর কিছুর জন্যে ?

এমন সময়—মহাযান—স্বয়ং নরেন এসে উপস্থিত।

'এসেছিস, তুই এসেছিস ?' ঠাকুর ছুটে এসে ধরলেন নরেনকে। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ধারা তার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। স্নেহভরা বিহ্বল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এসেছ, তুমি এসেছ !'

নরেন এসেছে, আর কি কলকাতায় যাওয়া যায় ! মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর : 'কি বলো ! আর কি কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানে হয় ?'

গাড়ি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেত, আর এ বৃহৎযান নরেন, এ আমাকে নিয়ে যাবে পৃথিবী ছাড়িয়ে, আকাশের ওপারে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের দেশে, কে জানে কোন নিষেধহীন নিমেষহীন স্তব্ধতায় !

১৪

রাম দত্তের বাড়ির চাকর লাটু—দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সেবায় লেগেছে। ঠাকুর তাকে ডাকেন লেটো। আর নরেন ডাকে, প্লেটো।

'ওরে প্লেটো, এক কলকে তামাক ভালো করে সেজে খাওয়া না।' হুকুম করে নরেন।

তখুনি তামিল করে লাটু। যে যা বলে তাই করে দেয়। লোকসেবাই তার ঈশ্বর-আরাধনা।

প্রথম যখন যোগীন এল ঠাকুরের কাছে, বললে, আমি থাকব আপনার এখানে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, রাতে কি খাস ?

'আধসের আটার রুটি আর এক পোয়া আলুর চচ্চড়ি।' যোগীন বললে।

'তোকে আমার সেবা করতে হবেনা। রোজ আধসের ময়দা, অত বাপু যোগাতে পারবনা। তার চেয়ে বরং তুই বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে এখানে আসিস।'

লাটুও খুব খেতে পারে। একসের দু-সের আটা একেকবেলা উড়িয়ে দেয়। 'খাওয়া কমা, খাওয়া না কমালে ধ্যানধারণায় মন বসবেনা।' এমন খাওয়া কমিয়ে দিল লাটু, খিদের চোটে পেটে ব্যথা হবার যোগাড়। তখন আবার তিরস্কার। 'ওরে অতটা ভাল নয়। শরীর রাখবার জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু খাবি। দিনে বারুদঠাসা করে খেতে পারিস, কিন্তু খবরদার, রাতে একেবারে হালকা।'

শরীর তো বীণা। তাকে যদি না বেঁধে নিস জোর করে, ঈশ্বরসুরলহরী ফুটবে কি করে ?

কিন্তু নরেন ? নরেনের কথা আলাদা, থাক আলাদা। সে তো রোগী নয় যে

তার পথ্য বরাদ্দ হবে। সে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নি। সব পরিপাক করে নেবে, আত্মসাৎ করে নেবে।

'ওগো নরেন আজ এখানে খাবে।' নহবৎখানায় শ্রীমাকে উদ্দেশ করে বলছেন ঠাকুর, 'মোটা-মোটা আটার রুটি করো আর ছোলার ডাল। রুগীর পথ্যি হয় না যেন।'

দক্ষিণেশ্বরে মাংস রান্না হচ্ছে সেদিন। সেদিকে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর দেখে ফেলেছেন।

'কি হচ্ছে রে?'

'মাংস রান্না হচ্ছে।'

'মাংস?'

'হ্যাঁ, নরেন খাবে।'

আর কথা নেই। যখন নরেন খাবে তখন আর কথা কি। আর সব কলসী ঘটি, নরেন জালা। অন্য পদ্ম কারু দশদল কারু ষোড়শদল কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন সহস্রদল।

'ওকে অনেক কাজ করতে হবে।' আপন মনেই যেন বলছেন ঠাকুর, 'একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে পারবে কেন? ওর মধ্যে জ্ঞানঅগ্নি জ্বলছে, ও যা খাবে সব হজম হয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না।'

কত ভক্ত কত কিছু কামনা করে ভোগ দেয় ঠাকুরকে। সে সব অশুদ্ধ ভোগ। সে সব ফেলে দেওয়া উচিত আগুনে। কিন্তু এত ভালো-ভালো খাবার নষ্ট করে দেওয়া হবে? কেন, নরেনকে খেতে দাও, নরেন খাবে। বললেন ঠাকুর। নরেন্দ্র পবিত্র পাবক। সর্বসহ, সর্বদহ বিশুদ্ধাত্মা।

থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন সেখানেও ঠাকুরের প্রথম জিজ্ঞাসা: 'ওহে নরেন্দ্র এসেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছে। বসেছে ঐ দিকে।'

ঠাকুর হাসলেন, সুস্থ হলেন। ওরে ও আমার বল, ও আমার আশ্রয়-আশ্বাস।

অভিনয়ের শেষে গিরিশ ঘোষকে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'এ কি তোমার থিয়েটার, না, তোমাদের?'

'আজ্ঞে, আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমাদের কথাটিই ভালো।' বললেন ঠাকুর, 'আমার বলা ভালো নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি। এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকে বলে।'

আমি নিজেই এসেছি! কি আশ্চর্য, তুমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছ পৃথিবীতে? নির্বাচন করে নিয়েছ তোমার বাড়ি-ঘর, তোমার জাতি-কুল, তোমার বাপ-মা, তোমার পরিধি-প্রতিবেশ। কোথা থেকে তোমার আরম্ভ, এবং কবে থেকে? তোমার ইচ্ছেতেই তোমার মৃত্যু? আর, ঠিক তোমার মনোনীত সময়ে? যখন প্রথমে ও শেষে কোথাও আমি বলে কিছু নেই, শুধু মাঝখানের এই সেতুপথটিতেই অহংকর্তৃত্ব? কি সাধ্য তুমি এক পা ফেল তোমার নিজের ইচ্ছেয়?

তুমি নিজেই এসেছ? পথে ঠিক ঠিক গাড়ি-ঘোড়া চলেছিল, পথ পিছল ছিলনা, তুমি আছাড় পড়নি, ঘটেনি কোনো দুর্ঘটনা—তবে না তোমার আসা? তাই তোমার ইচ্ছে নয়, তাঁর ইচ্ছে, তাঁর কৃপা। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দুর্গা-দুর্গা বলি, কিন্তু সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে এসে আর বলিনা দুর্গা-দুর্গা। আমরা এমন অকৃতজ্ঞ।

সব যদি তাঁরই কৃপা, তবে সে কৃপা আকর্ষণ করব কি করে? কর্ম করে। কৃ—কর; পা, পাবি। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তুই যদি বসে থাকিস ভগবানও বসে থাকবেন। কৃপা যে নিবি, পাত্র চাই। শূন্য পরিচ্ছন্ন পাত্র চাই। পাত্র যদি বাসনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তাতে সুধাসার নিবি কি করে? পাত্র শূন্য কর্। অনেক ক্লেদ অনেক গাদ জমে আছে, তাকে মার্জন কর্। বাসন মাজবার জন্যে শক্ত একটা ঝামা চাই। কর্মই তোর সেই ঝামা। কর্ম করে-করে শূন্য কর্ শুদ্ধ কর্ নিজেকে, দেহ-মনকে প্রসাদধারণের পবিত্র পাত্র করে তোল্।

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হ্যাঁ, তাই।' সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'

'সবই বিদ্যার।' নরেন জোর গলায় বললে।

'হ্যাঁ, ওটি চরম জ্ঞানের অবস্থা—' সায় দিলেন ঠাকুর।

নরেন সেই প্রজ্বলন্ত জ্ঞান।

থিয়েটারের বসবার ঘরে কথা হচ্ছে। ঠাকুর বললেন, 'একটু গান গা!'

নরেন গান ধরল: 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী।' গানের এক জায়গায় আছে, 'মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল—দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল—' তখন ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এইটিই জ্ঞানের অবস্থা। তখন সবই বিদ্যা, সবই ঈশ্বরময়—'

ঠাকুরকে খেতে দিয়েছে। তখুনি নরেনের খোঁজ। 'নরেন খা, নরেন খা।'

'শুধু নরেন খা।' শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ির ছেলে যতীন দেব ছিল সে-আড্ডায়, সে বলে উঠল: 'আর আমরা শালারা ভেসে এসেছি।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাস, সেখানে দেব'খন খেতে।'

'সে জন্যেই তো দেবেন, মজুমদারের অভিমান।' গিরিশ বললে, 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। তা আমরা গিয়ে কি করব!'

নরেনকে বেশি ভালোবাসি। কি করব, ভালোবাসি। ভালোবাসি—এর উপরে কি আর কোনো কথা আছে। কেশব সেনকেও ভালোবাসি। হাজরা বলে, কেশব সেন রজোগুণী লোক, টাকা-কড়ি মানসম্ভ্রম আছে, তাই তাকে ভালোবাস। ঠাকুর বললেন, 'তা নয় বুঝলুম, কিন্তু হরীশ, নোটো ওদের ভালোবাসি কেন? আর নরেন, নরেনকে কেন ভালোবাসি? তার তো কলাপোড়া খাবারও নুন নেই।'

সেই নরেনই একদিন ঠাকুরকে চেপে ধরল : 'কে বলে তোমার ঈশ্বর দয়াময় ? সে যদি দয়াময়ই হবে তবে পৃথিবীতে এত দুঃখদারিদ্র্য কেন, কেন এত অসামঞ্জস্য, কেন এত নিষ্ঠুরতা ?'

এক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কথা কোসনে। স্তব্ধ হ। আকাশের দিকে তাকা।'

আকাশের দিকে তাকালে কি দেখব ? দেখব অনন্ত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অজ্ঞেয় অপরিমেয় মৌন সম্ভাষণ করছে আমাকে। দেখব নক্ষত্রকণিকার মণিকা জ্বলছে অগণন। একটা-দুটো, বিশ-পঁচিশ, শ-দুশো নয়—লাখ-লাখ কোটি-কোটি। একটা সূর্য, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রুবতারা বুঝি, তাদের দিয়ে না-হয় কিছু-না-কিছু কাজ হয় সংসারের,—কিন্তু এতগুলি তারা দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন ? কয়েক ঝাঁক কম হলেই বা ক্ষতি কি ছিল ! কেন অসংখ্য হল ? অসংখ্য কি অনিয়মের ফল, না, নীতির ও শৃংখলার ? এখন এই অন্তহীনকে ক্ষান্তিহীনকে দেখ, আর, ভাবো এই অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী কতটুকু। এক দানা সর্ষে, এক কণা ধূলি। তার মধ্যে তুই। তোর মস্তিষ্ক, তোর হৃৎস্পন্দন, তোর প্রশ্ন, তোর অভিযোগ ! কথা কোসনে।

কর্ম কর্, কর্ম করে আকর্ষণ কর্ কৃপা।

জীবনের পরম স্তব্ধতায় সেই মহামৌনের উত্তর দে। তিনি সম্বোধন তুই প্রতিধ্বনি।

সেই ঠাকুরকে কে-একজন সেদিন খুব নিন্দা করল নরেনের সামনে। গেঁয়ো মুখখু বামুন, তার আবার জ্ঞানগম্যি কি। তার আবার কথার মূল্য !

প্রথমটা নরেন খানিক তর্ক করলে। কিন্তু লোকটি উকিল, তর্কে পরাস্ত হবার পাত্র নয়। শেষে ছেড়ে দিল নরেন, এমন ভাব করল যেন সে মেনে নিয়েছে উকিলকে। উকিল হাসতে-হাসতে চলে গেল।

চলে যেতেই তেড়ে এল লাটু। বললে, 'আপনি ঠাকুরের নিন্দে মেনে নিলেন ?'

'ওরে ধোঁয়া কি আকাশকে ময়লা করতে পারে ?' নরেন বললে, 'ওর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে গেলে আমার কত সময় নষ্ট হয়ে যেত বল দেখি। একটু মেনে নিলুম লোকটা খুশি হয়ে চলে গেল। অল্পে একটা লোককে খুশি করতে পারলে মন্দ কি।'

'হায়রে অল্প বিশ্বাস !' ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'তাঁর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে। আমাদের আর কি চাই ! তিনি শরণ দিয়েছেন, আর চাই কি ! ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা। যিনি খাইয়ে-পরিয়ে বুদ্ধিবিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন-রাত দেখলে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি ! অমন ঠাকুরের দয়া ভোলো ! দেশে-বিদেশে নাস্তিক-পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে—আর তোদের

মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে! তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস।'

১৫

মুক্তি?—ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে। ঠাকুর বললেন, আমি মুক্তি চাইনা, ভক্তি চাই। আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালোবাসি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বৃষ্টিবিন্দু হয়ে সমুদ্রে ঝরে পড়ব না। ঝরে পড়ব মাটিতে। ঝরে পড়ে ধুয়ে দিয়ে যাব এক কণা ধুলি। মুছে দিয়ে যাব এক কণা পিপাসা।'

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নইরে শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।' ঠাকুর গান ধরলেন: 'ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, তারে কে বা পায়, সে যে ত্রিলোকজয়ী।'

মুক্তি দিলেই তো নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই ঝামেলা নেই। কিন্তু ভক্তি দিলে মুস্কিল, ভগবানের সর্বদা থাকতে হয় ভক্তের সঙ্গে। উঠতে-বসতে। পদে-পদে। সম্পদে-বিপদে।

ভক্তি ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বোঝে না, জানতেও চায় না। সে শুধু মাধুর্যের কারবারী, তার তৃপ্তি শুধু উপভোগে, আস্বাদনে। সে হিসেব করে না তার মা কত রূপসী না বিদুষী, তার কাছে মা মা, সব হিসেবের পার, সব সময়েই মিষ্টি। মায়ের ধন-রত্নর দিকে সে তাকায় না, সে তাকিয়ে থাকে মায়ের হাসিটির দিকে।

আর কর্ম? কর্ম হচ্ছে পুজা। ভগবানের প্রীতির জন্যে যে কর্ম সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুজা।

'আরেক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম।' বললেন বিবেকাবন্দ: 'বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো। নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্যে সব দিয়েছে, সেই মুক্ত। আর যারা, আমার মুক্তি, আমার মুক্তি করে দিনরাত মাথা ভাবায় তারা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

আবার ডাক দিলেন: 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাধা নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনো চিন্তা রেখ না। নরক-স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব ডোণ্ট কেয়ার। আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দেখি বাবাজী। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়।

মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে ! তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস ।'

১৫

মুক্তি ?—ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে। ঠাকুর বললেন, আমি মুক্তি চাইনা, ভক্তি চাই। আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালোবাসি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বৃষ্টিবিন্দু হয়ে সমুদ্রে ঝরে পড়ব না। ঝরে পড়ব মাটিতে। ঝরে পড়ে ধুয়ে দিয়ে যাব এক কণা ধূলি। মুছে দিয়ে যাব এক কণা পিপাসা।'

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নইরে শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।' ঠাকুর গান ধরলেন : 'ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, তারে কে বা পায়, সে যে ত্রিলোকজয়ী।'

মুক্তি দিলেই তো নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্চাট নেই ঝামেলা নেই। কিন্তু ভক্তি দিলে মুস্কিল, ভগবানের সর্বদা থাকতে হয় ভক্তের সঙ্গে। উঠতে-বসতে। পদে-পদে। সম্পদে-বিপদে।

ভক্তি ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বোঝে না, জানতেও চায় না। সে শুধু মাধুর্যের কারবারী, তার তৃপ্তি শুধু উপভোগে, আস্বাদনে। সে হিসেব করে না তার মা কত রূপসী না বিদুষী, তার কাছে মা মা, সব হিসেবের পার, সব সময়েই মিষ্টি। মায়ের ধন-রত্নর দিকে সে তাকায় না, সে তাকিয়ে থাকে মায়ের হাসিটির দিকে।

আর কর্ম ? কর্ম হচ্ছে পূজা। ভগবানের প্রীতির জন্যে যে কর্ম সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পূজা।

'আরেক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম।' বললেন বিবেকাবন্দ : 'বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো। নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্যে সব দিয়েছে, সেই মুক্ত। আর যারা, আমার মুক্তি, আমার মুক্তি করে দিনরাত মাথা ভাবায় তারা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

আবার ডাক দিলেন : 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাধা নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী ? সব ত্যাগ করেছ এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনো চিন্তা রেখ না। নরক-স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব ডোণ্ট কেয়ার। আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দেখি বাবাজী। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়।

তাইতে লেগে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'

বীরভক্ত কে ? মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মরণ-মনন করে। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, সে শবসাধনার মত। শবের উপরে বসে সাধন করবার সময় শবের মুখে মাঝে-মাঝে জল-ছোলা দিতে হয় নইলে সাধকের ঘাড় মটকে দেবে। তাই পরিবার-পরিজনের খাবার যোগাড় করো তারপর বোসো তোমার সাধনায়। ঘরে চাল নেই, উপাসনা অসম্ভব। পেটে ভাত নেই, কিসের ভক্তি ? তবে ঘরে চাল আর পেটে ভাত হলেই সমস্ত হল না—চাই ভালোবাসা, সমস্ত ব্যঞ্জনের যা নুন, সমস্ত মাল্যের যা গ্রন্থি। আর সন্ন্যাস ? বেপরোয়া হয়ে উঁচু তালগাছ হতে ঝাঁপ দেবার নাম সন্ন্যাস।

'গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব—আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী ও কাতর। ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।'

'নরেনের খুব উঁচু ঘর।' বললেন ঠাকুর, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না। আমি ওকে ভুলিয়ে রেখেছি। ওর চাবি আমার হাতে।'

একদিন বললেন, 'তুই যদি চাস কৃষ্ণকে দেখতে পারিস।'

এক কথায় উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'আমি কিষ্ট-ফিষ্ট মানিনা।'

আর একদিন বললেন ঠাকুর, 'আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করব, কি বলিস ?'

আবার উড়িয়ে দিল এক কথায়। নরেন ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'না ওসব চলবে না।'

'কাউকে কেয়ার করে না।' বলছেন ঠাকুর, 'কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল, কাপ্তেন ভালো জায়গায় বসতে বললে, তা চেয়েও দেখল না। আমারই অপেক্ষা রাখে না, অন্যালোকে কা কথা! আবার যা জানে তাও বলে না। পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই নরেন এত বিদ্বান। মায়া নেই মোহ নেই বাধা নেই বন্ধন নেই। তারপরে কত গুণ। যেমনি গাইতে-বাজাতে তেমনি লেখাপড়ায়। তা আমার কাছে বেশি আসে না। তা ভালো। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

সেদিন বলছেন, 'মনে চারটি সাধ উঠেছে। বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে দেখব। অষ্টমির দিন তন্ত্রের সাধকেরা কারণ পান করবে তাদের প্রণাম করব।'

নরেন কাছে বসে। হঠাৎ তার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন, নরেনের হাঁটুতে পা রেখে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর সেদিন বসলেন নরেনের পিঠের উপর।

ভবনাথের সঙ্গে গল্প করছে নরেন। ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। তাতে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে দু'জন। গল্প করতে-করতে কখন উপুড় হয়েছে নরেন, হঠাৎ ঠাকুর তার পিঠের উপর এসে বসলেন। আর বসেই সমাধিস্থ।

সেদিন একেবারে ঘাড়ের উপর।

ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে। নরোত্তম কীর্তন গাইছে, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠমিলন পালা। কিন্তু সবই আলুনি, নরেন এখনো আসেনি।

'কই নরেন এল না?' বারে-বারে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন ঠাকুর। আবার বলছেন, ওরে তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই টানটুকু নে।'

সেই একাগ্র তন্ময়তা! পরমবিরাম সমুদ্রের জন্যে যেমন নির্ঝরধারার ব্যাকুলতা। নরেন এসেছে, নরেন এসেছে। তপ্তধূলি রুক্ষ ডাঙায় নেমেছে স্নেহবৃষ্টি। যেই প্রণাম করতে নিচু হয়েছে নরেন, তার কাঁধের উপর চড়ে বসলেন।

'তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে যাস?' জিগগেস করলেন একদিন।

'তা যাই মাঝে মাঝে।' বললে নরেন।

'কিন্তু ওর থাক আলাদা। ওর হচ্ছে রাবণের ভাব। ভোগও করবে আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ।'

'তা রশুনের বাটি যতই ধোওনা কেন গন্ধ একটু থাকবেই।'

'কিন্তু আজকাল আপনার চিন্তাতেই মশগুল।'

'ও যা আজকাল বলে তার সঙ্গে কি তোর মিল হয়?' ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'আপনাকে ওর অবতার বলে বিশ্বাস।' নরেন বললে, 'কিন্তু আমি কিছু বলিনি।'

'কিন্তু ওর খুব বিশ্বাস!'

দীপ আর শিখা। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। হাল আর পাল। চাকা আর তার মধ্যবিন্দু।

অজ্ঞাতসমুদ্রে নিশ্চয়ই কোথাও কূল আছে এই আমার মহৎ সম্বল। এই আশ্চর্য পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সমস্ত জীবন দিয়ে ঘোষণা করতে হবে সেই আশ্চর্যকে এই আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা। মনে সংকল্প করবে বাক্যে উচ্চারণ করবে আরে কর্মে তা সুসিদ্ধ করবে।

সেবার বলরাম বোসের বাড়ি খেতে বসেছেন ঠাকুর, খেতে-খেতে নরেন-নরেন বলে কাতরতা। ওরে, নরেন কোথায় বসেছে? ঐ যে, প্রথম সারে। ঠাকুর একবার তাকে দেখেন আবার খান; হঠাৎ পাত থেকে দই আর তরমুজের পানা নিয়ে নরেনের কাছে উপস্থিত। বললেন, 'নরেন তুই একটু খা।'

মুখ ফিরিয়ে নিতে পারল না নরেন। হাতে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, সানন্দে তা গ্রহণ করল। তার ঠাকুর আবার তাঁর নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

হীরানন্দ এসেচে ঠাকুরকে দেখতে, তাঁর অসুখ শুনে। কলকাতার কলেজে

লেখাপড়া শিখে হীরানন্দ দেশে গিয়েছিল, এবার আবার ফিরেছে কলকাতা। সিন্ধুদেশের ছেলে, কোথায় কলকাতা, কোথায় সিন্ধু। ঠাকুরের টানে দুস্তর ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরের বড় সাধ, নরেনের সঙ্গে হীরানন্দের একটু কথা হয়। একটু বা তর্ক হয়। বেশ লাগবে ওদের কথা শুনতে।

তোমরা দুজনে একটু কথা কও। নরেন আর হীরানন্দকে বসালেন তাঁর পাশটিতে।

হীরানন্দ নরেনকে প্রশ্ন করল : 'আচ্ছা, ভক্তের এত দুঃখ কেন?'

কি মধুময় কণ্ঠস্বর! শুধু একটা প্রশ্নের জন্যে প্রশ্ন নয়। অন্তরে রসসঞ্চিত ভালোবাসা থাকলেই বুঝি কন্ঠস্বর এমন গাঢ় হয়। শুধু সামান্য একটু উচ্চারণেই উপলব্ধির পরিচয়।

নরেন খেপে উঠল। বললে, 'আমার তো মনে হয় এ জগৎ এক শয়তানে তৈরি করেছে—'

শান্তমুখে হাসল হীরানন্দ।

'আমি যদি হতাম আমি এর চেয়ে ভালো সৃষ্টি করতে পারতাম—'

'কিন্তু দুঃখ না থাকলে কি সুখবোধ হবে? মন্দ না থাকলে ভালোর দাম কি?'

'কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে তা আমি বলছি না।' নরেন বললে, 'তবে যা দেখতে পারছি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত মোটেই ভালো নয়। তবে এক কথা।' তাকাল ঠাকুরের দিকে : 'তবে যদি সবই ঈশ্বর এ বিশ্বাস করা যায়, পাপ-পুণ্য শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞান দ্বেষ-প্রেম তবেই সব হ্যাঙ্গাম চুকে যায়। আমি এখন তাই করছি।'

'ও কথা বলা সোজা, আয়ত্ত করা কঠিন।'

নরেন নির্বাণষটক স্তোত্র আবৃত্তি করলে :

আমি মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত কিছুই নই, আমি কর্ণে-রসনায় ঘ্রাণে-নয়নে কোথাও নেই। আমি না আকাশ না মাটি না অগ্নি—আমি চিদানন্দময় শিব। আমাতে না আছে দ্বেষ বা অনুরাগ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাৎসর্য ; ধর্মও বুঝি না অর্থও বুঝি না, কামও জানি না মোহও জানি না—আমি চিদানন্দময় শিব। না পুণ্য না পাপ না সুখ না দুঃখ—মন্ত্রও নেই তীর্থও নেই বেদও নেই যজ্ঞও নেই। আমি ভোজ্যও নই ভোক্তাও নই—আমি ভোক্তাভোজ্যবিরহিত অনন্ত ভোজন, অনন্ত আস্বাদ—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি অমৃত্যু আমি অশঙ্ক, আমার পিতা নেই মাতা নেই জাতি নেই বন্ধু নেই আত্মীয় নেই, আমি গুরুও নই শিষ্যও নই—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি নির্বিকল্প, নিরাকার, সমস্তই আমার ইন্দ্রিয়ের বিভূতি। আমি মুক্তও নই পরিমিতও নই, অংশও নই সম্পূর্ণও নই—আমি শিব চিদানন্দময়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। হীরানন্দকে বললেন, 'এর এখন জবাব দাও।'

হীরানন্দ বললে, 'ও একই কথা। এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তাই। আমি তোমার দাস এতেও ঈশ্বরানুভব আর আমিই সেই ঈশ্বর এতেও ঈশ্বরানুভব। ঘরে ঢোকবার অনেক দরজা। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে ঢোকা যায় আবার নানা দ্বার দিয়েও।' ঠাকুর খুশি হলেন উত্তর শুনে। নরেনকে বললেন, 'এবার সেই গানটা গা তো। যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।'

এতক্ষণ আমি-আমি শুনলাম এবার একটু তুমি-তুমি শুনি।

নরেন গান ধরল : 'তুমসে হামনে দিলকো লাগায়া, যোকুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়। যাহা মাই দেখা তুঁহি নজরমে আয়া, যোকুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।'

যা কিছু দেখেছি সব তোমাকেই দেখেছি। সর্বত্রই তোমার আসন, তোমার আনন।

হীরানন্দ বললে, 'এখন আর হাম হাম নয় তুঁহু-তুঁহু।'

নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আমাকে এক দাও, আমি তোমাকে কোটি-নিযুত দেব। একের পরে শূন্য বসিয়েই কোটি-নিযুত! আসল হচ্ছে সেই এক। আমি এক, তুমি সেই একের পিঠে শূণ্য। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। আমি বই আর কিছু নেই।'

'নরেন যেন হাতে খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।' বললেন ঠাকুর। 'আর হীরানন্দ?' কি শান্ত, কি স্থির! যেন রোজার সামনে জাতসাপ ফণা ধরে চুপ করে আছে।'

১৬

'নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আন্।' বললেন বিবেকানন্দ : 'হৃদয়ে শ্রদ্ধা আন নচিকেতার মত। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা, আত্মতত্ত্ব জানবার জন্যে, আত্মাকে উদ্ধারের জন্যে, জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার মীমাংসার জন্যে। যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে চলে যা।'

উদ্দালকের ছেলে এই নচিকেতা। স্বর্গকামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছেন, সেই যজ্ঞে সর্বস্ব দান করলেন ব্রাহ্মণদের! ছোট ছেলে নচিকেতা এসে জিগগেস করলে, বাবা, আমাকে কাকে দান করবেন? কথাটা কানে তুললেন না উদ্দালক। ছেলে আরেকবার জিগগেস করল। আরো একবার। তখন উদ্দালক রুষ্ট হয়ে বললেন, যমকে দান করব।

খুশি হল নচিকেতা। আমি তো অধম-অক্ষম নই, বরং শ্রদ্ধায় সদাচারে আমি অনেকের অগ্রণী। তাই বাবা যখন আমাকে যমের বাড়ি পাঠাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধন হবে। তথাস্তু। এবার তবে সত্যপালন করুন।

পাঠিয়ে দিন যমগৃহে।

যেন অপ্রস্তুত হলেন উদ্দালক।

শস্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বললে নচিকেতা। একবার জীর্ণ হয়ে মরে আবার সজীব কান্তি নিয়ে জন্মায়। সুতরাং অনিত্য সংসারে মিথ্যাচারণ বৃথা।

উদ্দালক তখন নিরুপায় হয়ে নচিকেতাকে পাঠিয়ে দিল যমলোকে।

যমালয়ে এসে নচিকেতা দেখলে যম বাড়ি নেই। প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তিন দিন পরে ফিরল বৈবস্বত। অভুক্ত অতিথি দেখে অপ্রতিভ হল যম। বললে, তুমি আমার ঘরে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করেছ, আমার মঙ্গল হোক। হে ব্রাহ্মণ তোমাকে নমস্কার, তুমি অনাহারযাপিত প্রতিরাত্রির জন্যে একটি করে বর চাও।

নচিকেতা বললে, তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর এই দাও, আমার বাবা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন ও বীতক্রোধ হন। আর যখন যমপুরী থেকে ফিরে যাব, যেন আমাকে আগের মত চিনতে পেরে সাদরসম্ভাষণ করেন।

'মৃত্যুমুখ থেকে প্রমুক্ত হয়ে তুমি যখন ফিরে যাবে দেখবে তোমার বাবা আগের মতই তোমার প্রতি স্নেহশীল আছেন।' প্রথম বর পূর্ণ করল যম। 'দ্বিতীয় ?'

ক্ষুধাতৃষ্ণাভয়দুঃখাতীত হয়ে স্বর্গে যারা বাস করছে, কি উপায়ে তারা লাভ করল অমরত্ব ? আমি শ্রদ্ধাযুক্ত। আমাকে বলুন সে কৌশলকথা।

স্বর্গসাধন কর্মকাণ্ডের কথা বললে এবার যম। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা করো।

মরলে পর মানুষ কোথায় যায় এই প্রশ্নের উত্তরই আমার তৃতীয় বর। কেউ বলে সে তখনো বেঁচে থাকে, কেউ বলে নয়, এই তত্ত্বের নির্ণয় চাই।

যম বললে, আর কোনো বর চাও। এই আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। দেবতারাও বুঝে উঠতে পারেনি সহসা। সুতরাং এ উপরোধ ত্যাগ করো।

'আপনার মত কে আছে আর আত্মতত্ত্বের বক্তা ? আর আত্মতত্ত্বের মত বিষয়ই বা কি আছে ? উপরোধ ত্যাগ করতে অনুরোধ করবেন না।' দৃঢ় হল নচিকেতা। আমার তৃতীয় বর পূর্ণ করুন।

যম লোভজাল বিস্তার করল। দীর্ঘ জীবন কামনা করো, যত দিন বাঁচতে চাও ততদিনের আয়ুষ্কাল। অফুরন্ত স্বর্ণরত্ন নাও, নাও পুত্রপৌত্র, হস্তী-অশ্ব, নাও মহদায়তন বিশাল ভূমি। মর্তলোকে যে সব কাম্যবস্তু দুর্লভ নাও সে সব দিব্য-ভোগের অধিকারণ। আর সব প্রশ্ন করো কিন্তু আমাকে মৃত্যু বিষয়ে কিছু প্রশ্ন কোরো না।

ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যঃ। বিত্তে মানুষের তৃপ্তি নেই। তার সন্তোষ আত্মবোধে। আমাকে লুব্ধ করবেন না। সমস্ত লোভবস্তু স্বল্পজীবী। সেই স্বল্পসুখভোগী দীর্ঘ জীবন নিয়ে আমি কি করব ? যা জানবার জন্যে আমি পিপাসিত হয়েছি তাই জানিয়ে আমার তৃষ্ণা দূর করুন। বালক নচিকেতা

নির্বিচল রইল সঙ্কল্পে।

হে মহৎজিজ্ঞাসু, তুমি তাঁকেই জানতে চেয়েছ যিনি এই অনর্থবহুল মানুষের শরীরের মধ্যেই বাস করছেন, যিনি হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি গূঢ় দুর্জ্ঞেয় অথচ যিনি স্বপ্রকাশ। কঠোর দুঃখসাধন করা ছাড়া যাঁকে দেখা যায় না, যিনি সর্ব আনন্দের আকর, সর্ব জগতের ধ্রুবপদ। যিনি অণু হতে অনীয়ান মহৎ হতে মহীয়ান, যিনি শরীরের মধ্যে অশরীরী, অনিত্যের মধ্যে সনাতন। কে লাভ করতে পারে আত্মা ? যে দুশ্চরিত থেকে নিবৃত্ত, যে শান্তমানস, যে সমাহিত সেই প্রজ্ঞানযোগে আত্মাকে লাভ করতে পারে। তুমিই সেই প্রজ্ঞানী; তুমিই সেই বিবেকবুদ্ধিমান।

'বল অস্তি অস্তি—' বললেন বিবেকানন্দ : 'নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। সোঽহং, সোঽহং, শিবোঽহং। প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি। ওরে নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি ? কিসের নেই ? কার নেই ? শিবোঽহং, শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনহীন ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা ? ও গুপ্ত অহঙ্কার। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও। দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, কোনো ভাবনা নেই। বল, আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। নো নেই-নেই, বল হাঁ হাঁ, সোঽহং, সোঽহং। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। পর্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপের মত পড় গিয়ে দুনিয়ার উপর। নিজেকে শ্রদ্ধা কর নিজেকে বিশ্বাস কর—হর হর মহাদেব।'

'প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।' নরেন বললে জোর দিয়ে।

বলরাম বোসের বাড়িতে দোতলার উপরে বসে কথা হচ্ছে। ঠাকুর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তদলের সমাবেশ। বলরাম বাড়ি নেই, হাওয়া বদলাতে মুঙ্গেরে গেছে। কিন্তু ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের জন্যে তার ঘর মুক্তদ্বার।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই যথেষ্ট প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি ? যে মুহূর্তে বিশ্বাস করব যে আছে সেই মুহূর্তেই তা প্রমাণিত।'

নরেনের বিচার, গিরিশের বিশ্বাস।

পল্টুও তর্কে যোগ দিলে। সেও বিশ্বাসের দিকে। বিচার যদি চার হাত যায় বিশ্বাস যাবে আদিগন্ত।

ঠাকুর হেসে বললেন, 'নরেন হচ্ছে উকিলের ছেলে আর পল্টু ডেপুটির।'

উকিল সওয়াল করে, রায় দেয় ডেপুটি। রায়ই বহাল থাকে। বহু তর্কবিচারের পর অচলপ্রতিষ্ঠ হয় বিশ্বাস। বিশ্বাসের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

'সরল বিশ্বাস বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।' বললেন আবার ঠাকুর, 'মা বলেছেন, ও তোর দাদা, বালকের তখনি বিশ্বাস, ও

আমার ষোল আনা দাদা। সে হয়তো বামুনের ছেলে আর দাদা হয়তো ছুতোর কি কামার। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে, ষোলো আনা বিশ্বাস জুজু আছে ও ঘরে। সংসারবুদ্ধি, সেয়ানাবুদ্ধি, পাটোয়ারিবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।'

'আমি তো ঈশ্বরে অবিশ্বাস করছি না।' বললে নরেন, 'কিন্তু তিনি অবতার হয়ে কোথাও ঝুলছেন তা মানতে আমি প্রস্তুত নই।'

'নরেনের কথা আর আমি লই না।' ঠাকুর বললেন স্নেহকরুণ হাসি ঢেলে : 'ও সেদিন চামচিকেকে চাতক বলেছিল। যদু মল্লিকের বাগানে সেদিন আমাকে বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টূপ যা দেখ সব মনের ধোঁকা। আমি বললাম সে কি, কথা কয় যে রে! নরেন তবু উড়িয়ে দেয়, বলে, ও অমন হয়।'

'আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মানি।' গর্জে উঠল নরেন : 'আর মানি অনন্ত অবতার।'

'আহা!' ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট হলেন, দু'হাত জোড় করে কপালে এনে ঠেকালেন। বললেন, 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার।'

সকলেই সেই তেজোময় অমৃতপুরুষ—আত্মার প্রকাশে স্পষ্ট করো সেই স্বর্ণস্বাক্ষর। মানুষের মধ্যে তো শুধু বাঁচবার প্রাণ নেই, আছে বড় হবার মহিমা। মানুষের ঋদ্ধি বৃদ্ধি সিদ্ধি সব সেই বড় হবার মহত্ত্বের মধ্যে। সেইখানেই তার ঈশ্বরত্ব। সব তার নিজের মধ্যে সঞ্চিত ও সংহত হয়ে আছে, তার অতিরিক্ত কিছু নেই। নেই প্রচ্ছন্নকে প্রস্ফুট করো। জড়ের মধ্যে আনো প্রাণস্পন্দনব্যঞ্জনা। যা মূক তাকে শুধু মুখর করা নয়, সেই মুখরতাকে মহান্ অর্থে আরূঢ় করা। সোঽহং বলা তো নিজের কাজ সেরে সরে পড়া নয়, সমস্ত মানুষকে সেই সত্তায় পৌঁছে দেবার সাধন করা। তাই সোঽহং মানে একলা আমি নই সোঽহং মানে সকলে। আমি ছাড়া সকল নেই সকল ছাড়া আমি নেই। তাই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, অবতার আমি তুমি সকলেই, সেই ঈশ্বরের প্রতিভাস ঈশ্বরের প্রতিকায়।

একটা হিন্দুস্থানী ভিক্ষুক গান গাইতে এসেছে। দু-একটি করে পয়সা দিচ্ছে ভক্তরা। বেশ গায় কিন্তু ভিখিরী—নরেনের ভালো লেগে গিয়েছে। সে বলে উঠল, 'আবার গাও।'

'কিন্তু অত পয়সা কোথায়?' ঠাকুর আপত্তি করলেন : 'বললেই তো আর হল না।'

'আপনাকে আমীর ঠাওরেছে।' বললে একজন ভক্ত। 'আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'অসুখ হয়েছেও ভাবতে পারে।'

সত্যি-সত্যি ঠাকুরের অসুখ করে গেল। কিছুই খেতে পারেন না। গলায় ঘা।

তবু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়ে না নরেন। বলে, 'যেমন গাছ দেখছি তেমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?'

তুমি চোখ চেয়ে দেখ না ভাস্বর দিব্যাম্বর কে তোমার চোখের সামনে বসে। সর্ববরদ কাঞ্চনবৃক্ষ।

'কেউ-কেউ ঈশ্বর বলে আমাকে।' স্নেহান্বিত কণ্ঠে বললেন ঠাকুর।

'হাজার লোকে বলুক বয়ে গেল।' বললে নরেন্দ্রনাথ। 'আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবনা।'

'অনেকে যা বলবে তাই তো সত্য, তাই তো ধর্ম।'

'আমি তা মানিনা। নিজে ঠিক না বুঝলে মানিনা অন্যের কথা।' নরেন আবার হুংকার দিল : 'পরের মুখের ঝাল খেতে আমি প্রস্তুত নই।'

কিন্তু যাই তিনি হোন, কিছু খেতে পাচ্ছেননা, গলা দিয়ে নামছেনা কিছু, এই দুঃখের দৃশ্য তো দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার কালী তবে কি করতে আছে? তিনি তো বলো পুত্তলিকা নন। তিনিই তো সব কর্ত্রী-কারয়িত্রী, তবে তোমার এই ব্যাধি কেন সারিয়ে দেন না? অন্তত সাধারণ রুগীর মত খেতে পারো গিলতে পারো তার ব্যবস্থা করে দিন। কী তবে এতদিন তার ভজনা করলে তার সঙ্গে এত চলাফেরা করলে এত কথা-বার্তা কইলে, তোমার খবর জানতে তার তো আর কিছু বাকি নেই। তবে করুননা কিছু সুরাহা। অন্তত কিছু খেতে পারো। তোমার অসুখের কষ্টের চেয়ে তুমি যে খেতে পাচ্ছনা এই কষ্টই বেশি।

যাও তোমার ভবতারিণীর মন্দিরে। ছাড়বনা কিছুতেই, পাঠাবই পাঠাব। যেমন আমাকে একদিন পাঠিয়েছিলে। যাও আহার্য আর আরোগ্য চেয়ে নিয়ে এস।

নরেন কোমর বাঁধল। যেতেই হবে। খেতেই হবে।

১৭

'যে মন মাকে সমর্পণ করেছি তা আবার নিজের দেহের উপর এনে বসাতে পারি না।' ঠাকুর বাধা দিতে চাইলেন নরেনকে। 'সামান্য শরীরের কথা মাকে কি করে বলব?'

এ একটা কথা হল? যেখানে একটা মুখের কথা বললে শরীরের এই দারুণ-দহন দুঃখ দূর হয়ে যায় সেখানে আবার কিসের আপত্তি? মেঘ চাইতেই যেখানে জল মেলে সেখানে শুকনো মাঠ নিয়ে কে বসে থাকে?

'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' ছন্দোময় আনন্দমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ঠাকুর।

এই যে আমার রোগজ্বালা এ দুঃখ আর শরীরের মধ্যে একটা নিষ্করুণ সংগ্রাম। একজনের হাতে প্রহার আরেকজনের হাতে প্রত্যাহার, ঢালে-তরোয়ালে যুদ্ধ করছে দুই শত্রু। দেখাচ্ছে তাদের রণনৈপুণ্য। তাতে, হে মন, তোমার কি মাথাব্যথা! তোমাকে কে ছোঁয়, তোমাকে কে ম্লান করে? তুমি স্বাধীন তুমি

স্বতন্ত্র তুমি সংশ্লেষলেশশূন্য। তুমি নীলনির্মল নিঃসঙ্গানন্দ আকাশ। তোমার কে নাগাল পায়! ধোঁয়া ঘর-দেয়ালই মলিন করে কিন্তু আকাশের কাছে ঘেঁষতে পারে না। তেমনি, হে মন, দুঃখে তোমার কি করবে? কুসুম কণ্টক থাকতে পারে, কলানাথে কলঙ্ক, কিন্তু মন, তোমাতে গ্লানি নেই মালিন্য নেই দুঃখের বাষ্পমাত্র নেই।

'কিন্তু আমাদের দুঃখটা দেখুন! আপনি যে কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। সেই দুঃখের বিহিত করুন।'

ঠেলেঠুলে ঠাকুরকে নরেন পাঠিয়ে দিল মন্দিরে। পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। সেই এক দিন আর এই এক দিন। কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর।

উচ্ছলিত হয়ে নরেন ছুটে গেল তাঁর কাছে। বললে, 'কি বলেছিলে?'

'বলেছিলুম।'

'কী বলেছিলে?'

'বলেছিলুম, মা, কিছু খেতে পাচ্ছি না, গলা দিয়ে নামছেনা কিছু। যদি বুঝিস, এমন একটা ব্যবস্থা করে দে, যাতে চারটি খেতে পারি।'

'তারপর—তারপর মা কী বললেন?'

প্রতিপদের চন্দ্রের মত হাসলেন ঠাকুর। 'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস। তোর নরেন খাচ্ছে বাবুরাম খাচ্ছে রাখাল খাচ্ছে, এ কি তোরই খাওয়া নয়?'

বিস্ময়বিগাঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল একবার নরেন। মাথা আনত করলে।

তুইও যা আমিও তাই। সমস্ত বিশ্বসত্তা আমাতেই প্রাণায়িত। সর্বভূতে আমারই জীবনস্পন্দন। দুই বলে কিছু নেই, সবই সেই এক, সেই একের বিচিত্র প্রতিচ্ছায়া। রৌদ্রে যে দেহের ছায়া পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিম্ব কিংবা স্বপ্নে যে দেহ চলাফেরা করে এই সব বিভিন্ন দেহকে কি তুমি সত্যি বলে মনে করো? না। এই সব কায়া ছায়ামাত্র।

তেমনি সমস্ত কিছু সেই একের প্রতিবিম্ব। স্থলে জলে সূক্ষ্মে স্থূলে স্বপ্নে বাস্তবে।

একটা ছোট ছেলে ফড়িঙের ল্যাজে একটা কাঠি গুঁজে দিয়ে খেলা করছে। ফড়িঙের সেই ব্যথা নিজের মধ্যে অনুভব করলেন, পর মুহূর্তে আবার সেই বালকের আনন্দ। ফড়িংও রাম, তার ব্যথাদাতা বালকও রাম। হেসে উঠলেন ঠাকুর: 'হে রাম, নিজেই নিজের দুর্দশা ঘটিয়েছ, নিজেই নিজের দুর্দশা মোচন কর।'

গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছেন ঠাকুর। ঘাটের দুটো মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। হঠাৎ এক মাঝি আরেক মাঝির পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল। ঠাকুর কাতরস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন। কালীমন্দিরে কি কাজ করছিল হৃদয়,

তার কানে গেল সেই আর্তনাদ। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সে গঙ্গার ঘাটে। ঠাকুরের কী বিপদ হল না জানি! কী না জানি আঘাত পেলেন অকস্মাৎ!

'কী হয়েছে?'

ঠাকুর তাঁর পিঠের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

হৃদয় দেখল ঠাকুরের সমস্ত পিঠ ফুলে লাল হয়ে রয়েছে। 'এ কি, কে তোমাকে মারল?' রাগে উত্তেজিত হয়ে জিগগেস করল হৃদয়।

ঠাকুরের মুখে কথা নেই। সমস্ত মুখে যন্ত্রণার বিবর্ণতা।

বলো না কে মারল তোমাকে। আমাকে দেখিয়ে দাও কোন্ জন। তারপর আমি একবার দেখে নি।'

'আমাকে আবার কে মারবে!' মাঝিদের দেখিয়ে বললেন, 'এ ওকে মারল আর তাই ছাপ পড়ল আমার পিঠে।

হৃদয় তো স্তম্ভিত।

নতুন বর্ষায় মাঠের ঘাস নিবিড় সবুজে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিভোর হয়ে তাই দেখছেন ঠাকুর। মনে হচ্ছে ঐ তৃণাঞ্চিত শ্যামলশোভন মাঠটুকু যেন তাঁরই অঙ্গ। কে একজন ঠাকুর ঐ মাঠের উপর দিয়ে অতর্কিত হেঁটে যাচ্ছে আর অমনি ঠাকুর ব্যথায় কেঁদে উঠলেন, যেন কেউ তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলে গেল।

মাটির সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে অনুভব করলেন একাত্মতা। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—বেদান্তের এই বাণীর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। তাই তোর যে খাওয়া তাই আমারও খাওয়া। তোর যে তৃপ্তি আমারও তৃপ্তি। তোর যে শ্রী তা আমারও শ্রী। তাই পরশ্রীতে আমি কাতর নই, পরশ্রীতে আমি আনন্দিত। পরশ্রী মানেই তো পরমের শ্রী।

সুখে-দুঃখে আঘাতে-আরামে জয়ে-পরাজয়ে মিত্রতায়-শত্রুতায় বীর হও, অকুতোভয় হও। আর এই বীরত্ব ও ভয়শূন্যতার উৎসই হচ্ছে ঈশ্বরবিশ্বাস। কে সেই ঈশ্বর? আমিই সেই ঈশ্বর। কোঽহং? সোঽহং। অতএব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হও।

বৃত্রাসুর স্বর্গ আক্রমণ করল। দেবতারা যে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাই বৃত্র গ্রাস করে ফেলে। তখন ভয় পেয়ে দেবতারা বিষ্ণুর স্তব সুরু করল। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বললেন, দধীচির কাছে যাও, তার বিদ্যাব্রততপঃসার পাত্রাস্থি চেয়ে নাও। সেই অস্থি দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে বলো বিশ্বকর্মাকে। সেই অস্ত্রেই বৃত্রের শিরশ্ছেদ হবে।

মহর্ষি দধীচির কাছে দেবতারা তাদের প্রার্থনা জানাল।

দধীচি বললে, 'মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ, দেহও দেহীর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু, আমি কেন তা তোমাদের দান করব?

দেবতারা ঘাবড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'আপনার মত দয়ালু মহাপুরুষের পরহিতের জন্যে অদেয় কি আছে?'

'ঠিক বলেছ। তোমাদের কাছ থেকে এই ধর্ম কথাটুকু শোনবার জন্যেই ঐ

কথা বলেছিলাম।' বললে দধীচি, 'দেহ যতই প্রিয় হোক একদিন তা ত্যাগ করতেই হবে। কি দৈন্যের কথা, কি কষ্টের কথা, যদি এই ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ নিয়ে কারু না কিছু উপকার হয়।'

আত্মাকে পরব্রহ্মে স্থাপন করে দধীচি দেহত্যাগ করল। সেই দেহের অস্থি দিয়ে তৈরি হল বজ্র। সুরু হল দেবাসুরের সংগ্রাম।

অসুরদের পাতালে দেখে বৃত্র বললে, 'মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, তাতে কাতর হবার কি আছে? দুরকম মৃত্যু দুষ্প্রাপ্য অথচ বাঞ্ছনীয়। এক হচ্ছে যোগরত হয়ে, আরেক হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদের অগ্রণী হয়ে। সেই সম্ভাবনা তোমাদের সামনে। এমন মৃত্যু কে ছাড়ে?'

ইন্দ্র আর বৃত্র পরস্পর সম্মুখীন হল। বৃত্র বললে, 'তুমি আমার ভাই বিশ্বরূপাকে হত্যা করেছ, এই শূলে তোমার হৃদয় ছিন্ন করে আমি আজ অঋণী হব। আর যদি তুমি দধীচির অস্থিনির্মিত কুলিশ দিয়ে আমার মস্তক ছিন্ন করো তবে এই দেহ পঞ্চভূতে উপহার দিয়ে মনস্বীদের পদধূলি হয়ে যাবো। তোমার ভাবনা কি, তুমি তো বিষ্ণুদ্বারা নিয়োজিত। আমারও ভয় কি। তোমার বজ্রবলে আমার বিষয়পাশ ছিন্ন হয়ে যাবে। নাও, হানো তোমার বজ্র, যে বজ্রে শ্রীহরির তেজ আর যা দধীচির তপস্যা দ্বারা তেজস্বান। আর যেখানেই হরি সেইখানেই বিজয়শ্রী। এস, আপন শত্রুকে নিধন করো।'

তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। বৃত্রের শূলের আঘাতে ইন্দ্রের হাত থেকে খসে পড়ল বজ্র। স্খলিত বজ্র মাটি থেকে তুলে নেবে কিনা অপ্রতিভ হয়ে ইন্দ্র ইতস্ততঃ করতে লাগল। লজ্জিতমুখে তাকিয়ে রইল বজ্রের দিকে।

নিরস্ত হল বৃত্র। বললে, 'তুলে নাও বজ্র, দধীচির মান রাখো, শ্রীহরির ইচ্ছা পূর্ণ হতে দাও, শত্রুকে বধ করো আহবে। এখন লজ্জা বা বিষাদের সময় নয়।'

বজ্র তুলে নিল ইন্দ্র। বললে, 'হে বীর, তুমি সিদ্ধ। সর্বাত্মা ও সর্বসুহৃদ ঈশ্বরে তুমি অনুরক্ত। শ্রীহরিতে যার ভক্তি সে অমৃতসমুদ্রে বিহার করে, স্বর্গসুখভোগের ক্ষুদ্র গর্তের সে মণ্ডুক নয়।'

বজ্রপ্রহারে এবার নির্বিচল প্রসন্নতায় মৃত্যুবরণ করল বৃত্রাসুর।

'বিচার আর কি করব!' বললেন ঠাকুর, দেখছি তিনিই সব। এই দেখনা, নরেনকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।' তাকালেন গিরিশের দিকে: 'এর তুমি কি করলে বল দেখি!'

গিরিশ হেসে বললে, 'এর আমি কি করব!'

এ কথা বলার মানে আছে। গিরিশের এত বিশ্বাস আর নরেনের এত অস্বীকৃতি! দেখ তার একটা বিহিত করতে পারো কিনা, পারো কিনা তোমার দলে টানতে। কিন্তু মানুক আর না মানুক কি এসে যায়! ঠাকুরের ভালোবাসা যেন আরো বেশি উথলে পড়েছে। নরেনের গায়ে হাত রেখে বললেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।' শুধু তাই নয়, মুখে হাত বুলিয়ে আদর করলেন আর বলতে লাগলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

তুই আমার মধ্যে কিছু দেখিস আর না দেখিস আমি তোর মধ্যে দেখছি নারায়ণকে। সেই পীতবাস জনার্দনকে। যিনি কর্তা, বিবিধরূপের বিধাতা, সেই অব্যয় অক্ষয় অনাদিনিধনকে। দেবের অবিদিত সেই পরমপুরুষকে।

অর্ধবাহ্যদশা ঠাকুরের। কখনো নরেনের পায়ের উপর হাত রাখছেন যেন ছল করে পা টিপে দিচ্ছেন নারায়ণের। আবার কখনো হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন সারা গায়ে। এ কি নারায়ণের সেবা হচ্ছে, না শক্তিসঞ্চার করছেন নরেনের মধ্যে ?

আরেকদিন ভাবাবেশে উন্মত্তপ্রায় হয়ে জানু দিয়ে নরেনের জানু চেপে বসলেন। নিজের হাতে তামাক খেয়ে সেই হাতে জোর করে তামাক খাওয়ালেন নরেনকে।

'কি করেন, কি করেন,—' বাধা দিতে গেল নরেন।

ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তুই আর আমি কি আলাদা ? তোর শরীর আর আমার শরীর কি অভিন্ন ? দুইই আমার শরীর।'

সেই যে প্রথম যেদিন দেখেছিলেন নরেনকে, চিনে নিয়েছেন সেই স্বপ্নে দেখা ঋষি, আর সেই ঋষির জ্যোতিপুঞ্জ থেকে তৈরি হল একটি শিশু, ঠাকুর নিজে। তার আগে কত তিনি ডাক ছেড়ে কেঁদেছেন আরতির ঘণ্টা বাজলে, কুঠিঘরের ছাদে উঠে, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছিনে। বিষয়কথা বলে-বলে জিভ পুড়ে গেল। তারপর এসেছে সব একে-একে এবং কে-কে আপনার লোক ঠিক চিনে নিয়েছেন এক নিমেষে।

'দ্যাখ', আর সবাইকে বলছেন ঠাকুর, 'চারটে দর্শনের পণ্ডিত, পাঁচটা দর্শনের পণ্ডিত, সব দু'চার কথায় চুপ। কিন্তু এই নরেন ছোঁড়াটা আজ দু'বছর ধরে আমার সঙ্গে খটাখটি করছে। কেন জানিস ? এখানকার কাজ করবে বলেই চলছে তার এই গড়া-পেটা। যদি দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় একটা নতুন মত চালিয়ে যাবে। কেবল এখানকার জন্যেই মহামায়া ওকে দাবিয়ে রেখেছেন।'

ও-ও যা আমিও তাই।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেথা খুশি সেথা যা, যা ইচ্ছে তাই কর। এক ছানা-চিনির ঠাশা থেকেই নানা রকম সন্দেশ। এক পলতার কলের জলই কারু বাড়িতে সিংহের মুখ দিয়ে কারু বাড়িতে মানুষের মুখ দিয়ে পড়ছে। তেমনি একই বিভু নানারূপে বিভাত হচ্ছেন। একই কবি নানা ছন্দে নানা শ্লোকে প্রকাশ করছেন নিজেকে।

বিবেকানন্দ অক্সফোর্ড থেকে ফিরে যাচ্ছে লণ্ডন। অক্সফোর্ড গিয়েছিল ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু স্টেশনে এসে দেখে, তাকে বিদায় দিতে স্বয়ং ম্যাক্সমুলারই উপস্থিত।

'এ কি, আপনি এত কষ্ট করে এই দুর্যোগের রাতে এসেছেন কেন ?'

'রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তকে আর একবার দেখতে।' ম্যাক্সমুলার বিবেকানন্দের হাত ধরলেন : রামকৃষ্ণকে তো দেখিনি তাঁর ভক্তকে দেখি।

১৮

ঠাকুরের অসুখ কমতির দিকে যাচ্ছেনা কিছুতেই। কি হবে? কোথা থেকে কুড়িয়ে আনব উপশম? কুড়িয়ে না পাই ছিনিয়ে আনব। শুধু একবার স্থান বলে দাও। কোথায় সেই গন্ধমাদন?

নরেন পাগলের মত হয়ে গেল। চলে যাবেন ঠাকুর? তাঁকে রাখা যাবে না? কিন্তু উপায় কি। এল সে ডাক্তার, আর কজন শিষ্যসেবক। শিষ্যসেবকদের আবার ঘর-বাড়ি আছে। পালা করে চালাচ্ছে সেবাশুশ্রূষা। নরেনের আছে আবার আইনপরীক্ষা। সংসারের ঝামেলা। কি করি? কোথায় মাথা ঠুকি?

কজন গুরুভাইকে নির্জনে ডেকে নিল নরেন। বললে, 'মনে হচ্ছে ঠাকুর আর থাকবেন না দেহে। তিনি থাকতে থাকতেই ঘটাতে হবে চরম আত্মোন্নতি। দিনের আলোটুকু থাকতে-থাকতেই পেরোতে হবে পথ। সময় বয়ে যাচ্ছে, শেষে অনুতাপের অবধি থাকবেনা।'

বন্ধুরা তাকাল নরেনের দিকে।

'ভাবছি হাতের এটা-ওটা কাজ সেরে নিয়ে বেশি করে লাগব ঈশ্বরের কাজে, ঈশ্বরের সাধনে-সন্ধানে। এ আর কিছুই নয় বাসনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছি আষ্টেপৃষ্ঠে। বাসনাই মৃত্যু। বাসনাকে উচ্ছেদ করতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে মৃত্যুকে। এখুনি, এই মুহূর্তে। সময়কে পালিয়ে যেতে দেবনা, তার ঝুঁটি চেপে ধরব।'

কি করতে হবে বলো।

আয় ধুনি জ্বালাই। ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী সাজি। অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করি বাসনাজাল।

ধুনির কাঠ কোথায়? শুকনো খড়কুটো যোগাড় করো। ভস্ম কোথায়? তামাকপোড়া টিকের ছাই আছে, তাই নিয়ে এস মুঠোমুঠো।

পৌষমাস, প্রচণ্ড শীত। তারই মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচে নগ্নপ্রায় দেহে বসল নরেন আর তার বন্ধুরা। সামনে জ্বালতে লাগল হোমাগ্নি।

রোজ ঘরের মধ্যে ধ্যান করি। আজ অচঞ্চল আকাশের নিচে, সত্য সরল আগুনকে সাক্ষী করে।

সবাই ধ্যাননিবিষ্ট হল।

এসব কি পুড়ছে? শুষ্ক তৃণপত্র?

না, আমাদের সংস্কারজাত বাসনা দগ্ধ করছি।

কিন্তু হায়, উকিল হবার বাসনা বুঝি তবু যায়না। কি করে যাবে? মা-ভায়েদের পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা না করতে পারলেই বা ছুটি মেলে কি করে? ঠাকুরই তো বলেছিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে, 'আগে তোর মা-ভায়েদের একমুঠো অন্নের জোগাড় করে আয়, তোকে পরমহংস করে দেব।'

'শুনেছেন? নরেন নাকি ওকালতি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে', গিরিশ

ঘোষের ভাই অতুল একদিন ঠাকুরের কাছে এসে নালিশ করল : 'এত করে শেষ পর্যন্ত সেই আইনব্যবসা।'

মৃদুমধুর হাসলেন ঠাকুর। কথা কইলেন না।

এর কদিন পরেই গিরিশের বাড়িতে নরেন এসে হাজির। খালি পা, খালি গা। কি ব্যাপার? গিরিশ চমকে উঠল।

'অশৌচ হয়েছে।' বললে নরেন।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল গিরিশ। প্রশ্ন কণ্ঠের কাছে এসে আটকে রইল।

'মৃত্যু-অশৌচ ও জন্ম-অশৌচ, দুই অশৌচ হয়েছে।'

গিরিশ তো বিমূঢ়।

'অবিদ্যা-মায়ের মৃত্যু আর বিবেক-পুত্রের জন্ম। আর ফিরছিনা সংসারে।' বলতে লাগল নরেন : 'কাশীপুর থেকে আজ সকালে সবে বাড়ি ফিরেছি।' পড়ায় মন নেই, কি করে তবে পাশ করব, বাড়ির সবাই তিরস্কার করতে লাগল। বই নিয়ে চলে গেলাম দিদিমার বাড়ি। কিন্তু পড়ব কি বই খুলে, বসতেই প্রচণ্ড এক ভয় আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল পড়ার মত আতঙ্ককর বুঝি কিছু নেই। শুরু হল ঘোরতর দ্বন্দ্ব। কাঁদতে লাগলাম। এমন কান্না জীবনে আর কখোনো কাঁদিনি। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বইখাতা। ছুটতে ছুটতে আসছি তোমার এখানে। আবার ছুটতে-ছুটতে চলে যাব—'

'কোথায় যাবে?'

'কাশীপুর। ঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নেব। আর ফিরব না।'

বলেই দৃকপাত না করে ছুটল কাশীপুরের দিকে।

অতুল তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। দেখল, যিনি ডাঙায় নৌকা চালান তাঁর খেলা বোঝা ভার।

'আহা! দেখ এখন একবার আমার নরেনের দিকে।' কথা কইতে কষ্ট তবু বলছেন ঠাকুর : 'কি উচ্চাবস্থায় এসে পৌঁচেছে। আগে ভগবানে বিশ্বাস করত না, এখন ভগবানকে পাবার জন্যে পাগল।'

এই না হলে হয়! চাই সর্বসংশয়চ্ছেদী ব্যাকুলতা।

গভীর রাতে ঠাকুর নরেনকে ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, 'তোকে মন্ত্র দেব।'

মর্মমূল পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়ে রইল নরেন। দাবদগ্ধ ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিকণার মত নরেনের সমস্ত রোমকূপ সেই অমিয়সিঞ্চনের আশায় কাঁপতে লাগল।

'ছোট্ট একটি শব্দ। আমার গুরুর কাছ থেকে পাওয়া। সেইটি তোর কানে দিয়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুরের মুখের কাছে নুয়ে পড়ল নরেন। অস্ফুট গদগদকণ্ঠে ঠাকুর উচ্চারণ করলেন, 'রাম।'

সেই অনন্তগুণগম্ভীর ধীরোদাত্তগুণোত্তর রাম। শ্যামাঙ্গসুন্দর ভানুকোটি প্রতীকাশ। মন্ত্রস্পর্শে ফণায়িত হয়ে উঠল নরেন।

আর চাই কি। পরদিন উচ্চকণ্ঠে রামনাম করতে-করতে কাশীপুরের বাগান-বাড়ি পরিক্রমণ করতে লাগল। একবার নয় দুবার নয় বারংবার। যেন শরীরী মানুষ নয় একটা জ্বলন্ত বহ্নিশিখা। যেন বাহ্যিক কোনো চেতনা নেই, যেন একটা ধ্বনির ঝড় বয়ে চলেছে। ধ্বনি আর শিখা, শিখা আর ধ্বনি। যেন বজ্রবিদ্যুৎবাহিনী ঝঞ্ঝা। ঠাকুরের কানে উঠল। নরেনকে ঠেকান। সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

'নিজে নিজেই শান্ত হবে।'

নিজে নিজেই শান্ত হল নরেন।

কিন্তু আমি এই ফেনমত্ততা চাই না, আমি চাই নির্বিকল্প সমাধি। প্রজ্বলন নয়, আমি চাই নিমজ্জন।

'সব হবে। সমাধি তো তুচ্ছ। তার চেয়েও বড় জিনিস তোকে দেব।'

উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'একজন সিদ্ধপুরুষ বা পরমহংস হবি তাতেই তোর কাজ ফুরিয়ে গেল? নিজে মায়ার সমুদ্র পেরোবি আর সকলকে পার করে দিবিনে? নিজে আত্মোদ্ধার করবি আর সকলে বয়ে যাবে? তাদের আত্মার উদ্ধার ঘটাবিনে? নিজে ভগবানকে পাবি আর সকলকে দিবিনে সেই সুধাস্বাদ?'

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। তিনি ভাবাতীত গুণাতীত হয়েও আবার ভাবময় গুণময় রূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ অনুভবানন্দস্বরূপ হয়েও আবার শরীর ধারণ করেন। নামে ও রূপে অভিব্যক্ত হন। তুই যখন জীবকে সেবা করবি তখন তাকে শিব ভেবেই সেবা করবি। কিন্তু যে সেবা নিচ্ছে সেও যে শিব এও তো তাকে ভাবাতে হবে। এ ভাবনা তার মধ্যে না ঢোকালে সেও বা অন্যকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে কেন?

তুই হবি নতুন সাম্যের উদ্গাতা। জীবসান্য নয় শিবসাম্য। জীবনের মান নামিয়ে এনে সমতা নয়, জীবনের মান উন্নত করে সমতা।

এবার তবে ভিক্ষেয় বেরো। গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে ভিক্ষে কর। যদি অহঙ্কারের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধুলোয় বিসর্জন দে।

মুখে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, রামকৃষ্ণ নাম—ভিক্ষায় বেরুল ছেলেরা। নরেন ও তার সহচরের দল। তৃণের চেয়েও অমানী এই দৈন্যকে দেহের ভূষণ করলে। ভিখিরির আবরু মর্যাদা কি? যদি দাও একমুঠো চাল নেব হাত পেতে। যদি ফিরিয়ে দাও ফিরে যাব হাসিমুখে। যদি কঠিন কথা বলো এতটুকু বিঁধবে না। যদি অপমানও করো হারাবনা প্রসন্নতা। তোমার শতসহস্র তিরস্কারের পরেও বলব, বন্ধু, আমার প্রিয়সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

'গুণ্ডার মত তো চেহারা, খেটে খেতে পারোনা? লজ্জা করে না ভিক্ষা করতে?' বলে কেউ রূঢ়কণ্ঠে।

'ট্রাম কণ্ডাকটারিও জোটেনি বুঝি !' আরেক দ্বারটি টিপ্পনী কাটে।

'ওরে গেট বন্ধ করে দে।' আরেক দরজা গর্জন করে। 'চুরি করবার অছিলায় ভিক্ষুক সেজে এসেছে।'

এরই মধ্যে দু'চার জন গৃহস্থ দেয় কিছু চাল-ডাল। দু-একটা পয়সা বা কেউ-কেউ। যা দেবে তাই ঈশ্বরের অহেতুক কৃপা ভেবে মাথায় ধরব।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল দিয়ে ভাত রান্না হল। থালায় করে সে ভাত নিবেদন করল ঠাকুরকে। ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, বড় পবিত্র এ অন্ন। বলে অগ্রভাগ গ্রহণ করলেন।

নরেনকে আরেক দিন ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, তোর হাতে যুবকভক্তদের দিয়ে যাব। আমি যখন থাকব না তখন তুই ওদের দেখবি।

তুমি থাকবেনা কি? তুমি সকল জগতের চক্ষু সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক। তুমি বিভাবসু সূর্য, সকল জ্যোতির অধীশ্বর। তুমিই ধারণ করছ, প্রকাশ করছ, প্রতিপালন করছ। তুমিই ভুবনত্রয়ের একমাত্র শুভদাতা।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত দিন উপোস করছে নরেন। নরেন একা নয়, তার সহগামী বন্ধুরাও।

সমস্ত রাত ধ্যানে আর প্রার্থনায় অতিবাহিত করবে বলে সংকল্প করেছে। বসেছে বন্ধ ঘরে। রাত্রির প্রথম যাম কেটে গেল। কেন কে জানে একে-একে সবাই চলে গেল ঘর ছেড়ে—বাকি রইল শুধু নরেন আর কালীপ্রসাদ।

চারদিক নিস্তব্ধ। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কেমন এক শীতল শান্তি নেমেছে অন্ধকারে।

কালীকে নরেন বললে চুপিচুপি, 'শোন, খানিক পরে আমাকে একবার তুই স্পর্শ করবি।

'কতক্ষণ পর?'

'কথা কোসনে। যখন তোর খুশি।' বলে ধ্যানস্থ হল নরেন।

এই সময় কে আরেকজন ভক্ত ঢুকল দরজা ঠেলে। আর তখুনি কালী স্পর্শ করল নরেনকে।

স্পর্শ করা মাত্র এ কী হয়ে গেল কালীর হাত! বেঁকে গেল। কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ লাগল হাতটাকে চেষ্টা করে সোজা করতে।

খানিক পর নরেন জিগগেস করল কালীকে, 'কেমন মনে হল বল দিকি।'

'যেন প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক পেলাম।' কালী অভিভূতের মতন বললে?

মধ্যরাত্রের পুজোর পর আবার বসল সকলে ধ্যানে। এবারে কালীর ধ্যান সব চেয়ে গাঢ় হল। সবাই বললে, নরেনের স্পর্শের ফল।

পুজোর শেষে নরেন গেল ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুর অসন্তুষ্টের মত বললেন, 'এ সব তুই কী করছিস? শক্তি সঞ্চয় করবার আগেই বিলিয়ে দিচ্ছিস সবাইকে?'

'তুমি কি করে জানলে ?'

'আমি সব জানি। তুই কি ঐটুকু ? শুধু সিদ্ধাই দেখাবার জন্যে তুই আসর জমাবি ? তোর কত বড় কাজ। শুধু একজনকে কি, গোটা পৃথিবীর মানুষকে তুই শক্তিমান করবি। তুই তো শুধু জ্ঞানী হবি না তুই ভক্ত হবি। তুই শুধু নিজে ব্রহ্ম হবি না, সকলকে নিয়ে যাবি সেই ব্রহ্মভূমিতে।'

১৯

'বৈরাগ্য কি !' ঈশ্বরকে তীব্র ভালোবাসার নামই বৈরাগ্য। আর কিছুতে ভালো না লেগে শুধু ঈশ্বরকে ভালোলাগার নামই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ।

বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে নরেনকে ! কি নিবে গেলে সকল জ্বালা নিবে যায় ? ভোগ্যবস্তু দিয়ে কি ভোগ-স্পৃহার নির্বাণ হয় ? না। একমাত্র নির্বাণ তৃষ্ণার উৎখাতে। তৃষ্ণাকে তাই উচ্ছিন্ন করো।

নবীন বয়স, সুন্দরী স্ত্রী, সদ্যোজাত পুত্র, সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য, বিপুল বৈভব সমস্ত ত্যাগ করে চলে গেল সিদ্ধার্থ। চলে গেল প্রব্রজ্যার পথে, ধ্যান-সমাধির পথে। একটি মাত্র উত্তর খুঁজতে। কি নিবে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিবে যায় ?

সেই সমাধানসন্ধানে নরেনও বেরিয়ে পড়ল। তারক আর কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে। চলে এল বুদ্ধ-গয়ায়। এইখানেই বোধি লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব। নিজেই নিজের আশ্রয়। নিজেই নিজের উপায়। নিজের হাতেই নিজের মুক্তির চাবিকাঠি।

মুক্তি কি ? মুক্তি হচ্ছে নিজের উচ্চারণ নিজের উন্মোচন। নিজের অন্তর্নিহিত সম্পদকে উদ্ঘাটন করে দেখানো। আমি নিজে যখন প্রকাশিত তখনই আমি প্রমাণিত। মানুষের মুক্তি এই প্রমাণে এই প্রকাশে। মুক্তোর মুক্তি শুক্তির বিদারণে।

একটি মাত্র জীবন, তাই পরিপূর্ণ করে উৎসর্গ করো। সেই উৎসর্গেই লাভ করো নবজীবন।

যেমন অঙ্গুলিমাল করেছিল। তার কাহিনী ভাবতে বসল নরেন।

দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললে, এ শিশু যৌবনে দস্যু হবে। সুতরাং একে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি। একে হত্যা করো। বললেন স্বয়ং শিশুর পিতা ভার্গব কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত। এ কি অসম্ভব সংকল্প। স্বয়ং প্রসেনজিত বাধা দিলেন। বললেন, দৈবজ্ঞদের জ্ঞান কতটুকু।

ভার্গবের ছেলের নাম রাখলেন অহিংসক। তক্ষশীলায় ভর্তি করে দিলেন। যেমন বুদ্ধি তেমনি মেধা। দেখতে দেখতে সকল ছাত্রের অগ্রগণ্য হয়ে উঠল।

এবং সেই কারণে হল সে সকল ছাত্রের চক্ষুশূল। ছাত্ররা ষড়যন্ত্র করল। ষড়যন্ত্র করে অহিংসকের নামে রটনা করল কলঙ্ক। অধ্যাপকের কানে তুলল। অধ্যাপক ঠিক করলেন, দূর করে দিতে হবে অহিংসককে। বিদ্যাপীঠে আর তার স্থান হবে না।

অহিংসককে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক। বললেন, 'নবীন বয়সেই তুমি সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেছ, শুধু এক বিদ্যা তোমার বাকি।,

'বলুন তা কি। যে মূল্যেই হোক, আমি শিখব সেই শেষ বিদ্যা।' বিদ্যার ব্যাকুলতায় দীপ্তচক্ষু অহিংসক তাকিয়ে রইল অনিমেষ।

'কিন্তু সে বিদ্যার অধিকারী হতে হলে তোমাকে হাজার লোক খুন করতে হবে একে-একে। হাজার পূর্ণ হলেই আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে সেই সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা উপহার দেব।'

'হাজার লোক?'

'হ্যাঁ, যাদের তুমি মারবে প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেকের কড়ে আঙুলটি সংগ্রহ করবে। আমাকে এনে দেখাবে সেই অঙ্গুলিমালা। আমি গুণে দেখব হাজার পুরল কিনা। যাও।' অধ্যাপক তাড়া দিলেন, 'সর্বশেষ বিদ্যার পারঙ্গম হও।'

বিদ্যাকে অসমাপ্ত রেখে যাবনা। আর গুরুবাক্য অভ্রান্ত ও অবিচল বলে বিশ্বাস করব। নরহত্যায় লেগে গেল অহিংসক। এক-এক করে হাজার পূরণ করব তবে আমার ছুটি। দেখি মৃত্যুর উপঢৌকনে পাই কিনা অমৃতের সঞ্জীবনী।

চারদিক থেকে আটটি পথ এসে মিলেছে এক অরণ্যে। সেই অরণ্যেই বসবাস করে অহিংসক। যে কেউই আসবে এ পথের পথিক হয়ে তাকে অক্লেশে প্রাণ হারাতে হবে। ডান হাতের কড়ে আঙুলটি কেটে নেবে তারপর। গলায় মালা করে পরবে। আর বারে-বারে আঙুল গুনে-গুনে নিজের মনে জিগগেস করবে, হাজার পুরতে আর বাকি কত?

আঙুলের মালা গলায় পরেছে বলেই তার নাম অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারের কথা রাজার কানে উঠল। কোথায় সেই অরণ্য! অরাতিপাতন সৈন্য নিয়ে সে বন ঘেরাও করো। একটা সামান্য দস্যুকে দমন করতে পারবনা?

এ দস্যু কে, ভার্গবের তা বুঝতে বাকি নেই। নিশ্চিন্ত হলেন রাজা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন শুনে। শুধু গোপনে স্ত্রীকে বললেন কথাটা। বললেন, 'এই কুলকলঙ্ক পুত্রের মৃত্যুই সমীচীন।'

কিন্তু মা তা মানবে কেন? মা ছুটলেন অরণ্যের দিকে, ছেলের সন্ধানে। রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে আক্রমণ করতে আসছেন, তুই একা কি করে পারবি তার সঙ্গে? তুই পালা। সে সংবাদটুকু দিতে ছুটে এসেছি আমি। আমি তোর চিরদুঃখিনী মা, আমার কথা শোন, রাজার সৈন্য যেন তোকে খুঁজে না পায়!

'তুমি যেওনা। ও মা-বাপ কিছুই মানেনা। উলটে তোমাকেই কোপ মেরে বসবে।'

'বসুক। কিন্তু বলো ওর বিপদের মুহূর্তে চুপ করে থাকি কি করে? আমাকে ওর অরণ্যবসতির পথ বলে দাও। আমাকে ও মারুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু ও বাঁচুক।'

এ কি, মাতৃহত্যার পাপেও কলঙ্কিত হবে নাকি? শ্রাবস্তীর কাছে জেতবনে বিহার করছেন তখন বুদ্ধদেব, তাঁর কানে সমস্ত কাহিনী উপনীত হল। দুর্দান্ত দুর্জন একে বশীভূত না করতে পারলে শান্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মাতৃহত্যার পাতকে সে পঙ্কিল হবে?

নৃশংস দস্যুর জন্য করুণাময়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সামান্য এক ভিক্ষুর বেশে একা-একা তিনি চললেন সেই অরণ্যপথে।

'যাবেন না, ও পথে যাবেন না।' গ্রামের রাখাল ছেলেরা মিনতি করে উঠল।

প্রশান্তমুখে বুদ্ধদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'কিছু আগেই জঙ্গলের মধ্যে অঙ্গুলিমালের বাসা। তার কথা শোনেননি বুঝি? সে যাকে সামনে পায় তাকেই কেটে ফেলে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন যাত্রী একত্র দল বেঁধে না গেলে তার হাতে আর নিস্তার নেই। আপনি একা, আপনি নিরস্ত্র—'

অভয়সুন্দর চোখে তাকিয়ে রইলেন বুদ্ধদেব। কোন নিষেধ কানে না তুলে চললেন এগিয়ে।

অঙ্গুলিমাল বড় অস্থির হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বহুদিন কোন লোকের সে দেখা পাচ্ছেনা। তার ভয়ে পথঘাট সব নির্জন হয়ে গেছে, কেউ আর আসছেনা অরণ্যের ত্রিসীমায়। কি হবে! নশো নিরানব্বইটি আঙুল সে সংগ্রহ করেছে, আরেকটি আঙুল এখনো বাকি। হাজার না পুরলে যে তার ব্রতোদযাপন হবেনা। আয়ত্ত হবেনা সে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা বিদ্যা।

যে করে হোক শেষ আঙুল, সহস্রতম আঙুলটি আজ চয়ন করতেই হবে। সম্পূর্ণ করতে হবে প্রমাণমাল্য। চুপ করে প্রতীক্ষা করে থাকলে মিলবেনা সেই শেষ বলি। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তৎপর হয়ে খুঁজতে হবে এদিক-ওদিক।

অরণ্যগহন থেকে বেরিয়ে এল অঙ্গুলিমাল। যতদূর চোখ যায়, জনমানবহীন। অরণ্যসঙ্গমের আট-আটটি পথই খাঁ-খাঁ করছে। একটা ধূলিকণা পর্যন্ত উড়ছে না। কি হবে? প্রতিজ্ঞাপূরণ হবেনা তা হলে? পূর্ণ হবেনা গুরুপূজার উপচার?

ক্ষুধার্ত বাঘের মত অঙ্গুলিমাল তাকিয়ে রইল লোলুপ চোখে। ও কে! ও কে আসছে? ভগবান তা হলে মুখ তুলে চেয়েছেন?

সামান্য একজন ভিক্ষু। উদাসমনে চলেছেন অন্যমনে। অন্যমনে চলেছেন বলেই বুঝি এসে পড়েছেন বনপথে। এখানেই যে তাঁর প্রাণশেষ তা, হায়, তাঁর জানা নেই।

আনন্দে অধীর হয়ে অঙ্গুলিমাল তাঁর দিকে ধাবমান হল।

কিন্তু এ কি, কিছুতেই যে পৌঁছুতে পারছে না ভিক্ষুর কাছে। ছুটছে,

ছুটছে, আবার তাকিয়ে দেখছে, যেমন ব্যবধার তেমনি ব্যবধান। ভিক্ষু তো কই পালাচ্ছেনা প্রাণভয়ে, ধীর পায়ে হাঁটছে, তবু এত তীব্রবেগে ছুটেও কেন সে তাঁর নাগাল পাচ্ছে না ? এত দিন অরণ্যে বাস করে কত হরিণকে সে হারিয়ে দিয়েছে গতিতে, আজ এক মন্থর পদচারী ভিক্ষুর সঙ্গে সে পেরে উঠছে না। তীরের মত উল্কার মত ছুটল আবার অঙ্গুলিমাল, কিন্তু আশ্চর্য্য, যেই দূরত্ব, সেই দূরত্ব।

তখন আর্তনাদ করে উঠল দস্যু, 'একটু দাঁড়াও। আমি বড় বিপন্ন। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও।'

সর্বাবস্থায়ই মানুষের এই বিপন্নবুদ্ধি। আমি অশরণ, আমি অসহায়, আমি গৃহহারা। অরণ্যে বাস করছি আমি, সার বিদ্যা আহরণের পুণ্যব্রত এখনো সম্পন্ন করতে পারলুমনা। আমি নিঃসঙ্গ, সর্বপরিত্যক্ত। আমার কেউ নেই। তুমি একটু দাঁড়াও। তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেওনা। কলঙ্ককর্দমে আমার দুই হাত লিপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু জানি, এ দুই হাতে আর কিছু ধরা না যাক, যা ধরা যায় তা তোমারই পদকুসুম। দয়া করো, একটু দাঁড়াও। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও। আমার ব্রতপূর্তির সহায় হও।

তথাগত দাঁড়ালেন।

'আহা, বড় ক্লান্ত হয়েছ তুমি ছুটে-ছুটে।' করুণার্দ্র স্বরে বললেন বুদ্ধদেব, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমিই যাচ্ছি তোমার কাছে।'

মন্ত্রস্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল অঙ্গুলিমাল।

ধীর পায়ে প্রভু তার কাছে এগিয়ে এলেন। শান্তোদাত্ত কণ্ঠে শোনাতে লাগলেন অভয়ের কথা, অশোকের কথা। বললেন, 'নশো নিরানব্বুই জন লোককে তুমি হত্যা করেছ। তাদের মৃত্যু-কালীন মুখগুলো মনে করো।'

বিভীষিকা দেখতে লাগল অঙ্গুলিমাল। শুনতে লাগল তাদের মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ।

'আমাকে ক্ষমা করুন।' অঙ্গুলিমাল যেন কেমনতর হয়ে গেল, লুটিয়ে পড়ল প্রভুর পাদপদ্মে।

'তোমাকে রক্ষা করতেই তো এসেছি।'

'আমারও বাঁচবার উপায় আছে ?' কাঁদতে লাগল অঙ্গুলিমাল।

'আছে।' বললেন করুণাময়। 'রক্তনদী ধুয়ে দেবার জন্যে আছে শ্বেতনদী, অশ্রুনদী। তোমাকে আমি প্রব্রজ্যা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চলো জেতবনে।'

অঙ্গুলিমালের মা ফিরছে উন্মাদিনী হয়ে। কোথায় তার ছেলে ? কই সেই অরণ্যে তো সে নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান পেল না। এদিকে রাজার সৈন্য বেরিয়েছে তাকে বিধ্বস্ত করতে। যদি পূর্বমুহূর্তে সতর্ক করে না আসি তবে যে সে বাঁচে না। কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল মা। কোথায় আমার অহিংসক ? তার বুঝি আর নিস্তার নেই।

কোথাও যাবার আগে কোনো কিছু করবার আগে প্রসেনজিতের একবার আসা চাই গৌতমের কাছে। গৌতমের চরণবন্দনা না করে কোন কর্মে তার উৎসাহ নেই,

উদ্দীপনা নেই।

'ব্যাপার কি?' রাজাকে জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব, 'এত সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোথায় চলেছেন? কোন শত্রুজয়ে?'

'অঙ্গুলিমালকে দমন করতে। জানেন সেই নরঘাতকের কাহিনী?'

'জানি। নশো নিরানব্বুই জনকে হত্যা করে সে একজনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। আপনাকে পেলে তার হাজার সংখ্যা পূর্ণ হত।' প্রশান্ত উদার মুখে হাসলেন গৌতম: 'তবু আপনি রাজার কর্তব্যপালনে চলেছেন, কি করে আপনাকে বাধা দিই? কিন্তু যদি ধরুন সে এখানে আপনার কাছে এসে হাজির হয়?'

'এখানে? এই জেতবনে? ভিক্ষুসংঘে?' প্রসেনজিৎ যেন পড়লেন আকাশ থেকে।'

'হ্যাঁ, যদি দেখেন সে জীবহিংসা ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষু হয়ে গিয়েছে, তা হলে কি করেন? তার নশো নিরানব্বুই হত্যার দণ্ড দেন?'

'সে যদি ভিক্ষু হয়ে যায় তা হলে তো তার সমস্ত অপরাধের মার্জনা হয়ে গেল।'

'তবে এই দেখ অঙ্গুলিমালকে।'

অঙ্গুলিমাল রাজার সামনে দাঁড়াল অভিবাদন করে। সৌম্য শান্ত ভিক্ষুর বেশে। মেঘমালিন্যমুক্ত সূর্যের দীপ্তিতে।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল প্রসেনজিৎ। এও সম্ভব! এত বড় পাষণ্ডকে প্রভু ক্ষমা করেছেন। আর সেই স্পর্শমণির ছোঁয়ায় এই ক্লিন্নমলিন লোহাও সোনা হয়!

আনন্দের উপহারস্বরূপ মণিময় কটিবন্ধ অঙ্গুলিমালকে দিতে গেল রাজা। অঙ্গুলিমাল বললে, 'আমার আভরণ দিয়ে কি হবে? অহিংসাই আমার আভরণ।'

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল বেরুল রাজপথে। কিন্তু তাকে যে দেখে সেই পালায়। ওরে ঐ অঙ্গুলিমাল আসছে। পালা। আর কিছুতেই না পেরে শেষে ছদ্মবেশ ধরেছে। তার হাজার সংখ্যার একজন এখনো বাকি। সরে পড়্। বাড়ি গিয়ে ঘরে কপাট দে।

পথঘাট জনশূন্য হয়ে গেল। এক মুষ্টিও ভিক্ষা মিলল না অঙ্গুলিমালের। সকাল থেকে দুপুর, দুপুরও এখন বিকেলের দিকে হেলেছে, তবু খাদ্য নেই পানীয় নেই আশ্বাস নেই আশ্রয় নেই। সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ, পথচারী যদি কেউ পড়ে দৃষ্টিপথে, পালিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে।

অভুক্ত অপীত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে বিহারের দিকে। দেখল পথিপার্শ্বে একটি নিরাশ্রয় নারী মৃত্যুযন্ত্রনায় আর্তনাদ করছে।

আশ্চর্য, সেই শুধু অঙ্গুলিমালকে দেখে পালালনা। কি করে পালাবে? স্বয়ং মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। যে মরছে তার আবার মরতে কি ভয়? কিন্তু আর্তনাদ শুনে দ্রবীভূত হল অঙ্গুলিমাল। কি করে এই পথশায়িনী দুঃখিনীর যন্ত্রণার উপশম করবে? ব্যাকুল হয়ে তার উপায় খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় উপায়? সোজা ছুটে এল প্রভুর কাছে। প্রভু, আর্তকে ত্রাণ করুন। লাঘব করুন

তার ক্লেশভার।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বুদ্ধদেব। মৃত্যুকালে নশো নিরানব্বুয়ের কত করুণ আর্তনাদ শুনেছে অঙ্গুলিমাল, এক তন্তু বিচলিত হয়নি। আজ কোথাকার কে এক নামগোত্রহীনা পথের মেয়ের জন্যে তার এই ব্যাকুলতা। শুধু বিচলিত নয় বিগলিত।

প্রভু বললেন, 'তুমি ফিরে যাও সেই নারীর কাছে। তাকে বলো, আমি আজন্ম স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিনি। আমার সেই পুণ্যের বিনিময়ে তোমার যন্ত্রণার উপশম হোক।'

'আমি প্রাণিহিংসা করিনি ? সে কি কথা ?' অঙ্গুলিমাল স্তম্ভিত হয়ে রইল।

'না করোনি। কোথায় করলে ?'

'সে কি ? একটি দুটি নয়, নশো নিরানব্বুই জন নিরীহের প্রাণ নিয়েছি।'

'সেই তুমি কোথায় ? সে আরেক লোক। তার নাম ছিল অঙ্গুলিমাল। এখন তোমার সেই অহিংসক নাম ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নতুন গৌরবে। তুমি ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেছ। তোমার নবজন্ম হয়েছে। বলো এই নবজন্মে স্বেচ্ছায় হিংসা করেছ তুমি ?'

করুণাঘন অমৃতবাণীতে স্নিগ্ধ হল দেহমন।

'পূর্বজন্ম ও পূর্বজীবনের কথা ভুলে যাও।' আবার বললেন বুদ্ধদেব, 'মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে চলে এস নবজীবনের মহাদেশে।'

'কিন্তু প্রভু, এক অতৃপ্তি রয়ে গেল।'

'কি ?'

'আমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হলনা।'

'কে বললে ?'

'নরহত্যায় এক সংখ্যা কম পড়ল। হাজার পুরলনা।'

সিদ্ধার্থ হাসলেন। বললেন, 'না, পুরেছে হাজার নশো নিরনব্বুই বধের পর একটা জীবন বাকি ছিল। সে তুমি তোমার নিজের জীবন দিয়ে পূরণ করেছ। সেই তোমার গতজীবন, দস্যুজীবন। সেই জীবন বলি দিয়েই সহস্র সম্পূর্ণ হয়েছে তোমার। গুরুদক্ষিণার শোধ হয়েছে। এবং সেই শোধের পর তোমার যে শেষবিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা অর্জন করবার কথা ছিল তাই এবার এসেছে তোমার করতলে। অহিংসাই সারবিদ্যা।'

দুই চোখ উদ্দীপ্ত হল অহিংসকের।

'যাও', প্রভু আবার বললেন, 'সেই মুমূর্ষু নারীর যন্ত্রণা শান্ত করে এস।'

ত্বরিত পায়ে সেই নারীর ধূলিশয্যার পাশে এসে দাঁড়াল অহিংসক। দৃঢ় ও গাঢ় স্বরে বললে, 'আমি জন্মাবধি স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিনি। আমার সেই পুণ্যের বিনিময়ে তোমার যন্ত্রণা উপশম হোক।'

নারীর যন্ত্রণার উপশম হয়ে গেল। পরম তৃপ্তিতে তাকাল সে অহিংসকের দিকে।

মোট কথা হচ্ছে কি? নিজের জীবন উৎসর্গ করো। নিজের জীবন উৎসর্গ করে ব্রতপূর্তি করো। অর্জন করো সারবিদ্যা। নিখিলমৈত্রী। নিজের জীবন উৎসর্গ না করলে হবে না নবজন্ম। আর নবজন্ম না হলে জন্মগ্রহণ করে সুখ কি!

উৎসর্গ করবে কোথায়?

উৎসর্গ করবে প্রভুর পাদপদ্মে।

দু'চার দিন পরেই গয়া থেকে ফিরে এল নরেন।

ঠাকুর বললেন, 'কোথায় আর যাবে। মাস্তুলছাড়া পাখির কি আর গতি আছে? মাস্তুলে এসে বসেছিল এক পাখি। জাহাজ যখন ছাড়ল তখন পাখি ভাবলে, দেখি, ডাঙায় ফিরে যাই। বহুক্ষণ এদিক ওদিক উড়ে যখন কূল পেলনা, তখন আর কি করবে, ফের সেই মাস্তুলে এসে বসল।'

নরেন ফিরে এলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে বললেন, যা কলকাতা থেকে শঙ্খকুণ্ডল কিনে নিয়ে আয়। তা দিয়ে সাজিয়ে দেব নরেনকে। জানিস কুণ্ডলধারণে ধ্যাননিরত বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন। নরেনও তেমনি সিদ্ধ হবে।'

শঙ্খকুণ্ডল এলনা ঠিক সময়ে। ঠাকুর তখন নিজহাতে মৃৎকুণ্ডল তৈরি করলেন। নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন নরেনকে। ঠাকুরের নিজের হাতে গড়া কুণ্ডল, সে আরো শক্তিশালী।

নরেনকে আশীর্বাদ করলেন, 'মহানিশায় যাও দক্ষিণেশ্বরে। ধ্যানযোগে সিদ্ধ হও।'

২০

ঠাকুরের কেন এত যন্ত্রণা? তিনি কি ইচ্ছা করলে ত্রাণ পেতে পারেন না এই ক্লেশ থেকে?

সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে তারক এসে বললে, 'আপনার হাতে এ কী হয়েছে?

বাড়-বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'পায়ে তার বেধে পড়ে গিয়েছে।'

'হাড় সরে গিয়েছে না ভেঙে গিয়েছে?'

'কে জানে বাপু কি হয়েছে। ওরা তো বেঁধে দিয়েছে আষ্টেপৃষ্টে। একটু আরাম করে যে মাকে ডাকব তার জো নেই।'

ঠাকুরের স্বর আর্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠল। তারক অসহায়ের মত তাকাতে লাগল চারদিকে।

'এক-এক সময়ে ইচ্ছে হয়, দুত্তোর বাঁধাবাঁধি, সব কেটে বেরিয়ে যাই। দু'হাত তুলে নাচি হরিবোল বলে।' পরের মুহূর্তেই ঠাকুরের স্বর আবার আচ্ছন্ন হয়ে

এল : 'না, এও একরকম বেশ খেলা চলছে। এ খেলায়ও আছে বেশ রস-কস।'

কী দরকার এই কষ্টের খেলা খেলে? তারক স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'এতে যে আমাদেরও কষ্ট। আপনি তো ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে যেতে পারেন—'

'ভালো হয়ে যেতে পারি? ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে যেতে পারি?' কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন ঠাকুর। পরে বললেন', না, রোগের ভোগই ভালো। যারা নানা কামনা নিয়ে আসে আমার কাছে, তারা আমাকে ভুগতে দেখে ভেগে যাবে। ভাববে, এও আমাদের মতই ভোগে, এ আর আমাদের প্রার্থনা মেটাবে কি! চল অন্য সাধুর খোঁজ নিই।' ঠাকুর হাসলেন।

'ওসব বাজে লোকের ভিড় কমে গেলে আমি বরং হালকা হব।' পরে মহামায়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন : 'কী কৌশলই করেছিস মা!'

নরেন বললে, 'এ কৌশল ভেঙে দিতে হবে।'

'বলিস কি রে?' ঠাকুর তার দিকে তাকালেন স্নেহচক্ষে। বললেন, 'বুড়ি যে খেলতে ভালবাসে।'

'খেলতে ভালবাসে তাতে আমার কি? আমি কেন খেলি?'

'সে কি রে, কি বলছিস তুই? খেলেই তো সুখ। নানারকম খেলা। কভু হার কভু জিত। কভু হাসি কভু কান্না। যে কেবল বুড়ির কাছে ঘোরে তাকে বুড়ি ভালবাসে না। যে অনেক দান খেলে বুড়িকে ছুঁতে আসে তার জন্যই বুড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই তো পাকা খেলোয়াড়। ক্লান্ত হয়ে কুপা কুড়িয়ে নেয়। পাশা খেলায় দেখিস নি, পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খায়, আবার যেমনি চায় অমনি দান ফেলে, কচে বারো—আবার উঠে যায় এক লাফে।'

খেলা, খেলা, শেষকালে খেলাভাঙার খেলা।

নরেন চুপ করে রইল।

তখন না হয় সামান্য হাত ভেঙেছিল, কিন্তু এখন এ কি মর্মচ্ছেদী যন্ত্রণা! যদি সাধ্য হয় কার না ইচ্ছে হবে এই বিষদগ্ধ দারুণ ব্যাধি ঝেড়ে ফেলে গা থেকে। আর সংসারে যদি কারু সেই শক্তি থাকে তবে তা স্বয়ং সাধকচক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণেরই আছে।

কিন্তু এখনো তাঁর সেই এক কথা : 'এই ব্যারাম হয়েছে কেন? যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

'আর আমরা?' কেঁদে উঠল ভক্তের দল।

'তোরা যারা শুদ্ধ ভক্ত, তোরাই থাকবি। তোদের সাধ্য কি আমায় ফেলে পালিয়ে যাস। তোদেরকে মিলিয়ে দেওয়াও আরেকটা উদ্দেশ্য এই অসুখের।' নিজেকে দেখিয়ে ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন : 'এর ভিতর মা স্বয়ং লীলা করছেন। প্রথম অবস্থায় জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করত। তাকিয়ে থাকত হাঁ করে। তাই মাকে বললুম, মা, বাহিরে প্রকাশ পেয়ো না, ঢুকে যাও, লুকিয়ে পড়ো। মা শুনলেন। তাই এখন এই হীন দেহ।' একটু স্তব্ধ হলেন ঠাকুর, বললেন, 'ভালোই হয়েছে। নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকের ভিড়

লেগে যেত। এক দণ্ড তিষ্ঠোতে দিত না আমাকে। এই ভালো হয়েছে।'

'ভালো হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, আগাছার দল পালিয়ে গেছে। যাক, যেতে দে। তোরা অক্ষয়করণ বট, তোরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবি।'

নরেন তারক রাখাল বাবুরাম—সকলের চোখ জলে ভরে উঠল।

'আর, নরেন ? তুই তো আমার সেই হোমাপাখি।'

হোমাপাখি খুব সুদূর আকাশে বাস করে, শূন্যেই ডিম পাড়ে। ডিমটা মাটিতে পড়ে যাবার কথা, কিন্তু পড়বার আগেই ফুটে ছানা বেরোয়। ছানা নামতে থাকে মাটির টানে কিন্তু মাটি স্পর্শ করবার আগেই ওর চোখ ফোটে, ডানা গজায়। বুঝতে পারে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়ছে। বুঝতে পারে মাটি ছুঁলেই মৃত্যু। তখন হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠে উপরের দিকে উড়ে চলে। উড়ে চলে তার মার কাছে, সেই আকাশ-আবাসে। ঈশ্বরনিকেতনে।

হোমাপাখি নিত্যসিদ্ধের প্রতীক। কে নিত্যসিদ্ধ ? জন্ম থেকেই যে ঈশ্বরকে চায়, সংসারের কোনো ভোগে যার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। শুধু নিত্যসিদ্ধ ? আরো কত-কি বিশেষণের মাল্যদাম গলায় পরিয়ে দিয়েছেন নরেনের।

এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন জালা। অন্যেরা ডোবা-পুকুর নরেন বড় দীঘি। অন্যেরা কাঠি-বাটা, নরেন রাঙাচক্ষু লাল রুই। বাঁশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফুটোওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। নরেন সভায় থাকলে আমার বল, সঙ্গে থাকলে সাহস। যেন খাপখোলা তরোয়াল।

রাম দত্ত বললে, 'এমন অসুখ না হলে ঠাকুরকে চিনত কে ? সুস্থ শরীরে সবাই-ই তো ভগবানে মন রাখতে পারে। কষ্টের কণ্টকশয়নে শুয়েও যিনি অনুক্ষণ নির্বিকল্পে থাকতে পারেন তিনিই অবতার।'

'তাছাড়া আবার কি।' বললে বলরাম, 'ঠাকুরের অসুখ করেছে, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ঠাকুরের কখনো অসুখ করতে পারে ? এ আমাদের অসুখ, আমাদের পাপ।'

'প্রভু আর কত ছলনা করবেন ?' হাতজোড় করে বলছে কেদার চাটুজ্জে।

ছলনা ?

'তাছাড়া আবার কি।' বলেছে গিরিশ ঘোষ। 'এ তাঁর লীলা, মানুষের দুঃখ হরণ করবার ছল। সর্বজীবের পাপাপরাধ টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে আর সেই দুর্ভার গ্লানি মুছে দিচ্ছেন নিজের ক্লেশ দিয়ে।'

গিরিশের পাপ নিয়েই ঠাকুরের ব্যাধি। শুধু গিরিশের পাপ ? আমার-তোমার সকলের পাপ। সকলের দুষ্কৃতি। সকলের ঋণবন্ধন। চেয়ে দেখ ঠাকুরই সেই নির্জিতদুঃখ বিপাপ অগ্নি।

'জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।' বললে শশী।

'অত কথায় কাজ কি। শুধু সেবা, সেবা লাগিয়ে দে।' নরেন বলে উঠল, 'দেখছিস না, আমাদের সেবা নেবেন তাই তাঁর এই অসুখ। সেবাই যে পূজা, সেবাই যে শিব, তাই শেখাবার জন্যেই এই আয়োজন। তাই ভাবছিস কেন? তাঁর এই অসুখ না হলে কি আমাদের হ'ত এই মন্ত্রদীক্ষা, এই চক্ষুরুন্মেষ? তাই ছাড়িসনে এ সুযোগ, কায়েমনে সেবা লাগিয়ে দে। এমন সেবা লাগিয়ে দে যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে না পারেন।'

কে একজন এসে নালিশ করলে লাটুকে, 'সারাদিন কেবল রুগীর সেবাই করেন, উপাসনা-আরাধনা করেন না?

লাটু একবার তাকাল নরেনের দিকে। বললে, 'সেবাই তো আমাদের একমাত্র উপাসনা, একমাত্র আরতি। আমাদের আর কোনো পূজা-চর্যা আছে নাকি? যাকে শুশ্রূষা করছি, নাওয়াচ্ছি-খাওয়াচ্ছি, যার পা টিপে দিচ্ছি, মলমূত্র পরিষ্কার করছি, সেই আমাদের ইষ্ট, আমাদের সর্বশিরোমণির ভগবান।' .

আর্তকে পেয়েছি, তার মানেই শিবসন্ধান হয়েছে। এবার তার হিতচিকীর্ষায় দৃঢ়ব্রত হও। সেই হিতচিকীর্ষাই তোমার পূজোপাসনা। কল্যাণকর্মের সুযোগ না পাও অন্তত সর্বভূতে শুভাভিলাষী হও। সেই শুভাভিলাষও ঈশ্বরের আরতি।

এত কষ্ট তবু ঠাকুর কি করে আছেন এত আনন্দময়!

রহস্যটুকু শিখে নে আমার থেকে। যে রয় সেই সয়, আর যে সয় সেই মহাশয়।

'কত তোকে সইতে হবে, বইতে হবে একা-একা।' নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন ঠাকুর: 'জীবনে আর তপস্যা কি? সহ্য করাই তপস্যা। যত দুঃখকষ্ট বৈফল্যনৈরাশ্য আসবে সব শরীরের, সংসারের, কিন্তু তোর মন থাকবে পুণ্য-প্রতিজ্ঞায় ভরপুর। সেই পুণ্যপ্রতিজ্ঞাই ঈশ্বরানন্দ।' বলেই তার দীপ্ত মন্ত্র, দিব্য সূক্ত উচ্চারণ করলেন: 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

ধূমপঙ্কের ঊর্ধ্বে তুই বিশুদ্ধ নীলিমা। সর্বভাসক উপস্থিতি।

কীর্তন লাগিয়েছে ভক্তদল। নরেন রাখাল লাটু বাবুরাম।

ঠাকুর ডেকে পাঠালেন কীর্তুনেদের। বললেন, 'তোরা তো বেশ রে! কেউ মরে আর কেউ হরি হরি বোল বলে।'

সবাই অপ্রস্তুত।

হেসে উঠলেন ঠাকুর। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলককদম্ব। বললেন, 'গান গাইছিস তো সুর ভুল করছিস কেন? তাছাড়া এক কলি ছেড়ে দিয়েছিস। বলে ঠাকুর সুর করে গেয়ে দিলেন কলিটা। কোন্ জায়গায় সেটা বসাতে হবে তাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'হরিনাম গান করছিস সুরে-তালে নিটুট থাকবি। এতটুকু আখর পর্যন্ত ফেলে যাবিনে। যা, লাগা কীর্তন।'

ভক্তবৃন্দ উদ্দাম আনন্দে কীর্তন সুরু করল।

'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার চিকিৎসা করছে ঠাকুরের। সে ঈশ্বর পর্যন্ত না হয় মানল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের চেহারা ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এ মানতে সে রাজি নয়। কি করে হবে? যিনি অবতার তিনি ধরা দিয়ে বুঝিয়ে দিন না। তাহলেই তো মিটে যায় গোলমাল।

নরেনের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল। নরেনও প্রথমটা মানতে চায়নি। তুমি যদি অবতার তাহলে আমিও অবতার। বটেই তো, তুইও ঈশ্বরের প্রতিনিধি। একই জল গোষ্পদেও আছে সমুদ্রেও আছে। যতটুকু জল ততটুকুতেই আকাশের প্রতিবিম্ব। যতটুকু গুণ ততটুকুতেই ঈশ্বর আভাসিত। তাই গুণদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।

'দেখুন না রামকে অবতার কি করে বলি? বালি-বধ, শম্বুক-বধ,—এ কি মশাই ঈশ্বরের কাজ? এ কাজ নিতান্ত মানুষের।'

গিরিশ ঘোষ কাছে ছিল, হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এমন কাজ যদি কেউ করতে পারে সে কেবল ঈশ্বরই পারে।'

'তারপর সীতাবর্জনটা দেখুন।'

'এও মশাই ঈশ্বরের কাজ। মানুষের সাধ্য নেই জেনেশুনে নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে।'

ডাক্তার সরকার মৃদুরেখায় হাসল। এও একটা কথা?

ঈশ্বর যদি নিরাকার হন কেন তিনি সাকার হতে পারবেন না? এত সব করতে পারেন তিনি, আর একটু আকার ধরতে পারবেন না? মন সৃষ্টি করে তিনি নিরাকার, দেহ সৃষ্টি করে তিনি সাকার। যিনি আদ্যন্তহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি খেলাচ্ছলে ধরতে পারেন না একটি মানুষের ছদ্মবেশ? রাজা কি কখনো-কখনো ছদ্মবেশ ধরে দেখতে আসেনা তার নিজের রাজ্য?

ঠাকুর বললেন, 'আরে, ওরা যে বিজ্ঞানের আজ্ঞাধীন। ঈশ্বর যে অবতার হতে পারেন এ কথা ওদের সায়ান্সে লেখা নেই। তাই কি করে বিশ্বাস হবে শুনি? বলে ঠাকুর হাসতে হাসতে এক গল্প ফাঁদলেন: 'তবে এক গল্প শোনো। একজন এসে বললে, ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যাকে বললে সে একজন লেখাপড়াওয়ালা লোক। সে বললে, দাঁড়াও খবরের কাগজখানা একবার দেখি। খবরের কাগজ নিয়ে এপৃষ্ঠা ওপৃষ্ঠা অনেক ওলটাল-পালটাল কিন্তু অমুকের বাড়িভাঙার কথার উল্লেখ নেই। তখন সে বলল, কই খবরের কাগজে তো লেখেনি। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করিনা। সে কি, নিজের চোখে দেখে এলুম যে। বিশ্বাস করিনা, ও সব মিছে কথা, নইলে খবরের কাগজে থাকত।'

সবাই হেসে উঠল।

যেহেতু বইয়ে নেই সেহেতু অনুভবেও নেই। পায়ের নিচে মাটির পৃথিবীটাই

সত্য, আর মাথার উপরে আকাশটাকে দেখেও দেখবনা।

খবরের কাগজে লিখেছে আণবিক বোমায় পৃথিবী একটি ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। যদিও তা চোখে দেখিনি, দেখবও না, তবু তা বিশ্বাস করে বসে আছি। কোন্ যুক্তিতে এ বিশ্বাসের সমর্থন আছে? এর জন্যেই আছে যে একজন এক্সপার্ট, পারঙ্গম বৈজ্ঞানিক, তাঁর নিভৃত লেবোরেটরির নীরব সাধনায় তা আবিষ্কার করেছেন। যেহেতু সেই বৈজ্ঞানিক আমাদের বিশ্বাসভাজন, সেই হেতু তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে আমরা বিশ্বাসবান।

তেমনি দেখ আধ্যাত্মিক লেবোরেটরির ক্ষেত্রে কোনো এক্সপার্ট, পারঙ্গম বৈজ্ঞানিক আছেন কিনা। তিনি তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন কিনা। তিনি যদি তেমন জাতের লোক হন, যদি বিশ্বাসের পাত্র হন, তবে তাঁকেই বা তুমি মানবেনা কেন, কেনই বা নেবেনা তাঁর আবিষ্কার?

পৃথিবী যদি ধূলিকণায় পরিণত হয় তবে আজকের সব ধূলিকণাও পৃথিবীতে পরিণত হবে। পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণা, কোটি-কোটি ধূলিকণাও কোটি-কোটি পৃথিবী। বিশ্বাস করতে পারো? কি করে পারবে? খবরের কাগজে এখনো তা লেখেনি যে।

'সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয়না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর, অনেক—অনেক দূর।' বললেন ঠাকুর: 'বিষয়বুদ্ধি থাকলেই সংশয়। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই অহংকার। পাণ্ডিত্যের অহংকার, সব-জেনে-ফেলেছির অহংকার। ধনের অহংকার, সব-করতে-পারির অহংকার। সেই অহংকারই দেয়না বিশ্বাস করতে।'

তাহলে বলতে চাও, জ্ঞান, জ্ঞান চাইনা?

কিন্তু আমরা কি জ্ঞান চাই? আমরা চাই বিদ্যা। শুধু বিদ্যার বোঝা বাড়িয়ে চলেছি। শুধু পাণ্ডিত্যের পিণ্ড। যদি জ্ঞান চাই, নম্র একটি বালকের মত নীরবে এসে বসতে হবে গুরুর পায়ের কাছে। আত্মা, অন্তর্যামীই সেই পরমগুরু। গুরু আমার থেকে বেশি জানেন বেশি বোঝেন এ বিশ্বাসটি না থাকলে জ্ঞানার্জন হবে কি করে? গুরু ছাড়া বিদ্যার্জন হতে পারে শুধু শুকনো পুঁথি পড়ে। কিন্তু জ্ঞান পেতে হলে বিশ্বাস চাই নম্রতা চাই সারল্য চাই।

ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।'

বেশ তো, নিজের চোখেই তবে দেখনা।

ডাক্তার সরকার আরেক ডাক্তার নিয়ে এসেছে সেদিন। সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ উপস্থিত হল। দেখতে-দেখতে লোপ পেল ঠাকুরের বাহ্যচেতনা। নীরন্ধ্র নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

সমাধিভাবটা একবার বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষা করে দেখিনা। ডাক্তার সরকার ঠাকুরের বুকে স্টেথিসকোপ লাগালেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন মুহূর্তে। হৃৎস্পন্দন নেই, না, একবিন্দু না। এ কি, নিশ্বাসও পড়ছে না, হাতের নাড়ি কোথায় উঠে গেছে কে বলবে। অথচ ঢলে পড়ে যাচ্ছেনা মাটিতে। অচল অটল

সুমেরুবৎ বসে আছে। শুধু তাই নয়, দুই চোখ উন্মীলিত, পলকবিহীন।

আঙুলের খোঁচা মারলে নিশ্চয়ই চোখ সঙ্কুচিত হবে। সেই পরীক্ষা করবার জন্যে ডাক্তার সরকারের সহাগত ডাক্তার ঠাকুরের চোখে আঙুলের খোঁচা মারল। এতটুকুও কোঁচকালনা চোখ, পলক নড়লনা।

ডাক্তারের নিজের চোখে দেখা। বাইরে থেকে দেখতে মৃত, অথচ আসলে বসে আছেন স্থির হয়ে।

কি আর বলবেন ডাক্তার! মাথা হেঁট করলেন। স্টেথোসকোপ খসে পড়ল হাত থেকে।

তারপর সেদিন আরেক কাণ্ড।

রাত তিনটে থেকে জেগে বসে আছে সরকার। চোখে ঘুম নেই। কেবল রামকৃষ্ণচিন্তা। আর কিছু নয়, আহা, ঠাণ্ডা লাগল নাকি নতুন করে। গলা আবার টাটাল নাকি! বাড়ল নাকি কাশি!

শুধু তাই? নিজের মনকে কত চোখ ঠারবে? মন বলছে, আরো একটু ভাবো। আরো একটু গভীরে যাও।

ঈশান মুখুজ্জেকে সেদিন যেমন বলেছিলেন ঠাকুর, 'বামুন, ডুবে যাও, তলিয়ে যাও—'

না তলালে অতলকে ছোঁবে কি করে?

রোজ-রোজ কত টাকা যে লোকসান হচ্ছে বলবার নয়। ঠাকুরের কাছে এসে আর উঠতে সাধ হয়না। পায়ে শিকড় গজায়। সকাল আটটা বেজে গেল তবু বেরুবার নাম নেই। তখনো পরমহংসের চিন্তা। মাস্টারমশাই এসে জিগগেস করলেন, 'কি হচ্ছে?'

'আর কি হবে! পরমহংস হচ্ছে।'

সেদিন বিকেল তিনটের সময় এসে হাজির। ইচ্ছে ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে অন্য রুগীর বাড়ি যাবে। অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে সেদিন। এবং সকলের অগ্রনায়ক নরেন্দ্রনাথ। নরেনকে দেখে খুশি হল সরকার। বললে, 'আজ গান হবেনা?'

ঠাকুর বললেন, 'একটু গান কর।'

তানপুরা টেনে নিয়ে নরেন গান ধরল: 'সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে।' তারপর আবার আরেকখানা, ঠিক সরকারের মুখের উপর জবাব: 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

মুহূর্তে কি হয়ে গেল কে বলবে। সকলেই একসুরে বলছে সেই কথা। শুধু বলছেনা, সবাই উঠে পড়েছে, নাচতে সুরু করেছে। সবার আগে বিজয়কৃষ্ণ। দেখাদেখি আর সকলে। ঠাকুর স্বয়ং। কে বলবে তার ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধির যন্ত্রণা। দেহবোধের লেশমাত্র নেই, রোগ কোথায় দেহছাড়া হয়ে গেছে। এ কি সম্ভব! এমন রুগী নাচবে দু'হাত তুলে। নৃত্যের পরেই সমাধিস্থ হয়ে যাবে! নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত ঋজু হয়ে থাকবে। সেদিন দেখছিল বসে, আজ দাঁড়িয়ে!

দিব্যভাস্বর কলেবরে এ কি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব! যেমন রুগীর হুঁশ নেই সঙ্গে-সঙ্গে তার ডাক্তারও বুঝি বেহুঁশ হতে চলল। যেমন রুগী তেমনি ডাক্তার!

না, না, আমি বেহুঁশ হব কেন? আমি যে সায়ান্স পড়েছি। আমি যে বুদ্ধিবিচারের ক্রীতদাস। কিন্তু ঐ দেখ ছোট নরেনকে, লাটুকে। তারা একেবারে স্তব্ধীভূত পাষাণ। ভাবের উপশমে কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে—কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ যে দেখছি কতগুলো মাতালের খেলা! এ কি মদ-মাতাল না মন-মাতাল?

'তোমার সায়ান্স কি বলে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'এই যে এ মুহূর্তে কাণ্ডটা ঘটে গেল এটা একটা শুধু ঢং?'

'তা আর কি করে বলি?' ডাক্তার মাথা চুলকোলো: 'এত লোকের যখন একসঙ্গে হচ্ছে তখন তো সেটাকে আর ঢং বলতে পারি না?' নরেনের দিকে তাকাল ডাক্তার: 'তুমি যখন জ্ঞানবিচার ফেলে পাগল হবার গানটা গাইছিলে তখন নাচের টানে আমার পা-ও টলে উঠেছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম। ভাবলুম বাইরের লোক দেখিয়ে লাভ কি! আমার অন্তরের যে বাউলবৈরাগী সে নাচুক।'

ঠাকুর উৎফুল্ল হলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনিনা? তুমি হচ্ছ গম্ভীরাত্মা। হাতি যদি ডোবাতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়, কিন্তু যদি সায়রদীঘিতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়না। তুমি হচ্ছ সেই সায়রদীঘির হাতি।'

'কই অন্য রুগী দেখতে উঠবেননা?' কে একজন মনে করিয়ে দিল।

'আর রুগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল।'

ঠাকুরকে বলে দিয়েছে কথা না কইতে অথচ কথা শোনবার লোভে নিজেই বসে আছে তীর্থকাকের মত! এ কি কথা না অমৃতস্নান?

'কি করি বলো তো?' বলছে ডাক্তার সরকার, 'তোমার কাছে এলেই সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে যায়। পেটের ধান্দা উনুনে গিয়ে ঢোকে। কতক্ষণ তোমাকে বকালাম আজ। কিন্তু দেখো আর কারু সঙ্গে যেন কথা কোয়োনা। আমি এলে আমার সঙ্গে শুধু কইবে।'

ঠাকুরের রোগ তো বাড়ছেই, সন্দেহ হচ্ছে তাঁর সেবকদের মধ্যে না এ কালব্যাধি সংক্রামিত হয়! সুজির পায়েস খেতে পারেননি ঠাকুর। সব বমি করে ফেলেছেন। পুঁজরক্ত সব পড়েছে বাটিতে।

অবতার তো বলো? এই বাটিতে দাও দেখি চুমুক।

তথাস্তু। নরেন ঠাকুরের সেই উচ্ছিষ্ট পায়েস খেয়ে ফেলল এক চুমুকে।

২২

আমি নীলকণ্ঠ শিব। আমি সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু। স্ফুট-স্ফটিক-সপ্রভ বিশ্ব-বিকাশ শ্বেতশিখা। আমি সর্বপাশমোচন পশুপতি। বীরভদ্র বীরেশ্বর। আমিই ভূত, ভবন এবং ভব্য, আমিই অনেকাত্মা সহস্রাংশু। মৃত্যুমৃত্যু শাশ্বতপুরুষ।

সমস্ত বিষ আমি ধারণ করতে পারি। নিঃশেষে করতে পারি পরিপাক। আমি সমস্ত সন্দেহনাশন বিদ্যুদ্বিম্বান দুর্ধর্ষ।

ধ্যানে বসেছে নরেন। চারদিক নিঃসাড়, বায়ুও বুঝি নিশ্বাস ফেলছেনা। ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে আর সকলেই ঠাকুরের সেবায় ব্যাপৃত, শুধু বুড়ো গোপাল নরেনের পাশে বসে। সেও স্তব্ধ-মগ্ন। হঠাৎ নরেনের মুখ থেকে একটা কাতর আর্তনাদ ছুটে এল: 'গোপালদা, আমি কোথায়? আমার শরীর কোথায় গেল?'

ত্রস্ত হয়ে নরেনের গায়ে হাত রাখল গোপাল। নাড়া দিয়ে বললে, 'এই যে, এই যে!'

কোথায় এই যে! সারা গা মৃত্যুর মত হিম। চেতনার তাপচিহ্ন নেই কোথাও। মরীয়ার মত ছুট দিল গোপাল। একেবারে দোতালায়, ঠাকুরের কাছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' এতটুকু চমকালেন না ঠাকুর।

'নরেন নেই। মরে গেছে।'

ছোট্ট একটি ভ্রূভঙ্গি করলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

বেশ হয়েছে? এ কি অসম্ভব কথা।

'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। থাক খানিকক্ষণ ওরকম হয়ে। সমাধি সমাধি করে আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করে তুলছিল। বুঝুক একটু সমাধির স্বাদ।'

রাতের প্রায় একপ্রহর কেটে যাবার পর নরেন ফিরে পেল দেহজ্ঞান। আর ফিরে পেয়েই চলল ঠাকুরের কাছে। পা চলছে কি চলছে না বুঝতে পারছেনা। সিঁড়ি যেন টলমল করছে।

তাকে দেখতে পেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'কিরে, সব দেখতে পেলি তো? মা-ই আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস।'

চোখ তুলে তাকাল নরেন।

'তোর সেই বন্ধ ঘরের চাবি কিন্তু আমার কাছে থাকবে।' বললেন ঠাকুর, 'এখন তোকে অনেক কাজ করতে হবে, আমার কাজ। আর যখন সেই কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি ঘুরিয়ে ঘর খুলে দেব।'

'কি কাজ?'

ঠাকুর এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিলেন। যেন কি গোপন কথা, গোপনে লিখলেন সেই কাগজে। যেন কি অগ্নি-অক্ষর বীজমন্ত্র, নরেন ছাড়া আর কারু দেখবার নয়। লেখা কাগজ তুলে দিলেন নরেনের হাতে।

নরেন দেখল কাগজে লেখা একটি মাত্র শব্দ। বজ্রগর্ভ মহাকাব্য। কথাটি আর কিছুই নয়, 'লোকশিক্ষা।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল নরেন, 'পারব না।'

'পারিবনে কিরে? তোর ঘাড় পারবে।' ঠাকুর তাকালেন প্রফুল্ল চোখে, বললেন, 'তুই আমার হাতের অস্ত্র, আমার হাতের লেখনী।'

অতল-অতুল আনন্দে দেহ-মন ভরে গেল নরেনের।

'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল, দেহ সমপিলুঁ' করিয়াছি। মানুষের সহায়তাকে আমি পদদলিত করি। যিনি গিরিগুহায়, দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। জানিনা, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয় সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়াই বড় শক্ত। আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।'

গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যে বহু সাধুর ভিড় হয়েছে কলকাতায়। বুড়ো গোপালের ইচ্ছে হল বেছে-বেছে কয়েকজন সাধুকে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা দেয়। অকপটে অভিলাষের কথা বললে ঠাকুরকে।

ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'ভালো কথা। কিন্তু তুই আর সাধু পেলিনে?'

তার মানে? গোপাল অপ্রতিভ হয়ে গেল।

'ওসব জটা-দাড়ি দেখেই বুঝি ভুললি? দূরের মাঠকেই বুঝি সবুজ মনে হয়?'

চুপ করে রইল গোপাল।

'তোর এই নিত্যকার চোখে দেখা ভক্ত ছোকরাগুলি বুঝি আর নজরে পড়ল না? ওদের ত্যাগ আর ভক্তি সেবা আর নিষ্ঠা কিছুই দেখতে পেলিনে তুই? যা, বারোখানা গেরুয়া কাপড় কিনে নিয়ে আয় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা। আমি আমার দ্বাদশ রাজকুমারকে সূর্যের দ্বাদশমূর্তির মত ধর্মরাজ্যে অভিষেক করব।'

গোপাল কিনে নিয়ে এল গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ।

ঠাকুর বিতরণ করতে বসলেন। কে সেই বারো জন? সূর্য আর বিবস্বান, অর্যমা আর পূষা, ত্বষ্টা আর সবিতা, ধাতা আর বিধাতা, বরুণ আর মিত্র, শত্রু আর উরুক্রম।

ডাকো নরেনকে। আর এগারো জন? রাখাল আর তারক, যোগীন আর শরৎ, বাবুরাম আর নিরঞ্জন, হরি আর কালী, লাটু আর গোপাল। সব মিলে এগারো জন তো হল। বারো নম্বরের কোন ব্যক্তি? মাথা চুলকোতে লাগল গোপাল। সত্যিই তো, গৃহত্যাগী ভক্ত সেবকদের মধ্যে আর কেউ তো বাকি নেই। তবে ঠাকুর কি সংখ্যা নির্ণয় করতে ভুল করলেন?

'একখানা কাপড় ও একটা মালা যে বাড়তি হল।'

'বাড়তি হল? কেন, ভক্ত ভৈরবকে ডাকো।' ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে।

ভক্ত ভৈরব? সে আবার কে?

'তুই তাকে কি করে চিনবি? আমি তাকে দেখেছি ধ্যানে, দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে। দেখেছি একটি ধুলোমাখা উলঙ্গ ছেলে নাচতে-নাচতে আসছে। মাথায় একগোছা চুল, বাঁ হাতে মদের বোতল, ডান হাতে অমৃতের ভৃঙ্গার। জিজ্ঞেস করলাম, তুই কে? বললে, আমি ভৈরব। এখানে এসেছিলে কেন? তোমার কাজ করতে এসেছি।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোপাল।

'তারপর সেই ভৈরবকে ফের দেখলাম যেদিন গিরিশ প্রথম এসে দাঁড়াল আমার সামনে। এক হাতে মদ আরেক হাতে সুধা। এক হাতে পাপ আরেক হাতে নির্মলতা। অন্তরজোড়া বিশ্বাস আর শরণাগতি।'

সেই গিরিশ ঘোষ দ্বাদশ আদিত্যের একজন? সেও রুদ্রাক্ষ আর গেরুয়ার অধিকারী? যে ঠাকুরকে মদের নেশায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে, বার করে দিয়েছে থিয়েটার থেকে, সেই গিরিশ ঘোষ? যার পাপ ধারণ করে ঠাকুরের ব্যাধি?

হ্যাঁ, সেই গিরিশ ঘোষ। পঙ্কিলকে যদি না তিনি পবিত্র করবেন, কুটিলকে যদি না করবেন অকপট, তবে তিনি কিসের ঠাকুর? অধোগত বলেই তো তার দরকার উত্তোলনের হাত। যে অভাজন তারই তো দরকার অনুকম্পা। যে শাখা নিষ্পুষ্প ও নিষ্ফল তারই জন্যে তো শ্রাবণের ধারাবর্ষ। গিরিশ কোথায়? সে এখনো আসেনি। তবে তার জন্যে রেখে দাও বস্ত্র-মাল্য। সে এলে পরে দিও। নয়তো পাঠিয়ে দাও তার বাড়িতে।

গিরিশ আর নরেন বসেছে এক গাছের নিচে। বসেছে ধ্যান করতে। চোখ বোজো। চিত্ত স্থির করো। একাগ্রভূমিতে চলে যাও। চিত্তবৃত্তির নিরোধই হচ্ছে যোগ। তাই একসঙ্গে একাগ্র ও নিরুদ্ধ হও।

উঃ, কি মশা রে বাবা! সাধ্য কি চোখ বুজে থাকো। কানের কাছে অনবরত পিনপিন করছে। বসছে এসে নাকে মুখে, সূক্ষ্ম সূচীতে হুল ফোটাচ্ছে। বারে বারে চোখ খুলে যাচ্ছে গিরিশের। সাধ্য কি তুমি একাসনে দৃঢ় থাকো, মশার কামড় উপেক্ষা করো। মশা থাকতে দশায় পড়া অসম্ভব—গিরিশ উঠে পড়ল।

কিন্তু এ কি, নরেন যে ঠায় বসে আছে। অটল-নিশ্চল। মন অনন্তভাবে স্থির। অর্পিত ও আবিষ্ট। এতটুকু যেন নিশ্বাসেরও আভাস নেই কোথাও। ওমা, মোটা একখানা কালো কম্বল গায়ে দিয়ে বসেছে। তাই, তাই স্থির থাকতে পারছে অমনি। তাই মশার কামড় উপেক্ষা করতে পারছে। আমিও তখন বুদ্ধি করে একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে বসলে পারতাম। এ কি, এ কম্বল নয় তো! এ যে মশার ঝাঁক। পুঞ্জ-পুঞ্জ মশা ঘন হয়ে ছেঁকে ধরেছে নরেনকে, শরীরের একতিল স্থান বাকি রাখেনি। তাইতে মনে হচ্ছে পুরু একখানা কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢাকা! এ কি আশ্চর্য! এ কি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি! হাজার হাজার মশকদংশন তবু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। না বাইরে না ভিতরে। পূর্ণের উপলব্ধিতে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। যেন বল্মীকের স্তূপের মধ্যে সাধক রত্নাকর!

ভীষণ এই সর্বাত্মক ঐকান্তিকতা। ভয় পেয়ে গিরিশ বারে-বারে ডাকতে লাগল নরেনকে। সাড়া নেই, স্পন্দন নেই। তখন আরো ভয় পেয়ে গিরিশ তার পা ধরে টানতে লাগল : 'ওঠো, ওঠো, চোখ চাও।'

কোথায় চোখ চাইব? সংসারে আর কী রূপ আছে যে চোখকে আকর্ষণ করবে? কী শব্দ আছে যে কানে মধু ঢালবে? যেখানে এসেছি সেখানে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন আর কিছু নেই। শুধু আত্মসাক্ষাৎকার। কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান আনা যাচ্ছে না। তখন গিরিশ নরেনের আসন ধরে টানতে লাগল। নরেনের অচেতন দেহ টলে পড়ল মাটিতে। অনেক চেষ্টা, অনেক হাঁক-ডাক, তবে নরেন ফিরে এল দেহভূমিতে।

'বোস আমার পাশটিতে।' ঠাকুর নরেনকে কাছে ডেকে নিলেন : 'শোন, আর সকলকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বল। দরজা বন্ধ করে দে।'

কি ব্যাপার, কেন দরজা বন্ধ করতে বললেন কে জানে। ভয়ে নরেনের বুক দুরদুর করে উঠল। দরজা বন্ধ করে দিল নরেন। ঘরের মধ্যে শুধু দু'জন। নরেন আর ঠাকুর। ঠাকুরের সেই স্বপ্নে দেখা ঋষি আর শিশু।

'আমার পাশ ঘেঁসে চুপটি করে থাক।' বললেন ঠাকুর।

ঘন হয়ে বসল নরেন। ঠাকুর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কি করুণাপরিপূর্ণ সুগভীর স্নেহদৃষ্টি। যেন বলছেন, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তোকে ছাড়া কাকে দিয়ে যাব আমার হাতের বাঁশি। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। নরেন অনুভব করল কি-একটা তীব্র আলো ঠাকুরের শরীর থেকে বেরিয়ে তার শরীরের মধ্যে ঢুকছে। যেন একটা বিদ্যুতের ছুরি হয়ে চিরে-চিরে দিচ্ছে। শিহরিত করছে সর্বাঙ্গ। এ কি হল! এ আমি কোথায় এলাম! দেখতে-দেখতে নরেনও ডুবে গেল সমাধিতে। বাহ্যচেতনা ফিরে পেয়ে নরেন তাকিয়ে দেখল ঠাকুরও জেগেছেন। কিন্তু এ কি, ঠাকুরের চোখে জল! কাঁদছেন ঠাকুর।

'এ কি, আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?' কাতর ঔৎসুক্যে জিজ্ঞেস করল নরেন?

'কষ্ট? না, না, আনন্দ। ফকির হবার ফতুর হবার আনন্দ!'

মুহ্যমানের মতো তাকিয়ে রইল নরেন।

'আজ আমার যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে দিলুম।' বললেন ঠাকুর, 'আমার সমস্ত রাজ্য-সম্পদ। দিয়ে একেবারে ফকির হয়ে গেলুম। তুই এখন একাই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি। সেই রাজশক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি এবার তুই। আমি আর থাকব না।'

নাথহীন শিশুর মত অসহায় কণ্ঠে কেঁদে উঠল নরেন। সে কান্না আর থামে না। তুমি থাকবেনা কি? তুমি না থাকলে এই সূর্যসনাথা পৃথিবীই যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

'আসলে আমি আর তুই অভেদাত্মা।' বললেন আবার ঠাকুর। 'কিন্তু বাইরের

চোখে আলাদা, গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র। এবার আমি চলে যাব। তুইই এখন একরথ একচ্ছত্র সম্রাট। তুইই এখন দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ।'

নরেন তবু কাঁদছে নিরর্গল।

'কাঁদিসনি। কাঁদবার সময় কই? শুধু কাজ আর কাজ। আবার তোর যখন কাজ ফুরোবে তুইও ফের ফিরে যাবি স্বধামে।'

২৩

অতিলৌকিককে বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞাননির্মল আমার চক্ষু। বিজ্ঞানবলিষ্ঠ আমার ভঙ্গি। সব যাচাই-বাছাই করে নিই। নিই নিকষপাষাণে ঘষে-ঘষে। কিন্তু আমি কতটুকু জানি, কতটুকু বুঝি, কতটুকু বা আমার স্নায়ুশিরার আয়ত্তে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আইনের বই আমার জীবনের লাইব্রেরি ঘরে তো ধরছেনা। কী জানি কোথায় কোন আইনের কী ধারা-উপধারা, করণ-প্রকরণ, বিধি-অনুবিধি! আমার একমুঠো উঠোনে কি করে ধরব এই একআকাশ তারা! পিঁপড়ের গর্তে হাতির পদচারণ!

তাই বলে চুপ করে থাকব? চুপ করে মেনে নেব ঘাড় পেতে? বুদ্ধি-যুক্তি বলে একটা কিছু দিয়েছেন তো ঈশ্বর, সেটাকে ব্যবহার করবনা? ভাবের লোনা হাওয়ায় বুদ্ধির শক্ত লোহাতে মর্চে পড়তে দেব? কিন্তু বুদ্ধি যেমন ঈশ্বর দিয়েছেন তেমনি অনুভূতিও তো দিয়েছেন দেখিনা-শুনিনা ধরিনা-ছুঁইনা তবু অনুভব করি। গায়ে আঘাত লাগেনি তবু মনে ব্যথা করে উঠেছে। সেই ব্যথাই কি সেই আঘাতের প্রমাণ নয়? দেখিনা সেই মহাশক্তিকে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নির্ভুল জেগে আছে সে বিবেকরূপে। ক্ষণে-ক্ষণে বলছে, বলে উঠেছে, এই, কি করছিস, দেখে ফেলেছি! আমি যদি বারে-বারে নিজের সামনে ধরা পড়ে যাই তা হলে কি এইটেই প্রমাণ হয় না যে আমিই সেই মহাশক্তি! তা ছাড়া আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা, ধরতে পারছিনা এইটেই কি প্রমাণ নয় যে আছে কোথাও এক মহা-অজ্ঞেয়, মহা-অনির্ণেয়, মহা-অপরিমেয়?

ঠাকুরের লীলা-সংবরণের দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। ঠাকুরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নরেন। এই কি অবতার? এই কি সেই ছদ্মবেশী রাজা? কি করে বিশ্বাস করি। রোগে-রোগে শীর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছেন, কথা কইবার শক্তি নেই, সাধারণ দেহধারী মানুষের মত অবস্থা, এর মধ্যে কোথায় সেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ? যদি এই সময়, শেষ সময়, মুখ ফুটে বলে যেতে পারেন যে তিনি ভগবান তা হলে বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে এখন ভাষা কই; চোখে জ্যোতি কই, লোক চেনবার ক্ষমতাও হয়তো এখন চলে গিয়েছে।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চোখ চাইলেন ঠাকুর। তাকালেন নরেনের দিকে। কিছু চান? কিছু বলতে চান? ব্যস্ত হয়ে কাছে এগুলো নরেন। স্পষ্ট স্বচ্ছ

কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, 'শোন তোকে বলে যাই'। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। বুঝলি ?'

অন্তর্যামী ঠিক মনের কথাটি টের পেয়েছেন। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছেন ছদ্মবেশ। অরণিকে আশ্রয় করে জ্বলছিল যে আগুন সে এখন নির্ধূম নিরিন্ধন। সে এখন স্বপ্রকাশ। দেখতে পাচ্ছি পরমকারণকে। যতক্ষণ পরমকারনকে জানিনি ততক্ষণ কারণানুসন্ধানের শেষ ছিলনা। এখানে-ওখানে ঘুরেছি। দুলেছি সংশয়ের দোলনায়। আর সংশয় নয়, স্বীকৃতি। শুধু স্বীকৃতি নয়, সমর্পণ। শুধু সমর্পণ নয়, প্রত্যুত্তর। ঘোষণার উত্তরে প্রতিধ্বনি। পরমকারণের সন্ধান এখন নিজের জীবনের মধ্যে। শুধু সন্ধান নয়, উদ্ঘাটন। আমিই সেই, সে অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির স্থির বিদ্যুৎ!

আমিই সেই রামকৃষ্ণ।

ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন ঠাকুর। শ্রাবণ মাসের গভীর রাত, সেও তখন সমাধিমগ্ন।

অনাথ শিশুর মত কাঁদতে লাগল সকলে। শ্রীশ্রীমা আর্তনাদ করে উঠলেন: 'আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো ?'

বরানগরের শ্মশানের দিকে চলল সবাই সর্বস্বহারার মত।

ঠাকুরের পূত-ভস্ম নিয়ে গৃহীতে-সন্ন্যাসীতে ঝগড়া বেধে গেল। গৃহীদের দলপতি রাম দত্ত বললে, এ ভস্ম গৃহীদের প্রাপ্য, কেননা ঠাকুর শ্রেষ্ঠ গৃহী। পালটা জবাব এল সন্ন্যাসী শিষ্যদের তরফ থেকে। তারা বললে, এ ভস্মে সন্ন্যাসীদের অধিকার, কেননা ঠাকুর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী।

'কিন্তু অস্থি-ভস্ম তোমরা রাখবে কোথায় ? বললে রাম দত্ত। 'তোমাদের চাল আছে না চুলো আছে ? কাশীপুরের বাড়ির ইজেরা তো আর মোটে সাত দিন। তখন রাখবে কোথায় ?'

'রাখব মাথার উপরে।' বললে শশী আর নিরঞ্জন।

ঝগড়া ঘোরতর হয়ে উঠল। এ বলে আমার দাবি ও বলে আমার। আর দু' ভাইয়ের ঝগড়া দেখে হাসেন বসে ঈশ্বর।

নরেন এল সালিশ করতে। গৃহীদের বললে, 'ভয় নেই, তোমাদেরই পাওনা সেই পূত-ভস্ম, পূত-অস্থি। তোমাদেরই দিয়ে দেব।'

সন্ন্যাসী ভায়েদের কাছে ডেকে আনল। বললে, 'ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকলেই কি সর্বসাম্রাজ্যের অধিকার হল ? আমরা কি শুধু ভারবাহী হব, সারবাহী হব না ? শুধু ভস্ম হয়ে বেড়াব, বহন করব না সেই তেজ, সেই পবিত্রতা ? অচল-প্রতিষ্ঠ বারিধির কি আমরা এক-একটা তরঙ্গ হয়ে উঠব না ? তিনি কি ভস্ম হয়েছেন যে তার ভাগ নিয়ে ঝগড়া করব। আমাদের মজ্জায় তাঁর মজ্জা, আমাদের অস্থিতে তাঁর অস্থি। আমরা তাঁর কেমনতরো শিষ্য যদি না তাঁর জ্যোতির্ময় বাণীমূর্তি হতে পারি ? যদি না হতে পারি তাঁর উপদেশের উদাহরণ ?'

কাঁকুড়গাছিতে বাগান করেছে রাম দত্ত। সেখানেই রাখা হবে দেহাবশেষ।

চলো, মাথায় করে দিয়ে আসি। পূতভস্মাস্থির কলসী নরেন নিজে মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে এল বাগানে।

কিন্তু তার আগে ভস্মের প্রায় অর্ধেক সন্ন্যাসীরা সরিয়ে ফেলেছে। আরেকটা পাত্রে ভরে রেখে দিয়ে এসেছে বলরাম বোসের বাড়ীতে।

আমি যেমন সংসারীর তেমনি আবার সন্ন্যাসীর। আমি সকলের। যেমন সংসারে আমার সন্ন্যাস, অর্থাৎ সম্যক ন্যাস, তেমনি সন্ন্যাসে আমার লোকসেবার সংসার। আমি যেমন গৃহস্থের তেমনি আবার গৃহহীনের। যেমন মঠবাসীর তেমনি মরুচারীর। আমার সন্ন্যাস সংসারের সংকোচন নয় সংসারের সম্প্রসার। আর আমার সংসার ভোগায়তন নয় বিদ্যায়তন। বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্রশয্যায় যে শুয়েছে সে যেমন আমার, তরুকোটরগুহা-গহ্বরকাননে যে বাস করছে সেও আমার। আমার সর্বসমন্বয়ের ধর্ম। আমার ধর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর।

নর্তকীর মতন থাকো। মাথার উপরে ঘড়া নিয়ে নাচছে নর্তকী, ঘাঘরা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। নাচছে, কিন্তু মাথার ঘড়া ফেলে দিচ্ছেনা। মাথার ঘড়া ফেলে দিলেই নাচ ব্যর্থ হয়ে যাবে। পড়ে যাবে যবনিকা দর্শকের দল টিটকিরি দিয়ে উঠবে। তেমনি তোমার জীবননৃত্য যদি সফল করতে চাও তো যে তোমার শিরোধার্য তাকে ফেলে দিও না মাটিতে। যে তোমার অচ্যুত তাকে বিচ্যুত কোরোনা। শুধু যেমন নাচায় তেমনি নেচে যাও। চেয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে। বসুন্ধরা নাচছে দিনে-রাত্রে, ঋতুতে-ঋতুতে, ইতিহাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। কিন্তু তার মাথার উপরে ধরা আকাশের কুম্ভটি ফেলে দেয়নি।

'একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হল।' বলেছেন ঠাকুর। তাই পথটা জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ভালোবাসা।

হোক তোমার কণ্টকক্লেশের পথ, নয়তো বা ভোগবিলাসের। যদি একবার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে, তবে কে বা হিসেব করে কণ্টকপীড়া, কে বা ভোগলালসা! নদী একবার সমুদ্রে এসে মিশলে সে কি আর তাকায় পশ্চাতের মানচিত্রের দিকে, কোন্ পথ দিয়ে এলাম! সে কি শ্যামশস্যের পথ না কি প্রাণচিহ্নহীন মরুভূমির!

'আমাদের পথ সন্ন্যাসের।' বীরগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল নরেন।

জ্বলন্ত বৈরাগ্যের। জ্বলন্ত বৈরাগ্যের মানে প্রতপ্ত অনুরাগের।

বৈরাগ্যের রঙই হচ্ছে গেরুয়া।

'সন্ন্যাসী জগৎগুরু।' বললেন ঠাকুর। 'সন্ন্যাসীদের ষোল আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকে ত্যাগ করতে শিখবে।'

'সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী।' আবার বললেন ঠাকুর, 'আরো দুরকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে, আর লুচি-ছক্কা খেয়ে। সংসারীদের হচ্ছে লুচি-ছক্কা খাওয়া একাদশী। তাদের এতে দোষ নেই। তাদের হচ্ছে কেল্লার থেকে যুদ্ধ। আর সন্ন্যাসীর যুদ্ধ হচ্ছে মাঠে দাঁড়িয়ে।'

সংসারীর ত্যাগ হবে মনে। সন্ন্যাসীর ভিতরে ও বাইরে দুয়েতেই। পাঁকের

মধ্যে পাঁকাল মাছের মত থাকলেই চলবে সংসারীর। সন্ন্যাসী পাঁকের কাছাকাছিই আসবেনা।

কেন, কেন এত সব কঠিন নিয়ম সন্ন্যাসীর? ঠাকুর বললেন, 'তাকে যে লোক-শিক্ষা দিতে হবে। তাকে দেখে যে লোকের জাগ্রত হবে চৈতন্য।'

যদি কৃশানুই না জ্বলে তবে শীতত্রাণ হবে কি করে?

'বাবুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্যে পড়।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'সীতার উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজত্ব করতে রাজি হলনা। রাম বললেন, মূর্খদের শেখাবার জন্যে রাজা হও। নইলে তারা বলবে, বিভীষণ রামের এত সেবা করল, তার লাভ কী হল। রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে তোমাকে রাজত্ব করতে দেখলে তারা খুশি হবে।'

গেরুয়াকে নিশান করো। গেরুয়া ছিল বলেই কামকাঞ্চন ও বিলাসব্যসন পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যত্ব হরণ করতে পারেনি। কিন্তু, সাবধান, গেরুয়ার অহমিকা যেন পেয়ে না বসে।

'কি রকম জানো?' বললেন ঠাকুর। 'ঠিক দুপরবেলা সূর্য মাথার উপর ওঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নেই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে, সমাধিস্থ হলে, অহংরূপ ছায়া থাকে না।'

গেরুয়া হচ্ছে সেই সমাধি, সেই সম্যক সম্বোধির রঙ। নইলে গেরুয়া পরে ভাবলে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছি, তাকিয়া না পেলে বসবেনা ঠেসান দিয়ে, তাহলেই সর্বনাশ। কোনো ভয় নেই, অভয়ের মন্ত্র পেয়েছি আমরা। বললেন, বিবেকানন্দ। ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, মানে দৈন্যভয়, বিত্তে রাজভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে জরাভয়। শাস্ত্রে তর্কভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে যমভয়। এ জগতে সর্ববস্তু ভয়ান্বিত। শুধু বৈরাগ্য অভয়।

কিন্তু কোথায় যাবে? বলছি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কাশীপুরের বাগানবাড়ি যেখানে কোনরকমে আছ সবাই মাথা গুঁজে, তার ইজারার মেয়াদ মোটে আর সাতদিন। এতগুলি ঘরছাড়া ছেলের জায়গা দেবে কোথায়? মনে থাকে যেন ঠাকুর এদের সকলের ভার তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন।

২৪

কাশীপুরের বাড়ি এবার ছাড়তে হয়। নোটিশ দিয়েছে বাড়িওয়ালা। এখন যাই কোথায়? কোথায় মিলবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই? ডেরা-ডান্ডা কে জোটাবে? ঠাকুর জোটাবেন। কোথায়! তার কোন আভাস-উদ্যোগ দেখিনা। ইজারার মেয়াদ ফুরোতে আর দু'দিন। তারপর গাছতলা। লাটু তারক আর বুড়ো গোপাল—এরা তিনজন তো বাড়িঘর ছেড়ে কায়েমী বাসিন্দে হয়েছিল কাশীপুরে, তারা কি তবে ফিরে যাবে? আর যে সব সন্ন্যাসী-শিষ্য নিত্য আসা-যাওয়া করেছিল তারা

আর হবে না এমনুখো ? সব ভেঙ্গে যাবে ? কেঁচে যাবে ?

'তাছাড়া আবার কি।' গৃহী ভক্তরা উপদেশ দিতে এল। 'এ সব কচি কচি ছেলে পথেপথে ভিক্ষে করে বেড়াবে ? নিরাশ্রয়ের মত পড়ে থাকবে ঘাটে-মাঠে ? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আখের নষ্ট কোরো না।'

ওদের কথা শুনিসনি। বললে নরেন। ঠাকুরের কথা ভাব। ঠাকুরের কথা বল্।

অভিভাবকরা নাছোড়বান্দা। কেউ বি-এ পড়ার মাঝখানে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, তাদের টানতে লাগলেন। পড়া সাঙ্গ করে পরীক্ষা দিয়ে তবে চলে আসিস না হয়। সন্ন্যাসী হবি তো বিশ্বান হতে দোষ কি ! কেউ-কেউ গেল বুঝি ফিরে। পাশ করে আসতে। কিন্তু পাশ করা না পাশ পরা ! যে যাবার যাক। আমরা যাচ্ছি না। আয় সবাই বসি গোল হয়ে। ঠাকুরের কথা ভাবি, ঠাকুরের কথা বলি। আজ ছাদ, কাল না হয় মুক্ত আকাশ। আমাদের আচ্ছাদনও যিনি অনাবরণও তিনি। আমাদের সর্বত্রই রামের অযোধ্যা।

'সেইবার কি একটা মজার কাণ্ড হল শোন !' নরেন পূর্বকথা বলতে লাগল। 'আমি চুপচাপ বসে থাচ্ছি, হঠাৎ ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন। বসেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।'

আবার বললে, 'বলতেন, আমার যারা আপনার লোক তাদের বকলেও আবার আসবে। জানো তো, আগে কালী মানতুম না, যা ইচ্ছে তাই বলতুম। একদিন চটে উঠে বললেন, শালা, তুই আর এখানে আসিস না। সেকি তিরস্কার, না, ভালোবাসা। আমার এতটুকু রাগ হল না। আমি তামাক সাজতে বসলুম। তাই দেখে ঠাকুরের কি তৃপ্তি ! মাণ্টারমশাইকে বললেন, নরেন আমার আপনার লোক, তাকে বকলেও তার রাগ নেই।'

মাণ্টারমশাই বললেন, 'যখন আসে তখনই একটা কাণ্ড সঙ্গে আনে।'

শিশুর মতন হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'ও একটা কাণ্ডই বটে। প্রকাণ্ড কাণ্ড।'

একঘর লোক, একপাশে গিয়ে বসেছি। সবাইকে ফেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, আমার সঙ্গেই তাঁর যত কথা। আমি বললুম, সে কি, এঁদের সঙ্গে কথা কন ! আমার কথা কানেও তুলতেন না ! কাছে ডেকে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। পরিহাস করে বলতেন, দ্যাখ, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর নতুন পতির মতন একটু ঘন ঘন আসতে হয়। কিন্তু তেমন আর কই যেতুম। বলতেন, নরেন বেশি আসে না। ভালোই করে। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই !

যদু মল্লিকের বাগানে বসে কাঁদতেন আমার জন্যে। সবাই বলত, একটা কায়েতের ছেলে, কি বা ছাই পড়াশুনো, এর জন্যে আপনার অধীর হওয়া সাজে না। ওরে কি বলিস, ওর জন্যে যে আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে পর্যন্ত করতে পারি।

একদিন গিয়েছি, তখন সেই অস্বীকার আর অবিশ্বাসের অধ্যায়, বলছেন বিরক্ত হয়ে, তুই আমাকে নিসনা, মানিস না, তবু আসিস কেন ?

সত্যি আসি কেন ? কে কোথাকার গেঁয়ো মুখখু বামুন, কালী পেয়েছে কি না পেয়েছে তাতে কী মাথাব্যথা ! আমি কেন আমার মধ্যরাত্রির সুখশয্যা ফেলে চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বরে ? আমি বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণির ছেলে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, মিল-স্পেন্সার পড়া দার্শনিক, কী আমার আসে যায় একটা কালীঘরের পুরোতের মাথা খারাপ হয়েছে কিনা তাই নিয়ে। আমার কেন মাথা খারাপ হয় ? আমি কেন আসি ? সেদিন সেই উত্তর আমাকে দিতে হয়েছিল স্পষ্ট করে। অন্তরের অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বের করতে হয়েছিল সে মুক্তামণি।

বললাম, আসি কেন ? আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে।

অহেতুক ভালোবাসা, অবিমিশ্র ভালোবাসা। নিরর্গল, নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। কোথায় যাব সেই ভালোবাসা ফেলে ? একটা রূঢ় উদ্ধত প্রস্তরকঙ্করময় পাহাড় ছিলাম, সেই প্রেমস্পর্শে হয়ে গেলাম একতাল নবনী।

'তাঁর ভালোবাসার কথা আর বোলো না।' এবার সুরু করল লাটু : 'একদিন শিবমন্দিরে বসে ধ্যান জমে গিয়েছে, আশ-পাশের খেয়াল নেই। ধ্যান ভাঙতে তাকিয়ে দেখি ঠাকুর পাশে বসে হাওয়া করছেন আমাকে। দেখো দিকি কাণ্ড। পাখা কেড়ে নিতে গেলুম, দিলেন না। বললেন, এ কি আমি তোকে হাওয়া করছি ? শিবকে হাওয়া করছি।'

আমি একটা কোথাকার কে, কোন বাড়ির চাকর, অপদার্থ অনাথ, আমাকে তিনি ভালোবাসা ঢেলে দিলেন। আমাকে কৃপা না করলে আমি নকরি করতে-করতে বকরি বনে যেতাম। আমায় শুধু বলতেন, দ্যাখ্, দিল সাফ রাখবি আর গরদা ঢুকতে দিবিনে। নিজের বুকের উপর হাত রাখতেন। এইখানে সাচ্চা থাকবি। কামকামনা যদি বেশি উৎপাত করে ঈশ্বরের নাম নিবি, তাঁকে ডাকবি প্রাণপণে। তিনিই তোকে বাঁচিয়ে দেবেন। যখন তাতেও মন বসাতে পারবিনে, ছুটে আমার কাছে চলে আসবি।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঠাকুরের মুখ দেখতুম, তারপরে অন্য কাজ। সেদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই। চোখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আপনি কোথায় ? যাচ্ছিরে যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন ছুটে এলেন আমার ডাক শুনে। এমন করুণা, আবার চোখের দৃষ্টিটি বাঁচিয়ে দিলেন। চোখ মেলে দেখলুম সেই নয়নাতীতকে, নয়নোৎসবকে। আরেকদিনও অমনি উঠেছিলাম চেঁচিয়ে। ঠাকুর প্রতিধ্বনি করলেন, বাইরে আয়। বাইরে গিয়ে দেখি কি খুঁজছেন বাগানে। কি খুঁজছেন ?

ওরে কাল একজোড়া নতুন জুতো এনেছিলনা, তার একপাটি রয়েছে আরেক পাটি খুঁজে পাচ্ছিনা—

সেকি ? আপনি খুঁজছেন কেন ? আর, তাছাড়া এখানেই বা আসবে কি করে ?

কি করে বলি ? হয়তো শেয়ালে টেনে এনেছে।

যেই আনুক, আপনাকে খুঁজতে হবেনা। বলে উঠলাম ধমকের সুরে, আপনি চলে আসুন।

কি যে বলিস তার ঠিক নেই। অমন নতুন জুতো জোড়া তোর ভোগে এল না। কাল সবে এনে দিল আর—মাত্র একবার পায়ে দিয়েছি।

ছুটে গিয়ে তার পায়ে পড়লুম। বললাম, আপনি চলে আসুন। আপনাকে ওসব খুঁজতে নেই। আমার আজকের দিনটা বিলকুল নষ্ট করে দেবেন না।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, দিন কি ওতে খারাপ যায়রে ? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।

ঝড়-জল-বিদ্যুতের দিন দুর্যোগ নয়, হরি-হারা দিনই দুর্যোগ।

এবার তারকের পালা। কি করে তার চিবুক ধরে আদর করেছেন, কি ভাবে টেনে নিয়েছেন কোলের মধ্যে। তাঁর জলের গাড়ুটি পর্যন্ত ধরতে দেননি। যেহেতু আমার বাবা তাঁর গাত্রদাহ কমাবার জন্যে তাঁকে ইষ্টকবচ দিয়েছিলেন, সেইজন্যে আমাকে সেবা করতে দিতেন না, বলতেন, তোর সেবা কি নিতে পারি ? তোর বাবাকে যে আমি শ্রদ্ধা করি গুরুর মত।

সেবার, এখানে, বামুন নেই কদিন থেকে, নিজেরা পালা করে রান্না করছি। কি বা রান্না, ভাত ডাল চচ্চড়ি। সেদিন আমার পালা পড়েছিল, তোদের মনে আছে ? চচ্চড়ির ফোড়নের গন্ধ তাঁর নাকে পৌঁচেছে। জিগগেস করলেন, কে রাঁধছে রে ? তারকনাথ ? তবে একটু আমার জন্যে নিয়ে আয়। এমনিতে দুধ সুজি সেদ্ধ ছাড়া কিছু মুখে তুলতে পারেন না, কি কৃপা, আমার রান্না চচ্চড়ি সেদিন চেয়ে খেলেন !

হ্যাঁ, শুধু তাঁর কথা বলো। আমাদের অন্য কথায় দরকার কি, কি লাভ বৃথা কথায়। যা বলবে, হিত কথা, ঋত কথা। যদি কথা বলবার লোক না পাও তাঁর সঙ্গে বলো। সবার মধ্যে তাঁকে সাক্ষাৎকার করো। যদি তাই হয় তবে হরি-কথা ছাড়া ভালবাসার কথা ছাড়া আনন্দের কথা ছাড়া আর কোন কথা কইবে ?

'তাঁকে না দেখে কি করে বেঁচে আছি ?' নরেন অস্থির হয়ে উঠল। 'হ্যাঁরে লেটো, যাকে দেখতে না পেয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকতিস, এখন চোখ মেলে কি দেখে শান্ত হয়ে আছিস জিগগেস করি ?'

রাত বেশি হয়নি, পুকুরধারে নরেন পাইচারি করছে। সঙ্গে ভক্ত-বন্ধু হরি। বাড়ি-ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এল। এবার কি করি, কোথায় যাই। ভয় নেই। তিনি আছেন। আর আছে জ্বলন্ত বিশ্বাস। প্রচণ্ড বৈরাগ্য। আমরণ প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ দূরে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। চমকে উঠল দুজনে। ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেলনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের অবয়ব নিলে। মনে হল জ্যোতির বসন-পরা কে একজন মানুষ যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে !

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে কই ? আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। ফটক পেরিয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে চলে এসেছে।

এ কে ? ঠাকুর !

সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল নরেন। বোধহয় মাথার ভুল। চোখ কচলাল বারকতক। বোধহয় রুগ্ন স্বপ্ন! না, আরো এগিয়ে আসছেন। যেখানে জুঁই ফুলের মঞ্চ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন স্তব্ধ হয়ে!

'একি! এ কে?' হরি চমকে উঠল। আঁকড়ে ধরলে নরেনকে।

সেই অভয়ময় ভুবনমনোহর হাসি। ললাটে সেই তপস্যার প্রদীপ্তি। দুই পদ্মপত্রবিশাল চোখে বিরামহীন করুণা। দেখে যা দেখে যা সকলে। সিন্ধুকে যে বিন্দু করেছে সেই জাদুকরকে দেখে যা। দেখে যা প্রধান পুরুষোত্তমকে। সর্বমন্ত্রপ্রণেতা সর্বসিদ্ধিপ্রদাতাকে।

সবাই ছুটে এল লণ্ঠন নিয়ে। এখানে-ওখানে ঝোপে-ঝাড়ে অনেক খোঁজা-খুঁজি করল। আর কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়! সেই নির্মল জ্ঞানচক্ষু কজনের আছে! দিগদেশে না পাও দেখ তাঁকে হৃদাকাশে। হৃদাকাশে বোধভানু।

সুরেন মিত্তিরকে দেখা দিলেন স্বপ্নে। বললেন, আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করে দাও। তুমি আমার রসদদার, তুমি আমার জন্যে কত করেছ। কাশীপুরের বাড়ির খরচ বাবদ কত দিয়েছ মাস-মাস। তুমি থাকতে আমার ছেলেরা নিরাশ্রয় হয়ে যাবে? ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াবে পথে-পথে?

ঠিক ঠাকুরের মূর্তি! ঠিক তাঁর কণ্ঠস্বর!

ঘুম ভাঙতেই সুরেন মিত্তির ছুটল কাশীপুরে। ঠাকুরের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কি ব্যাপার? ব্যাপার আর কিছুই নয়। এক বাড়ি যায় আরেক বাড়ি যোগাড় করে দেব। আমি তার ভাড়া যোগাব। আমি একা না পারি চাঁদা সংগ্রহ করব গৃহীদের কাছ থেকে। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। সেই বাড়িতে তোমাদের মঠ হবে।

'শুধু তোমাদেরই আশ্রয় নয়, আমাদের সংসারীদেরও আশ্রয়।' সুরেনের দুই চোখ ছলছল করে উঠল। 'আমরাও জ্বালা জুড়োতে রোগ সারাতে আসব সেই শান্তির নিলয়ে।'

জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়। ভক্ত সন্ন্যাসীর দল লাফিয়ে উঠল।

যা অসম্ভব ছিল তাই সহজ-সুলভ হয়ে উঠল। লোভনীয়ই জানতুম, এখন দেখছি লাভনীয়।

বরানগরে প্রায় একটা জঙ্গলের মধ্যে নড়বড়ে একটা দোতলা ভাঙা বাড়ি পছন্দ করল সবাই। নিচের তলায় সাপখোপেরা থাকবে উপরের তলায় আমরা। পিছনে যে পাঁকের পুকুরটি আছে সেটিও অনবদ্য। মশার পল্টনী কুচকাওয়াজ চলছে দিবারাত্র। দেয়ালের ফোকরে হুতুমপেঁচার আস্তানা। সদর দরজা থুবড়ে পড়েছে, সামনের ঝোলা বারান্দাটিও গেল-গেল।

তবু এই বাড়িই ভালো। কলকাতার কলুষ-কোলাহলের থেকে অনেক দূরে। নির্জনে থাকা যাবে। কেউ নাক ঢোকাতে আসবে না, কেমন আছি কেমন দিন কাটছে তাও আসবেনা জিগগেস করতে।

বলো কি, ঐ বাড়িতে কি করে থাকবে? কে একজন বাধা দিতে এল। ওটা যে ভূতের বাড়ি। ভূতের ভয় না করো মৃত্যুভয় তো আছে। একদিন ছাদ ভেঙে মারা পড়বে সবাই।

নরেন হাসল। বললে, ভূত আমাদের ভাই। মৃত্যু আমাদের মিতা। এই বাড়িই স্বর্গ। কাছেই গঙ্গা, কাছেই শ্মশান। যে গঙ্গা ঠাকুরের শান্তি আর যে শ্মশান ঠাকুরের শয্যা। আর, সব চেয়ে বড় কথা, বাড়িটা শস্তা। মোটে দশটাকা ভাড়া। আমাদের অট্টালিকা কে দেবে? আমরা শিবের দৈত্য-দানা। আমাদের দেখে ভূত পালায়। আমাদের কৃচ্ছ্র দেখে কঠোরতা দেখে। ধারে-কাছে ঘেঁষতেও পারে না। দিবা-রাত্রি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আরাম-নিদ্রা, ঘৃণা-লজ্জা, আচার-বিচার—কত রকমের ভূত। সব তফাত থাকে। যখন হর-হর ব্যোম-ব্যোম করে উন্মাদ নৃত্য করি ভূতেরই ভয় হয়।

তাই উপরের বড় ঘরটার নাম হয়েছে দানোদের ঘর। আর যে দুখানা ঘর আছে দুপাশে, একখানা ঠাকুরঘর, আরেকখানা নৈবেদ্যঘর। সেই দানোদের ঘরেই নবীন সন্ন্যাসীদের থাকা-বসা। ওরে, শুবি কোথায়? এই ঘরেই। চট বিছিয়ে চ্যাটাই বিছিয়ে। চট-চ্যাটাই না জোটে শুকনো মেঝের উপর। বালিশ, বালিশ কোথায়? 'এই যে নরমনরম বালিশ এনেছি তোদের জন্যে। মাথায় দিয়ে শো।' পর-পর কখানা ইঁট সাজানো। ইষ্টকই ত্যাগতেজস্বী সন্ন্যাসীদের উপাধান।

শুধু শোবার-থাকবার ব্যবস্থা করলেই তো চলবেনা, খেতে হবে তো? দেহটাকে রাখতে হবে তো টিঁকিয়ে। ভাত জোটে তো নুন জোটেনা। নুন-ভাত জুটলেই রাজ-ভোজ। শুধু নুন-ভাত? একটা কিছু তরকারি জোটে না? তোদের ভাগ্য ভালো, জুটছে একটা না-চাইতেই। বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ঐ দ্যাখ্ তেলাকুচো। তার গোটাকতক পাতা ছিঁড়ে এনে সেদ্ধ করে নে। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ আর নুন-ভাত—এ রাজ-ভোজের চেয়েও বেশি, অমৃতভোজ। তাই চালিয়ে যা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

'ওরে আঙুল টাকনা দিয়ে খা।' বললে বিবেকানন্দ।

থাকা-খাওয়া হল—পরা? একটা করে কৌপীন আর একটুকরো গেরুয়ার কানি। উপর গায়ে? মুক্ত হাওয়া। না, একখানা চাদর আছে। প্রত্যেকের একখানা করে নয়, সকলের জন্যে একখানা। দড়ির উপর টাঙানো আছে, যে যখন বাইরে যাচ্ছে টেনে নাও গায়ের উপর।

কষ্ট? কষ্টেরও এখানে আসতে কষ্ট হবে। দুঃখ? দুঃখ দুঃখিত হয়ে চলে গেছে অনেকদিন।

একটা নতুনের আনন্দের মধ্যে চলে এসেছে সবাই। জপধ্যানের নামনৃত্যের আনন্দ। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে যাব এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞার আনন্দ। এমন একটা আনন্দ যে সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। সেই আশ্চর্যময়তার মধ্যে কে তাকায় থাকা-পরার দিকে, কে নেয় ভাত-নুনের হিসেব ?

আর আছে একটা তানপুরা! জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে গান ধরে বিবেকানন্দ। সহপন্থীরাও সুর মেলায়। তারপর সারাদিন নানা কর্মে নানা ধ্যানে সেই সুর, সেই সুখ, সেই দীপনা-প্রাণনা।

চল আঁটপুরে যাই। বাবুরামের মা ডেকেছেন আমাদের।

হরিপাল পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে ছ্যাকড়া গাড়ী। পায়ে হেঁটে যেতে হলেও যাব। মা ডেকেছেন। সঙ্গে তানপুরা আছে। গান ধরো সকলে—শিবশঙ্কর ব্যোম ব্যোম।

বাবুরামের মা তো আনন্দে দিশেহারা। ঠাকুরের ছেলেরা এসেছে। অমৃতের সন্তান। ত্যাগযজ্ঞের হোমশিখা।

মা, আমরা দশজন এসেছি। শুধু লাটু আর যোগেন রয়েছে এখনো বৃন্দাবনে। আর রাখাল, কেন কে জানে, ধরতে পারেনি ট্রেন। তোমাকে আগে কিচ্ছু খবর দিতে পারিনি। ভরদুপুরে চলে এসেছি আচমকা। হেঁশেল আমাদের হাতে ছেড়ে দাও আমরা নিজেরাই রান্না করে নিচ্ছি।

মা কি সে কথা কানে তোলেন ? তোমাদের কাউকে হাত লাগাতে হবেনা। তোমাদের দশজনের জন্যে আমি একাই দশভুজা।

আমরা এখানে চড়ুইভাতি করতে আসিনি। আমরা এখানে সন্ন্যাস নিতে এসেছি। রূপান্তরপরিগ্রহের ভূমিকা নির্মাণ করতে।

খিড়কি পুকুরের ধারে তেঁতুল গাছের কটা কুঁদো পড়ে আছে। তাই দিয়ে পুজার দালানের পাশে ধুনি জ্বালানো হল।

ধুনির চারিদিকে, আয়, গোল হয়ে বসি আমরা দশজন। এ আগুন কাঠের নয়, আমাদের আধ্যাত্মজীবনের আমাদের অনির্বাণ ঊর্ধ্বপ্রত্যাশার। এ কাঠ পুড়ছেনা, পুড়ছে আমাদের বন্ধনআবর্জনা। আর এই যে দীপ্তি এ আমাদের বিপাপ বৈরাগ্যের।

'ঈশ্বরোপলব্ধিই আমাদের জীবনের সাধনা। কি করে মানুষ তৈরি করব যদি না নিজেরা মানুষ হতে পারি? আর যার মধ্যে যতখানি ঈশ্বরবিকাশ তার ততখানি মনুষ্যত্ব।' নরেন ঘোষণা করল বজ্রকণ্ঠে। 'এই প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ করে আয় শপথ করি সকলে, আমরা মানুষ হব। হব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি।'

প্রত্যেকেই যেন একটা দীপতাপপ্রদ অগ্নিভাণ্ড, প্রত্যেকেই যেন অনুভব করতে লাগল। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের আশ্রয়, প্রত্যেকের উৎসাহ। প্রত্যেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষয়হীন বিদ্যুৎভাণ্ডার। যেন এক দেহ এক মন এক আত্মা। এক প্রেমের প্রসন্নপ্রবল প্রস্রবণ। চিত্তশুদ্ধ করে নাও অগ্নিস্নানে। যদি চিত্তশুদ্ধ না হয় তাহলে ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিন-

পরিধান, ব্রতচর্যা, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান অরণ্যবাস ও শরীরশোষণ—সমস্তই নিষ্ফল। চিত্তশুদ্ধি না হলেও সেবা করবে কি করে? পীড়িতকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে পানীয়, ক্ষুধিতকে ভোজন ও অভ্যাগতকে নয়নমন প্রিয়বচন দানই সেবা। উত্থিত হও, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের চরম বর পরম সম্বোধি না লাভ করতে পারো নিবৃত্ত হয়োনা। অগ্নির সই করো প্রাণের প্রতিজ্ঞাপত্র।

উপরে খোদিত স্ফুলিঙ্গাকীর্ণ স্তব্ধ আকাশ, নিচে এই মানুষের হাত জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের ঊর্ধ্বশিখ অভ্যর্থনা। চারিদিকে অক্ষয় প্রশান্তি! অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছে বন্ধুরা। বসেছে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে। স্তব্ধতায় এককেন্দ্রীক হয়ে। কতক্ষণ কেটে গেল রাত কে জানে নরেন হঠাৎ চোখ খুলল। বলতে লাগল যীশুখৃষ্টের কথা। তার জন্ম তার মৃত্যু তার পুনরুত্থানের কথা। এই পৃথিবীর নবীন-সঞ্জীবনের জন্যে আমাদের হতে হবে যীশুখৃষ্ট। জীবকষ্টের কাষ্ঠফলকে প্রাণ উৎসর্গ করে যাব যাতে সেই মৃতকাষ্ঠে ফুটতে পারে আনন্দের অরুণমঞ্জরী।

ঈশ্বরের সামনে, পরস্পরের সামনে এই আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক, আমরা সন্ন্যাসী হব। ঈশ্বরানুভবের আনন্দ বিতরণ করব দিকে দিকে। সেই আমাদের লোককল্যাণ। মানুষ যে ছোট নয়, মানুষ যে এখানে বয়ে যেতে আসেনি, শোনাব সেই আত্মার গভীরগুহার প্রতিধ্বনি। বরানগরের মঠে ফেরবার কালে চল যাই তারকেশ্বর।

জয় শিব ওঁকার, জয় শিব ওঁকার হর হর, মহাদেব। হে চন্দ্রচূড়, হে মদনান্তক শূলপানি, হে স্থাণু, হে গিরীশগিরিজেশ, হে ভীতভয়সূদন ভূতনাথ, সংসার-দুঃখগহন থেকে রক্ষা করো আমাকে। হে ভস্মভূষিতাঙ্গ, হে সর্পোপবীতী ললাটাক্ষ, হে সর্ববিশ্বৈকজেতা বীরেশ্বর, আমার মধ্যে আর্বিভূত হও। হে সদ্যোজাত হে সর্বেশাতিশয়, সর্বদা আমাতে অবস্থাপন করো।

মঠে ফিরে চল এবার। দ্যাখ সবাই এল কিনা। হরি এসেছে, সুবোধ এসেছে, গঙ্গাধর এসেছে। রাখালও চলে এসেছে সংসারের দাঁড় টপকে। বৃন্দাবন থেকে লাটু আর যোগীনও এসে হাজির। ওয়া গুরুজীকি ফতে। জয় গুরু-মহারাজজীকি জয়।

ওরে বৃন্দাবন থেকে তিলকমাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে। নরেন ভাবলে খানিকটা লঘু পরিহাস করে নি। দে ঝুলি মালা দে। নিতাই ঠক-ঠক করি।

সর্বাঙ্গে ছাপতিলক কেটে হাতে ঝুলি মালা নিয়ে নরেন চোখ বুজে জপ করতে লাগল, নিতাই ঠক-ঠক, নিতাই ঠক-ঠক। তার ভাবভঙ্গি দেখে আর সকলের তো হাসির অট্টরোল। অনেক দিন হাসিনি পেট ভরে। নে আয় এখন একটু কীর্তন করি। খোল-টোল নিয়ে আয়। তারপর বিদ্রূপের ভান করে নরেন নাকি গান ধরল : নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে—

হাসতে হাসতে আর সকলে ধুয়ো ধরল। যেন কি একটা হাসির ব্যাপার। নাচতে লাগল কেউ কেউ। এ কি। নরেন যে দরদরধারে কাঁদছে। কোথায় হাসির

হুল্লোড়। এ যে দেখি নামপ্রেমের অমৃতপিণ্ড। প্রথম ঝাপটাটা কেটে যেতেই গলতে সুরু করেছে। অভ্যাসের শুষ্ক কোটর থেকে শুরু হয়েছে অনুরাগের মধুক্ষরণ। বন্ধুরা প্রথমে নির্বাক হয়ে গেল। পরে সেই গভীরস্পর্শে তারাও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। গলে যাবার ঢেলে দেবার উদ্দীপনা। বেলা বারোটা থেকে সুরু করে একটানা পাঁচটা পর্যন্ত। প্রকাণ্ড ভিড় জমেছে বাইরে। শান্ত হয়ে তন্গত মনে শুনেছে সেই নামকীর্তন।

এবার বিরজা হোমের অনুষ্ঠান করো। বিধিমত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুরের পাদুকার সামনে এই হোম। ঠাকুর গেরুয়া দিয়ে গিয়েছেন এবার সে গেরুয়া বসন না হয়ে নিশান হয়ে উঠবে। কৌপীনবান না সৌভাগ্যবান।

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

বেদান্তবাক্যে যার সদানন্দ, ভিক্ষান্নমাত্রে যার পরিতুষ্টি, অন্তরে যার অশোক, চরাচরে যে একচর, সেই তো সৌভাগ্যবান। স্বানন্দভাবে যার অবস্থান, যে সুশান্ত-সর্বেন্দ্রিয়, অহর্নিশ যে হরিরসমদিরা পান করে, ব্রহ্মেই যার স্থায়ী স্থিতি সেই দেহে-চিত্তে প্রসন্ন সমুজ্জ্বল। একদিকে বুদ্ধের তপস্যা ও দার্ঢ্য, অন্যদিকে আবার শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি। তার সঙ্গে মেলাও শঙ্করের অদ্বৈতজ্ঞান। আমিই ব্রহ্ম, সেই উর্জস্বল বিভাবনা। কিন্তু একসঙ্গে সব যেখানে মিশেছে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা কই? চোখের সামনে এত দেখলাম এত ছুঁলাম কিন্তু কই ত্যাগ আর সাধনা, সেই জ্ঞানচক্ষু, সেই ধ্যানমন্থন, সর্বোপরি সেই অনিমেষ ভালোবাসা, সেই ক্ষমা আর শান্তি, সেই আশ্চর্য ভাবসমাধি!

আগুন যেমন বাতাসকে ডেকে আনে আমাদের বিশ্বাস ডেকে আনবে ব্যাকুলতাকে। যদি সম্যক ন্যাস বা নির্ভর করতে পারি ভগবানকে, তিনি দেখা দেবেন ধরা দেবেন। দম্ভের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হবেন নরসিংহ।

হোমের পর সন্ন্যাস নিল সকলে। গুনে-গুনে পনেরো জন। নতুন আশ্রমে এসে জন্মান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে নামান্তর ঘটল। নরেন বিবেকানন্দ, রাখাল ব্রহ্মানন্দ, বাবুরাম প্রেমানন্দ। তারক হল শিবানন্দ, শরৎ হল সারদানন্দ, হরি তুরীয়ানন্দ। যোগানন্দ যোগীন, অভেদানন্দ কালী, অখণ্ডানন্দ গঙ্গাধর। লাটু অদ্ভুতানন্দ, শশী রামকৃষ্ণানন্দ, বুড়োগোপাল অদ্বৈতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ নিরঞ্জন, সুবোধানন্দ সুবোধ, ত্রিগুণাতীতানন্দ সারদাপ্রসন্ন।

ভাঁড়ারে আজ এককণাও চাল নেই। ভিক্ষায় বেরিয়েও একমুঠো জুটলনা। না জুটুক, কীর্তন জুড়ে দাও। অবসাদকে আসন্ন করে দেব। ঈশ্বরের নামে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়ে যাবে। মৃত্যুকেও মনে হবে অমৃততুল্য।

সবাই কীর্তনে মেতে উঠল। শশী আস্তে-আস্তে সরে গেল দল থেকে। এরা তো নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলতে চায় কিন্তু একদিকে যে ঠাকুর উপবাসী। এক কণা চাল না পেলে ঠাকুর যে থাকেন আজ অনশনে। তাঁকে কী দিয়ে ভোলাব? বেদনায় দগ্ধ হতে লাগল শশী। ঠাকুর, তোমার মুখে দেবার জন্যে এক মুঠো অন্নেরও কি আজ সংস্থান হবে না?

পাশের বাড়ির ছোকরাটি বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু তাদের বাড়ির সকলেই সন্ন্যাসীদের উপর খাপ্পা। জোয়ান-জোয়ান ছেলে ভিক্ষে করে, সারাদিন দাপাদাপি করে, কীর্তন করে, পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, এরা দৈত্য-দানা ছাড়া আর কি। তবু সেই ছোকরাটিকেই নির্জনে ডেকে নিল শশী। ভাই, ভিক্ষেয় আজ কিছুই পাওয়া যায়নি। আমাদের ঠাকুর উপোস করে আছেন। কিছু আলো চাল দুটো আলু আর এক ছিটে ঘি দিতে পারবে?

কঠিন কোমল হয়ে গেল। পোয়াটাক চাল কটা আলু আধ ছটাকটাক ঘি পেঁৗছে দিয়ে গেল ছেলেটি।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণানন্দ আনন্দে অন্নভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করল। অন্নপ্রসাদ চটকে নিয়ে ছোট-ছোট পিণ্ড তৈরি করে নিয়ে গেল দানাদের ঘরে। দানারা সবাই তখন হরিনামে উন্মত্ত কীর্তনে বিভোর। হাঁ করো, ঠাকুরের প্রসাদ এনেছি। এক-এক দলা চটকানো ভাত সকলের মুখে দিতে লাগল একে-একে। এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?

অমৃতলোক থেকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

২৬

চরম কৃচ্ছ্র চলেছে বরানগরে, প্রজ্জ্বলিত তপস্যা, একদিন দেখা গেল সারদাপ্রসন্ন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মঠে নেই। কি হল, কোথায় গেল? অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সারদা একখানা চিঠি রেখে গেছে। কি লিখেছে চিঠিতে? পড়ে শোনা।

'পায়ে হেঁটে চললুম আমি বৃন্দাবন। এখানে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। কখন আবার মনের গতি বদলে যায় ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে বাড়ি ঘরের স্বপ্ন দেখি, সে সব মায়ার মূর্তিতে মন নরম হয়ে পড়ে। দু-দুবার হেরে গেছি, দু-দুবার ফিরে গেছি বাড়িতে। আর হার স্বীকার করতে পারবনা, তাই এবার দীর্ঘ পথে, দূর পথে বেরিয়ে পড়লাম।'

নরেন অস্থির হয়ে উঠল। সারদা যে নিতান্ত ছেলেমানুষ। কে তাকে পথ বলে দেবে, কে দেবে তাকে আশ্রয়, খিদের সময় একমুঠো শাকান্ন? রাখালের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল: 'রাজা, তুই ওকে যেতে দিলি কেন?'

রাখাল তার কি জানে! কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে নজর এড়িয়ে। যে যাবেই তাকে রুখবে কে? নদী-পর্বত তার পথ ছেড়ে দেবে, গহন অরণ্য তার জন্যে রচনা করবে আশ্রয়-আরাম। রুক্ষ মরুপ্রান্তরেও তার জন্যে সরল সরণি।

রাখাল ঢোক গিলল। বললে, 'আমারও তো বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে।'

'তোমারও?' নরেন ভয়ে আতঁকে উঠল।

'হ্যাঁ, এখানে বড্ড ভিড়, গোলমাল। আমার একটু সুদূরে নির্জনে যাবার

ইচ্ছে।' রাখাল তাকাল গভীর দৃষ্টিতে : 'এই ধরো নর্মদার তীরে।'

'তবে তাই যাও, বেরিয়ে পড়ো। বসে আছ কেন?' নরেন ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ভেবেছ ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালেই ঈশ্বরের দেখা পাবে? ঈশ্বর তো বরানগরে নেই, তিনি আছেন নর্মদায়! যা হোথায় থাকতে পারে তা আর হেথায় থাকতে পারে না?'

কোথায়? কোথায় ঈশ্বর? একদিন এই প্রশ্ন নিয়েই নরেন সম্মুখীন হয়েছিল ঠাকুরের। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, সর্বঘটে ঈশ্বর। সেই প্রশ্ন নিয়েই এক জিজ্ঞাসু ভক্ত উপস্থিত হল নরেনের কাছে। প্রশ্ন করল, 'কোথায় ঈশ্বর?' নরেন বললে, 'আত্মঘটে। হৃদ্দেশে। তোমার নিজের বুকের মধ্যে।'

'কিন্তু কিছুই তো বুঝি না।'

'তুমি কি করে বুঝবে! কীটাণুকীট, তোমার কী সাধ্য তাঁর মহিমা বোঝো। ব্যাকটিরিয়ার সাধ্য কি ডাক্তারকে বোঝে! পরমাণু-পুঞ্জের মধ্যে এক পরমাণু এই পৃথিবী, তার মধ্যে তুমি! কার তুমি ইয়ত্তা করবে?'

'তবে উপায়?'

'উপায়? উপায় আত্মসমর্পণ। উপায় সর্ববিসর্জন। উপায় শরণাগতি।'

'কি করে আত্মসমর্পণ করব?'

'শুধু নাম করে। শুধু তাঁকে ডেকে। হৃদয়ের সমস্ত সুরটুকু তাঁকে নিবেদন করে।'

'তিনি কি তবে আমাকে নেবেন?' যুবক ভক্ত আকুল চোখে তাকাল নরেনের দিকে : 'তবে কি তিনি আমাকে দয়া করবেন? তিনি কি দয়ালু?'

'তিনি কৃপার পারাবার। কৃপার মৌশুমি হাওয়া।'

'তার প্রমাণ কি?'

'তার প্রমাণ তোমার নিজের করুণামাখানো মুখখানি।' নরেন বন্ধুর হাত ধরল : 'তোমার বুকে যদি কোন করুণা থাকে সে তো তাঁরই করুণা। তোমার বুকে যদি কিছু স্নেহ থাকে তা তো তাঁরই স্নেহ।'

যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। ঈশ্বর যাঁকে কৃপা করেন তিনিই তাকে লাভ করেন। কাকে কৃপা করবেন? সে তাঁর খেয়াল। তুমি দেখ ঈশ্বরের প্রতি একটু ভালোবাসা আসে কিনা! ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার নামই ভক্তি। ভক্তির আরেক নাম "ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপিণী।" ঈশ্বর ছাড়া অপর সর্ববস্তুতে যখন বিতৃষ্ণা জন্মে তখনই দেখা দেয় বিশুদ্ধা ভক্তি। সুতরাং সেই ভক্তি আসে বৈরাগ্য থেকে। তাই প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, আমাকে বিষয়বিমুখ করো, আমাকে দাও তোমাকে একটু ভালোবাসবার অধিকার।

গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, চলল তিব্বতের দিকে। বৃন্দাবন থেকে একবার ঘুরে এসেছে কালী—অভেদানন্দ—সে এবার চলল পুরী। একা নয়, সঙ্গে শরৎ, মানে সারদানন্দ আর বাবুরাম মানে প্রেমানন্দ।

সবাই চললি?

হ্যাঁ, যত বড়ই সাধনার কেন্দ্র হোক বরানগর, ও যেন সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এর চারপাশে পরিচিত প্রতিবেশী, জুটে যায় এটা-ওটা সাহায্য। উপোস করে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছি, হঠাৎ কোনো লোক পাঠিয়ে দিল খাবারের থালা। তাদের কানে খবরটা গিয়েছিল বলেই না তারা করুণাপরবশ হয়েছিল! এমন এক জায়গায় চলো যেখানে তোমার আত্মীয়-পরিচিত কেউ নেই, তুমি উপোস করে আছ কি না আছ সে খবর কানে নেবার কারু আগ্রহ নেই বিন্দুমাত্র। তবে সেখানেই দেখব ভক্তের জন্যে প্রসাদ পাঠান কিনা ভগবান। বুঝব সত্যিই তাঁর করুণা কতখানি।

'তুমি, তুই যাবিনা শশী ?' রামকৃষ্ণানন্দকে জিগগেস করল নরেন।

'আমি আবার কোথায় যাব ?' শশী একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

'বা, এই যে সবাই তীর্থে যাচ্ছে, কেউ বিন্ধ্য, কেউ হিমালয়, কেউ শ্রীক্ষেত্র— তুইও বেরিয়ে পড় এই সঙ্গে। তুই চলে যা দক্ষিণে।'

'কোন দুঃখে ?' শশী ঘুরে দাঁড়াল : এই মঠের জিম্মায় ঠাকুরের পূতভস্ম, তাই এই মঠই আমার সারতীর্থ, দক্ষিণেশ্বরই আমার তীর্থেশ্বর। আমি আমার ঘাঁটি ছাড়বনা কিছুতেই।'

মঠের শিরদাঁড়া হচ্ছে শশী, তাকে কিছুতে বাঁকানো গেল না। নিষ্ঠায় সে নিয়তাত্মা।

সবাই যদি চলে যায়, আমি কেন বসে থাকি ? আমার কেন এত মায়া ? সন্ন্যাসী হয়ে শেষকালে কি সন্ন্যাসী ভায়েদের মায়ায় জড়িয়ে পড়ব ? মায়ের পেটের ভাইবোনেরা তবে কী দোষ করেছিল ? লোহার হোক সোনার হোক শৃঙ্খল শৃঙ্খল। শৃঙ্খলকে ছিন্ন-দীর্ণ করতে হবে। শিব শিব শিবভোঃ, শ্রীমহাদেব শম্ভো। বেরিয়ে পড়ল নরেন।

পরনে গেরুয়া কাপড় গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে কমণ্ডলু আর দণ্ড, ভিক্ষায় বেরিয়েছে কোন রাজপুত্র। রূপে রতিপতি তেজে দিনপতি এ কে ঊর্ধ্বশিখ হুতাশন। চোখে জাগ্রত জ্ঞান মুখভাবে ভক্তির বিনম্রতা! দীপ্তবিশালনেত্র গম্ভীরবলবাহন এ কে প্রশান্ত পুরুষ! যে দেখে সেই অবাক হয়ে থাকে। যদি কেউ বা নিজের অজানতে কিছু সম্বোধন করে বসে, সনমস্কার উত্তর হয় : 'নারায়ণো হরিঃ।'

প্রথমেই চলে এল কাশী। কাশী সর্বপ্রকাশিকা। গহনগাহিনী গঙ্গা, বীরেশ্বর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, কিছু দূরে মহামূর্তি সারনাথ। এখানেই এসেছিলেন বুদ্ধদেব, এসেছিলেন শঙ্করাচার্য, এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। নাও এখানকার বায়ু-স্পর্শ, ধূলিস্পর্শ সলিলস্পর্শ। শুদ্ধ হও উজ্জ্বল হও লাবণ্যমনোহর হও। উদারধী প্রসন্নধী হও। হও সূর্যবীর্যসমুদ্ভব।

রাস্তায় কতগুলো বানর তাড়া করল স্বামীজিকে। ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল স্বামীজি। হয়তো মনে হল পলায়নেই মুক্তি। পলায়নেই পরা সুধা। যত ছোটে ততই বানরের দল তেড়ে আসে। সহসা কে হুঙ্কার করে উঠল : থামো,

পালিয়ো না। ফিরে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও, দাঁড়াও বুক ফুলিয়ে!

যেন দৈববাণী হল। কে যেন সবলে দাঁড় করিয়ে দিল স্বামীজিকে। বিপদের সামনে দৃঢ়পদ করে দিল। আর যায় কোথা! বানরের দল লেজ গুটোলো। চোঁচা চম্পট দিলে।

সুতরাং, ফিরে দাঁড়াও, দাঁড়াও সাহসবিস্তৃত বক্ষ মেলে, দৃঢ়বদ্ধপরিকর হয়ে। যত বড় বাধা তত বড় উৎসাহ। মহাবিঘ্নে মহোৎসাহ। ভয়ের সামনে দাঁড়াও, দাঁড়াও কাপট্যের সামনে। শুধু সম্মুখীন হও। অজ্ঞানের, আলস্যের, অনিশ্চয়তার। সমক্ষসংঘাত করো। দাঁড়াও জীবনের মুখোমুখি। যা কিছু ভয়াবহ তোমার বীর্যে তোমার সামর্থ্যে তাকে তুমি জয়াবহ করো। এড়িয়ে যেওনা, পেরিয়ে এস। পাশ কাটিয়ে যেওনা, অন্তস্তল ভেদ করে সোজা বেরিয়ে এস তীক্ষ্ন তরোয়ালের মত। আত্মদীপ হও। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং। নিজেকেই নিজে উদ্ধার করো। নিজেই নিজের ধাতা ত্রাতা-মহাদাতা।

তুমি ছাড়া আমার কে আছে? আমি আছি। কেননা তুমিই আমি! তাই বলো, আমি ছাড়া আমার কে আছে?

কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা করল স্বামীজি। ত্রৈলঙ্গ স্বামী কথা কননা, যদি কখনো নিতান্ত দরকার হয় ইশারায় উত্তর দেন। আছেন অখণ্ড মহামৌনে। অনুভবসিদ্ধ অবস্থায়। অচল-প্রতিষ্ঠ ধ্যানের সমুদ্রের মত।

প্রণাম করে দাঁড়াল স্বামীজি। কোনো কথা কইল না। শুধু ভাবল এঁরই কাছে একদিন এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। জিগগেস করেছিলেন, 'জীব আর ব্রহ্ম কি আলাদা?' ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইশারায় বলেছিলেন, 'যতক্ষণ ভেদবোধ আছে ততক্ষণ আলাদা। যেই ভেদবোধ দূরে যাবে অমনি এক।'

বহুর মধ্যে এককে দেখা, আপাতভিন্ন প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা, সেই সাধনাই জীবনসাধনা। মুক্তি সৃষ্টির নয় মুক্তি দৃষ্টির। কি করে চোখের ধাঁধা ঘুচে যাবে মনের দ্বন্দ্ব মুছে যাবে তারই জন্যে অন্তরের আগুনে নিজেকে তপ্ত করা। আর যা তপ্ত করে তাই তপস্যা।

শুধু একজনই আছেন। বলছেন স্বামীজি। যিনি একমাত্র সত্তা, জন্মমৃত্যু-বর্জিত, সর্বব্যাপি, সর্বাংশস্পর্শী। তিনিই একমাত্র আত্মা, একমাত্র পুরুষ। তাঁরই আদেশে আকাশ ছড়িয়ে আছে দিকদেশ আচ্ছন্ন করে, তাঁরই আদেশে বাতাস বইছে, আগুন জ্বলছে, অঙ্কুর মৃত্তিকার বাধা বিদীর্ণ করে উদ্গত হচ্ছে। তাঁরই আদেশে সর্বত্র এই প্রাণরঙ্গ। তিনিই সমস্ত প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ। তিনি তোমারও ভিত্তিভূমি। সুতরাং, সন্দেহ কি, তুমিই তিনি। তুমি আর তিনি অভগ্ন, অচ্ছিন্ন, অব্যবহিত। যেখানেই দুই সেখানেই দ্বন্দ্ব। যখন সবই এক তখন তুমি কাকে ঘৃণা করবে কাকে আঘাত হানবে? কার সঙ্গে তোমার যুদ্ধবিগ্রহ? যখন অনেক দেখছ তখনই জানবে তুমি রয়েছ অজ্ঞানে, যখন দেখবে তুমিই সেই সর্বাত্মা নিত্যপুরুষ তখনই তুমি মুক্ত, পূর্ণ, পরমপ্রসন্ন। এ ছাড়া মুক্তির কোনো অর্থ নেই, নেই বা পূর্ণতার উপলব্ধি। তুমিই সেই ঈশ্বর।

সুতরাং চারদিকে মানুষ না দেখে ঈশ্বরকে দেখ।

আগ্রা হয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলেছে স্বামীজি। চলেছে পায়ে হেঁটে। একটা কানাকড়িও সঙ্গে নেই। পথের ধারে কোথায় তার জন্যে একটু বিশ্রামের ছায়া পাতা কে বলে দেবে! চলেছে তো চলেইছে। শ্রান্তিতে-ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সর্বদেহ। কি করি, কোথায় যাই! দেখতে পেল পথের ধারে গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। কলকে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। লোকটার মুখে প্রগাঢ় তৃপ্তি। যেন তার শরীর থেকে মুছে যাচ্ছে সমস্ত দিনের পুঞ্জিত অবসাদ। আহা, যদি পেতাম এমনি এক ছিলিম তামাক। স্বামীজি দাঁড়াল একমুহূর্ত। একটি সুখটানে মুছে যেত সমস্ত পথশ্রম।

'ভাই তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই—' স্বামীজি হাত বাড়াল।

লোকটা তাকাল স্বামীজির দিকে। উদারদর্শন গৌরকান্তি পুরুষ—দেখে কেমন ত্রস্ত-লজ্জিত হল। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর।'

প্রসারিত হাত সংবৃত করল স্বামীজি। মেথর-উচ্ছিষ্ট কলকে কি করে মুখে দিই! আরামের মুখে ছাই দিয়ে ফিরে চলল স্বামীজি! কি হবে আমার সুখে-আরামে? অপরিমেয় দুঃখই আমার সুখ। অনপনেয় ক্লান্তিই আমার আরাম। খানিকটা পথ এগিয়ে এসে থেমে পড়ল স্বামীজি। এ কি, আমি সন্ন্যাসী না? আমি না সমস্ত সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করেছি, ছিন্ন করেছি সমস্ত সংস্কারজঞ্জাল? এই আমার সর্বভূতে অভেদদর্শন? নয়ন উন্মীলন করে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন কর। এই যে মেথর এও সেই ঈশ্বর ছাড়া কেউ নয়। কাকে তুমি ঘৃণা করছ? কাকে তুমি অবজ্ঞা করে পরিহার করলে? তুমি তাকে ছোট করে দেখছ বলেই সে ছোট নয়। তুমি জিনিসকে হলদে দেখছ বলেই তা হলদে নয়। সূর্য সূর্যই আছে শুধু তোমার দেখবার ভুল। আর এই দেখবার ভুলের জন্যেই তোমার যত দুঃখ। শাশ্বত সুখ কার? যিনি এক, একমাত্র, যিনি সকলের নিয়ন্তা, সকলের অন্তরাত্মা, যিনি একরূপকে বহুধা করছেন বিচিত্র করছেন, তাঁকেই যে দেখছে অহরহ, অন্তরে আর বাহিরে—তার। যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে জাগ্রত, যিনি একাকী হয়েও সকলের কাম্যবস্তু বিধান করছেন তাঁকে যে দেখে, দেখতে শেখে, তারই অচ্ছেদ শান্তি। যার চোখ আছে সে দেখ, যার কান আছে সে শোনো। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কি অন্ধ তুমি কি বধির? যোঽসাবসৌ-পুরুষঃ সোঽহমস্মি। এ কথা ঘোষণা করোনি গুঞ্জরণ করোনি অনুভবের গভীরে? তবে কেন ফিরে এলে? তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রয়েছে সে আমিই। বলো আরেকবার বলো।

ফিরল বিবেকানন্দ। লোকটার কাছে এসে বললে, 'ভাই, আমাকে শিগগির এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

'মহারাজ, আমি যে মেথর।'

'কে বললে? তুমি নারায়ণ। তুমি আমার সহোদর।'

'কিন্তু এ তো তামাক নয়, এ বড়ো-তামাক।'

'তা হোক। তুমি দাও আমাকে কলকে ধরিয়ে।'

কিছুতেই নিবৃত্ত হল না সন্ন্যাসী। ভরাট কলকে টানতে লাগল তৃপ্তিতে।

ঘটনাটা কানে গেল গিরিশের। সে বললে, 'বিশ্বাস করিনা।'

'কি বিশ্বাস করিসনে?'

'তুই গাঁজাখোর, তোর অমনি নেশা করবার মন হয়েছিল, তাই গাঁজার কলকে দেখে সখ করে টান মেরেছিলি।' বললে গিরিশ ঘোষ। 'নইলে কেউ কি আর মেথরের কলকেতে মুখ দেয়?'

'আমি দিই।' বজ্রকণ্ঠে বললে স্বামীজি। 'এইটে পরীক্ষা করবার জন্যে দিই আমি জাতিভেদের পরপারে বেদান্তের জগতে চলে আসতে পেরেছি কিনা। পূর্বসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে থাকব তবে কিসের বিরজা হোম কিসের সন্ন্যাসব্রত। ঠিক ব্রত ধরেছি কিনা নিজেকে একবার বাজিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। নিজের কাছে যদি পরীক্ষায় জিতি তবেই নিজের কাছে নিজে আশ্বাসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ হয়ে উঠি। ভাই জি-সি, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।'

কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় কামকাঞ্চনের কথা উঠল। ভাস্করানন্দ বললে, 'মানুষের এই দুই নির্দয় গ্রন্থি।'

'সন্ন্যাসীরও?' ঝলসে উঠল স্বামীজি।

'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীরও। সাধ্য কি সেও এ বন্ধন থেকে ষোল আনা মুক্ত হয়।'

'মিথ্যে কথা। কামকাঞ্চনই যদি ত্যাগ করতে না পারল তবে আর সে সন্ন্যাসী কোথায়?' স্বামীজি দৃপ্তমুখে বললে।

'মুখে বলাই সহজ।' ভাস্করানন্দ গম্ভীরমুখে বললে, 'কিন্তু মনে-মনে তার মূল বহু দূর।'

'মানিনা। বিশ্বাস করিনা।'

'তোমার এই নবীন বয়স', ভাস্করানন্দ অনুকম্পার হাসি হাসল: 'তুমি কি জান? কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?'

'জানি মানে? আমি দেখেছি।'

'দেখেছ?'

'হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখেছি। এই কিছুদিন আগে। কলকাতায়। দক্ষিণেশ্বরে।'

'কী দেখেছ?'

'সে এক আশ্চর্য প্রদীপ্ত পুরুষ। কামকাঞ্চনের বাষ্প পর্যন্ত নেই। মাটি টাকা, টাকা মাটি বলে একসঙ্গে তিনি টাকা আর মাটি নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।' দুই চোখ জ্বলতে লাগল স্বামীজির: যাঁর কাছে সমস্ত স্ত্রীজাতি মা। তিনি নিজের স্ত্রীকে পুজো করেছিলেন। টাকা পয়সা দূরের কথা, সামান্য ধাতুদ্রব্যের স্পর্শে যার হাত বেঁকে যেত—'

যেন গাঁজাখুরি গল্প এমনিভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল ভাস্করানন্দ।

তখন ভাস্করানন্দকে কে বলে দেবে, যে নবীনবয়স সন্ন্যাসীকে সে উপেক্ষা করেছিল সেই বিশ্ববিজেতা বিবেকানন্দ। কে বলে দেবে যার শিষ্যত্ব নিয়ে তার এই দিগ্বিজয় সেই অমিতমহিমা অব্যর্থ পুরুষের নাম কি!

প্রমদাদাস মিত্রর সঙ্গে ভাব হল কাশীতে। একেই পর পর কত চিঠি লিখেছে স্বামীজি: 'আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমার থেকে দূরপরাহত হয়ে যায়। আমরা ক্রুশ ঘাড়ে করেছি, হে ঈশ্বর, তুমিই তা আমাদের অর্পণ করেছ। এখন আমাদের বল দাও, যেন আমরণ তা বহন করতে পারি। একটি গুরুভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। সে কিছুতেই আমার সঙ্গত্যাগ করবেনা। তাই তাকে উত্যক্ত করে বিদায় করেছি। কি করি, আমি বড় দুর্বল, বড়ই মায়াচ্ছন্ন, আশীর্বাদ করুন যেন কঠিন হতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলব, মনের মধ্যে দিবারাত্র নরক জ্বলছে —কিছুই হলনা, এ জন্ম বুঝি বিফলে গেল। আশীর্বাদ করুন যেন অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় আমার হয়।'

ঠাকুরের একটা স্মরণচিহ্ন ও তাঁর ভক্তশিষ্যদের একটা আশ্রয়স্থান তৈরি করবার জন্যে স্বামীজি তখন পাগল। লিখছে প্রমদাদাসকে: 'যদি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন, আমি বলব আমি রামকৃষ্ণের দাস, তাঁর নাম তাঁর জন্মভূমিতে ও সাধনভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাঁর শিষ্যদের সাধনের অনুমাত্র সাহায্য করতে আমাকে যদি চুরি-ডাকাতিও করতে হয়, আমি তাতেও রাজি। এখন সিদ্ধান্ত এই যে রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই। সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া এ জগতে আর নেই। হয় তিনি অবতার, যেমন তিনি নিজে বলতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হয়েছে তিনি তাই।'

অযোধ্যায় এসেছে স্বামীজি। এই সেই লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা। মানবেন্দ্র মনু যে পুরী তৈরি করেছিলেন। যেখানে সত্যসন্ধ রামের জন্ম। নবদূর্বাদলশ্যাম কমলায়তাক্ষ রাম। গাম্ভীর্যে সমুদ্র ধৈর্যে হিমালয়। ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীর সমান। জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ, সর্বগুণোপেত সৌম্য ও করুণাময়। লোকাভিরাম রাম।

অযোধ্যা থেকে লখনউ, লখনউ থেকে আগ্রা, আগ্রা থেকে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে আশ্রয় নিল স্বামীজি। ঠাকুরের শিষ্য বলরাম বসু, তারই পূর্বপুরুষদের তৈরি এই মন্দির, কালাবাবুর কুঞ্জ।

নতুন করে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল স্বামীজি। সর্বকর্মকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছু নেই, নেই কিছু অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য, তবুও আমি সর্বক্ষণ কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমি যদি অলস হয়ে কর্মবিমুখ হয়ে থাকি, আমাকে দেখে সকলে তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে, উচ্ছন্নে যাবে সর্বসৃষ্টি। তাই আমি নিরবচ্ছিন্ন কর্ম করে যাচ্ছি। একমুহূর্ত আমার তন্দ্রা নেই বিরতি-বিচ্যুতি নেই। চেয়ে দেখ আগুন হয়ে তাপ দিচ্ছি, জল হয়ে শীতলতা। মাটি হয়ে শস্য, সমীরণ হয়ে প্রাণস্পন্দ। সমস্ত জগতের চক্ষু যে সূর্য সেই সূর্য হয়ে বিতরণ করছি দীধিতি। কর্মবলেই ইন্দ্র দেবরাজ্য অধিকার করেছিল, বৃহস্পতি হতে পেরেছিল দেবাচার্য। মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ তাও আমারই বিভূতি। আমারই প্রেরণায় সকলের কর্ম। আমিই অপ্রমেয় মহাবাহু।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণও অন্তর্হিত হয়েছেন। দ্বারকা থেকে হস্তিনায় ফিরছে অর্জুন। রাস্তায় ডাকাতের দল লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণ করল। অমর্ষপরবশ অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে উদ্যত হল। সে কি! গাণ্ডীব যে তোলা যাচ্ছেনা। তার বাহু যে নির্বল। বহু কষ্টে ধনুতে জ্যা আরোপ করল। কিন্তু সে কি, অস্ত্রের কথা যে মনেও আসছেনা। বল মেধা বুদ্ধি সব যে একসঙ্গে তিরোহিত হল। সামান্য দস্যুকর্তৃক পরাস্ত হল অর্জুন। কোনোদিন পরাজয় কাকে বলে যে জানেনি তার আজ এ কি দশা! রহস্য কি বুঝতে দেরি হলনা। শক্তি পার্থের নয়, শক্তি পার্থসারথির। যেহেতু কৃষ্ণ নেই অর্জুন নিষ্পৌরুষ।

গিরিগোবর্ধনের দিকে অগ্রসর হল স্বামীজি। পর্বত পরিক্রমা করছে, প্রতিজ্ঞা করল, আজ কিছুতেই ভিক্ষে করব না। যদি এমনি জোটে তো জুটবে নইলে নিরাহার থাকব। অনশনে প্রাণ বিসর্জন দেব। কী কেবল পরের দুয়ারে ধাওয়া করিয়ে বেড়াচ্ছ, যদি তোমার ডাকেই বেরিয়ে থাকি তবে তুমিই নিজের হাতে খাবার জুটিয়ে দেবে। তোমার করুণা চাইতে হবে কেন, তোমার করুণা নিজের থেকেই প্রতিমূর্ত হবে। আজ এ পরীক্ষা আমার নয়, এ পরীক্ষা তোমার। প্রার্থনা করে করুণা নেব না, তোমার করুণাই আমার প্রার্থনাকে ডেকে নেবে। ত্রাণ করবে লজ্জা থেকে।

মধ্যাহ্ন খরতর হয়ে উঠল। জঠরে দুঃসহ ক্ষুধা, দুই পায়ে গুরুভার ক্লান্তি। তবুও থামছেনা, পিছনে তাকাচ্ছেনা স্বামীজি, অপ্রতিবারণীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দুপাশে গৃহস্থের বাড়ি পড়ছে তবু কারু দুয়ারে গিয়ে হাত পাতছেনা। চলব আর দেখব। দেখব তিনিও আমার সঙ্গে চলছেন কিনা,

আমাকেও দেখছেন কিনা নির্নিমেষে। পথের ধারে যখন মুখ থুবড়ে পড়ব দেখব তিনি তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছেন কিনা। তাঁর কৃপা খাদ্যরূপে না আসুক আসবে মৃত্যুরূপে। সফলমনোরথ হবই হব। হয় খাব নয় পাব। হয় ধরব নয় মরব।

তারপর আবার মুষলবর্ষণ বৃষ্টি নামল। না, বৃক্ষতলেও আশ্রয় নেবনা। এই পথই আমার পাথেয়, বিদ্যুৎবিদীর্ণ মুক্ত আকাশই আমার আশ্রয়। আমি থামবনা, আমি নামবনা। আমাকে দেখতে দাওই না এ আকাশ থেকে বজ্র ছাড়া আর কিছু ঝরে কিনা, এ পথের শেষে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আছে কিনা পরিতৃপ্তি !

বৃষ্টি থামতেই শোনা গেল, কে একজন দূর থেকে তাকে ডাকছে।

স্বামীজি ফিরেও তাকালনা, একাগ্রবেগে সামনে চলতে লাগল।

'শুনছেন ? শুনুন—' পশ্চাৎবর্তী লোক ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ক্ষীণকণ্ঠ স্পষ্টতর হচ্ছে।

কে শোনে ! গ্রাহ্যও করলনা স্বামীজি। যে চলেছে তার কাছে পশ্চাৎ মিথ্যা, পশ্চাৎ মৃত।

'শুনুন, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

স্বামীজি এবার ছুটতে আরম্ভ করল। এ কি ছলনা না প্রহসন ? কান্তারে-প্রান্তরে ভোজ্যবস্তু ? এ নিশ্চয়ই রাত্রি না হতেই নিশির ডাক। হয়তো বা প্রচ্ছন্ন প্রলোভনের আর্তনাদ। স্বামীজি ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভুলেও একবার তাকালনা পিছন দিকে। কিন্তু এ ছলনা নয়, প্রহসন নয়। এ অঘটনকারিণী কৃপা।

পিছনের লোকও ছুটতে লাগল পিছু পিছু। দু-দশ রশি নয় প্রায় এক মাইল। স্বামীজি যত ছোটে পিছনের লোকও তত দৌড়ায়। শেষকালে প্রায় এক মাইলের মাথায় পিছনের লোক স্বামীজিকে ধরে ফেলল। বললে, 'এই দেখুন, আপনার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি।'

লোকটির হাতে খাবারের পুঁটলি। স্বামীজি নিল হাত পেতে। দুই চোখ ফেটে নিরর্গল অশ্রু ঝরতে লাগল। লোকটির কোন পরিচয় জানতে চাইলনা। সে ঈশ্বরের বার্তাবহ। ঈশ্বরের কৃপার প্রতিমূর্তি।

স্বামীজিকে খাইয়ে লোকটিও চলে গেল নীরবে। অরণ্যে না লোকালয়ে, কে বলবে তার ঠিকানা। কৃপার ঠিকানা যত্রতত্র। শূন্যে মরুভূমিতে পাতালের অন্ধকারে। আমি আছি এটুকু বোঝাবার জন্যেই ঈশ্বরের কৃপা। আর তুমি যে আছ এটুকু বোঝাবার জন্যেই আমার ভক্তি।

গোবর্ধন থেকে স্বামীজি চলে এল রাধাকুণ্ডে। একখণ্ড কৌপীনই তখন একমাত্র পরিধেয়। নদীতে নির্জনে স্নান করছে স্বামীজি, কৌপীনখানা পাড়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে। স্নান করতে-করতে হঠাৎ নজরে পড়ল কৌপীন নেই। ইতিউতি খুঁজতে লাগল স্বামীজি, কোথায় কৌপীন ! দেখলে সেই কৌপীন

বৃক্ষপরে এক শাখামৃগের হাতে। হাত তুলে স্বামীজি প্রার্থনা করল কিন্তু বানর তা গ্রাহ্যও করল না। ভীষণ রাগ হল স্বামীজির, বানরের উপর নয় রাধিকার উপর, যিনি এই কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁর রাজত্বে এই অবিচার! আমি গভীর অরণ্যগহ্বরে প্রবেশ করব ও অনশনে মরব তিলে তিলে। এই দেহ আর রাখবনা।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, কোত্থেকে কে একটি লোক এসে হাজির। হাতে তার একখানি গেরুয়া কাপড় আর কিছু খাবার। কিছু জিগগেস করলনা স্বামীজি। যেন জিগগেস করবার কোনো প্রয়োজনও নেই। নিল সব হাত বাড়িয়ে। জঙ্গল পেরিয়ে এল আবার সেই নদীর ধারে। দেখল যেখানে তার কৌপীনটি শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সেইখানেই কৌপীনটি পড়ে আছে।

বলো জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

'বিপদে প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজের অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপার দয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করিবেন।'

হরিদ্বারের পথে হাতরাস রেল স্টেশনে এসে উঠেছে স্বামীজি। ট্রেনে করে নয় পায়ে হেঁটে। স্টেশনের এককোণে মাটির উপর বসে পড়েছে। অনাহার ও ক্লান্তির শুষ্কতা সারা গায়ে। বৃহদক্ষরে লেখা এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার শরৎ গুপ্তের নজরে পড়ল। কে এই সৌম্যসুন্দর উদারদর্শন যুবক সন্ন্যাসী! এত ঔজ্জ্বল্য এত পবিত্রতা তো কোথাও দেখিনি এর আগে!

শরৎ গুপ্ত জৌনপুরী মুসলমানদের সঙ্গে মিশে তাদেরই রীতিনীতি বেশি রপ্ত করেছে। মাতৃভাষা বাঙলার চেয়ে উর্দুই তার বেশি আসে, কিন্তু রক্তের সংস্কার যাবে কোথায়? সন্ন্যাসী দেখেই সমস্ত মন সেবাশ্রদ্ধায় উথলে উঠল। তাড়াতাড়ি স্বামীজির কাছে এসে শরৎ জিগগেস করলে, 'কিছু মনে করবেন না। স্বামীজি, আপনি কি ক্ষুধার্ত?'

কণ্ঠস্বরে অপার আন্তরিকতা। অমেয় মাধুর্য।

স্বামীজি বললে, 'তাই তো মনে হচ্ছে। ক্ষুধাই তো চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে।'

'যদি আমার চৈতন্যকে একটু জাগান।' প্রাণঢালা প্রীতির কণ্ঠে শরৎ জিগগেস করল, 'আমার কোয়ার্টারে একটু যাবেন?'

হাসিমুখে স্বামীজি উঠে পড়ল: কি খেতে দেবে?

শরৎ একটি পার্শি বয়েত আবৃত্তি করল: 'হে প্রিয় তুমি আমার ঘরে এসেছ। সবচেয়ে সুস্বাদু ভোজ্য তোমাকে পরিবেশন করব। সুস্বাদু ভোজ্য আমার

হৃদয়ের মাংস দিয়ে তৈরি।'

স্বামীজি শরতের আতিথ্য নিল। আকাশের মত উন্মুক্ত হৃদয়ের আতিথ্য। ক্ষণে-ক্ষণে স্বামীজির চক্ষুদুটিই দেখতে লাগল শরৎ। ফুল্ল ইন্দীবরের মত চক্ষু। যেমন প্রদীপ্তভাস্বর তেমনি যেন আবার ললিতমধুর। নির্মলজ্ঞানচক্ষু, আবার কোমলপ্রেমনেত্র। একদিকে বিদ্যুৎ আরেকদিকে নীহার। সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা সূর্য আবার সর্বপ্রেমমোহনাত্মা সুধাংশু। কত দিন কিছু খায়নি। মৃতকল্প হয়েছিল এতদিন। আজ খেল পেট পুরে। জঠরবাসী কাঠের দেবতা আহুতি পেল।

শরৎ বললে, 'আমাকে কিছু বলুন।'

'কি আর বলব, একটা গান গেয়ে শোনাই।' স্বামীজি গান ধরল। বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সেই যে বলেছিল সুন্দরকে সেই গান। 'যদি বিদ্যাকে পেতে চাও তাহলে চাঁদমুখে ছাই মাখো, নইলে কেটে পড়।'

যেন ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল শরৎ। যদি ঈশ্বরকে পেতে চাও ত্যাগী হও, বৈরাগী হও। শরৎ অন্তঃপুরে চলে গেল। তারপর স্বামীজির কাছে বৈঠকখানায় যখন ফিরে এল তখন তার গায়ে আর সরকারী পোশাক নেই, পরনে সামান্য কাপড়—আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য, মুখে ছাই মাখা।

'এ কি, এ কী করেছ?' স্বামীজি চমকে উঠল।

'ঠিকই করেছি। আপনি যদি বলেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তাহলে সব ছেড়ে-ছুড়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

স্বামীজি আনন্দে উছলে উঠল: 'কিন্তু, জীবনের ঘোর বর্ষাবাদল কি কেটে গেছে এরই মধ্যে, এসেছে কি শরতের শেফালি লগ্ন!'

হাতরাসে ব্রজেনের সঙ্গে দেখা। কলকাতায় থাকতে চেনা, ব্রজেন হাত বাড়িয়ে স্বামীজিকে ডেকে নিল তার বাড়িতে। সমস্ত বাঙালিমহল ভেঙে পড়ল। কত কি দলাদলি ছিল তাদের মধ্যে পালিয়ে গেল এক নিমিষে। যত সব সংকীর্ণ আলের বন্ধন ডুবে গেল ভাবের বন্যায় প্রেমের বন্যায়। সঙ্গীতসুধারসস্রোতে। লোক যত শোনে ততই তাদের আত্মার তৃষ্ণা বাড়ে। ঈশ্বরই তো একমাত্র প্রসঙ্গ যার কোথাও কোনো সমাপ্তির রেখা নেই, কোথাও ইতি নেই সে প্রেমপত্রে। যে বলে সে ক্লান্ত হয়না, যে শোনে তার কানে চিরঅতৃপ্তি লেগে থাকে।

কিন্তু এক জায়গায় বেশিক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকবে এ তো সন্ন্যাসীর ব্রত নয়। একজায়গায় আটকে থাকলেই তো মমতার শিকড় গজিয়ে যাবে। সুতরাং মায়াবন্ধন উচ্ছিন্ন করো। যে জল বয়ে চলে আর যে সাধু ঘুরে বেড়ায়, সে জল সে সাধুই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছ বেশি পবিত্র।

এক জায়গায় কি, এক বৃক্ষতলেও সনাতন গোস্বামী একদিনের বেশি বসেন নি। স্বামীজি চলবার জন্যে পা বাড়াল।

শরৎ বললে, 'দাঁড়ান।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আপনার সঙ্গে যাব।'

'পারবে যেতে?'

'পারব।'

'তবে তার আগে পরীক্ষা দাও।'

'কিসের পরীক্ষা?' শরৎ গুপ্ত তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

'একটা পাত্র নিয়ে এস। ভিক্ষে করো। সকলের সামনে মেলে ধরো সে ভিক্ষাপাত্র। পারবে?'

'পারব।'

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে স্টেশনের কুলিদের সামনে এসে দাঁড়াল শরৎ। কুলিরা তো স্তম্ভিত। না, আমি আর স্টেশন-মাস্টার নই, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই সঙ্গীসাথি। শুধু সঙ্গীসাথি নই, তোমাদেরই সেবক-পরিচারক।

'তবে চলো আমার সঙ্গে।' ডাক দিল স্বামীজি।

এ যেন অগাধস্পর্শ সমুদ্রের ডাক, অপারস্পর্শ আকাশের। শরৎ বললে, 'আমি প্রস্তুত।'

তবু এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বোধহয় স্বামীজি। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেই সহজে খুঁজে পাবে ঈশ্বরকে? কেন, ঘরের মধ্যে কি তিনি নেই? তিনি কি নেই তোমার নির্ধারিত কর্মের মধ্যে?'

'আছেন, জানি। সমস্তর মধ্যেই তিনি। তবু মন বড় উতলা হয়েছে।' শরৎ গুপ্ত স্বামীজির হাত চেপে ধরল। 'কিছুতেই আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারছি না।'

'এই কথা? বেশ তো, আমি বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাব।'

'না, না, আমি যাব। আমাকে নিয়ে চলুন। ঈশ্বর সর্বভূতে, এ কে না জানে! কিন্তু যেখানে আপনি সেখানে ঈশ্বর বেশি প্রজ্বলন্ত।'

তবে চলো হৃষিকেশ।

আলস্যে-বিলাসে সমৃদ্ধ জীবন, এখন এসে দাঁড়াল ক্লেশ ও কাঠিন্যের মধ্যে। সুখ-শান্তি আরাম-বিশ্রাম কে চায়, আমাকে লজ্জা দিও না, আমাকে এবার তোমার রণসজ্জায় সাজিয়ে দাও। আমাকে অক্লান্ত করো, অক্ষুণ্ণ করো। যা দুঃখের দ্বারাও দুর্লভ সেই দুরধিগম্যকে লাভ করার শক্তি অনুভব করতে দাও নিজের মধ্যে। যে পথ শানিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম সেই পথ দিয়ে নিয়ে চলো।

হিমালয়ের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শরৎ একদিন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ক্ষুধার অন্ন নেই, তৃষ্ণার জল নেই, কোথায় আর কতদূর নিয়ে যাবে? এই তোমার কোলেই এবার আশ্রয় নিই। জীবন পর্বতরুক্ষ, কিন্তু মৃত্যু সমুদ্রশীতল।

চোখ চেয়ে দেখল স্বামীজি তার মাথা কোলে নিয়ে বসেছে। শুষ্ক মুখে জল ঢেলে দিচ্ছে। দারুণ কঠিনের পাশে এ কে শ্যামলশীতল।

আরেকবার ঘোড়া থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ে যাচ্ছে শরৎ, নিচেই

তীক্ষস্রোতা পার্বতী নদী, কোত্থেকে স্বামীজি ছুটে এসে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরল, বাঁচিয়ে দিল শরৎকে। নিজের প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে তা হোক তবু যে আমাকে নির্ভর করে দুঃসহ দুঃখভারাক্রান্ত জীবন তুলে নিয়েছে তাকে আমি না ধরি তো কে ধরবে ?

ঘোর অসুখে পড়েছে শরৎ, উঠতে পারছে না। উঠতে পারলেও চলতে পারছেনা। তবু যেতে হবে এগিয়ে। যাব কি করে ? আমি আছি। দেখল পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীজি। আমি তোকে বয়ে নিয়ে যাব। শুধু তোকে ? তোর লোটা কম্বল জুতো ছাতা সমস্ত।

কাতর হয়ে চারিদিকে আঁধার দেখে মাঝে-মাঝে স্বামী সদানন্দ বলেছে বিবেকানন্দকে, 'স্বামীজি, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না তো ?'

'মূর্খ ! মনে নেই আমি তোমার জুতো পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছি !'

প্রেম—মূর্তিমান প্রেম। তাছাড়া আর কোন কথায় স্বামীজিকে প্রকাশ করা সম্ভব ?

'কর্ম, কর্ম, কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হে*—কর্ম, কর্ম, কর্ম, ইভন্ আনটু ডেথ। দুর্বলগুলোর কর্মবীর, মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্যে ভয় নেই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যারা দেবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি ? কার নাম—কিসের নাম ? কে নাম চায় ? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পেঁছাতে যদি নাম-ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যং, অহোভাগ্যং।' অখণ্ডানন্দকে আলমোড়া থেকে লিখছেন স্বামীজি : 'হৃদয়, হৃদয়ই শুধু জয়ী হয়ে থাকে, মস্তিষ্ক নয়। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান। প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারীশরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে।' এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলব না ? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য ! লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা। এরি নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি', স্বার্থ চলে গিয়েছে।'

বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দু'জনে, অকস্মাৎ, স্বামীজি থমকে দাঁড়াল।

'কি ?' চারিদিক চাইতে লাগল শরৎ।

'বাঘ।'

'বাঘ ? কোথায় ?'

'এই তোমার চোখের সামনে। বাঘের খাদ্যের ভুক্তাবশেষ।'

তাকিয়ে দেখল শরৎ, কখানা মানুষের হাড় পড়ে আছে। পাশে গেরুয়া কাপড়ের টুকরো।

'বুঝতে পাচ্ছ ? এক সন্ন্যাসীকে সাবড়ে দিয়েছে বাঘ।' বললে স্বামীজি।

'দিক।'

'আমাদের সে মিত্রটি কাছেকাছেই আছে।'

'থাকুক।'

'তোমার ভয় করছে না?'

'আপনি থাকতে আবার কিসের ভয়!'

হৃষীকেশে এসে দেহমন ঠাণ্ডা হল। একদিকে সফেনজলহাসিনী গঙ্গা, আরেকদিকে বীরসাধনারূঢ় হিমালয়। খুব ধ্যান আর প্রার্থনা লাগিয়ে দাও। ধ্যানের মূর্তি দৃঢ়স্তব্ধ হিমালয় আর প্রার্থনার মূর্তি কল্লোলকলভাষিণী জাহ্নবী।

কিন্তু কতদিন? শরৎ আবার অসুখে পড়ল। এবারের অসুখ আরো সাংঘাতিক। কেদার-বদরী পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রভু চোখ তুলে চাইলেন না। এই তো পরীক্ষা। এই তো সাধনসংগ্রামের প্রস্তুতি। ব্যর্থতাই তো সিদ্ধির বনিয়াদ। পরাজয়ই তো সাফল্যসৌধের স্তম্ভ। তবে আর কি। ফিরে চল হাতরাস। পুনর্মূষিকো ভব। হাতরাসে ফিরে এসে স্বামীজি শয্যা নিল। সেবা যে করবে সে সৌভাগ্যও শরতের হলনা, কেননা নিজেই যে শয্যাশায়ী। উপায়? তুমি আগের মতন হাতরাসে, আমি আগের মতন বরানগর।

বরানগর মঠে ফিরে এল স্বামীজি। যাবার আগে শরৎ বললে, 'বন্ধু, এই বিচ্ছেদ আর কতদিন?'

কয়েক মাস পরে সুস্থ হল শরৎ। গায়ে একটু জোর পেতেই চলল স্বামীজির কাছে, বরানগরে।

'এ কি, তুমি?'

'বিচ্ছেদ দুর্বিষহ। এবার একেবারে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছি। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, শেকড়সুদ্ধ বিষবৃক্ষ তুলে ফেলেছি উপড়ে। এখন রোগ হোক শোক হোক আর ফেরবার পথ নেই, আর ছাড়ব না আপনাকে।'

সন্ন্যাসে দীক্ষিত হল শরৎ গুপ্ত। নাম হল স্বামী সদানন্দ।

'অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা।' বলছে স্বামীজি : হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা, ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হল। আর, আচারবর্জিত হয়েও কেউ যদি আত্মদর্শন করতে পারে তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শংকরও বলেছেন, নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ? অতএব মূল কথা হচ্ছে অনুভূতি। তাই জানবি লক্ষ্য, মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে এইটিই জানবি উন্নতির কষ্টিপাথর। কামকাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখবি কমতি, সে যে মতের যে পথের লোক হোক না কেন, তার জানবি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জানবি আত্মানুভূতির দ্বার খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি জীবন বৃথা। এই

অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্রটাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল দিকি তাতে হল কি ? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা।'

বরানগরের মঠে প্রায় একবছর কাটিয়ে দিল স্বামীজি। এই একটা বছর তীব্রতর সাধন করল। এইবারের সাধন শুধু ঈশ্বরপ্রেমের নয়, দেশপ্রেমের। দেশই ঈশ্বর। দেশের মুক্তিই ঈশ্বরের উপাসনা।

'ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ মানুষই চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়ন-রহিত সভ্যতা ভাঙবার জন্যেই ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন। মনে করোনা আমরা দরিদ্র, অর্থ জগতে শক্তি নয়, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি।'

কিন্তু কলকাতার কাছে থাকাই মা-ভায়েদের দুঃখ দেখা। সেই দুঃখের প্রতিবিধানে নিজেকে উদ্যত করবার চেষ্টা করা। সেই তো আবার সেই মায়ার নাগপাশ, আবার সেই বন্ধনমোচনের সংগ্রাম।

কাশীতে প্রমদাদাসবাবুকে লিখছে স্বামীজি : 'আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। আমার মা-ভায়েদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখনো কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈত্রিক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈত্রিক বাটির অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর। কখনো কখনো কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ংকর। এবার তাঁহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইতে পারি আপনি আশীর্বাদ করুন।'

বিদায় ! বিদায় ! আবার বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি।

এবার প্রথমেই বৈদ্যনাথধাম।

২৮

হে ঈশ্বর, তুমি আমার সারথি হও।

বাসুদেব ঘুমিয়ে আছে পালঙ্কে। দুর্যোধন প্রথমে ঘরে ঢুকল। শয্যার শিয়রে প্রশস্ত আসন, সেখানেই সে বসল। পরে অর্জুন এসে বসল পায়ের কাছে। দুর্যোধনের ভঙ্গি গর্বারূঢ়, অর্জুনের বিনয়স্নিগ্ধ। চোখ চাইল বাসুদেব।

প্রথমেই দেখল অর্জুনকে। পরে দুর্যোধনকে। স্বাগত সম্ভাষণ করে জিগগেস করল, কেন এসেছ তোমরা ?

দুর্যোধন বললে, 'এ যুদ্ধে আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। আমাদের দু পক্ষের সঙ্গেই আপনার সমান সম্বন্ধ, সমান বন্ধুতা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমিই আগে এসেছি আপনার কাছে, সুতরাং আমার পক্ষেই আপনি আসবেন। যে প্রথম আসে সাধুরা তাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। আপনি সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সদাচার পালন করুন।'

'আপনি যে আগে এসেছেন তাতে সন্দেহ কি।' বললে শ্রীকৃষ্ণ। 'কিন্তু আগে আমি অর্জুনকে দেখেছি। সুতরাং আমি দু পক্ষকেই সাহায্য করব। কিন্তু যেহেতু অর্জুন বালক তাকেই আগে আমাকে বরণ করতে হবে। বালকই অগ্রবরেণ্য, সুতরাং তারই নির্বাচনে অগ্রাধিকার।'

দুর্যোধন বললে, 'তাই হোক।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে সম্বোধন করে বললে, 'এক পক্ষে থাকবে এক অর্বুদ গোপসৈন্য আরেক পক্ষে আমি। গোপসৈন্যরা সশস্ত্র, যুদ্ধব্রত, আর আমি নিরস্ত্র, ত্যক্তকর্ম। বলো, তুমি কাকে নেবে ?'

অর্জুন বললে, 'তোমাকে নেব।'

কি নীরন্ধ্র মূর্খ ! মনে মনে উৎফুল্ল হল দুর্যোধন। নারায়ণী সেনাতেই তার জয়বর্ধন, তার যশোবর্ধন। কৃষ্ণ যখন অস্ত্র ধারণ করবেনা তখন আর ভাবনা কি। নিরস্ত্র কৃষ্ণ মানেই বিজিত অর্জুন।

দুর্যোধন চলে গেলে অর্জুনকে জিগগেস করল বাসুদেব, 'আমি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এ জেনেও তুমি আমাকে নিলে কেন ?'

'তুমি আমার সারথি হবে বলে।'

'সারথি হব ?'

'যুদ্ধ আমিই করব, তুমি শুধু আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে। এ ছাড়া আর আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রার্থনা নেই। তুমি আমার এ অভিলাষ পূরণ করো, আমার সারথি হও।'

স্পর্ধিত প্রার্থনা। ক্ষাত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য হেয় কর্ম। অর্জুনের কি ঔদ্ধত্য, এমন অসম্ভব প্রার্থনা সে করতে পারে। অর্জুনই তো পারবে। অর্জুন যে ভক্ত। স্পর্ধিত প্রার্থনা তো একমাত্র ভক্তেরই অধিকার। ভগবানও তো একমাত্র ভক্তেরই।

'এ স্পর্ধা একমাত্র তোমাকেই সাজে।' সহাস্যমুখে বললে, শ্রীকৃষ্ণ, 'আমি তোমার সারথি হব।'

যুধিষ্ঠির খুশি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, 'যুদ্ধ না করুন, অগ্রভাগে তো থাকবেন। কৃষ্ণ যার অগ্রণী তাকে কে প্রতিরোধ করবে ?'

আমাকে অপ্রতিরোধ্য করো। তুমি আমার সারথি হও। আমার অগ্রনায়ক হও।

বৈদ্যনাথধামে এসে স্বামীজি তাকালো কাশীর দিকে। শুনতে পেল

এলাহাবাদে যোগানন্দের অসুখ। কি অসুখ? বসন্ত। পত্রপাঠ রওনা হল স্বামীজি। আগে রোগীসেবা পরে তীর্থসেবা। কদিনের অক্লান্ত সেবাযত্নে ভালো হয়ে উঠল যোগানন্দ। এখানেই কানে এল গাজীপুরের পওহারী বাবার কথা।

দেখা করতে গেলে পাব তাঁকে দেখতে? কে এই পওহারী বাবা?

কাশীর কাছে এক অখ্যাত গ্রামে তার জন্ম। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে খুড়ো, তিনিই তাকে প্রতিপালন করছেন। খুড়ো আজীবন ব্রহ্মচারী, রামানুজপন্থী। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। গাজীপুরের মাইল দুই উত্তরে এক টুকরো জমি আছে, তাতেই বসবাস করেন। নিজে বৈরাগী-বাউণ্ডুলে হোন, ভাইপোটা মানুষ হোক, দিগগজ হোক, এই তাঁর স্বপ্ন।

ব্যাকরণ আর ন্যায় অল্প কদিনেই আয়ত্ত করল ভাইপো। ক্রমে-ক্রমে আরো সব শব্দশাস্ত্র। এমন সময় হঠাৎ একদিন খুড়ো চোখ বুজলেন। চতুর্দিক আঁধার দেখল ভাইপো। যেন প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল দাঁড়িয়ে, শাদা একটা ফাঁক হয়ে গেল। সমস্ত পুঁথিপত্রকে মনে হল একটা ফাঁকি, শুধু কথার ঘোরপ্যাঁচ। যার উপর চিত্তের সমস্ত ভালোবাসা, সম্পূর্ণ নির্ভর, সে এমনি করে চলে গেলে কী অর্থ থাকে আর জীবনে। জীবনে এমন কি কিছুই নেই যা আমার এই শূন্যতা ভরে দিতে পারে, যা কোনোদিন শূন্য হয় না, যার কোনো পরিণাম নেই, যা অপরিবর্তনীয়!

আছে। কে যেন বললে অন্তস্তল থেকে। কোথায় সে, কী সে, পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল সে শোকার্ত যুবক। ঘুরতে ঘুরতে এল সে কাথিয়াওয়াড়। গিরনার পর্বতের চূড়ায় বসে প্রথম যোগসাধনার সে আস্বাদ পেল। নেমে এসে চলল সে কাশী। সেখানে গঙ্গাতীরে মিলল তার গুরু। নদীর উঁচু পাড়ে এক গর্ত খুঁড়ে সে সেখানে বাস করছে। দেখাদেখি পওহারীও এক গর্ত খুঁড়ল। আমিও তোমার মত থাকব এই মৃত্তিকার বিবরে।

নির্জন গুহাতেই যোগাভ্যাসের সুবিধে। শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, আবহাওয়ার অদল-বদল নেই। মনকে বিচলিত করতে পারে মন ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মন কতদিন যন্ত্রণা দেবে? নিশ্চেষ্ট করে-করে তাকে নিশ্চল করে দেব।

সেখানে অদ্বৈতবাদ শিখল পওহারী। তারপর ছাড়া পেয়ে বেরুল ভ্রমণে। চার ধাম ঘুরে এল। ভারতবর্ষের চারকোণে চার ধাম। উত্তরে কেদারবদরী, পূবে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্বারকা। ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে সাধন। শ্রীচৈতন্যের বাংলা দেশেও কাটিয়ে গেল অনেকদিন। কাটিয়ে গেল শঙ্করাচার্যের দাক্ষিণাত্যে। তারপর ফিরে এল গাজীপুর জন্মভূমিতে। সমস্ত মুখে ব্রহ্মোপলব্ধির বিভা। ভূমিতে থেকে ভূমাকে যে দেখেছে তারই দুচোখে জ্বলতে পারে এই রত্নদীপ।

নদীতীরে ছোট একটা গর্ত খনন করলে। তাতেই বাস করতে লাগল। অন্ততঃ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। মধ্যরাত্রে নদী সাঁতরে ওপারে যায়, অরেকরকম নির্জনে সাধন-ভজন করে ভোর হবার আগেই ফিরে আসে। প্রেমিক-প্রভু

রামচন্দ্রের সেবা আর নিজের হাতে রেঁধে অতিথি সাধুদের খাওয়ানো এই তার দুই ব্রত। নিজের খাওয়ার মধ্যে একমুঠো নিম পাতা আর কটা লঙ্কা। তাও বন্ধ হল আস্তে-আস্তে। এখন শুধু বাতাস খেয়ে থাকে। তাই তার নাম হল পওহারী, বায়ুভুক।

কিন্তু কি করে দেখা হয় তার সঙ্গে। প্রায় সর্বক্ষণই সে মাটির নিচে বসে থাকে। গুহায় বসে থাকলে লোকের উপকার হবে কি করে?

লোকের উপকার করতে আমার কি মাথাব্যথা? যাঁর লোক তিনি করবেন। তাছাড়া, তোমরা কি বলতে চাও শুধু স্থূল দেহেই উপকার সম্ভব? একটি মন আরেকটি মনকে, শতশত মনকে, সাহায্য করতে পারে সঞ্চালিত করতে পারে এ তোমরা সম্ভব বলে মানোনা?

বাল্যসখা সতীশ মুখুজ্জের বাড়িতে আছে স্বামীজি।

চিঠি লিখছে কলকাতায়, বলরাম বসুকে: 'পওহারী বাবার বাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজি বাঙলোর মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড়-বড় ঘর, চিমনি ইত্যাদি। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজির সহিত দেখা হইল তো হইল, নহিলে এই পর্যন্ত।'

গোখরো সাপে কামড়েছে বাবাজিকে। সবাই ভাবল মারা গিয়েছে বুঝি। কয়েক ঘণ্টা পর চোখ চাইল পওহারী। কি ব্যাপার?

'পাহন দেওতা আয়া। আমার প্রিয়তমের নিকট থেকে দূতরূপে এসেছিল ঐ গোখরো।'

যেমন যত্নে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করে তেমনি যত্নে বাসন মাজে। প্রত্যেক কার্জটিই তার পূজা। উপায়ই উপেয়। উপায়ই সিদ্ধি। যন সাধন তন সিদ্ধি।

'বাবাজির সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ির বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানসমন্বিত এবং চিমনিদ্বয়শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই।' আবার চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন। কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা করিব। রবিবার কাশীধাম যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজি দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে।'

গুরুকা ঘরমে গো য্যায়সা পড়া রহনা। প্রভুর দ্বারে পড়ে থাকাই আসল কাজ। পড়ে থাকতে পারলে প্রভুর দয়া হবেই হবে। তুমি যে তোমার দুয়ার ধরে পড়ে থাকতে দিয়েছ এই তো তোমার অরুপণ দয়া। আর কিছু করে উঠতে না পারি পড়ে থাকতে পারব। আমার পড়ে থাকাই ধরে থাকা।

কতগুলি লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। একটা লোক তাদের সঙ্গ নিল। কোথায়

যাচ্ছ? ওপার। লোকগুলির সঙ্গে সেও নদী পার হল। ওপারে গিয়ে দেখে আবার কতগুলি লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। কোথায় চলেছ? ওপার। আবার মিলল যাত্রীদল, আবার তাদের সঙ্গে চলে গেল ওপার। তোমরা আবার কারা? আমরা ওপার চলেছি। আবার তাদের সঙ্গ নিল। কোনটা যে আসল পার স্থির করতে না পেরে এপার ওপার করতে লাগল। তখন হঠাৎ নদীতীরে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। লোকটা তখন তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহারাজ, পার কোথায়? কি করে পার পাব?

সাধু বললে, একধারে বসে পড়। যেখানে বসবে সেই তোমার পার।

পার কহে তো ওপার
ওপার কহে তো পার।
বইঠ কিনারা পাকড় রহ
যো পার সোই ওপার।

২৯

আফিম আপিসের বড়বাবু গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে এসে উঠেছে স্বামীজি।

দেখব যখন মনে করেছি দেখে যাবই। পওহারী বাবার আশ্রমের কাছাকাছি এক লেবুর বাগান। সেখানেই দিনরাত পায়চারি করে, আর থেকে থেকে বাবাজির দরজায় গিয়ে বসে থাকে। ফিরবনা বাড়ি, খাবনা ভাত-জল, লেবুর রস খেয়ে থাকব।

বাবাজি দর্শন দিলেন। দর্শন মানে চাক্ষুষ দর্শন নয়। দরজার ওপাশ থেকে গভীর মধুর সম্ভাষণ।

বলরাম বসুকে চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ: 'বহু ভাগ্যবলে বাবাজির সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বাবাজির ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিব না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা চক্ষে না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।'

এমন মিষ্টি ডাক মিষ্টি কথা কোনোদিন শোনেনি স্বামীজি।

'তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?' স্বামীজি জিগগেস করল।

'দাস ক্যা জানে?'

একদিন দরজা খুলে দিল পওহারী। প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের দেখা হল। যে প্রশ্ন সেই উত্তর।

চিঠি লিখছে স্বামীজি : 'বাবাজি আচার বৈষ্ণব, যোগ ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্তি বললেই হয়। তাঁহার কুটির চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন। যখনই উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহেন। কি খান কেহই জানেনা। মধ্যে একবার পাঁচবৎসর একবারও গর্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে শরীর ছাড়িয়াছেন, কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। কথা অভূতপূর্ব মিষ্ট, কিন্তু যেন আগুন বাহির হয়। আমাকে বলেন, আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এ প্রকার কখন কহেন না। আমি আশায়-আশায় আছি। আপনার ইচ্ছা থাকে পত্রপাঠ চলিয়া আসুন। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্মকান্ডও করেন, পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত হোম হয়। সে সময় গর্তে যাইবেন না নিশ্চিত। আপনি চলিয়া আসুন। ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এ প্রকার মহাপুরুষের জন্যে কোন কষ্টই বৃথা হইবেনা।'

কোমরে বাত হয়েছে স্বামীজির। চলতে পারে না। দু'দিন যেতে পারেনি আশ্রমে। পওহারী বাবা লোক পাঠিয়েছে, কেন আসছনা? তোমাকে না দেখে মন বড় উচাটন। এবার একেবারে আশ্রমের ভিতরে স্বামীজিকে টেনে আনল পওহারী। একেবারে গুহার মধ্যে। এ কি! গুহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পট।

'এ কে?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।'

পওহারীর উপরে শ্রদ্ধা আর অনুরাগ বেড়ে গেল স্বামীজির। স্বামীজির আকাঙ্ক্ষা হল পওহারীর কাছ থেকে দীক্ষা নিই। অন্ততঃ তাঁর কাছ থেকে হঠযোগের ক্রিয়াটা শিখে নিলে যে কোমরের বাত সেরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

'আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চাই।' বললে স্বামীজি।

'আমার কাছ থেকে? তুমি?'

'হ্যাঁ, আপনার মত জানতে চাই যোগমার্গের রহস্য। দীর্ঘকাল একাসনে বসে থাকার সমাধি।'

পওহারী হাসল, বললে, 'খুব ভালো কথা কিন্তু লগ্ন আসুক।'

স্বামীজির সংকল্পের কথা শুনতে পেল বরানগর। তারা প্রতিবাদ করে উঠল, রামকৃষ্ণভক্তের আবার গুরু কে! আবার কিসের দীক্ষা!

গাজীপুর থেকে অখণ্ডানন্দকে চিঠি লিখছে স্বামীজি : 'এখানে পওহারীজি নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হননা—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত আছে তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস-মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা কেবল বদ্‌খত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা জিমনাস্টিকস। এই জন্য এই অদ্ভুত

রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাংলো ঘর আছে, ঐ ঘরে থাকিব। উক্ত বাগান বাবাজির কুটিরের অতি নিকট। ঐখানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্বতারোহণ-সকল্প ত্যাগ করিলাম। কোমরে দু'মাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে ওঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজি কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক। আমার মূলমন্ত্র এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরানগরের অনেকে মনে করে যে গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদগুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।'

দীক্ষার দিন এবার তবে ঠিক করতে যেতে হয়। বাবাজির গুহার দিকে যাবে বলে যাত্রা করেছে স্বামীজি, এ কি, পা যেন কে টেনে ধরেছে! সমস্ত শরীর ভার, পাথর হয়ে উঠেছে। কোমরের বাত পায়ে নামল নাকি? তবু জোর করে চলতে চাইল স্বামীজি। সাধ্য কি পায়ের শৃংখল মুক্ত করে। নিশ্চয়ই এ এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে তাকে নিয়তি। এ পরীক্ষায় সে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে। শরীর অপটু হোক কিন্তু মন সক্ষমসমর্থ। শরীরকে বন্দী করতে পারো কিন্তু মন সমস্ত বন্ধনবেষ্টনের ওপার।

দীক্ষার দিন ঠিক করে পাঠালেন বাবাজি।

আগের রাত্রে লেবুবাগানের ছোট ঘরটিতে একটি খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে বিবেকানন্দ, দেখতে পেল ঘর আলো করে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কে? ধড়মড় করে উঠে বসল স্বামীজি। স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি। আয়ত প্রশান্ত চোখ দুটিতে কোমল বিষণ্ণতা। চিনতে কি আর ভুল হয়? শুধু বরানগরের মঠে নয়, গাজীপুরে বাবাজির গুহায় নয়, প্রতি ঘরে-ঘরে যাঁর একদিন পট পুজো হবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ। চোখ দুটি স্বামীজির চোখের উপর ফেলল সেই মূর্তি। সেই চোখ দুটি জলভরা, স্নেহভরা, ব্যথাভরা। দুহাতে মুখ ঢাকল বিবেকানন্দ। আমি কি অবিশ্বাসী, আমি কি অকৃতজ্ঞ!

মূর্তি আর নেই।

তবে কি শুধু ছায়া? শুধু একটা মনের ভেলকি?

'পওহারীজির সঙ্গে আর দেখা করিতে যাইতে পারি নাই', আবার চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ: 'কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন! কিন্তু এখন দেখিতেছি, উল্টা সমঝলি রাম। কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, এখন তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধহয় ইনি এখনও পূর্ণ হন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবন্ধ থাকিতে পারেনা, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উত্তেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি। শীঘ্রই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন। বাবাজি ছাড়েননা, আবার গগনবাবুও

ছাড়েননা। বাবাজির তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপড়হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ। অতএব আমিও প্রস্থান।'

পওহারী বাবা খবর পাঠালেন, দীক্ষার দিন নতুন করে ধার্য করা হয়েছে। এবার যেন আসতে ভুল না হয় স্বামীজির। না, এবার ঠিক যাবে। সেদিন রাতে যে মূর্তি দেখেছিল ঘরের মধ্যে সে শুধু তার চিন্তাজ্বরজীর্ণ মনের রচনা। বাবাজির যখন এত আগ্রহ তখন একবার নেওয়া যাক তাঁর উপলব্ধির সংস্পর্শ। লোক মারফৎ জানিয়ে দিল তার সমর্থন। যাবে নির্ধারিত সময়ে। এবারের লগ্ন বিফল হতে দেবে না।

কিন্তু আবার আগের রাত্রে সেই আগেকার রাত্রির মূর্তি। আবার এসে দাঁড়িয়েছেন ছলছল চোখে। মুখে সেই বিষাদমাখানো মমতা, সেই করুণাবিধৌত বাৎসল্য। তুই আমাকে ছেড়ে যাবি? আমি তোর কেউ নই? তুমি? তুমি-ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি-ছাড়া আমি নক্ষত্রহীন দ্যুলোক, বায়ুহীন আকাশ, শস্যশূন্য পৃথিবী, সংস্কারহীন বাক্য, সলিলহীন তরঙ্গিণী, হৃতসিংহ গিরিকন্দর। তোমার কমলদলকোমল পাণিতল দাও আমার করতলে। আমাকে তুমি ছেড়োনা। শুধু একরাত্রি নয়, পর-পর পাঁচ রাত্রি দেখা দিলেন ঠাকুর। দিগন্তে অস্ত হল দীক্ষার দিন।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইবনা। আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে। যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।' আবার চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই, আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতাও কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

সবই পূর্ণ। পূর্ণের থেকে পূর্ণ চলে গেলেও পূর্ণ।

গাজীপুর থেকে আবার চলে এল বারাণসী।

৩০

কাশীতে এসে খবর পেল বলরাম বসু দেহ রেখেছে।

শোকে ভেঙে পড়ল স্বামীজি। ঠাকুরের গৃহীভক্তদের প্রথম লাইনের একজন এই বলরাম। কত দিনের কত স্মৃতি দিয়ে শ্রীমন্ত সেই মূর্তি। যার বাড়ি ছিল

ছাড়েননা। বাবাজির তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপড়হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ। অতএব আমিও প্রস্থান।'

পওহারী বাবা খবর পাঠালেন, দীক্ষার দিন নতুন করে ধার্য করা হয়েছে। এবার যেন আসতে ভুল না হয় স্বামীজির। না, এবার ঠিক যাবে। সেদিন রাতে যে মূর্তি দেখেছিল ঘরের মধ্যে সে শুধু তার চিন্তাজ্বরজীর্ণ মনের রচনা। বাবাজির যখন এত আগ্রহ তখন একবার নেওয়া যাক তাঁর উপলব্ধির সংস্পর্শ। লোক মারফৎ জানিয়ে দিল তার সমর্থন। যাবে নির্ধারিত সময়ে। এবারের লগ্ন বিফল হতে দেবে না।

কিন্তু আবার আগের রাত্রে সেই আগেকার রাত্রির মূর্তি। আবার এসে দাঁড়িয়েছেন ছলছল চোখে। মুখে সেই বিষাদমাখানো মমতা, সেই করুণাবিধৌত বাৎসল্য। তুই আমাকে ছেড়ে যাবি? আমি তোর কেউ নই? তুমি? তুমি-ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি-ছাড়া আমি নক্ষত্রহীন দ্যুলোক, বায়ুহীন আকাশ, শস্যশূন্য পৃথিবী, সংস্কারহীন বাক্য, সলিলহীন তরঙ্গিণী, হৃতসিংহ গিরিকন্দর। তোমার কমলদলকোমল পাণিতল দাও আমার করতলে। আমাকে তুমি ছেড়োনা। শুধু একরাত্রি নয়, পর-পর পাঁচ রাত্রি দেখা দিলেন ঠাকুর। দিগন্তে অস্ত হল দীক্ষার দিন।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইবনা। আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে। যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।' আবার চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই, আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতাও কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

সবই পূর্ণ। পূর্ণের থেকে পূর্ণ চলে গেলেও পূর্ণ।

গাজীপুর থেকে আবার চলে এল বারাণসী।

৩০

কাশীতে এসে খবর পেল বলরাম বসু দেহ রেখেছে।

শোকে ভেঙে পড়ল স্বামীজি। ঠাকুরের গৃহীভক্তদের প্রথম লাইনের একজন এই বলরাম। কত দিনের কত স্মৃতি দিয়ে শ্রীমন্ত সেই মূর্তি। যার বাড়ি ছিল

ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা।' যার বাড়ির অন্ন ঠাকুরের কাছেও শুদ্ধান্ন। ঠাকুরের রসদদারদের একজন।

প্রমদাবাবু প্রমাদ গুনলেন। বললেন, 'আপনি এমন একজন বৈদান্তিক, আপনার মৃত্যুশোক!'

'বলবেন না ও কথা। সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয় খুইয়ে এসেছি? চোখের জল কি ধোঁয়া হয়ে গিয়েছে?'

বাড়ির কর্তা হয়ে দাসের মত থাকতেন, কত বড় ভক্ত এই বলরাম। অর্থ সঞ্চয় করতেন সাধুসেবার জন্যে। ছোট একখানি শতরঞ্জি পেতে শুচ্ছেন, লাটু বললে, আপনার এত পয়সা, আপনার এই হাল কেন? বলরাম হেসে বললে, মাটির দেহ মাটিতে মিশবে, কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগাব।

যার জন্যে একবার শ্রীমার উপরেও বিরক্ত হয়েছিলেন ঠাকুর। বলরামের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে ঠাকুর বলতেন, অষ্টসখীর প্রধানা। তার ভারি অসুখ করেছে। মাকে ঠাকুর বললেন, একবার গিয়ে দেখে এস। কিন্তু মা কি করে যাবেন, গাড়ি কই, পালকি-ডুলি কই? ঠাকুর বললেন, 'কেন, হেঁটে যাবে। আমার বলরামের সংসার ভেঙে যাচ্ছে আর তুমি কিনা গাড়ি পেলেনা বলে যাবেনা?'

না, যাচ্ছি। গাড়ি পাওয়া গিয়েছে ঠিক। পায়ে হাঁটবার দরকার নেই।

'এই সেই বলরাম যার বাড়িতেই ঠাকুরের পূতাস্থিভস্ম রাখা হয়েছে। বলরাম চলে গেল, কে আর তবে তা আলগাবে সযত্নে? কোথাও কি একটুকরো জমি পাওয়া যাবেনা যেখানে সেই অস্থিভস্মের সমাধি হতে পারে?'

কলকাতায় ফিরে এল স্বামীজি। কাশীতে প্রমদা দাসকে চিঠি লিখলে: 'যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাকছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী ইউনিভার্সিটি-মেন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোনো স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে? সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক রামকৃষ্ণের দুই গৃহস্থ শিষ্যের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য এক হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্যরাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায় কিছুই স্থিরতা নাই। (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।'

ঠাকুরের আরেকজন রসদদার এই সুরেন বা সুরেশ মিত্তির। ঠাকুরের

কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া যুগিয়েছে, যার টাকাতেই বরানগর মঠের সূত্রপাত। শুধু তাই নয় যার হাতেই ঠাকুরের জন্মোৎসবের প্রবর্তন। ঠাকুরের ভক্তদের জন্যে ব্যয় করতে না পারলেই যার অভিমানের পর্বত।

'মশাই, আমাদের আর কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন ?' সেদিন ঠাকুরকে বললে সুরেন মিত্তির।

ঠাকুর তো অবাক।

'মশাই, আমরা পাপী এ কে না জানে। কিন্তু আপনার সংস্পর্শে এসে আমাদের কী উন্নতি হল ? আমরা কোন ছাই সাধু হলাম !'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'আমরা আপনার মত মহাপুরুষের কাছে সর্বদা আসছি, হরি বলে নৃত্য করছি, ভাবে গদগদ হচ্ছি, লোকে ভাবছে খুব সাধু হয়েছি আমরা, কিন্তু যদি হৃদয়কে জিগগেস করা যায় সে বলবে এক বিন্দুও সাধুর বাতাস পাইনি। যে সব অসৎ সংস্কার ছিল সব ঠিক-ঠিক বজায় আছে। এ আমাদের কি দশা ! বরং, লাভের মধ্যে, শঠতা শিখলাম। আগে এমন করে কাঁদতে পারতাম না, এখন বেশ কাঁদছি।'

'তোমাকে কাঁদতে কে বলেছে, তুমি আনন্দে থাকো।'

'আনন্দে থাকব ?'

'হ্যাঁ, আনন্দে থাকো। তোমাকে সাধু সাজতে হবেনা। তোমার আনন্দই তোমাকে সাধু করবে।'

'আনন্দে থাকবার উপায় কি ?'

'এক উপায়। শুধু মা-মা বলো, মাকে ডাকো। যেখানে খুশি সেখানে যাও, শুধু আনন্দময়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

সুরেশ আরেক দিন এসেছে ঠাকুরের কাছে। মনে সুখ নেই।

'কি হল ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'কিছুই হচ্ছেনা। না জপ না ধ্যান না কিছু।'

'কি করো তবে ?'

'মা-মা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'বেশ, তা হলেই হল।'

সেই সহজ পথের পন্থী সুরেশ মিত্তিরও চলে গেল।

'রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। লোক না পোক !' শশী মহারাজাকে লিখছে স্বামীজি : 'শুধু তোমাদের ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে। আর কখনো কপটতার দিক মাড়াবে না। অনুষ্ঠানী পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন্ কালে ? আই ডু নট পোজ য়্যাজ ওয়ান। বাঙ্গালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি ? যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলেনা আবার লম্বা কথা ! রাম ! রাম ! আহার গেঁড়িগুগলি, পান পুকুরজল, ভোজনপাত্র

ছেঁড়া কলাপাতা, শয্যা ভিজে মাটির মেঝে, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায়! তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দ্যাখ।'

বরানগর মঠে দু'মাস কাটিয়ে স্বামীজি ঠিক করল আবার নিরুদ্দেশ হব। এবার আর ফিরবনা। চলে যাব হিমালয়। অখণ্ডানন্দ সদ্য ফিরেছে কাশ্মীর থেকে। তার কাছে যত রাজ্যের রোমহর্ষ গল্প শুনছে স্বামীজি। কাশ্মীরের কথা, তিব্বতের কথা, কেদারবদরীর কথা। এবার তবে চলো হিমালয়—মৌন, ধ্যান ও ও যোগের লীলালোকে।

মঠের খরচ না হয় এখন গিরিশ ঘোষ চালাচ্ছে, কিন্তু হিমালয়ে যাবার ভাড়া কোথায়? সারদানন্দ তখন আলমোড়ায়, তাকে চিঠি লিখছে স্বামীজি।

'আমি শীঘ্রই, অর্থাৎ ভাড়ার টাকা যোগাড় হলেই আলমোড়া যাইবার সংকল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা। গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এবার একেবারে উপরে যাইতেছি। তোমাদের ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল তোমরা সেইটেই কর নাই। অর্থাৎ, কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। মুর্খ ভবঘুরে হইও না, বীরের মত অগ্রসর হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও।'

ঘুষুড়িতে আছেন তখন শ্রীমা, দেখা করতে গেল স্বামীজি।

বললে, 'মা, আমি চললুম।'

মা চমকে উঠলেন: 'কোথায়?'

'হিমালয়ে। তুঙ্গতম তীব্রতম তপস্যায়। মাগো, আর ফিরব না।'

'সে কি? ফিরবে বৈকি। আমি যে পথ চেয়ে থাকব।'

'না মা, এবার মহত্তম জ্ঞান পরিপূর্ণতম উপলব্ধির জন্যে চলেছি। যতক্ষণ তা না পাই, কি হবে ফিরে এসে? এমনটি হওয়া চাই যেন যাকেই স্পর্শ করব সে-ই মুহূর্তে নবীনতরো মানুষ হয়ে উঠবে। নিজে যদি স্পর্শমণি হতে না পারি তাহলেই তো প্রমাণ হল ঈশ্বর আমাকে স্পর্শ করেননি। সেই পরাজয় মানব না কিছুতেই। কিন্তু কতদিনে সফল হব তা কে বলবে।'

স্নেহকরুণ চোখে স্বামীজিকে দেখতে লাগলেন শ্রীমা। এই তাঁর সেই নরেন! দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর তাকে রেখে দিতে চাইতেন আর অমনি খবর পাঠাতেন মাকে, ওগো নরেন এসেছে। মোটা মোটা করে রুটি বানাও আর খুব ঘন করে ছোলার দাল। দেখো যেন রুগীর পথ্য কোরো না।

রাখাল ঠাকুরের ছেলে, কিন্তু নরেন মায়ের ছেলে। সপ্তর্ষিলোক থেকে নেমে এসেছে। যেদিন দেহ ছাড়বেন, বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর,

মাকে আর লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতেই ঠাকুর বললেন, 'এসেছে? দেখ আমি যেন কোথায় যাচ্ছি, জলের ভেতর দিয়ে—অনেক, অনেক দূর।'

শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। তবে বুঝি ঠাকুর আর থাকবেন না।

'কাঁদছ কেন? তোমার ভাবনা কি?' কাছে দাঁড়ানো নরেনের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর : তোমার তো নরেনই আছে।'

আমার তো নরেনই আছে।

সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি বাবা। সর্বতপস্যায় সিদ্ধ হও। ফিরে এস মার আঁচলে। ধুলো মুঠো ধরে সোনা মুঠো করে দাও।

৩১

এত জায়গা থাকতে এল কিনা ভাগলপুর। কলকাতা থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি তার কাঁকর-পাথরের শুষ্কতা থেকে এই অনেক শান্তি। স্তব্ধ প্রান্তর মুক্ত আকাশ উধাও-ধাওয়া হাওয়া—আর কি চাই। আর, নতুন জায়গা দেখার আনন্দ। নতুন জায়গা দেখার চেয়েও বেশি সুখ নতুন মানুষ দেখা। একটা মানুষের হৃদয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো একটা সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়ানো। একটা মানুষের হৃদয় জয় করা মানে একটা সাম্রাজ্য লুট করে নেওয়া।

কুমার নিত্যানন্দ সিংহের বাড়িতে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে তার গৃহশিক্ষক মন্মথনাথ চৌধুরির বাড়ি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে মন্মথ আর তার বন্ধু দানাপুরের উকিল মথুরা সিং, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দ এসে হাজির। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া গেরুয়া, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। যেমন শহরে-বাজারে সাধু দেখা যায় তেমনি। এমনি মনে হল মন্মথর। বসতে বললে বটে কিন্তু আর যেন কথা কইবার উপযুক্ত নয়। ইংরিজি একটা বই খুলে তাতেই ডুবে গেল।

স্বামীজিই কথা কইল। জিগগেস করল, 'ওটা কি পড়ছেন?'

লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়। পেট-ভিখারী সাধু, কুঁজোর কিনা চিৎ হয়ে শুতে চাওয়া। গম্ভীরমুখে মন্মথ বললে, 'গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বই।'

সপ্রতিভের মত স্বামীজি বললে, 'ইংরিজি?'

প্রশ্নের ধরনে বুঝি অবাক হল মন্মথ। জিগগেস করলে, 'আপনি ইংরিজি জানেন?'

'যৎসামান্য।'

'গৌতম বুদ্ধের নাম শুনেছেন?'

'একটু-আধটু আপনারই মত।'

একেবারে আকাট বলে মনে হচ্ছেনা। দেখা যাক না একটু আলাপ করে। মন্মথ বৌদ্ধধর্মের কথা পাড়ল। তর্ক তুলল। ওরে বাবা, এ যে প্রকাণ্ড পণ্ডিত।

সমুদ্রের কাছে গেড়ে-ডোবা এমনি মন্মথর মনে হল নিজেকে। মথুরা সিংও বসল খাড়া হয়ে।

কথা উঠল, ভিক্ষু কে?

যে সর্বত্র সংযত, চোখে কানে ঘ্রাণে জিহ্বায়, কায়ে মনে বাক্যে, সেই ভিক্ষু। তার হাত কাউকে প্রহার উদ্যত হয়না, তার পা বিচার-বিবেচনা করে ধীর-স্থির থাকে। মিথ্যাবাক্যে অন্যের মনে দুঃখ দেয়না, মিত ঋত ও হিতকথায় যে অন্যের উপকার সাধন করে? যে একচারী সতত সন্তুষ্ট ধ্যানপরায়ণ সেই সদানন্দময় অর্হৎ পুরুষই ভিক্ষু।

কে এ সাধু! আপনারা আমার এখানে থাকবেন?

কেন থাকবনা? থাকবার জন্যেই তো এসেছি।

একদিন যোগসাধনের কথা উঠল। এ বিষয়েও পারংগম স্বামীজি। দয়ানন্দ স্বামীর কাছ থেকে যোগসম্বন্ধে কিছু-কিছু শুনেছিল মন্মথ, দেখল তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এমন সব কথা বলছে যা আগে শোনেনি কোনোদিন।

বাতশূন্যদেশস্থিত দীপ যেমন নিষ্কম্প থাকে মনকে তেমনি বিনিশ্চল করো।

ঈশ্বরকে পাবার সহজ উপায় কি?

সাধুসঙ্গ। যোগ, সংখ্যা-বিবেক, অহিংসা, জপ, কৃচ্ছ্র, সংন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, মন্ত্র, তীর্থ, যম-নিয়ম-এগুলি কেউই ঈশ্বরকে বশীভূত করতে পারেনা, সর্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ যেমন পারে। আর লোকহিতকর কর্ম করো। যে পর্যন্ত সর্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে পর্যন্ত সর্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে কায়মনোবাক্যে সেবা করো জীব আর কিছুই নয়, শিবেরই নামান্তর, আকারান্তর। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করো। হাতা ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, এমনি কর্মমাত্রই ব্রহ্ম যার দৃষ্টি সেই ব্রহ্মকে লাভ করে।

সংস্কৃতও বেশ জানা আছে মনে হচ্ছে। উপনিষদ পড়তে পারেন?

একটু-আধটু।

একটু শোনাবেন পড়ে?

শোনাচ্ছি। না, না, বই আনবার দরকার নেই। এমনিতেই মনে আছে কিছু-কিছু।

আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি। মন্মথ আর মথুরা তো নিস্পন্দ! কি না জানে এই সাধু! ইংরিজি, সংস্কৃত, সমস্ত যোগশাস্ত্র। তারপর উপনিষৎরাশি।

বেদান্তের অনুবন্ধ চারিটি। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন।

বুঝিয়ে দিন।

প্রমাতা মানে অধিকারী। প্রমাণ মানে সম্বন্ধ। প্রমেয় মানে বিষয়। প্রয়োজন মানে ফল। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সামনে অন্ন দেখলে কি করে? অন্ন ভক্ষণ করে। ভক্ষণ কেন করে, করলে কি হয়? ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, পুষ্টিতুষ্টি হয়। এখানে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রমাতা। অন্ন প্রমেয়। অন্নদর্শন ও অন্নভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি,

তুষ্টিপুষ্টিলাভ প্রয়োজন। তেমনি বেদান্তের প্রমাতা জীব, প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়োজন অনর্থ-নিবৃত্তি, পরমানন্দলাভ।

'আপনি আমার এখানে থাকুন।' আতিথেয়তায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মন্মথ।

সাত-সাতদিন থেকে গেল স্বামীজি।

একদিন নিজের মনে গুনগুন করে সুর ভাঁজছে স্বামীজি, শুনতে পেয়ে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল মন্মথ। জিগগেস করল, 'আপনি গান জানেন ?'

একটু-আধটু।

একটা ধরুন না।

সবাই মিলে পিড়াপিড়ি করতে লাগল স্বামীজিকে। স্বামীজি গান ধরল। যেমন জ্ঞানে তেমনি গানে উন্মেষনিমেষশূন্যে হয়ে শুনতে লাগল সকলে ভালো জিনিস আরো অনেকে শুনুক। আমার যা আনন্দ তা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। মন্মথ পরের দিন বাড়িতে গানের আসর বসাল। অনেক ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ের নিমন্ত্রণ হল। বিদগ্ধ সমাজ ভেঙে পড়ল বাড়িতে।

রাত নটা-দশটার মধ্যে আসর উঠে যাবার কথা, কিন্তু স্বামীজি একাই গেয়ে চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। কারু জায়গা ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। ক্ষুধাতৃষ্ণা সবাই ভুলে গিয়েছে, ভুলে গিয়েছে বাড়ি-ঘরের কথা। কারু খেয়াল নেই এখন কটা রাত। সময়ও যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গান শুনে। আরো চাই। আরো শুনব। একটার পর একটা গেয়েই চলেছে স্বামীজি। অবসাদ নেই। অন্যমনস্কতা নেই। কণ্ঠস্বরে নেই এতটুকু ক্লান্তি বা অনানন্দ। কৈলাসবাবু সঙ্গত করছিল। তার আঙুল কাঠ হয়ে গেল, ব্যথা করে উঠল। তবু থামছে না স্বামীজি। মীলিতনয়নে তন্ময় হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

সবাই বুঝলে এ ঐশী শক্তি ছাড়া কিছু নয়।

পরের দিন সবাই আবার ভিড় করল মন্মথর বাড়িতে। আবার শুনব। আবার শোনান। স্বামীজি রাজি হল না। আর একবার যখন 'না' বলে দিয়েছে তখন লক্ষ উপরোধেও টলবে না স্বামীজি।

একদিন মন্মথ বললে, 'চলুন ভাগলপুরের বড়লোকদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। হেঁটে যেতে হবে না, আমার গাড়িতে করেই যাবেন।'

'বড়লোক !' স্বামীজি গম্ভীরস্বরে বললে, 'বড়লোকের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।'

মন্মথর ভারি সাধ বাকি জীবন বৃন্দাবনে কাটায় আর সেখানে সাধন ভজন করে। স্বামীজিকে বললে সেই মনের কথা। চলুন বৃন্দাবনে যাই। গোবিন্দের মন্দিরে তিনশো করে টাকা জমা দিলে, আর কিছু ভাবনা নেই, বাকি নিয়মিত প্রসাদ পেয়ে যাব। খাবার ভাবনাই তো ভাবনা। যখন সে ভাবনা আর থাকবে না তখন মহানন্দে নাম সাধন করব দুজনে।

'ও-সাধনা আমার জন্যে নয়।' বললে স্বামীজি : 'স্থির হয়ে বসবার জন্যে আমি আসিনি।'

একদিন ঘরে বসে কাজ করছে মন্মথ, না বলে কয়ে চলে গেল স্বামীজি। মুখোমুখি বিদায় নিতে গেলে যাওয়া হত না, মন্মথ দু'হাত মেলে পথ আটকাত। চুপিচুপি চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু বুদ্ধিমানের কাজ? নিরাসক্ত সর্বপাপবিমুক্ত সন্ন্যাসীর কাজ।

এ কি, স্বামীজি কোথায়? কেউ কিছু বলতে পারছেনা, সবাই একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তার গুরুভাই বা কোথায়? সেও বেপাত্তা!

ভেবেছিলুম ধরে রাখতে পারব। ভেবেছিলুম অন্তত জানতে দেবে তার পথের ঠিকানা! তুমি কে না কে মন্মথ, তুমি তাকে বাঁধবে? তার ইচ্ছাশক্তির কাছে তোমার ইচ্ছাশক্তি!

তবু কিসের টানে কে জানে মন্মথ বেরিয়ে পড়ল। একবার যেন শুনেছিল স্বামীজি বদরিকাশ্রমে যাবে। চলো তবে সেই বদরিকাশ্রম। ট্রেনে চেপে বসল মন্মথ। আলমোড়া পর্যন্ত এল। আলমোড়ায় এসে শুনলে স্বামীজি আরো উত্তরে চলে গিয়েছে। কেন কে জানে আর এগোতে ইচ্ছা হল না। ঘরে ফিরে এল ঘরের ছেলে।

অখণ্ডানন্দ বললে স্বামীজিকে, চলো বৈদ্যনাথধাম যাওয়া যাক।

বৈদ্যনাথধামে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা। এত বড় একটা লোক, বা, দেখা করে যাব বইকি। কিন্তু, খবরদার, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না যে আমি ইংরিজি জানি। অখণ্ডানন্দকে স্বামীজি হুঁসিয়ার করে দিল। আমরা অশিক্ষিত সাধারণ সাধুমাত্র এই সবাই মনে করুক।

রাজনারায়ণবাবু তাই এদের সঙ্গে বাঙলাতেই আলাপ চালালেন। কিন্তু বাঙলাই বা এরা কি সুন্দর যে বলে! যেমন কথার ছটা তেমনি বলবার তেজ। আর ইংরিজি জানেনা বলে ইংরিজির বাঙলা প্রতিশব্দ গঠনের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! যে সব তর্ক উঠেছে তাতে বেটপকা ইংরিজি শব্দ এসে পড়াই দস্তুর। তাই রাজনারায়ণবাবুরও হয়েছে মুস্কিল। প্রায় প্রতিবাক্যে হোঁচট খেতে হচ্ছে। সামলে নিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে বাঙলা শব্দ জুড়ে দিচ্ছেন। ইংরিজি জানেনা অথচ ছোকরা সাধুদের তর্কের ভঙ্গীটি তো বেশ ধারালো।

কি কথার সঙ্গে রাজনারায়ণবাবু ইংরিজি 'প্লাস' কথাটা বলে ফেললেন। বলে ফেলেই বুঝলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে, কথাটার মানে তো বুঝবেনা সাধুরা। তখন কি করেন, নিজের একটা আঙুলের উপর আরেকটা আঙুল রেখে যোগচিহ্নের সঙ্কেত করলেন। ব্যাপারটা তখন সাধুদের কাছে বোধগম্য হল!

দেওঘরে একদিন থেকে কাশী। কাশীতে দু'দিন থেকে অযোধ্যা। যাবার আগে প্রমদাদাসকে বলে গেল: 'এরপর যখন আসব দেখবেন একটা বোমা হয়ে ফেটে পড়েছি। আর সমস্ত দেশ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।'

অযোধ্যা থেকে নৈনিতাল।

নৈনিতালে রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে উঠল। কদিন থাকব? যতদিন পথ আবার না টানে। চোখে এসে না পড়ে দূর পাহাড়ের হাতছানি।

চলো যাই বদরিকার পথে। দিন পনেরো পরেই আবার যাত্রা করল দু'জনে। নরেন আর গঙ্গাধর। যাকে বলে নিটুট নিঃসম্বল, চলেছে দু'জনে পায়ে হেঁটে। একটা পাই-পয়সারও মুখ দেখবার আশা নেই কোথাও। তবু চলো এগিয়ে। পাহাড় ডেকেছে। অরণ্য ডেকেছে। ডেকেছে জীবনের সুবিশাল নিস্তব্ধতা। তিন দিন অবিশ্রাম পায়ে হেঁটে রাত্রে থামল এক ঝর্ণার ধারে। একটা বটগাছের নিচে। সেখানে ধ্যানে স্বামীজির অসামান্য অনুভূতি হল। অনুভূতি হল আকীটপতঙ্গপিপীলিকা সমস্তই ব্রহ্ম। অনুভূতিই প্রমাণ। সত্যের মত প্রমাণিত বলে অনুভব করল ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নেই। গাছে যেমন শাখা শিকড় ফুল পল্লবাদি আছে, ব্রহ্মে তেমন নেই। ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তার অংশ বলে কিছু নেই। স্বজাতীয় ভেদও নেই। এক আম গাছের সঙ্গে আরেক আম গাছের স্বজাতীয় ভেদ আছে, ব্রহ্মে সেরকম নেই। অহং অনেক কিন্তু আত্মা এক। বিজাতীয় ভেদও নেই। একটা গাছের সঙ্গে একটা শিলার ভেদ আছে, ব্রহ্মে সেরকম নেই। ব্রহ্ম ছাড়া যেমন অন্য আত্মা নেই, তেমনি অন্য জড় পদার্থও নেই। অতএব কি দেখলাম ? দেখলাম চেতন জীব বা জড়জগৎ কিছুই নেই, একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান। ব্রহ্ম অনাদি। নিরতিশয়। অস্তিও বলতে পারোনা, নাস্তিও বলতে পারোনা। সব দিকেই তাঁর হস্ত-পদ, অক্ষিশিরোমুখ, সর্বত্র কান পেতে আছেন, সব কিছু তাঁর আচ্ছাদনে। ইন্দ্রিয় নেই, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করেন। চোখ নেই দেখেন, পা নেই চলেন, হাত নেই ধরেন। অসঙ্গ হয়েও সর্বধার। নির্গুণ হয়েও গুণভোক্তা। অন্তর-বাহির সব তিনি। স্থাবর-জঙ্গম সব তিনি। যে বুঝতে চায়না তার তিনি দূর। যে বুঝতে চায় তার তিনি সন্নিহিত। তিনি জ্যোতির জ্যোতিষ, প্রকাশকের প্রকাশক। তিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে।

আলমোড়া পর্যন্তও বুঝি পোঁছুনো হলনা। তার আগেই একটা জঙ্গলের ধার দিয়ে যাচ্ছে, খিদের কণ্টে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। এইখানেই বুঝি শেষশয্যা নিতে হয়। সন্ন্যাসের চমৎকার পরিণাম! লোকে বলবে, রোগে নয় বাঘে নয়, মাত্র খিদের তাড়নায় দেহ ছেড়েছে সন্ন্যাসী। এ আমি কি করে সইব ? ঈশ্বর, শক্তি দাও, হাত ধরে তোলো ম্রিয়মাণকে।

মূর্ছিতের মত শুয়ে পড়ল স্বামীজি। পাশে গঙ্গাধর বসে। সর্বাঙ্গ শিথিল, বিষাদদুর্বল। কোথায় যাবে, কি চাইবে, কেউ বলবার নেই। চারিদিকে ঘনবনের শত্রুতা।

কে একজন কাছে এসে দাঁড়াল। এ জঙ্গলে মানুষ আছে ?

'কে ?' স্বামীজি চোখ চাইল।

'এই জঙ্গলের মধ্যে এক কবর আছে, আমি তার পাহারাদার।'

'থাকো কোথায় ?'

'কবরেরই এক ধারে, আমার কুঁড়েঘরে।'

'আমাদের কিছু খেতে দিতে পারো ?'

'পারি।'

একটা শশা নিয়ে এল। খাদ্য আর পানীয় একসঙ্গে। একসঙ্গে মানুষের স্নেহ আর ঈশ্বরের করুণা। দুই বন্ধুতে খেল তৃপ্তি করে। আবার পথ চলল।

আলমোড়ায় অম্বাদত্তের বাগানবাড়িতে সাধুসন্তদের থাকবার জায়গা আছে, জানা ছিল গঙ্গাধরের। সেইখানে গিয়েই দুজনে উঠল। খবর পেল বৈকুণ্ঠ সান্যাল আর শরৎ মহারাজ। আগে থেকেই এখানে আছে, বদ্রীশা থুলঘোড়িয়ার বাড়িতে। তাদের একটা খবর দাও।

বদ্রীশা নিজে এল স্বামীজিকে নিয়ে যেতে। বদ্রীশার প্রীতিভক্তির তুলনা হয়না। তিন সন্ন্যাসী ও এক গৃহী একত্র হল। বিবেকানন্দ, অখণ্ডানন্দ, আর বৈকুণ্ঠ সান্যাল। কিন্তু শান্তি মিলল না। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল স্বামীজির ছোট বোন আত্মহত্যা করে মারা গেছে।

বাণবিদ্ধ পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল স্বামীজি। এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দেখতে পেল ভারতীয় নারীদের অসহায়তার ছবি। কোনো দেশই শক্তিশালী হতে পারেনা যদি সে তার স্ত্রীজাতিকে দুর্বল করে রাখে। কোনো গৃহই স্বর্গ হতে পারেনা যদি সেখানে স্ত্রী শ্রীরূপে না বিরাজ করে। আমাদের দেশ এত অধম কেন, এত অধঃপতিত কেন? শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির আমরা অবমাননা করেছি বলে। যে গৃহে নারীর পূজা পায় সেই গৃহেই দেবতারা সানন্দে বসবাস করেন। যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। তাই সারদামণিকে পূজা করলেন রামকৃষ্ণ। তাই তাঁর ব্রাহ্মণী ভৈরবীকে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ। তাই তাঁর মাতৃভাব প্রচার! স্ত্রীজাতির অভ্যুত্থান না হলে জগতে অভ্যুত্থান নেই।

সিস্টার নিবেদিতাকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ: 'প্রিয় মিস নোবল, ভারতের জন্য, বিশেষত নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছেনা, তাই অন্যজাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে। কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। এদেশের দুঃখ কুসংস্কার দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পারোনা। এদেশে এলে তুমি দেখতে পাবে তোমার চারপাশে অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীর বাহিনী—তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে কি বিকট ধারণা! তারা ভয়ে শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে, আর শ্বেতাঙ্গরাও তাদের প্রবল ভাবে ঘৃণা করে। তারপর তুমি যদি আস শ্বেতাঙ্গের দল তোমাকে পাগল ঠাওরাবে আর তোমার সমস্ত গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া, তুমি জানো এদেশের জলবায়ুও গ্রীষ্মপ্রধান, সাধারণ শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত। শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই। সর্বত্রই শুষ্কতা ও বিমুখতা। তবু, এ সব সত্ত্বেও তুমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে আমি তোমাকে শত শত বার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। অন্যত্র যেমন, তেমনি এখানেও

আমি কেউ নই, তবু আমার যেটুকু সাধ্য সেটুকু দিয়েই তোমাকে আমি সাহায্য করব।'

আলমোড়ায় আর মন টিকলনা, বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি। বেরিয়ে পড়ল গাড়োয়ালের পথে। সঙ্গী সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ আর বৈকুণ্ঠ। অন্তর জুড়ে দুই কান্না—এক, বোনের জন্য, আরেক ঈশ্বরের জন্য। শেষের কান্নাই টেনে নিয়ে যাচ্ছে পর্বতের নিঃসঙ্গতায়, তার ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যে। এই শেষের কান্নাতেই ডুবে যাবে অন্য আর্তি।

যত যাত্রা তত বাধা। যাঁর মোচন তাঁরই আবার অবরোধ। এক হাতে টানেন, আরেক হাতে আটকান। এক চোখে প্রশ্রয় আরেক চোখে নিষেধ। অসুস্থ হয়ে পড়ল অখণ্ডানন্দ। কর্ণপ্রয়াগে এসে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল তার ভালো হবার আশায়। সে যদি বা ভালো হল, বাধা এল আরেক মূর্তিতে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ওদিকে, তাই কেদারবদরীর পথ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। পথ যদি খুলল দেখা দিল আরেক বাধা। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বেরিয়েছে, চটিতে আশ্রয় নিল।

'কেমন আছ হে গঙ্গাধর ?'

'চমৎকার ? তুমি ?'

'তোমারই মতন।'

'তবে আর শুয়ে কেন ?'

'না, ওঠো, চলো, বেরিয়ে পড়ি। জয়ধ্বজার চূড়া ঐ দেখা যাচ্ছে।'

ভালো করে না সারতেই বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে শুধু বিরাটের লিপি লেখা। বিরাট আতঙ্ক বিরাট প্রশান্তি। বিরাট আহ্বান বিরাট স্তব্ধতা। রুদ্রপ্রয়াগে এসে পেঁছুল। সেখানে এক বাঙালি সাধুর সঙ্গে দেখা। নাম কি আপনার? পূর্ণানন্দ। কবে বেরিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে? কেউ জানে না। মৌনের শিলালিপিতে কোথাও এতটুকু ইতিহাসের ইঙ্গিত লেখা নেই। যেই পূর্ণানন্দের যজ্ঞে লোকনেত্রের অলক্ষ্যে কত নামগোত্রহীন পূর্ণানন্দ আত্মহুতি দিয়েছে কে জানে! তোমাকে এগুতে বলেছেন তুমি এগোও। আমাকে পথের পাশে বসে থাকতে বলেছেন আমি বসে থাকি।

একটা ধর্মশালায় এসে উঠলে। স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দের আবার জ্বর এল। এবার আর শক্তি রইলনা যে উঠে বসে। উপায়? এখানে তো একটা কোনো ডাক্তারও নেই। বৈকুণ্ঠ আর শরৎ চোখে অন্ধকার দেখল।

সরকারী সদর আমিন কাছেই কোথাও তাঁবু ফেলেছে, তার সঙ্গে দেখা করল দু'জনে। কবরেজি টোটকা কিছু দিতে পারি দেখো, তাতেই আরাম হবে। আরাম কিঞ্চিৎ হল বটে কিন্তু জ্বর আর যায় না। ন মাইল দূরে শ্রীনগর, ডাণ্ডি করে ওঁদের নিয়ে যাও ওখানে। খরচ? যা লাগে আমি দেব। দাঁড়াও, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সরকারী সদর আমিন, বদ্রীদত্ত যোশী, সব ব্যবস্থা করে দিল। বৈকুণ্ঠ আর

সারদানন্দ চলল পায়ে হেঁটে, ডাণ্ডিতে অখণ্ডানন্দ আর স্বামীজি।

শ্রীনগরে অলকানন্দার ধারে একটি কুটির পেয়েছে সকলে। নদী আর পর্বত, কি জাদুস্পর্শে কে জানে, জ্বরটুকু মুছে নিল গা থেকে। ধীরে ধীরে ফিরে এল স্বাস্থ্যের দীপ্তি, শক্তির উৎসাহ। এখানেই থাকব। স্বামীজি বললে প্রফুল্ল কণ্ঠে।

চলবে কি করে?

কি করে? হাসল স্বামীজি। তিনি মধু আমরা মধুকর। আমাদের তাই মাধুকরী। নারায়ণ হরি। এই বলে গৃহস্থের দরজায় দাঁড়ায় এসে সন্ন্যাসী। গৃহস্থ তার নিজের খাদ্য থেকে সামান্য একটু অংশ, হয়তো রুটির একটা টুকরো, কিছু ভাজি কিংবা ডাল, দিয়ে দেন সন্ন্যাসীকে। তিন চার পাঁচ বাড়ি ঘুরে যেই নিজের পেট ভরবার মত খাদ্যের সংস্থান হয় সন্ন্যাসী তার ডেরায় ফিরে আসে। বিকেলে আর বেরোয়না। তাই যারা মাধুকরী করে তাদের একবেলা আহার। রাত্রে তাদের অনশন।

সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নেই। যা তার আছে ঐ গৃহস্থের ঘরে, গৃহস্থের সেবায়, গৃহস্থের প্রীতিতে। কিন্তু যতটুকু সে দেবে ততটুকু। যতটুকু তোমার দরকার ততটুকু। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে নেয় সেই হরণ করে।

৩২

শ্রীনগর থেকে তেহরি। গঙ্গাতীরে একটা পোড়ো বাগান, তার মধ্যে একটা ভাঙা ঘর। যতদিন কেউ না তাড়ায় এইখানেই, এস, বসে পড়ি। যাত্রা কিসের জন্যে? গন্তব্যস্থলে পৌঁছে উপবেশনের জন্যে। উপাসনাই আমাদের উপবেশন। নিত্য প্রার্থনাই আমাদের যাত্রা। খুব কষে ধ্যান লাগাও। প্রার্থনা করো।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হল স্বামীজির। গাড়োয়ালের রাজধানী তেহরি, তার রাজসরকারের দেওয়ান হচ্ছেন রঘুনাথ। বললেন, 'এখানে নয়, গণেশপ্রয়াগে আমি আপনাদের ধ্যানের জায়গা ঠিক করে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বিলাঙ্গনার সঙ্গমস্থানে। সেখানে যান।'

ধ্যান মানে কি? চোখ বুজে আলোকের একটি শিখা-দর্শন। কিসের শিখা? চারদিকের ঘন পুঞ্জীভূত দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে করুণার দীপশিখা।

যাবার সব ঠিকঠাক, অখণ্ডানন্দ আবার অসুখে পড়ল। ডাক্তার এসে বললে, পাহাড়ের শীত সহ্য হবেনা, নিচে নেমে যেতে হবে এখুনি।

তথাস্তু। আগে বন্ধু, পরে ঈশ্বর। কে না জানে ঈশ্বরই বন্ধু। তাই গণেশ-প্রয়াগের যাত্রী নেমে চলল মুসৌরি। ঠাকুর যে সব গুরুভাইকে আমার জিম্মায় দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, ওদের কেউ নেই, তুই যদি না দেখিস তো কে দেখবে?

দেরাদুনের সিভিল সার্জনের কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন রঘুনাথ। আর দুটো

টাট্টু। আর পথে যা দরকার হতে পারে তার খরচপত্র।

ঈশ্বরই বন্ধু। ঈশ্বরই সহযাত্রী।

'আপনার দয়া ভুলব না।' রঘুনাথকে বলছে স্বামীজি : 'যদি আবার সুযোগ আসে আবার আপনার করুণার স্বাদ নেব। যতবারই ধ্যানমৌনের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি ততবারই ঠাকুর বাদ সাধছেন। বারে বারে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন সংগ্রামের ক্ষেত্রে।'

পথে পড়ল রাজপুর। শুনল সেখানে হরি-মহারাজ, তুরীয়ানন্দ স্বামী আছে। এখানে সে কি করছে? ধ্যান করছে।

রাত্রে গাঁয়ে রব উঠেছে, বাঘ এসেছে। ভাঙা ইটের স্তূপ এই তো হরি-মহারাজের ডেরা, কোনোই প্রতিরোধ নেই বাঘকে ঠেকায়। দরজা নেই, দেয়ালও পড়ো-পড়ো। নিশ্চয়ই এ ভাঙা ঘরেই বাঘ ঢুকবে, খাদ্যের জন্যে না হোক, আশ্রয়ের জন্যে। এখন উপায়? দরজার ফাঁক ইট দিয়ে সাজিয়ে বন্ধ করতে চাইল হরিনাথ। খানিকক্ষণ পরে মনের মধ্যে ধিক্কার জেগে উঠল। লাথি মেরে ভেঙে ফেলল ইটের পাঁজা। আমার আর আত্মরক্ষার উপায় নেই? আমি এত নিঃসম্বল? ঘরের বাইরে অন্ধকারে ধ্যানে বসল হরিনাথ। অদূরে বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কে বাঘ, কে হরিনাথ!

তুরীয়ানন্দ দাঁড়াল এসে স্বামীজির পাশে। রুগীকে নিয়ে চলে এল দেরাদুন। আগে সিভিল সার্জনকে ডাকাই। তারও আগে দরকার একটা ভদ্র আশ্রয়। সিভিল সার্জনকে ডাকাব কোথায়?

'আমার গুরুভাই বড় অসুস্থ। তাকে কেউ একটু আশ্রয় দেবেন?' দ্বারে-দ্বারে ফিরতে লাগল স্বামীজি : 'কেউ করবেন তার একটু ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা?'

এ কি অদ্ভুত ভিক্ষা! নিজের জন্যে নয়, বন্ধুর জন্যে। তাও চাল-ডাল পয়সা-কড়ি নয়, একেবারে একখানি ঘর, একটি আরামের শয্যা, ডাক্তার-পথ্যের রকমারি সরঞ্জাম।

সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আবার মানুষের মুখেই তো ঈশ্বরের মুখ। এগিয়ে এলেন আনন্দ নারায়ণ। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, দেরাদুনের উকিল। তিনি রুগ্ন সন্ন্যাসীর ভার নিলেন। গোটা একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। উপযুক্ত ওষুধ-পথ্য তো বটেই, গরম কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিলেন।

'আপনারা?' স্বামীজির দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন ব্রাহ্মণ।

'আমাদের কোনো ঘরদোরের দরকার নেই।' বললে স্বামীজি : 'আমাদের ভিক্ষা সংস্থান আর বৃক্ষতল আশ্রয়।'

'আপনাদের কিসের দুঃখ? কেন আপনারা কষ্ট করবেন?'

'দুঃখ?' হাসল স্বামীজি : 'দুঃখ আমাদের দেখে দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে থাকতে কষ্টের কষ্ট হবে।'

এমন কিছু আছে কিনা
সদানন্দে থাকা যায়,
দুঃখ যেন আমায় দেখে
দুঃখ পেয়ে চলে যায় ॥

সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখং। যা পরাধীন তাই দুঃখ, যা স্বাধীন, আত্মনির্ভর, তাই সুখ।

একটু সুস্থ হয়ে উঠলে অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদের পথে পাঠিয়ে দিল। তারপর স্বামীজি আর-আর গুরুভায়েদের নিয়ে চলে এল হৃষীকেশে। চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে বসে পড়ো যোগাসনে। সুদীর্ঘ ধ্যান লাগাও। অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের নির্বিষয়তাই ধ্যান, অন্তরের অশুদ্ধিত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ।

আর ধ্যানে বসে এইটিই অনুভব করো, আমিই অগ্নি আমিই হবি। ভোক্তরূপেও আমি ভোগ্যরূপেও আমি—আমিই সর্বাত্মক।

কিন্তু কতক্ষণ বসবে? এবার নিজে অসুখে পড়ল স্বামীজি। প্রবল জ্বর, তার সঙ্গে প্রতপ্ত প্রলাপ। প্রায় প্রাণসংকট। দেখতে দেখতে অবস্থা নৈরাশ্যের শেষসীমার দিকে চলে আসছে। জ্ঞান নেই, কখনো-কখনো নাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা। মাটির উপর দুখানা কম্বল বিছিয়ে শয্যা, তার উপর শুয়ে স্বামীজি চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। গুরুভায়েরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। কি করবে কোথায় যাবে, কোন দরজায় হাত পাতবে? ধারে-কাছে ডাক্তার কোথায়? কোথায় বিপদের সহায়বন্ধু? কোথায় ত্রাণকর্তা?

পাহাড়ী একটা লোক এসে হাজির। বললে, 'আমি ওষুধ এনেছি।'

'কি ওষুধ?'

'পাহাড়ী গাছের শিকড়। মধুর সঙ্গে বেটে খাইয়ে দাও। ভালো হয়ে যাবে।'

জানিনা তুমি কে, তোমাকে কে পাঠাল? জানিনা তোমার ওষুধের গুণাগুণ। তবু মন বলছে তুমি তাঁরই দূত, যিনি কষ্টে ফেলে কৃপা দেখান, রোগে ফেলে আরোগ্য আনেন, ক্ষুধার দুঃখ দিয়ে আনেন খাদ্যের সুধাস্বাদ। ক্লেশ না থাকলে কৃপাকে বুঝত কে? রোগ না থাকলে কোথায় থাকত উপশমের আরাম? খিদে না থাকলে কোথায় খাওয়ার আনন্দ? ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে উঠল স্বামীজি।

'অন্ধকারেই ঈশ্বরকে মনে পড়ে।' বললেন ঠাকুর: 'মনে হয়, সব এই দেখা যাচ্ছিল, কে এমন করলে!'

আবার আলোকেও সেই ঈশ্বরকে মনে করো। অন্ধকার দেখে মনে হয়েছিল এ বুঝি আর নড়বে না, এ বুঝি আর সরবে না। জগদ্দলন পাথরের মত নিশ্বাস রোধ করে পড়ে থাকবে। কিন্তু না, এই দেখ, আলোয় দশদিক ঝলমল করে উঠেছে। অন্ধকারের তন্তুটিও আর কোথাও নেই। আশ্চর্য, কি করে রাত্রি আবার প্রভাত হল! তাও আবার হয় নাকি?

"যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে চাই
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে ॥"

তাই ঈশ্বরকে আলোকে-আনন্দেও দেখ। দেখ তোমার প্রসাদে-সুস্বাদেও। তাঁকে ভুলে যেওনা। তিনি শুধু খরশর নন, পুষ্পবৃষ্টিও। যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান।

তাড়াতাড়ি সবাই চলে এল হরিদ্বার। সেখান থেকে সাহারানপুর। সেখান থেকে মিরাট। মিরাটে আবার অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা। সে এলাহাবাদ না গিয়ে মিরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্য ঘোষের চিকিৎসায় আছে। বেশ সেরে উঠেছে।

'কিন্তু এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ !' স্বামীজিকে দেখে যেন চিনতে পাচ্ছে না গঙ্গাধর : 'যেন ক'খানা হাড়ের উপরে মাংসের প্রলেপ ! এখানেই থেকে যাও দিন কতক। কনখল থেকে ব্রহ্মানন্দও চলে আসছে।'

এ যে প্রায় সেই বরানগর মঠই হয়ে উঠল। ভিড়লেন এসে যজ্ঞেশ্বরবাবু, ঠাকুরের সেই বুড়ো গোপাল অদ্বৈতানন্দ। যে যজ্ঞেশ্বরবাবু পরে সন্ন্যাস নিয়ে জ্ঞানানন্দ স্বামী হন ! প্রতিষ্ঠা করেন ভারতধর্মমহামণ্ডল।

যতদিন শরীর বেশ পটু হয়ে না উঠছে ততদিন থাকি এই আনন্দের নিকেতনে। ত্রৈলোক্যবাবুর কাছ থেকে আমিও ওষুধ খাই। ওহে গঙ্গাধর, কিছু এবার সংস্কৃত সাহিত্য পড়া যাক। শাস্ত্র অনেক ঘাঁটা হয়েছে, এবার নিয়ে এস শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মৃচ্ছকটিক। এ আবার কী আনলে ?

'স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী।'

'কোত্থেকে আনলে ?'

'যেখান থেকে এতদিন আর-আর বই এনেছি সেখান থেকে। এখানকার লাইব্রেরি থেকে।'

পর দিন লাবকের বইগুলি ফেরৎ দিল স্বামীজি। বলে দিও, পড়া হয়ে গেছে একদিনে।

একদিনে ? এতগুলি বই ? লাইব্রেরিয়ান বিশ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয়ই চাল মেরেছে। একবার দেখা পেতাম, দেখতাম জিগগেস করে।

স্বামীজি তক্ষুনি চলল লাইব্রেরিয়ানের কাছে। বললে, 'বিশ্বাস না হয় জিগগেস করুন। যে কোন পৃষ্ঠা থেকে যে কোন প্রশ্ন।'

পর-পর কতকগুলি প্রশ্ন করল লাইব্রেরিয়ান। ঠিক-ঠিক উত্তর দিল স্বামীজি।

এ সব দিয়ে আমার কী হবে ? বিদ্যা দিয়ে ? বিদ্যা দেখিয়ে ?

হৃষীকেশ-হরিম্বারের জন্যে মন পুড়তে লাগল স্বামীজির। সেই সব বিশাল নিস্তব্ধতার ডাক, সেই সব গূঢ়গহন গভীরতার সংকেত। সেই কৃচ্ছ্র কাঠিন্যের আনন্দ, সেই দুর্বারণ অরণ্যের উন্মুক্তি।

আহা, হৃষীকেশের সেই দিগম্বর বুড়ো সাধুটির কথা মনে পড়ছে। সবাই ধরে নিয়েছে পাগল। রাস্তায় ছেলেরা তাকে ঢিল মারছে। ঢিল খেয়ে মুখ ও মাথা থেকে রক্ত পড়ছে তবুও উদ্দাম সুখে হাসছে সেই সন্ন্যাসী। উল্লাসে উথলে-উথলে উঠছে। যেন অপরিচিত পথচারীর হাতে অকারণ মার খাওয়ার মত সুখ নেই। স্বামীজি সাধুকে কাছে ডেকে আনল, জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে দিল, খানিকটা কাপড় পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করলে। তবুও সাধুর বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা নেই অভিযোগ নেই। তবুও সে হাসছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছে। বলছে, ছেলেদের কী আনন্দ আমাকে ঢিল মেরে। মারুক, ওদের খুশিতেই আমি খুশি।

আর এই যে তোমার মুখে-মাথায় ঘা ? রক্ত ? কালশিরে ?

তবুও অনর্গল হাসছে সাধু। বলছে, এ সব তাঁর খেলা।

ঠাকুরও বলতেন, 'সব সেই বুড়ির খেলা।'

'বুড়ির খেলা তো বুড়ি নিজে খেলুক।' বলেছিল নরেন, 'কিন্তু আমি খেলি কেন ?'

'তুই খেলবিনে মানে ? তুই না খেললে বুড়ির খেলা জমবে কেন ?'

৩৩

আমার সঙ্গে কেউ এসোনা। কেউ খোঁজ নিওনা আমার। আমি নিঃসঙ্গ, স্বভুজবীর্যবান। মায়ামূলকে উচ্ছিন্ন করব সবলে।

গুরুভায়েদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখন থেকে একা-একা থাকব, একা-একা চলব। কেউ খোঁজ নিতে এসো না আমার।'

অখণ্ডানন্দ মিনতি করে উঠল : 'আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।'

'কাউকে না।'

'কে তোমাকে দেখবে ?'

'আমার অসুখ হলে তুমি আমাকে দেখ, তোমার অসুখ হলে আমি তোমাকে দেখি—আবার গড়ে তুলি সেই মায়ার মৌচাক। আর নয়, এবার আমাকে সত্যি করে অনুভব করতে দাও, আমার কেউ নেই, আমি নিরাশ্রয়, আমি নিঃসহায়, আমি নিরাবরণ। আমাকে দাও একবার সেই একলা-থাকার উদ্দাম উন্মুক্ততা।'

দিল্লী চলে এল স্বামীজি। নাম নিল বিবিদিষানন্দ।

সে কি ! এখানেও গুরুভায়েরা পিছু নিয়েছে।

'এ কি, তোমরা এখানে কেন দেখা করতে এসেছ ?' স্বামীজি বিরক্ত হয়ে বললে।

'বা, আমরা কি জানি তুমি ?' গুরুভায়েরা অপ্রস্তুত হয়ে গেল : 'আমরা শুনলুম নতুন কে-এক ইংরিজি-জানা সন্নেসী এসেছে, নাম বিবিদিষানন্দ স্বামী, তাই কৌতূহলী হয়ে দেখা করতে এসেছি। তা তোমাকেই দেখব কে জানে।'

হ্যাঁ, বেশিক্ষণ দেখো না। মানুষের চোখের মধ্যেই মায়ার বাসা।

দিল্লী ছেড়ে সোজা আলোয়ার।

একলা চলো, একলা চলো। সামনে পথ নেই, তবুও। যেখানে তোমার পদ সেখানেই তোমার পথ। তবু একলা চলো, এগিয়ে চলো। কিছু হিসেব না করে গ্রাহ্য না করে। নিঃশঙ্ক ও নিরঙ্কুশ। এককবিহারী গণ্ডারের মত। অরণ্যে যত গর্জন উঠুক তুমি বধির থাকো। বিপথ বলে কিছু নেই, বিপদ বলে কিছু নেই, শুধু চলো, সামনে চলো, এগিয়ে চলো।

স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে হাজির এক ডাক্তারখানায়। ডাক্তারটিকে যেন বাঙালি বলে মনে হচ্ছে। স্বামীজি জিগগেস করল, 'এখানে সন্নেসীদের কোথাও থাকবার জায়গা আছে ?'

ডাক্তার বাঙালিই বটে। নাম গুরুচরণ লস্কর। বিদেশে কোমলকণ্ঠের বাঙলা কথা শুনে চমকে উঠল। কে এ সন্ন্যাসী! দৃঢ়ায়ত চেহারা অথচ মুখখানি এত সুকুমার! পবিত্র চিন্তার পেলব লাবণ্যে ভরপুর।

'আছে, আছে, আসুন আমার সঙ্গে।'

বাজারের মধ্যে একটা দোকানের দোতলায় খালি একখানা ঘর পাওয়া গেল। পারবেন থাকতে এখানে ?

'স্বর্গসুখে থাকব।'

'কিছু লাগবে ?'

'কিছু না।'

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল ডাক্তার, সঙ্গে কম্বলজড়ানো গুটি কয় বই, একখানা গেরুয়া, একটা দণ্ড আর কমণ্ডলু এই শুধু সম্বল সন্ন্যাসীর। আবার কী লাগবে! আহার? তা দু একমুঠো যোগাড় করে দেবেন ভগবান। যদি না দেন থাকব অনশনে। বুঝব আমার উপবাসেই তাঁর পরিতোষ।

ইস্কুলের মৌলভি সামনেই থাকে—গুরুচরণের বন্ধু। গুরুচরণ তার কাছে ছুটে গেল। এস এস নতুন দরবেশ দেখবে এস। বাঙালি দরবেশ। এমন উজ্জ্বল অথচ এমন মধুর কোথাও তুমি দেখনি।

দরজার পাশে জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে ঘরে ঢুকল মৌলভি। শুধু সেই মৌলভি ? ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক মুসলমান। শুধু মুসলমান ? সব ধর্মের সব জাতের লোক ভিড় করল। স্বামীজির কণ্ঠ থেকে ঝরতে লাগল পুরাণ-কোরান, বেদ-বাইবেল। শুধু শহরের লোক নয়, যেন চলে এসেছে বুদ্ধ-শঙ্কর নানক-চৈতন্য কবির-তুলসীদাস, আর সকলের হাত ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঘরে লোক আর ধরে না। আলোয়ারের ইঞ্জিনিয়ার শম্ভুনাথকে বললেন, স্বামীজিকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

চলো।

সারাদিন ধ্যান আর উপাসনা, আর বিরাম হলেই ঈশ্বরকথা। সব প্রসঙ্গের ইতি আছে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ইতিহীন। সব আগুনই নেবে, ঈশ্বর-আগুন অনির্বাণ।

'মহারাজ, আপনার শরীরের জাত কি?' কত লোক আসে, একজন জিগগেস করে বসল। প্রশ্ন শুনে সাধারণ সন্ন্যাসীর মত বিরক্ত হলনা স্বামীজি। পূর্বাশ্রম তো একটা ছিল, তা গোপন করে লাভ কি? গোপন করাই তো অসাধুতা। স্পষ্ট নির্ভীক স্বরে বললে, 'এ কায়স্থ শরীর।'

চুপ করে থেকে কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনায়াসে বোঝানো যেত পূর্বাশ্রমে স্বামীজি ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু সত্যবাদিতায় ঢের বেশি ব্রাহ্মণত্ব। সবাই শ্রদ্ধায় ভরে উঠল।

'আচ্ছা স্বামীজি, আপনি গেরুয়া পরেন কেন?'

'নিষ্কিঞ্চন বলে।' প্রসন্ন হাস্যে বললে স্বামীজি, 'গেরুয়া দরিদ্রের ভূষণ। আমি যদি শাদা সাধারণ কাপড় পরতাম, ভিক্ষুক এসে আমার কাছে ভিক্ষে চাইত। বুঝতনা যে আমিও একজন ভিক্ষুক। নিজের কাছে কত সময় একটা পয়সাও থাকেনা, কি করে মেটাতাম তাদের প্রার্থনা? একজন চাইবে অথচ আমি দিতে পারবনা এ ভাবতেও দুঃসহ। তার চেয়ে এই গেরুয়াই ভালো, গেরুয়াই স্পষ্ট। কেউ আর চাইবেনা কাছে এসে। ভাববে এ তো আমাদেরই একজন, আমাদেরই মতন দীনহীন। ভিখিরি কি ভিখিরির কাছে ভিক্ষে চায়?' স্বামীজির স্বর আরও উদার হল: 'সমস্ত বিশ্বকে সুমিত্র ও সগোত্র ভাববার নিশানই হচ্ছে গেরুয়া।'

আমার এ গেরুয়া ঐশ্বর্যরূঢ় অহমিকা নয়, দলিত-দীর্ণ দীনদরিদ্রে সমপ্রেম।

মৌলভি সাহেবের ইচ্ছে স্বামীজিকে একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। হৃদয়ের অমৃত অন্নের মাধ্যমে পরিবেশন করে। স্বামীজির কাছে এক জাতি—সে-জাতির নাম মানুষজাতি—তাঁর নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবেনা, ভয় শম্ভুনাথকে। শম্ভুনাথ সনাতনী, কিছুতেই স্বামীজিকে ছেড়ে দেবেনা।

'বড় সাধ স্বামীজিকে একদিন সেবা করি।' মৌলভি বললে শম্ভুনাথকে, 'আলাদা পরিচ্ছন্ন ঘরে বামুন দিয়ে রান্না করাব, তাদেরই বাসনকোসনে, তাদেরই কেনা জিনিসে। আর আমি—আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখব তাঁর খাওয়া।'

ভক্তির স্বভাবমধু ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে। ভক্তের আবার জাত কি। ভালোবাসার আবার আল-বাঁধ কিসের।

শম্ভুবাবু বললেন, 'আমি কাকে আটকাব? এ যে জলন্ত পাবক। জীবন্মুক্ত মায়ামুক্ত পুরুষ। সর্বত্র এঁর সাম্যবুদ্ধি শুদ্ধবুদ্ধি।'

সর্বত্র ঈশ্বরের হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁর চোখমুখ, সর্বত্র তাঁর কান পাতা। সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন করে আবৃত করে তিনি বিরাজমান। যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হলেও যিনি বিনষ্ট হন না সেই পরমেশ্বরকে

যে দেখে সেই যথার্থদর্শী।

মৌলভিসাহেব খাওয়াল স্বামীজিকে। এবং তার দেখাদেখি আরো অনেক মুসলমান।

ক্রমে-ক্রমে মহারাজার দেওয়ান রামচন্দ্রজির কানে উঠল। স্বামীজিকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ভাবলেন একে দিয়ে যদি মহারাজার চরিত্রের কিছু সংশোধন হয়।

মহারাজা মঙ্গলসিং ভীষণভাবে সাহেব বনে গিয়েছে। ষোল আনার উপরেও যেন দু আনা বেশি। খানাপিনা তো বটেই, চলন-বলন ধরন-ধারন সব ব্যাপারেই মাত্রাহীন উগ্রতা। দেওয়ান তাঁকে খবর পাঠাল, মস্ত এক সাধু এসেছে—মামুলি সাধু নয়, চমৎকার ইংরিজি জানে, বলতেও পারে অসাধারণ।

ইংরিজি কথা শুনে মঙ্গলসিং আকৃষ্ট হল। সাধুদর্শনে এল দেওয়ানের বাড়িতে।

বললে, 'শুনতে পাই আপনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে রোজগার করতে পারেন, তবে এমন ছন্নছাড়ার মত ভিক্ষে করে বেড়ান কেন?'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'শুনতে পাই আপনি একটা রাজ্যের শাসনকর্তা। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে প্রজার হিতসাধন করতে পারেন, তবে এমন উন্মাদের মত সাহেবিয়ানা করে বেড়ান কেন?'

স্বামীজির কথায় উপস্থিত সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। কী স্পর্ধা এই সাধুর! মহারাজার মুখের উপর এমন অবিনয় করবার সাহস রাখে। সাধুর অদৃষ্টে কি না জানি আছে আজ নিগ্রহ।

'কেন বেড়াই?' মহারাজা সামলে নিল নিজেকে: 'আমার খুশি।'

'আমারো সেই কথা।' স্বামীজি বললে, 'আপনার খুশি সাহেব সেজে, আমার খুশি ফকির সেজে।'

'কিন্তু যাই বলুন মূর্তিপূজা আমি বিশ্বাস করিনা।' মহারাজা তাকাল স্বামীজির দিকে: 'আপনি করেন?'

'করি।'

'কাঠ মাটি পিতল পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন?'

'ভাবি।' বজ্রদৃঢ় স্বামীজির স্বর।

'আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কি উপায় হবে?' মহারাজার কথায় বোধহয় একটু পরিহাসের সুর।

'ভাববেন না।' সহসা দেয়ালের একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল স্বামীজি: 'এটা কার ফটো?'

দেওয়ান বললে, 'মহারাজার।'

স্বামীজির অনুরোধে ছবিটা নামিয়ে আনা হল। স্বামীজি নিজের হাতে করে নিয়ে বললে দেওয়ানকে, 'এটার উপর থুতু ফেলুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। হতচকিতের মত তাকিয়ে রইল দেওয়ান। মহারাজারও চক্ষুস্থির।

'ফেলুন থুতু। লাথি মারুন। কেন, সংকোচ কিসের? এ তো এক টুকরো একটা কাগজ। এতে থুতু ফেলতে আপত্তি কি?'

'সে কি বলছেন স্বামীজি?' শুকনো গলায় ঢোক গিলল দেওয়ান: 'এ যে মহারাজার প্রতিচ্ছবি।'

'তাতে কি। এ তো খানিকটা কালিমাখা কাগজ। এর মধ্যে মহারাজা কোথায়?' স্বামীজি ফোটোগ্রাফটা বাড়িয়ে ধরল দেওয়ানের দিকে: 'এর মধ্যে রক্তমাংস, কোথায়? প্রাণ কোথায়? এ তো অনড়, নিঃশব্দ। এতে থুতু ছিটোলে থুতু তো কাগজেই পড়বে, মহারাজার গায়ে পড়বেনা। তবু থুতু ফেলছেননা কেন? ফেলছেননা এরই জন্যে, এ মহারাজার ছায়া, একে দেখলে মহারাজাকে মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলে মহারাজাকেই অপমান করা হয়। তাই এ ছবি শুধু কালিমাখা কাগজ নয়, এ ছদ্মবেশী মহারাজ।'

মঙ্গলসিংকে লক্ষ্য করল স্বামীজি। বললে, 'এক অর্থে আপনি এতে নেই, অন্য অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিন্ন করা যায়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভক্ত-সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা কি-আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে পূজা করি ঈশ্বরকে। আপনার ভক্ত-সেবকেরা কি কাগজকে প্রণাম করে, কাগজের মাধ্যমে প্রণাম করে আপনাকেই।'

মঙ্গলসিং দুই কর যুক্ত করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে। বললে, 'চলুন আমার প্রাসাদে।'

'যাব, কিন্তু এক সর্ত।' স্বামীজি উঠে দাঁড়াল: 'শুধু ধনীরা নয়, শুধু গণ্যমান্যের দল নয়, অধম-অক্ষম দীনদরিদ্রেরাও যদি আসতে চায় আমার কাছে, দরজা খোলা রাখবেন তাদের জন্যে। নির্বিবাদে আসতে দেবেন সকলকে। অশনবসন নেই তো না থাক, সকলের অবারিত প্রবেশ। কি, রাজি?'

'রাজি।'

রাজপ্রাসাদ টলমল করে উঠল।

৩৪

এক বৃদ্ধ এসেছে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে। কি অভিলাষ? আমাকে কৃপা করুন। কেন, কি করতে হবে? সারাজীবন ভোগের সন্ধানে কাটিয়েছি, বোঝাই করেছি পাপের নৌকো, এবার ভরাডুবি থেকে রক্ষা করুন আমাকে। আমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনা ? ঝলসে উঠল স্বামীজি । প্রার্থনায় কি হবে ?

তবে কিসে হবে ?

হবে আপনার নিজের পুরুষকারে। পরের কাছে কৃপা চেয়ে কি হবে যদি নিজেকে নিজে না কৃপা করেন ? পরকৃপা নয়, আত্মকৃপা। পরের দরজায় আঘাত করে কি হবে, নিজের অন্তরের দরজায় আঘাত করুন।

যখন সূতপুত্র বলে কর্ণকে বিদ্রূপ করা হল তখন কি বললে কর্ণ ? বললে, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম। উচ্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ আমার নিজের করতলে। আমার নিজের অধিকারের মধ্যে। আমি প্রমাণ করব সে পৌরুষ। মরুভূমিতে দেখবে আমিই এক পল্লব-বিকীর্ণ পুষ্পিত বৃক্ষ।

বৃদ্ধ বললে, 'সবই দৈব।'

পূর্বজন্মের যা পুরুষকার তারই ফল এই জন্মের অদৃষ্ট। অর্থাৎ আজ যাকে দৈব বলছ জানবে তা তোমার প্রাক্তন পৌরুষের পরিণাম। তেমনি এই জন্মে যা তোমার পুরুষকার তাই পরজন্মে দৈব বা অদৃষ্টরূপে দেখা দেবে। সুতরাং পুরুষকার ছাড়া অদৃষ্টের খণ্ডন নেই। তাই বলি পৌরুষ আশ্রয় করে দন্তে দন্ত চূর্ণ করে কাজে লেগে যাও, ঐহিক শুভকর্ম দ্বারা পূর্বতন অশুভ বর্ষফল জয় করো। পৌরুষং নৃষু। মানুষের মধ্যে পৌরুষ যে কর্মশক্তি তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হবে মানে নিজের পৌরুষের শরণাপন্ন হও। ঈশ্বরকে দেখবে মানে নিজের কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করো, প্রদীপ্ত করো। নিজেকে আলোকিত করে দেখ সেই আলোকময়কে।

হে কৌন্তেয়, অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, জলে আমি রস, চন্দ্রসূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ আর মানুষের মধ্যে আমি পৌরুষ।

পৌরুষই দুর্বলের বলাধারের মন্ত্র। পৌরুষেই দগ্ধ হবে সমস্ত পাপ, ক্ষয় হয়ে যাবে সমস্ত দুর্গতি, সমস্ত দারিদ্র্য।

'কিন্তু আমার কি আর সময় আছে ?' অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ।

জীবনের শেষ নিশ্বাস শেষ পলক ফেলা পর্যন্ত সময়। 'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।' অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধ করো।' যাকে ঠাকুর বলছেন, কর্মযোগ আর মনোযোগ। জীবনের শেষ নিশ্বাস শেষ পলকপতন পর্যন্ত যুদ্ধ, অনন্যগামিনী ঈশ্বরচিন্তা।

আলোয়ার ছেড়ে চলল স্বামীজি। এল জয়পুর।

রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংহের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হল। কিন্তু সেখানেও সেই তর্ক। কি হবে মূর্তি পূজা করে ? একটা কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎপিণ্ড কি ঈশ্বর ? অনেক যুক্তি-তত্ত্বের অবতারণা করা হল, কিন্তু হরি সিং নির্বিচল। কোনো মীমাংসাতেই তার সম্মতি নেই। তুমি বলবে বলেই আমি মানব এ কোন নীতি ? আমি দেখতে চাই।

একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছে দু'জনে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে এক শোভাযাত্রা। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে তাই সর্দার আর স্বামীজি। আর্তিহরণ লাবণ্যে মাখা এ কি প্রসন্ন মূর্তি!

'দেখ দেখ ঈশ্বরকে দেখ। জীবন্ত ঈশ্বর।' স্বামীজি সর্দারের হাত চেপে ধরল: 'তাকিয়ে দেখ ঐ মূর্তির দিকে।'

এ কি, সর্দারের দু'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা। এ কি, তোমার এ কি হল?

'জীবন্ত-জ্বলন্ত ঈশ্বরকে দেখলাম। স্বামীজি, এতদিন তর্ক করে যা দেখিনি তা দেখলাম তোমার এই চকিতস্পর্শে। বিগ্রহ কোথায়, শরীরপ্রাণবান পূর্ণসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।'

তাই বলে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়াও ছাড়বেনা স্বামীজি। অন্তত পাণিনিটা অধিকৃত করতে হবে। নামজাদা এক পণ্ডিত যোগাড় হল। কিন্তু পণ্ডিতের বিদ্যাই আছে, বিদ্যা চালনা করবার বুদ্ধি নেই। তিন দিনের চেষ্টাতেও প্রথম সূত্রটিই বোঝাতে পারলে না। বিরক্ত হল পণ্ডিত, বললে, 'প্রথম সূত্র বুঝতে যখন আপনার তিনদিনও কুলিয়ে উঠছেনা তখন গোটা ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে বাকি জীবনই বা যথেষ্ট হবে কিনা কে জানে।'

এই কথা? নিজের চেষ্টাতেই সূত্র-ভাষ্য উদ্ধার করব। পাণিনি নিয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। আর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই স্পৃহা নেই, গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করবার আগে আসন ছাড়বনা। কঠিন মাটির নিচে যেমন জল আছে, তেমনি কঠিন ভাষার নিচে রয়েছে ভাষ্যের স্বচ্ছতা। পণ্ডিত তিনদিনে যা পারেনি তিনঘণ্টায় তা নির্ণীত হল। ইউরেকা! স্বামীজি ছুটে গেল পণ্ডিতের কাছে। দেখুন, আমি বুঝে নিয়েছি। শুনুন, আমার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা।

জলের মত তরল আলোর মত সরল ব্যাখ্যা। শুধু ব্যাখ্যা নয় নতুন আলোকপাত। পণ্ডিত একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এ কে অসাধ্যসাধক!

আর স্বামীজিকে পায় কে? একে একে সমস্ত গ্রন্থি খুলে যেতে লাগল। বললে স্বামীজি, 'সংকল্পই আসল কথা। প্রতিজ্ঞায় যদি একবার দৃঢ় হওয়া যায় কোনো কাজই বসে থাকে না।'

'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব।' যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, উদ্‌যুক্ত হও। উত্থানে-উদ্যোগেই জয়ের প্রভাতোদয়।

টাইলা গ্রামে নীলকণ্ঠ শিবের মূর্তি দেখে এল। প্রজার স্বস্তির জন্যে সমুদ্রমন্থনের হলাহল যে পান করেছিল সেই দেবাদিদেব শংকর। বিষ পান করবার আগে শিব বললে সতীকে, যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ ও পরস্পর বৈরভাবে বদ্ধ তাদের উপর কৃপা করলেই স্বয়ং শ্রীহরি প্রীত হন। আর শ্রীহরি প্রীত হলে চরাচরসহ আমিও প্রীত হই। সুতরাং এই বিষ আমি খাব, আমার প্রজাদের কল্যাণ হোক। অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করাই অখিলপুরুষের আরাধনা।

অন্যের জন্য কল্যাণকর্ম করতে না পারো, অন্তত কল্যাণ চিন্তা করো।

কল্যাণকর্মা না হতে পারো, কল্যাণকামী হও। কল্যাণচিন্তাই উপাসনা।

সমুদ্র হচ্ছে এই মায়ার সংসার। ইন্দ্রিয়ভোগই হচ্ছে হলাহল। তোমার তপস্যায় তাকে নস্যাৎ করে দাও। মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ করো উদ্‌ভ্রান্তদের।

'আচ্ছা, তুমি অবতার মানো?' পণ্ডিত সুরজনারায়ণ জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'না মেনে করি কি?'

'কেন, অবতার কি আলাদা? তার কি চারটে হাত আছে না কপালে চোখ আছে?' পণ্ডিত উদ্ধতস্বরে বললে, 'আমি বলছি, আমিও একজন অবতার। কেন নই প্রমাণ করুন।'

'না, না, আপনি একজন অবতার বই কি। প্রমাণ লাগবেনা।' স্বামীজি হাসিমুখে বললে, 'আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে মাছ কচ্ছপ শুয়োর সবকিছুই অবতার। যদি বলেন অবতারের সঙ্গে আপনার কোনো তফাৎ নেই আপত্তি করব না।' যারা-যারা ছিল সবাই হেসে উঠল। পণ্ডিতের স্পর্ধায় বাজ পড়ল।

আজমির হয়ে স্বামীজি এল আবুপাহাড়ে। 'সৎ হওয়া ও সৎ ব্যবহার করা, ওতেই সমস্ত ধর্ম নিহিত।' আলোয়ারের গোবিন্দসহায়কে চিঠি লিখল স্বামীজি: 'যে শুধু প্রভু-প্রভু বলে চেঁচায় সে নয়, যে পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কাজ করে সেই ধার্মিক। ধর্ম কাজে, কথায় নয়। পর্বত যদি না আসে তুমি নিজেই পর্বতের কাছে যাও।'

পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল স্বামীজি। সঙ্গের সাথী দুখানা কম্বল, একটা কমণ্ডলু আর কখানা বই। আর সাধন কিংবা পাতন এই তপস্যার তপ্ততেজ।

একটি মুসলমান উকিল প্রায়ই বেড়াতে আসে এদিকে। কি করে সন্ধান পেয়েছে, গুহার বাইরে মুগ্ধের মত বসে থাকে আর একটা-দুটো করে কথা কয়। যত বলে তার চেয়ে শোনে বেশি। আর যা শোনে এমনটি আর কোনোদিন শোনেনি।

তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে—এই তো বেদান্তের কথা। তোমার এই শরীর তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ, মানে, তোমার নিজের কর্মই তোমার এই দেহধারকে গঠন করেছে। তোমার হয়ে আর কেউ তোমার এই নিশ্বাসগৃহ নির্মাণ করেনি। যে সমস্ত সুখদুঃখ ভোগ করছ তার জন্যে তুমিই একমাত্র দায়ী। তুমিই তোমার দণ্ডদাতা তোমার সুখধাতা। ভেবোনা তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, রাখা হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশে। তুমিই ধীরে-ধীরে তোমার জগৎ রচনা করেছ, এখনো করছ। তুমিই তোমার পথ তুমিই তোমার পরিবেশ।

'আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি?' জিগগেস করল উকিলসাহেব।

'বর্ষা আসছে, গুহায় কোনো দরজা নেই। কাঠের একজোড়া দরজা লাগিয়ে দিতে পারেন?'

'স্বামীজি, একটা অনুরোধ করতে পারি?' দুই হাত যুক্ত করল উকিল-সাহেব : 'কাছেই আমার একখানি বাঙলো আছে। আপনি সেখানে থাকবেন চলুন।'

আশ্চর্য, এক কথায় রাজি হয়ে গেল স্বামীজি।

একটু হয়ত দ্বিধা করল উকিলসাহেব। বললে, আমিও সেই বাড়িতে থাকি। কিন্তু, ভয় নেই, আপনার খাওয়াদাওয়ার সব আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।'

উকিলসাহেবের কাঁধে হাত রাখল স্বামীজি।

খেতড়ির রাজা একান্তসচিব মুন্সি জগমোহনলাল এসেছে উকিলসাহেবের ডাকে। কই, কোথায় তোমার আবিষ্কার? দেখল, কৌপীনধারী এক সাধু লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে। এই, এই তোমার সাতরাজার ধন এক মাণিক? ঠোঁট কুঁচকোলো জগমোহন। যেমন হামেসা দেখে থাকি ভবঘুরে বাউন্ডুলে এ তো তাদেরই একজন।

স্বামীজি চোখ মেলল।

'আপনি তো হিন্দু, তবে এই মুসলমানের সংস্রবে আছেন কেন?' জগমোহন ঝাঁজিয়ে উঠল। 'আপনার খাওয়ায় তো ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়।'

'তবুও আমার জাত যায় না, আমার জাত যাবার নয়।' দীপ্ত শানিত কণ্ঠে বললে স্বামীজি। 'আমি সন্ন্যাসী, আমি মেথরের সঙ্গে বসেও খেতে পারি। সমস্ত মানুষ আমার কাছে সমান, সকলে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূ। সর্বত্র সাম্য, সর্বত্র ব্রহ্ম। সর্বত্র শিব, সর্বত্র প্রেম।'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল জগমোহন। এ যেন মুখস্থ করা কথা নয়, এ একেবারে উদ্দীপ্ত আগুন। বাক্য শুধু বাক্য নয়, বাক্যই ব্যক্তি, বাক্যই ব্রহ্ম।

একবার রাজাকে দেখালে হয়। জগমোহন হাত জোড় করে বললে, 'স্বামীজি, দয়া করে একটিবার রাজপ্রাসাদে যাবেন? দয়া করে একটিবার দেখা দেবেন রাজাকে?'

৩৫

এখন শুধু কর্ম আর কর্ম। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নাম। এ ভিন্ন উদ্ধারের পথ নেই। বলছে স্বামীজি : এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজো, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীরের পুজো। তবে তো লোক মহোদ্যমে ধর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। দেশ ঘোর তমতে ছেয়ে গেছে। ফলও তাই হচ্ছে, ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক। কর্মে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠ। মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে ইহকাল না আছে পরকাল।

আরো বলছে : চোর হয়ে যে চুরি করতে পারে, আমার মতে এমন দৃঢ়চেতা দুষ্ট লোকও ভালো। কারণ তার পুরুষকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে। একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতাই হয়তো তাকে কুপথ থেকে সুপথে ফিরিয়ে

আনবে, প্রবৃত্তির স্থলে নিবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনে। কিন্তু অলস দুর্বল তমোগুণীদের দিয়ে কিছু হবে না। যতই তারা সাধু হোক, যতই সৎসঙ্গ করুক। মনে আছে ঠাকুরের কথা? ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। পনেরো মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। চিঁড়ের ফলার, আঁট নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে। উঠে পড়ে লাগো, কোমর বাঁধো। যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয় আর যে গরু গাবগাব করে খায় সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।

'স্বামীজি, জীবনটা কি?' খেতড়ির রাজা জিগগেস করলেন।

'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও আত্মস্বরূপের উন্মোচনের সাধনা।' বললে স্বামীজি।

প্রাসাদে সসম্মান অভ্যর্থনার পর এখন নিভৃতে কথা হচ্ছে। 'আচ্ছা স্বামীজি, শিক্ষা কাকে বলে?'

'কতগুলো সংস্কারকে মজ্জাগত করার জন্যই শিক্ষা।'

'স্বামীজি, সত্য কি?'

'যা পূর্ণ যা অদ্বিতীয় যা শাশ্বত তাই সত্য। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা যাকে সত্য বলি তা আপেক্ষিক। চরম সত্যের উপলব্ধি হলে আপেক্ষিক সত্যবোধ লোপ পায়।'

'আচ্ছা স্বামীজি, আরেক কথা। নীতি কি?'

'যার মাধ্যমে ঘটনা-পরম্পরার সূত্রটির ধারণা করতে পারি তাই নীতি।'

কোনো কিছুতেই দ্বিধা নেই, তীক্ষ্ন তীরের মত পরিচ্ছন্ন উত্তর।

রাজপ্রাসাদেই হোক আর গিরিগুহাতেই হোক, সমান নিরাসক্তি। সর্বক্ষণই পুজা, পাঠ, ধ্যান, জপ, ইষ্টকথন। শুধু তাই নয় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলের অধ্যয়ন চলেছে। কিন্তু কে বা মাস্টার কে বা ছাত্র! শিশুর যখন প্রথম অক্ষর পরিচয় হয় তখন শুধু অক্ষরের দিকে লক্ষ্য থাকে, যখন শব্দরচনা করতে শেখে তখন গোটা শব্দটা চোখের সামনে ধরে দেয়। পরে পঠনসাধনায় একাগ্র হয়ে আরো অগ্রসর হলে সম্পূর্ণ একটা বাক্য একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও অগ্রসর হও অনন্যচিত্ত হও, পলকে একটা অনুচ্ছেদ তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। কিন্তু এ ছাত্র তো জাদুকর। একটা পৃষ্ঠা ধরেছে আর তখুনি উলটিয়ে যাচ্ছে।

'এ কি, হয়ে গেল পড়া?'

'জিগগেস করুন।' বই বন্ধ করল স্বামীজি।

'কাল যা পড়িয়েছিলাম কি বুঝেছেন বলুন দেখি।' নারায়ণদাস পণ্ডিত গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করল।

অবিকল মুখস্থ বলে গেল স্বামীজি।

'আর আজ? এই যে এতক্ষণ একটুখানি চোখ বুলিয়েই পৃষ্ঠান্তরে চলে যাচ্ছেন, কতদূর কি বুঝলেন?'

আজকের পড়াও বলে দিল মুখস্থ।

'স্বামীজি, এ কি করে সম্ভব হয়?' নারায়ণদাস বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

'একমাত্র যোগে। মনের একাগ্রতায়।'

'কি করে হয় এই যোগ?'

'একমাত্র ব্রহ্মচর্যে। নিষ্ঠাপবিত্র অভ্যাসে। আপনিও দেখুন না চেষ্টা করে।'

বই-পত্র তুলে নিল নারায়ণদাস। বললে, 'আপনাকে তবে পড়ানো বৃথা।'

'সে কি, ক্ষুণ্ণ হলেন আপনি?'

'না, না, ক্ষুণ্ণ হব কেন? শূন্য হয়ে গেলাম! আপনাকে কিছুই আমার পড়াবার নেই।' দু কর যুক্ত করল নারায়ণদাস: 'সব আপনার জানা। এখন আপনিই গুরু আমিই ছাত্র।'

মহারাজার ভক্তি আরো প্রাঞ্জল, আরো প্রকাশ্য। স্বামীজি যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে এসে ধীরে-ধীরে বসবে পায়ের কাছটিতে। ধীরে-ধীরে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে।

একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই লাফিয়ে উঠল স্বামীজি: 'এ কি, এ কী করছেন?'

'আপনার একটু পদসেবা করছি।' সেবাশান্ত স্বরে বললে মহারাজ।

'সে কি কথা! আপনি রাজা—'

'রাজা? আমি আপনার দাসানুদাস।'

'না, না, যার যা মর্যাদা তার তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।' বললে স্বামীজি, 'আপনার এ ব্যবহার প্রজার চোখে হেয় করবে আপনাকে, এ বিধেয় হবে না।'

এবার আবার রাজপ্রাসাদ থেকে পালাতে হয়।

অর্জুন ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় কর্মত্যাগের উপদেশ দেবেন। কিন্তু না, কিছুতেই তিনি কর্ম ছাড়তে বললেন না। যা ছাড়তে বললেন তা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, ফলাভিলাষ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি মানে কি? কর্মত্যাগ নয়—সাধ্য কি, দেহধারী জীব হয়ে কর্ম ছেড়ে তুমি বসে থাকো! নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি মানে কর্মবন্ধনের যে কারণ সেই বাসনা বা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। আসক্তি ছেড়ে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করলেই নৈষ্কর্মসিদ্ধি। সন্ন্যাস মানে কর্মসন্ন্যাস নয়, ফলসন্ন্যাস। ফলাভিসন্ধি ছেড়ে সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা। শুধু কাজ করে, শুধু কাজ করেই, শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করা যায় যদি ঈশ্বরকে আশ্রয় করে সে কর্মচক্র গড়ে ওঠে।

খেতড়ি থেকে চলে এল আজমির, আজমির থেকে আমেদাবাদ। আমেদাবাদ থেকে ওয়াডোয়ান হয়ে লিমড়ি। দোর থেকে দোরে ভিক্ষা করতে লাগল স্বামীজি, রাত কাটাল পথের ধারে, এখানে-সেখানে। কাছাকাছি কোথাও সাধুর আস্তানা আছে? সে আশ্রয়ই তো তার স্বদেশ-স্ববাস। যাও ঐ শহরের উপান্তে, মিলে যাবে আস্তানা।

সাধুরা হাত বাড়িয়ে লুফে নিল স্বামীজিকে। আহা, বড় ক্লান্ত হয়েছ দেখছি,

কতদিন না জানি খাওনি, ঘুমোওনি গা ঢেলে। নাও, আগে পেট পুরে খাও, বিশ্রামের সরোবরে গা ভাসাও, চাও তো কায়েমি বাসিন্দে হয়ে থাকো। এত অভ্যর্থনা যেন ভালো লাগেনা। দু'দিনেই বুঝতে পারল স্বামীজি এ সাধুরা হীনব্রতী, এদের ক্রিয়াকলাপ অপরিচ্ছন্ন। ঠিক করল পালাতে হবে এখান থেকে। কিন্তু এ কি, দরজায় যে পাহারা বসানো। শুধু তাই নয়, দরজায় একেবারে তালা দেওয়া। দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল স্বামীজি। জানলা দিয়ে দেখা গেল বাইরে পাহারাওয়ালা হাসছে। পালাবার পথ নেই। গুহায় বন্দী করেছি কেশরী।

দলের যে পান্ডা, চুপিচুপি এল স্বামীজির কাছে। বললে, 'সন্দেহ কি, তুমি একজন উঁচু দরের সাধু। দীর্ঘ দিনের অটুট তোমার ব্রহ্মচর্য। কিন্তু তোমার এ ব্রহ্মচর্যকে বলি দিতে হবে। সেই বলিতেই আমরা আমাদের সাধনায় সিদ্ধ হব। তোমাকে তাই ছেড়ে দেওয়া হবেনা।'

স্বামীজি ভয় পেল কিন্তু মুখে এতটুকু চিহ্ন ফুটতে দিলনা। বরং এমন একখানা ভাব করল যেন পরিহাসের ব্যাপার। বন্দীকক্ষে একমনে বিপত্তারিণী দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগল। সেই আড্ডায় প্রায়ই একটি ছেলে আসত বাইরে থেকে। অনেকদিন আসেনা, কিন্তু পরদিন সকালেই সে এসে হাজির। আর একেবারে স্বামীজির ঘরে। ছোট ছেলে, কারো সন্দেহের কারণ ছিলনা। আর আগে থেকেই সে স্বামীজির ভক্ত।

স্বামীজি তাকে কাছে টেনে নিল। বললে, 'ভাই, আমার বড় বিপদ। আমাকে এরা কয়েদ করে রেখেছে। কে জানে হয়তো খুন করবে।'

ছেলেটি গলা নামিয়ে বললে, 'আমি কোনো উপকার করতে পারি?'

'একমাত্র তুমিই পারো। তারই জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন ঠাকুর।'

'বলুন, এই মুহূর্তে করব।'

'একটা চিঠি লিখে দিতে চাই। তুমি সেটা নিয়ে রাজবাড়িতে ঠাকুরসাহেবকে পৌঁছে দেবে।'

'এখুনি।'

কিন্তু চিঠি লেখবার কাগজ-কলম কই? চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা খোলামকুচি পাওয়া গেল, আর একটুকরো কাঠকয়লা। তাইতেই সংক্ষেপে বিপদের কথা লিখল স্বামীজি। বললে, 'এটাকে তোমার চাদরের তলায় করে নিয়ে যাও! এক দৌড়ে চলে যাও রাজবাড়ি। ভালো করে কিছু লিখতে পারলুমনা। তুমিই সব বোলো বুঝিয়ে।'

কে কোথাকার ছেলে, ছুটল ঝড়ের মত। কোনো রাজরক্ষীর সাধ্য নেই আটকায়, একেবারে গিয়ে হাজির হল ঠাকুরসাহেবের দরবারে। চাদরের তলা থেকে অভিনব পত্রখানি বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'চলুন, এক নিশ্বাসও দেরি করবার সময় নেই। আমার প্রভু, আমার স্বামীজিকে বাঁচান।'

সব বুঝে নিল ঠাকুরসাহেব। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে দিল সেই

মুহূর্তে। স্বামীজিকে উদ্ধার করে আনা হল। লোপাট হয়ে গেল সাধুদের আস্তানা।

'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব।' অসুখের সময় বলছেন সেবার স্বামীজি : 'রঘুনন্দন বলছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমং। এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে দুঃখে মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

নিউইয়র্ক থেকে পেরুমলকে লিখছেন বিবেকানন্দ : 'বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিওনা উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছু হয়না, নামেও কিছু হয়না, বিদ্যায়ও কিছু হয়না—ভালবাসায় সব হয়। একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।'

আরো এগিয়ে চলো। লিম্বড়ি থেকে জুনাগড়। জুনাগড় থেকে ভুজ। ভুজ থেকে প্রভাস। প্রভাস থেকে পোরবন্দর। এগিয়ে চলো।

৩৬

'সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে আমি আগে যাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমিই সর্বসম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তি লাভ করিব সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর।' বলছেন বিবেকানন্দ : 'স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাইনা, সকলের শেষে যাইব —আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যের জন্যে নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।'

পোরবন্দরে রাজপ্রাসাদে আছে স্বামীজি। একদল সাধু মরুতীর্থ হিংলাজ যাবার জন্যে জড়ো হয়েছে পোরবন্দরে। অভিলাষ যদি মহারাজা কিছু অর্থসাহায্য করেন। তীর্থে তারা পদব্রজেই যেত, কিন্তু বহু পথ হেঁটে তাদের পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তপ্ত বালি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে এমন আর শক্তি নেই। ইচ্ছে, জাহাজে করাচিতে গিয়ে সেখান থেকে উটের পিঠে করে পার হবে মরুভূমি। কিন্তু বলিহারি তাদের সাহস! পথে ভাসা কতগুলি সাধু, তাদের কিনা স্পর্ধা মহারাজার কাছে দরবার করে! সাধুর দলের চাঁই একজন বাঙালি। আর সে শুনেছে রাজবাটীতে রয়েছে একজন বাঙালি পরমহংস যার কথায় রাজা প্রায় ওঠেন-বসেন। সে শুধু সংস্কৃতেই পণ্ডিত নয়, এমন ইংরিজি বলে যেন মুখে খই ফোটে। তার কথা ঠেলতে পারবেন না রাজা। এমন খাতির রাজার

সঙ্গে, চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়, রাজপুত্রদের সঙ্গেও ঘোড়ায় চড়ে খেলা করে। বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্যে করবেনা একটু সুপারিশ ? চাঁই আর তার এক সাকরেদ দেখা করতে এসেছে পরমহংসের সঙ্গে। নিচে নেমে এল স্বামীজি।

এ কে ? তুমি ? স্বামীজি থমকে দাঁড়াল।

আরে, তুমি সেই পরমহংস ? আনন্দে উছলে উঠল আগন্তুক। আগন্তুক আর কেউ নয়, স্বামীজির গুরুভাই ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী। একেই নিউইয়র্ক থেকে লিখেছিলেন স্বামীজি : 'তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নামরে বাপ ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা "হরি" এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর-গম্ভীর নাম, অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঙ্গন, অশেষনিঃশেষকল্যাণকর প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়। নামটা সরল করলে ভালো হয় নাকি ? এখন বোধহয় আর হবেনা, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদরী যমতাড়ানে নামই করেছ !'

'তুমি এখানে ?' স্বামীজি অপ্রস্তুত। ইচ্ছে ছিলনা কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

'তুমি এখানে ?' ত্রিগুণাতীত উচ্ছ্বসিত। স্বপ্নেও ভাবেনি এমন প্রত্যাশিত লোকের আশাতীত দেখা পাবে।

'কি প্রয়োজন ?'

বলেন ত্রিগুণাতীত। সাধুরা হিংলাজ যাবে, রাজার কাছে কিছু ভিক্ষা চায়। তুমি যদি বলে-কয়ে রাজাকে রাজি করতে পারো।

'ভিক্ষে ?' দলিত ভুজঙ্গের মত ফণাবিস্তার করল স্বামীজি : 'তুমি সাধু হয়ে অর্থ ভিক্ষে করতে এসেছ ? ছি ছি, এ কি হীন বুদ্ধি !'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ত্রিগুণাতীত।

'যদি স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দেয় তাই নেবে, চাইতে যাবে কেন, হাত পাতবে কোন লজ্জায় ?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল স্বামীজি : 'আর আমিই বা তোমাদের জন্যে রাজার কাছে নিচু হতে যাব কেন ? আমি কি কারু কাছে কখনো অর্থের জন্যে হাত পাতি ? আজ রাজপ্রাসাদে আছি কাল হয়তো দেখবে দরিদ্রতমের পর্ণকুটিরে। কিংবা হয়তো গাছতলায়। আমি কি আরাম-বিরাম না সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ধার ধারি ? ভুলে যেওনা আমরা পরিব্রাজক, ঘর-বন, জল-আগুন, সুখ-দুঃখ আমাদের সব সমান। আমরা দ্বিতীয় মহেশ।'

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা
স্বকীয়ে পরে বা সমস্নেন বুদ্ধ্যা
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥

ত্রিগুণাতীত উজ্জ্বলমুখে তাকিয়ে রইল স্বামীজির দিকে। এই তো সাধকেন্দ্র

বীরেশ্বরের মত কথা। ঠাকুর যে বলতেন এর মধ্যে এমন শক্তি আছে যে ইচ্ছে করলে জগৎ মাতাতে পারে এ যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

রাজপ্রাসাদও যা ডোমডোকলার ডেরাও তাই। এ সর্বসম আকাশের মত নির্মল ও নিত্যমুক্ত। স্বভাবসচ্চিদানন্দ।

'তোমার কাছে কিছু আছে ?' অন্তরঙ্গের মত জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি।

কি বলবে ত্রিগুণাতীত যেন একটু দ্বিধা করতে লাগল।

'যদি কিছু থাকে দিয়ে দাও সাধুদের। নিঃস্ব হয়ে যাও। যে নিঃস্ব সেই নিঃসম্বল নয়। হর হর ব্যোম বলে পথ ভাঙো। হোক মরুভূমি, মরুভূমিই আর্দ্রান্তরাত্মা হয়ে উঠবে। মনে ভাববে জীবনের তীর্থযাত্রা নয় জীবনের জয়যাত্রা।'

এই ত্রিগুণাতীতকেই লিখছে স্বামীজি : 'হুটোপাটিতে কি কাজ হয় ? লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙোবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, যাতে পাহাড়-পর্বত ভেদ হতে চায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভালো, যে না আসে তার ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে। তা থাকুক, তুই, কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। কুছ পরোয়া নেই, তোদের মুখে-হাতে বাগদেবী বসবেন, ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।'

'মনুর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্যের জন্যে পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা ভালো নয়।' আবার লিখছেন স্বামীজি : 'আমি এখন বেশ প্রাণে-প্রাণে বুঝছি, ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণ যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক কথা। আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং। আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ। এই যে আমার এ-করব ও-করব এ রকম ছেলেমানুষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও। কেউ যেন তোমার শত্রু-মিত্র না থাকে—তুমি একাকী বাস কর। এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে সুখদুঃখের অতীত হয়ে বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে কোনো প্রাণীকে হিংসা না করে আমরা পাহাড়ে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে আবার পথে নামল স্বামীজি। এবার এল দ্বারকায়। প্রভাস আগেই হয়ে গেছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগ করেছিলেন, এবার দ্বারকায়, যেখানে রাজত্ব করেছিলেন মহাপ্রতাপে।

কিন্তু কোথায় সেই দ্বারকা ! সেখানে আজ সমুদ্রের নীল নির্জনতা। কৃষ্ণ কি শুধু পতিতপাবন না, তিনি আবার পতিতঘাতন। ক্ষমা মৈত্রী অহিংসার কথা কি হিন্দুশাস্ত্রে কম আছে ? বিদুরবাক্যই তো এই যে 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।' শত্রুকে প্রীতি দ্বারা অন্যায়ীকে ন্যায় দ্বারা হিংসুককে অহিংসা দ্বারা জয় করবে। তাই বলে কি শত্রুর কাছে বশীভূত হয়ে থাকবে ' এই কি হিন্দুত্ব ? ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ, ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।

সবসময়েই তেজ বা সবসময়েই মৃদুতা এ ঠিক নয়। অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যেমন পাপ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও সেই পাপ।

যুদ্ধে হেরে এসে ঘুমুচ্ছে সঞ্জয়। তার মা বিদুলা তখন তাকে বলছে: হা অরাতিহর্ষবর্ধন কাপুরুষ, গাত্রোত্থান করো। কূপ অল্প জলে পরিপূর্ণ হয়, মূষিকের অঞ্জলি অল্প দ্রব্যে ভরে ওঠে আর কাপুরুষ অল্পমাত্রলাভেই তুষ্ট থাকে। শত্রুনির্জিত হয়ে আর শয়ান থেকোনা, ওঠো। শ্যেনপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়। অশঙ্কিত চিত্তে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের মত পড়ে আছ? মুহূর্তমধ্যে প্রজ্বলিত হও। তুষাগ্নির মত চিরকাল ধূমায়িত হয়োনা। চিরকাল ধূমায়িত হওয়ার চেয়ে ক্ষণকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়। নির্জিত হয়েও যে ক্রুদ্ধ হয়না, প্রতিকার করেনা, সে ক্লীব—তার আর কিসের জন্যে প্রাণধারণ? ওঠো। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পতনসময়েও শত্রুর জঙ্ঘা আকর্ষণ করে তার সঙ্গে একত্র নিপতিত হয়, ছিন্নমূল হলেও ভগ্নোদ্যম হয়না। সুতরাং আয়াসহীন আলস্যে পড়ে থেকোনা। মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় দান, উত্তম উপায় দণ্ড। উত্তম উপায় অবলম্বন করো। উঠে দাঁড়াও, দণ্ডধর হয়।

দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের সারদা-মঠে আশ্রয় নিল স্বামীজি। নির্জন কক্ষে বসে ভাবতে লাগল সেই অতীত ভারতের কথা। গৃহহীন চিরপথিক সাধুসন্ন্যাসীদের কথা। শুধু কি অতীত? দেখতে পেল ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন। বীর বিজয়ী নতুন আরেকরকম সন্ন্যাসীর দল। কর্মে ত্যাগে বলে বীর্যে ভক্তিতে শক্তিতে নববলসাধক। রামকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিত।

দ্বারকা ছেড়ে চলে এল মাণ্ডবীতে।

কোনো তীর্থ আর দেবতা কোনো মঠ আর মন্দির বাদ রাখবোনা। ভারতের সোনার ধূলি মুঠো-মুঠো করে গায়ে মাখবো।

বরোদা হয়ে চলে এল খাণ্ডোয়ায়। হাঁটতে-হাঁটতে হরিদাস চাটুজ্জে উকিলের বাড়িতে।

'কি চাই?' কোর্ট থেকে ফিরছেন, দরজায় সন্ন্যাসী দেখে বিরক্ত হল হরিদাস। ভাবলে ভেক-ধরে-ভিক-মাগা পেট-বোরেগীদের কেউ হবে।

'আপনাকে চাই।'

অপার বিস্ময়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল হরিদাস। নিশ্চয়ই মক্কেল নয়, নিশ্চয়ই উকিলকে চায়না। আপনাকে চাই। যেন মর্মের অদৃশ্য শিকড় ধরে টান-মারা কথা। দুই চোখে কি গভীর পরিচিতির সৌহার্দ্য। আপনজন বলেই তো চাইতে পারছি আপনাকে। উজ্জ্বল করে লেখা দুই চোখে যেন সেই ভাষা!

'আসুন! আসুন!' হরিদাস হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল স্বামীজিকে। কথায়-কথায় এ কথা আর মনে হলনা, কোথায় উঠেছেন বা কতদিন থাকবেন। মনে হল এ গৃহই যেন তাঁর চিরন্তন নিকেতন, সময় ক্ষয় হয়ে গেলেও যেন থাকার ক্ষয় নেই।

সমস্ত বাঙালি সমাজ মেতে উঠল। জজসাহেব মাধব ব্যানার্জি ভোজ দিলেন। উপনিষদ নিয়ে কথা উঠল। স্বামীজি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। শুধু পাণ্ডিত্য নয় প্রাঞ্জলতা। কে তর্ক করবে, কে বলবে বুঝতে পাচ্ছিনা। গভীরে জেতে পারলেই তো সাফল্যের স্পর্শ লাগে। আর যে স্বচ্ছ সেই তো মুক্ত সেই তো শত্রুঞ্জয়। বাক্য ও ব্যাখ্যার আলোকস্নানে সবাই রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

পিয়ারীলাল গাঙ্গুলি উকিল হলে কি হবে এ অঞ্চলের সেরা পণ্ডিত। সে মন্ত্রাভিভূতের মত বললে, 'এ জগৎপ্রসিদ্ধ হবে।'

কথাটা কানে উঠল স্বামীজির। স্বামীজি মনে মনে হাসল। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা।

'আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন। টকটকে লাল সুরকির কাঁড়ির মত জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

'শিকাগোতে যাবেন ?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল হরিদাস।

'সেখানে কি ?'

'সেখানে ধর্মমহাসভা হবে। সবধর্মের প্রতিনিধি যাবে। আপনি যাবেন হিন্দুর হয়ে।'

স্বামীজি হাসল। সেই যে বলে 'নেই চাল নেই পাত, চড়িয়ে দাও শুধু ভাত', এ প্রায় সেই অবস্থা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

'আপনি বম্বে যাচ্ছেন ?' ঝলসে উঠল হরিদাস : 'আমি সেখানকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

৩৭

সঞ্জয় বললে, মা, আমি তোমার একমাত্র পুত্র। আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে পৃথিবীর জয়ৈশ্বর্য দিয়ে তোমার কী হবে ? তোমার হৃদয় কি লৌহনির্মিত ? ছেলের জন্যে তোমার এতটুকু করুণা নেই ? মা হয়ে তুমি তাকে শত্রুমুখে ঠেলে দেবে ?

সৌবীররাজমহিষী বিদুলা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। বললে, পুত্র, তোমার বংশগৌরব আজ কলঙ্কসাগরের অতলজলে ডুবেছে ! নষ্ট কীর্তি উদ্ধারের জন্যে তোমাকে উৎসাহ না দিলে আমার পুত্রস্নেহ শুধু গর্দভীর সন্তানবাৎসল্যেরই অনুরূপ হবে। শত্রুনির্জিত ধর্মার্থভ্রষ্ট ভোগসুখবঞ্চিত হয়ে জীবনধারণের উপদেশ কেউই দেবেনা, কোনো দিন না। এমন জীবন সজ্জনবিগর্হিত, মূর্খসেবিত। ছি ছি, তুমি স্নেহের কথা বলছ; তোমার দেহের জন্যে তুচ্ছ মায়ার

কথা ? দেহে আত্মবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি বিজয়কেশরীর বৃত্তি অবলম্বন করতে পারো তবেই তুমি আমার স্নেহের ধন, আমার অঞ্চলের নিধি। নচেৎ তোমাকে ধিক। নিরুৎসাহ কাপুরুষ পুত্র দিয়ে কোনো নারীই পুত্রবতী হয় না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। একবার হার হয়েছে বলে পুনরায় জয় হবে না এ কেউ বলতে পারে না। শত্রু জয় করবে বলেই তোমার নাম সঞ্জয় রেখেছিলাম। অন্বর্থনামা ভব মে পুত্র মা ব্যর্থনামকঃ। হে পুত্র, সার্থকনামা হও, বিফলনামা বিপরীতনামা হয়ো না।

সঞ্জয় কি তবু চুপ করে থাকবে ?

বিদুলা বলতে লাগল, 'যে গ্লানিপঙ্কের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ তার চেয়ে অবমাননাকর আর কী আছে ? যার প্রতিদিন অন্নচিন্তা তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। দারিদ্র্য মরণের তুল্য, রাজ্যনাশ পতিপুত্রবধের চেয়েও দুঃখকর। মরালী যেমন এক সরোবর থেকে আরেক সরোবরে উড়ে যায় আমিও তেমনি এক রাজকুল থেকে আরেক রাজকুলে এসেছি। কুলকন্যা থেকে কুলবধূ। রাজ্যনাশের বেদনা তাই আমার কাছে সহনাতীত। সঞ্জয়, ওঠো, অকূলে কূল দাও, অস্থানে স্থান দাও, বিপদসাগরে নিস্তারনৌকা হও—'

সঞ্জয় কশাহত তুরঙ্গের মত উঠে দাঁড়াল। বললে, মা, আমি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।

যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সে জয়ের জন্যেও প্রস্তুত।

শ্রীকৃষ্ণকে সেই কথাই বলছে কুন্তী। বলছে, বাসুদেব, যুধিষ্ঠিরকে তুমি আমার এই কথা বোলো যে সে মন্দমতি, ক্ষত্রিয়ব্রতে অপটু। সংকট হতে মানুষকে ত্রাণ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। শান্তি ও স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরী ক্ষত্রিয়। তাকে আরো বোলো, তোমার ধর্ম রাজধর্ম, রাজর্ষিধর্ম নয়। তুমি ক্ষতত্রাতা বহুবীর্যোপজীবিত। তোমার মায়ের দুঃখ বোঝো, তাকে পরগৃহে নিরাশ্রয়া প্রতিষ্ঠাশূন্যা করে রেখোনা। দণ্ড ধরো, ধনুকে জ্যা আরোপ করো, টঙ্কার দাও—

যেন কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে আছে, স্বামীজি বললে, যেন 'শ্লিপিং লেভায়াথান', ঘুমন্ত সমুদ্রদানব। সাড়া নেই স্পন্দন নেই বিরাট জাড্যের অনড় মৃৎপিণ্ড—এরই নাম বোধ হয় হিন্দুজাতি। একে বলসাধনায় আলোড়িত করতে হবে। জীবন্মৃতকে চেতনাপ্রহারে জর্জরিত সঞ্জীবিত করতে হবে। চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু বজ্রভীষণ মনোবল। অশ্বিনী দত্তকে বললেন, 'অশ্বিনী, আর কিছু নয়, এনার্জি ইজ রিলিজিয়ন। শক্তিসাধনাই ধর্মসাধনা।'

বলবীর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা।

বম্বে থেকে পুনায় এল স্বামীজি। সেখানে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে আলাপ। আলাপ ট্রেনের কামরায়। তিলক আর তাঁর ক'জন সঙ্গী আলাপ করছেন, এক কোণে স্বামীজি বসে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনের কামরায় সন্ন্যাসী দেখে স্বভাবতই সন্ন্যাসী নিয়ে কথা উঠল। কর্মবিমুখ আত্মসুখলিপ্ত ভাবভোগীর

দল। এই সন্ন্যাসীরাই জগৎ-মায়া-জীবন-অনিত্য ধ্বনি তুলে দেশের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। সন্ন্যাসের আদর্শ দেশ থেকে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মুক্তি নেই।

আলাপ হচ্ছে ইংরিজিতে। আর যেহেতু সবাই স্বামীজিকে সাধারণ একজন মুসাফির মনে করছে, তাই মন খুলে। সংস্কৃত হলে ছিটেফোঁটা জানতে পারে কিছু বা, কিন্তু ইংরিজির আশা দূরপরাহত।

কান খাড়া করে শুনছে সব স্বামীজি, আর আশ্চর্য হচ্ছে এদের মধ্যে মাত্র একজন সন্ন্যাস-আদর্শের নিন্দা করছে না, বরং সমর্থন করছে, সম্মাননা করছে। একদিকে একজন অন্যদিকে বহু। স্বামীজি আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেই একক ক্ষীণ-কণ্ঠের সঙ্গে মেলাল তার বজ্রঘোষ। সন্ন্যাসীর মুখে বিশুদ্ধ-উচ্চারিত অনর্গল ইংরিজি শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সম্যকপ্রকার ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। ত্যাগরূপ-যজ্ঞ ছাড়া অমৃত-উদ্ধার হবার নয়। কিন্তু ত্যাগ যে করবে তার আগে অর্জন দরকার। নিবেদন যে করবে তার আগে নৈবেদ্য-সংগ্রহ করো। দূরে শরনিক্ষেপ করবে তার আগে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করো নিজের দিকে। অহং না পেলে আত্মায় উৎসর্গ করবে কি করে? যার ঐশ্বর্য বা বিভূতি নেই সে ত্যাগ করবে কী! তাতে আর দীনহীন পথের ভিক্ষুকে তফাৎ কোথায়?

মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রইল স্বামীজির দিকে।

আত্মশক্তির বিকাশ করো, সেই শক্তিতে অনাত্মভাব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। অর্জন করে সব আপন করো, বিশ্বশক্তি তোমারই আত্মভাবের প্রকাশ কিছুই আর তোমার পর নয়। তোমার আপনরূপ ছাড়া দ্বিতীয়রূপ আর কিছু নেই। আত্মকে জেনে বিশ্বে তাকে বিস্তার করো। আর জ্ঞান ছাড়া কি ত্যাগ হয়? বিদ্বৎসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস।

এ কে অনন্যানন্দ মহাপুরুষ?

অনন্তচৈতন্যময় সত্তার সাগরে আত্মভাবের বুদ্বুদকে নিমজ্জিত করে দাও। তাতেই অমৃতত্ব। ঐ অমৃত ছাড়া তৃপ্তি নেই শান্তি নেই। ঐ অমৃতেই সকল ভ্রমণের শেষ, সকল অন্বেষণের উত্তর।

যে একা সন্ন্যাস-আদর্শের স্তুতি করছিল সে এগিয়ে এল স্বামীজির কাছে। জিগগেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'পুনায়। আপনি? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম বালগঙ্গাধর তিলক।'

তিলক স্বামীজিকে পুনায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। একমাস রাখল নিজের কাছে। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনব্রতের নবোচ্চারিত মন্ত্রের অর্থ শুনল।

মহাবলেশ্বরে লিমড়ির ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে দেখা, 'স্বামীজি, কেন সারাদেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন? লিমড়িতে চলুন, আমার প্রাসাদে চিরদিন বিশ্রাম করবেন।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'আমার বিশ্রাম নেই। আমি যে কাজ উদযাপন করতে বেরিয়েছি তার টানে আমাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। ভ্রমণই আমার স্থিতি। কর্মই আমার বিশ্রাম।'

মহাবলেশ্বর থেকে কোলাপুর। কোলাপুরের রাণী স্বামীজিকে একখানি গেরুয়া দিল। যদি নেন তো চিরকৃতার্থ হব। কত কিছু দান করছি ভাণ্ডার থেকে। তার সঙ্গে অহঙ্কার কোন্ না মেশানো থাকে। কিন্তু এ দান নয়, এ নিবেদন। এতে দীনতার পুণ্যগন্ধ।

সেই সুবাসটুকু অনুভব করল বলেই গ্রহণ করল স্বামীজি।

সেখান থেকে বেলাগাঁও। প্রফেসর ভাটের বাড়ি।

এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। আর-আরদের মত খালি গায়ে থাকেনা, বেনিয়ান পরে। মাথায় জটা নেই, পাগড়ি। হাতে দণ্ড নেই, লম্বা একটা লাঠি, বেড়াবার ছড়ি বললেই ভালো হয়। কমণ্ডলু আছে একটা বটে কিন্তু পকেটে তিনখানি বইয়ের মধ্যে একখানি ফরাসী গানের স্বরলিপির বই! আর কথা বলে কিনা ইংরিজিতে। শুধু ধর্ম আর ঈশ্বরের কথা নয়, সমস্ত লোকসংসারের কথা, সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতি। শুধু শাস্ত্র নয়, সমস্ত খবরের কাগজ যেন মুখস্থ। তারিখ মিলিয়ে দেখ, এতটুকু নেই কোথাও ভুলচুক।

শিষ্যা মৃণালিনী বসুকে চিঠি লিখলেন স্বামীজি: 'মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে। সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি-আমি দশজন বড় জাত? সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত—'

তার উপর কিনা পান-শুপুরি চেয়ে নিয়ে খায়। সেদিন কিনা দোক্তাও চেয়ে বসল। এতে স্তম্ভিত হবার কিছু নেই। বলছে স্বামীজি। শ্রীগুরুমহারাজ আমার অসম্ভব রকম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কিন্তু এসব তুচ্ছ নেশাগুলির দিকে নজর দেননি। বলেছেন এ থাক, এতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

'মাছমাংস খান, না, নিরামিষ?'

'মাঝখানের ঐ না-টুকু নেই। যখন যা জুটবে তাই খাব।'

'যদি না জোটে?'

'উপবাসে থাকব। নিরম্বু উপবাস।'

'যদি অহিন্দু নিয়ে আসে খাবার?'

'খাব। কত মুসলমানের বাড়ি অতিথি হয়েছি।'

অসাধারণই বটে। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়ছিল ভাটে, পাশটিতে চুপ করে

এসে বসেছে স্বামীজি। ভুল উচ্চারণ ও ভুল উদ্ধৃতির সংশোধন করে দিচ্ছে। সমস্ত শাস্ত্র যেন জিহ্বাগ্রে।

তর্কে বিন্দুমাত্র রোষ নেই রূঢ়তা নেই। সেদিন তো বেলগাঁওয়ের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র তর্ক করতে এসে কটু কথা বলে বসল, তত্রাচ স্বামীজির মুখের সরল লাবণ্যটুকু ম্লান হলনা। বললে, যাই বলুন বেদান্ত বনের জিনিস নয় ঘরের জিনিস, কোনো সম্প্রদায়ের নয় সমস্ত বিশ্বমানবের। এই বিশ্বমানবের একটিমাত্র ধ্বনি। তাই ওঁ। ওঁই পরমাত্মার প্রিয় নাম। ওঁ-ই সম্মতিবাচক স্বীকৃতিজ্ঞাপক শব্দ। তাই ওঁ-ই পরমাত্মার প্রতীক। ওঁ-এর মানেই হচ্ছে হাঁ, আছে, পেয়েছি। সেই ধ্বনিটি শুধু আমাতে নয় সমস্ত চরাচরে। সমস্ত পরিপূর্ণতার স্বীকারমন্ত্রই ওঁ! এইটিই আমার পতাকার পত্রচিহ্ন। পথে-প্রান্তরে এই পতাকা বহন করে নিয়ে যাব, প্রাসাদে-কুটিরে, হাটে-বাজারে, গঞ্জে-গ্রামে, যত্রতত্র। যিনি দিয়েছেন তিনিই বহন করবার শক্তি দেবেন। আর যদি না দেন, প্রকৃতির কাছে না হয় বলিপ্রদত্ত হব।

'জগতের মধ্যে যারা পরমসাহসী যাতনাই তাদের বিধিলিপি', লিখছেন স্বামীজি : 'আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখযন্ত্রণাকে স্বচ্ছন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আমি আনন্দিত, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে আমিও তাদেরই একজন।'

৩৮

কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ মহাবীর হনুমানের কথা।

'হে হরিশার্দূল, হে বানরশ্রেষ্ঠ, মহার্ণব লঙ্ঘন করো।' সেনাপতি জাম্ববান বলছে হনুমানকে, 'তুমি ছাড়া কারু সাধ্য নেই এই দুষ্পার পারাবার অতিক্রম করে। এই পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-আচ্ছন্ন সমুদ্র দেখে বানরকুল বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, তুমি একবার তোমার বিক্রম দেখাও। তুমি বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাবলপরাক্রম। শৈশবে নবোদিত সূর্য দেখে পরিপক্ব ফল মনে করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলে, তিনশত যোজন উঠেছিল আকাশে। আবার তোমার সেই দুর্দমবেগ প্রকাশিত করো।'

বানরবৃদ্ধদের অভিবাদন করে হনুমান বললে, 'সকলে নিশ্চিন্ত হও, আমি মহেন্দ্র পর্বতে তুঙ্গতম শিখরে গিয়ে উঠছি। আমি সেখান থেকে লাফ দেব। রামের হস্তনিক্ষিপ্ত শর যেমন ছোটে তেমনি প্রধাবিত হব শূন্যে। আকাশে-সমুদ্রে এমন কেউ নেই যে আমার বেগ প্রতিরোধ করে।'

মহাকায় মহাকপি লাফ দিল। পক্ষসমন্বিত পর্বতের মত শোভিত হল আকাশে। তখন সাগর ভাবল এর কিছু আনুকূল্য করি। জলমগ্ন মৈনাকপর্বতকে বললে, 'গিরিবর, তুমি এবার একবার উত্থিত হও। ভীমকর্মা হনুমান শ্রান্ত হয়েছে,

তোমার উপর বসে সে একটু বিশ্রাম করবে।'

সাগরজল ভেদ করে মৈনাক উত্থিত হল। হনুমান ভাবল আকস্মিক এক বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল বুঝি। বুকের আঘাতে তাকে আবার অবনমিত করল।

মৈনাক বললে, 'বানরোত্তম, তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্যেই আমি আবির্ভূত হয়েছি। তুমি দুষ্করকর্মে ধাবমান হয়েছ, তোমাকে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দুদণ্ড আমার শৃঙ্গে বসে বিশ্রাম করো। তারপর আবার যাত্রা কোরো।'

আকাশপথে হনুমান উত্তর দিল, তোমার কথাতেই আমি আতিথ্যলাভ করেছি। দুঃখিত হয়োনা, আমার বিলম্ব করার সময় নেই। কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

সেই প্রতিজ্ঞা স্বামী বিবেকানন্দেরও। ফরেস্ট অফিসর হরিপদ মিত্রর ইচ্ছে স্বামীজিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যায়।

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?' স্বামীজি ইতস্তত করল: 'বাঙালি দেখেই যদি চলে যাই তবে মারাঠি ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হতে পারেন।'

'কিন্তু কাল সকালে আমার ওখানে চা খেতে আপত্তি নেই তো?'

'না, না, যাব চা খেতে।'

আটটা বেজে গেল, তবু স্বামীজির দেখা নেই। এ কেমনতরো চা খাওয়া! ভুলে গেল নাকি? ভুলেই বা যাবে কেন? হরিপদ নিজেই দেখতে চলল কি ব্যাপার। গিয়ে দেখল মারাঠির বাড়িতে বিরাট মজলিশ। শহরের বহু জ্ঞানী-গুণী লোক স্বামীজিকে ঘিরে বসে ধর্মসম্বন্ধে বিচিত্র প্রশ্ন করছে, ইংরিজিতে, বাঙলায়, হিন্দিতে, সংস্কৃতে—আর স্বামীজি যার যা ভাষা সেই ভাষায় তাকে উত্তর দিচ্ছে অনর্গল। এতটুকু বিরতি নেই, বিরক্তি নেই। প্রশ্নকর্তারাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সাধারণত উত্তরদাতাই ঘায়েল হয়, আমতা আমতা করে আবোমতাবোল বকে, এখানে প্রশ্নকারীই নিরস্ত-পরাস্ত। কোথাও সুতীক্ষ্ন যুক্তি, কখনো বা গভীর উপলব্ধির তেজ, কোথাও বা নৃশংস বিদ্রূপ। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে আধুনিক বিজ্ঞান সর্ববিষয়েই অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি। মুগ্ধবিস্ময়ে শুনতে লাগল হরিপদ।

হাত জোড় করল স্বামীজি। হরিপদকে লক্ষ্য করে বললে, 'ভাই, যেতে পারিনি, মার্জনা চাই! এতগুলো লোকের প্রাণের পিপাসা মেটাতে গিয়ে নিজের পিপাসাকে ভুলে যেতে হয়েছে।'

'আপনি আমার বাড়ি চলুন। শুধু একবেলা চা খেতে নয়, কয়েক দিন থাকতে।'

'বড় জোর তিনদিন। একটি বৃক্ষের নীচেও সনাতন গোস্বামী তিনদিনের বেশি বসতেন না। কিন্তু তার আগে এই গৃহস্বামীর মত করো। তিনি না ছাড়লে যাই কি করে?'

মারাঠি ভদ্রলোকের মত করিয়ে হরিপদ স্বামীজিকে নিয়ে গেল স্বগৃহে। বললে, 'মহারাজ, একটা কথা জিগগেস করব?'

'করো।'

'ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে হলে অনেক কিছু লেখাপড়া করতে হয়, তাই না?'

কেমন যেন অসহায় দেখাল হরিপদকে। স্বামীজি কত কিছু পড়েছেন, তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ স্মৃতিশক্তি দুর্মর—সেই তুলনায় হরিপদ তো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়ে তুচ্ছ। তার কি উপায় হবে?

স্বামীজি হাসল। বললে, 'ধর্ম বুঝতে কানাকড়ি বিদ্যের দরকার হয় না। বোঝাতে গেলেই জাহাজবোঝাই বিদ্যের দরকার। ঠাকুর বলতেন, নিজেকে মারতে একটা নরুন হলেই চলে, কিন্তু অন্যকে মারতে হলে দা-কুড়ুল বর্শা-টাঙি অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রভুকেই দেখনা। রামকেষ্ট বলে সই করতেন কিন্তু তাঁর মত ধর্ম আর কে বুঝেছিল বলো?'

শ্রীকৃষ্ণ কি বললেন অর্জুনকে? বললেন, যে অনন্যভাক বা অন্যভক্তি হয়ে আমাকে ভজনা করে সে যদি ঘোর দুরাচারও হয়, জানবে সে সাধু। ভক্তির স্পর্শেই সে সাধু হয়ে যাবে। আর, যে ভক্ত, জানবে তার কখনো বিনাশ নেই।

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই তো ধর্মসাধন। আর ভালোবাসাই তো সহজসাধন। ভক্তির স্পর্শেই দুর্বৃত্তও নিমেষে সাধু হয়ে উঠবে। হাওয়াতে মেঘের টুকরোটুকু সরে গেলেই মুহূর্তে সূর্যের দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত। ভক্তিরই এই পতিতপাবনী শক্তি। হেন পাপ নেই যা জগাই-মাধাই করেনি, প্রেমের স্পর্শে কি হয়ে গেল? নিশাকালে গঙ্গাস্নান সেরে নির্জনে বসে প্রতিদিন এখন দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, আমার চিন্তায়ই মনকে নিযুক্ত রাখো, আমাতেই ভক্তিমান হও, পূজাপরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার করো। আমাতেই শরণ নিয়ে অধিষ্ঠিত থাকো। যা কিছু করো, কর্ম ও ভোজন, দান বা তপস্যা, সব আমাকেই অর্পণ করো। যে অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করে আমি তার যোগক্ষেম বহন করি। অর্থাৎ যা নেই তার সংস্থান করি, যা তার আছে তা রক্ষা করি।'

অলব্ধ বস্তুর সংস্থান হচ্ছে যোগ আর লব্ধবস্তুর রক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম।

'যে কোনো কাজ করবে মনপ্রাণ ঢেলে করবে।' বললেন স্বামীজি, 'নির্ধারিত কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ করাই ধর্ম। আমি এক সাধুকে জানতাম, বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে নিজের পিতলের লোটাটাকে মাজত একমনে। মেজে-মেজে সোনার মত ঝকঝকে করে তুলত। যেমন তার পূজায় নিষ্ঠা তেমনি এই লোটা-মাজায়। কোনোটাই কম নয়। লোটা মাজছে যেন অন্তর মার্জনা করে স্বর্ণবর্ণ করে তুলছে।'

একটি ছাত্র এসেছে স্বামীজির কাছে। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, মতলব কি করে তা এড়ানো যায়, তাই সাধু হবার অভিলাষ। বললে, আমাকে আশ্রয় দিন। সাধু করে নিন আপনার সঙ্গে।'

স্বামীজি বললে, 'এম, এ-টা পাশ করে এস, সাধু করে নেব। সাধু হওয়ার

চেয়ে এম, এ, পাশ অনেক সোজা।'

কি আশ্চর্য, মনের কথাটা কি করে ধরে ফেললেন! যুবক চলে গেল হেঁটমুখে।

সব সময়েই অসুখ—এই মনোব্যাধিতে ভুগছে হরিপদ। আর থেকে থেকে একটার পর একটা ওষুধ খাচ্ছে।

স্বামীজি বললে, 'আমি তোমার অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল হরিপদ। বললে, 'সারিয়ে দিচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি।' বজ্রকণ্ঠে বললে স্বামীজি, 'তোমার কোনোই অসুখ নেই—এই বলবান প্রত্যয়ের ভাবই তোমার সর্ব অসুখের মহৌষধ। বিষ নেই বললে সাপের বিষও চলে যায়, অসুখ নেই বলতে পারলে অসুখ উড়ে যাবে। আনন্দ করো, সেই আনন্দ যাতে শরীর না ক্লান্ত হয় মনে না অনুতাপ জাগে, আর শুদ্ধভাবে থাকো আর মহৎ চিন্তা মনে লালন করো। কোথায় ব্যাধি, কোথায় অবসাদ! আর মৃত্যু ? মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে দাও। ভাবো, তোমার আমার মত শতসহস্র লোক মরে গেলেও পৃথিবীর কিছু আসে যায়না। মরাটাকে বয়ে যেতে দাও, বাঁচাটাকেই বয়ে যেতে দিও না।'

হরিপদর রোগব্যাধি সেরে গেল। আরো এক ব্যাধি আছে—সবসময়ে অফিসের কর্তাদের সমালোচনা করা। সমালোচনা করা মানে নিন্দে করা।

'তোমার সমালোচনা কে করে! পালটা একবার শুনে এলে হয় তোমার কর্তাদের মুখে!' স্বামীজি ধমক দিয়ে উঠল : 'শোনো। তুমি যদি তাদের প্রতি প্রসন্ন হও তারাও তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে। তুমি বিরূপ হলে তারাও বিরূপ। অন্যের গুণ দেখ, অন্যেও তোমার গুণ দেখবে। তোমার প্রতি অন্যের ব্যবহার তাদের প্রতি তোমারই মনের প্রতিচ্ছায়া। যেমন ভিতরের চিত্ত তেমনি বাইরের চিত্র।'

নিরভিযোগ হয়ে গেল হরিপদ।

হরিপদর বিলিতি ভঙ্গি, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবেনা।

'দারিদ্র্য তাড়াতে পারো বুঝি, নয়তো দোরগোড়া থেকে ভিখিরিকে তাড়িয়ে দিয়ে বাহাদুরি কি ?'

'পয়সা দিলেই তো গাঁজা কিনে খাবে।'

'দেবে তো দু'চারটে পয়সা, কি খেল না খেল তোমার খোঁজখবরে কি দরকার ? তোমার উদ্বৃত্ত আছে, দিয়েই তোমার পাপক্ষয়।'

হরিপদর কৃপণ মুষ্টি উন্মুখ হল।

আরো এক উপসর্গ আছে, তর্ক করে। স্বামীজি বললে, 'তর্ক মরুভূমি। উপলব্ধিই হচ্ছে শ্যামছায়াচ্ছন্ন খর্জুরকুঞ্জ।'

কয়েকদিন ধরে রাখতে চাইল হরিপদ, স্বামীজি ঘাড় নাড়ল। এবার যাব দাক্ষিণাত্যে। নাগমাতা সুরমার মত সংসাররাক্ষসী যতই মুখব্যাদান করুক হনুমানের মত যাব নিষ্ক্রান্ত হয়ে। হনুমান সাগর লঙ্ঘন করছে দেখে সিদ্ধ-

গন্ধর্ব-দেবতারা নাগমাতা সুরমাকে বললে, রাক্ষসরূপ ধরে হনুমানের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করো। সুরমা ভয়াবহ মূর্তি ধরে মুখবিস্তার করলে। হনুমানকে বললে, 'বানরোত্তম, দেবতার বিধানে তুমি আমার ভক্ষ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছ, সুতরাং আমার মুখে প্রবেশ করো।'

কি দুর্নিমিত্ত! হনুমান দেহ স্ফারিত করতে লাগল, সুরমার গ্রাসও বড় হতে লাগল অনুরূপ। হনুমান তখন কি করে! মুহূর্তমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে গেল। ছোট্টটি হয়ে মুখবিবরে প্রবেশ করেই চক্ষের পলকে বেরিয়ে এল। অন্তরীক্ষে উঠে বললে, 'নাগমাতা তোমার কথা রেখেছি। এবার চলেছি শ্রীরামের কথা রাখতে।'

মহামায়া যতই বন্ধনরজ্জু আনুন দড়িতে কুলোবেনা। আর যদি বেশি দড়ি আনেনও, এত ছোট্টটি হয়ে যাবে, গ্রন্থি দিতে পারবেননা কিছুতেই।

৩৯

আমি যেমন বুঝি আর কেউ তেমনি বোঝেনা এই ভাবটা ত্যাগ করো।

এক রাজার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে বিদেশী। রাজা মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। কি উপায়ে রাজ্যরক্ষা হতে পারে তার উপদেশ করো। কারুশিল্পীরা বললে, রাজ্যের চারদিকে গভীর করে পরিখা খনন করলেই হবে। মৃৎশিল্পীরা বললে, শুধু পরিখায় ঠেকানো যাবেনা। আমরা বলি উঁচু করে মাটির দেয়াল দিন। সূত্রধরেরা বললে, দেয়াল দেওয়া ভালোই তবে মাটির নয়, কাঠের। চর্মকারেরা বললে, কাঠের নয় চামড়ার, কে না জানে কাঠের চেয়ে চামড়া মজবুত। কর্মকারেরা হাসল। বললে, লোহার চেয়ে আর শক্ত কে? লোহার দেয়ালই সবচেয়ে সমর্থ। উকিল-মোক্তারের দল এগিয়ে এল। বললে, ও সবে অনেক শ্রম অনেক অর্থ। আমাদের বলুন আমরা শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্কে বুঝিয়ে দিয়ে আসি বলপূর্বক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করায় তাদের কোনো অধিকার নেই। আহা, যুক্তিতর্ক শোনবার জন্যে কান তারা খাড়া করে আছে আর কি। এগিয়ে এল পুরোহিতের দল। বললে, আমরা যা বলছি তাই সেরা কথা, তাই পালন করুন। গ্রহদেবতার সন্তোষ করুন। যাগযজ্ঞ করুন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করুন—

যার যেমন স্বার্থ সে তেমনি বলছে। তারপর শুরু হয়ে গেল অন্তঃকলহ, আত্মসাধনসংঘাত।

ঠাকুর বলতেন, সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কথা কারু মনে হয়না।

সেই সূর্য কি? সেই সূর্য ঈশ্বর। ঈশ্বর কি? স্বার্থস্পর্শলেশশূন্য নিরন্তর কর্ম।

'প্রভুর মত কাজ করো, ক্রীতদাসের মত নয়।' বলছে স্বামীজি : 'নির্বিশ্রাম

কাজ করো। শতকরা নিরানব্বুই জন দাসের মত কাজ করে, তাই তার ফল দুঃখ, সেরূপ কাজ স্বার্থপর। স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করো, ভালোবাসার সঙ্গে কাজ করো। স্বাধীনতা না থাকলে ভালোবাসা কোথায়? ক্রীতদাসের কি ভালোবাসা থাকে? একটি দাস কিনে এনে শিকলে বেঁধে যদি তাকে কাজ করাও সে বাধ্য হয়ে কণ্টেস্‌ষ্টে কাজ করবে বটে, কিন্তু তাতে ভালোবাসার নাম-গন্ধও থাকবে না। স্বার্থের জন্যে যে কর্ম তাতে শুধু ক্ষোভ, আর ভালোবাসার জন্যে যে কর্ম তাতে শুধু আনন্দ।'

'শরীরে তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়?' আবার বলছেন স্বামীজি: 'মর্চে পড়ে-পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মরা ভালো। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভালো। এ অনিত্য সংসারে দু'দিন বেশি বেঁচেই বা লাভ কি। জরাজীর্ণ হয়ে একটু-একটু করে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যে লড়াই করে নিমেষে মরে যাওয়াও সুখের। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। হে বৎস, সৎকর্মকারীর কখনো দুর্গতি হয় না।'

বেলগাঁও থেকে বাঙ্গালোর। স্বামীজি ভাবল, গাঢাকা দিয়ে থাকব। কিন্তু সূর্য কতক্ষণ থাকতে পারে মেঘাবৃত হয়ে? মহীশূর রাজার দেওয়ান শেষাদ্রি আয়ারের কাছে খবর গেল।

এ কে অত্যাশ্চর্য পুরুষ! সমস্ত শাস্ত্র নখাগ্রে, প্রতিভাভাসিত ললাট, জ্যোতির্ময় চক্ষু, কে এ তরুণ সন্ন্যাসী! সমস্ত উপস্থিতি এই শুধু উচ্চারণ করছে সে ঈশ্বরপ্রেরিত। নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল আয়ার।

'কোরানের এ জায়গাটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?' মহীশূরের রাজার সভাসদ আবদুল রহমান এসে বললে।

'কোন জায়গাটা?' কুণ্ঠার এতটুকুও কুয়াশা নেই এমনি নিশ্চিন্ত সারল্য স্বামীজির কণ্ঠস্বরে।

জায়গাটা আওড়াল রহমান।

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অর্থের গ্রন্থিমোচন করল স্বামীজি। সন্দেহের মীমাংসা করে দিল।

আয়ারের ইচ্ছে হল রাজা উদিয়ারের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ করিয়ে দেয়। রাজা একবার চোখ মেলে দেখুক কাকে বলে ত্যাগ কাকে বলে বিদ্যা কাকে বলে ধর্মদৃষ্টি। কাকে বলে বহ্নিদীপ্তিময় ব্যক্তিত্ব। প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হল উদিয়ার। সন্ন্যাসী বটে, রাজপুত্রের মত শোভান্বিত। এ কি গেরুয়া, না ত্যাগ ও প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের বহ্নিপতাকা! রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল রাজা। একসার কুঠুরি ছেড়ে দিল স্বামীজিকে। স্বামীজি বললে, 'এতগুলো ঘর দিয়ে আমার কি হবে?'

'বেশ একটু মেলে-ছড়িয়ে থাকুন।'

'প্রসারিত হব শুধু কক্ষে নয়, বিশ্বে। শুধু খিলে নয় নিখিলে। আঙিনা ও আকাশকে এক করে।'

ক'দিনেই রাজার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল স্বামীজি। কিন্তু একাকী না হতে পারলে সেই অন্তরঙ্গতা স্বাদু হয়না। রাজা মানেই একটা ভিড়, পারিষদের বাহিনী। পারিষদেরা রাজাকে কিছুতেই একা থাকতে দেবে না। তাতে স্বামীজির কি। সে বিগতভী, তার কাছে একাও যা একশোও তাই।

সপার্ষদ সভাগৃহে বসে আছে রাজা, স্বামীজিকে জিগগেস করল, 'তুমি আমার পার্ষদদের কি রকম মনে কর ?'

আর যেন প্রশ্ন পেলনা রাজা। যতই অস্বস্তিকর হোক, স্বামীজি পেছপা হবার পাত্র নয়। বললে, 'পার্ষদরা সব জায়গাতে সব সময়েই একরকম। চাটুকারিতার শুধু একটাই নাম। আর, তা চাটুকারিতা।'

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'আমি কারু মুখ চেয়ে কথা বলিনা। মনে যা অনুভব করি তাই খুলে প্রকাশ করি।' ধীর স্বরে বললে স্বামীজি।

কিন্তু রাজার বড় ভাবনা হল। নিভৃতকক্ষে ডেকে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। বলল, 'এ আপনি করেছেন কি ?'

'কি করেছি ?'

'সত্য সব সময়েই স্পষ্ট। সরল, সুস্ফুট, বোধগম্য।'

'আমার পার্ষদরা সব ভীষণ চটেছেন, দেওয়ানও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—' রাজারও যেন খানিকটা মনোভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে।

'অন্ধকারে যারা থাকতে চায় তারা কি সূর্যকে সহ্য করতে পারে ?'

'আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে স্বামীজি।'

'আমার জন্যে ?' স্বামীজি হাসল।

'স্পষ্টবাদিতা নিরাপদ নয়, তার ফল শত্রুসৃষ্টি। ভয় হয় শত্রুর দল আপনার ক্ষতি, এমন কি আপনার মৃত্যুর জন্যে না ষড়যন্ত্র করে।' রাজার মুখ কালো, ঘোরালো হয়ে উঠল : 'এমন ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে সাধুর জীবননাশের কথাও আমার জানা আছে।'

'জীবননাশ ?' উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল স্বামীজি। 'আপনি কি মনে করেন ঠিক-ঠিক যে সন্ন্যাসী সে প্রাণভয়ে সত্য বলতে কুণ্ঠিত হয় ?'

'তবুও—'

যদি আপনার ছেলে এসে জিগগেস করে, 'তার বাবা কেমনতরো লোক, আমি তাহলে বলব তিনি সর্বগুণাধার ? যে গুণ আপনাতে নেই তাই আপনার ভয়ে, স্পষ্টবাদিতা নিরাপদ নয় বলে, বলব আপনাতে আছে ? যে চাটুবাদকে ধিক্কার দিচ্ছি, নিজেই করব সেই চাটুবাদ ? তবে এক কথা—'

উৎসুক হয়ে তাকাল রাজা।

'যার যা দোষ বা দুর্বলতা তা তার মুখের উপরই বলি। অগোচরে নিন্দা করিনা।'

'যদি তার সম্বন্ধে তার অসাক্ষাতে কথা ওঠে ?'

'তখন যেটুকু তার মধ্যে গুণ তার উল্লেখ করি।'

'বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাকো, আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে।' আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী সর্বদা তার সঙ্গ করবে। সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি লৌহবৎ দৃঢ় হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো ; প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।'

আবার লিখছেন মেরি হিলকে : 'মধুভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মধুভাষী হতে চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে তা হতে গেলে আমার অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে একটা উৎকট রকমের আপোষ করতে হয়, সেখানে আমি পিছিয়ে যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই, আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি সমদর্শিতার ভক্ত।'

'ভগিনী', আরো লিখছেন, 'আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সঙ্গে মিষ্টমুখে আপোষ করতে পারিনা তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু সত্য করে তোমাকে বলি, কিছুতেই পারি না আপোষ করতে। সারাজীবন এর জন্যে আমি ভুগেছি, তবু পারি না, শতশতবার চেষ্টা করেও পারি না। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, নাম যশ ধন বৈভব নশ্বর, এমন কি বন্ধুতা ও ভালোবাসাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। শুধু মিষ্ট শুধু মধু করে আমাকে রেখোনা। আমি যেমন আছি যেন তেমনিই থাকি। নিত্য নিয়ত আমাকে যেন কে বলছে, হে সন্ন্যাসী, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করে শত্রু-মিত্র ভেদ না রেখে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো। আমি হৃদয়বাসী সত্যের বাণী না শুনে কেন বাইরের লোকের খেয়ালমাফিক কথা কইব ? ভগিনী, আমি ভীত নই। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—এইই আমার ধর্ম। আমার ধর্মের শিক্ষা।'

রাজপ্রাসাদের কুয়াশা অন্তর্হিত হয়ে গেল। দেওয়ান নিজেই এসে একদিন বললে, 'কিছু একটা উপহার নিন।'

'কি আশ্চর্য, আমি কি উপকার নেব ?'

'আপনার সঙ্গে আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে দিচ্ছি, যে কোনো দোকানে গিয়ে যা আপনার ইচ্ছে একটা কিছু কিনে আনুন—'

'যা আমার ইচ্ছে ?'

সেক্রেটারি চেক-বই সঙ্গে নিল। যত মোটা টাকাই হোক দিয়ে দেবে অনায়াসে। স্বামীজিকে নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরতে লাগল। মনিহারি, জামা-কাপড়, বিলাস-প্রসাধন, এমন কি খেলনার দোকান। যা দেখে শিশুর মত তাতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার দ্রব্যান্তরে চলে যায়। সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই নয়নহরণ। কিন্তু কিনি কি ?'

'কিছু একটা কিনুন। কিছুই না কিনলে দেওয়ানজি অসন্তুষ্ট হবেন।'

বললে সেক্রেটারি, 'বলবেন আমিই সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাইনি আপনাকে।

কিছু একটা কিনতেই হবে? হাসতে লাগল স্বামীজি। কি রকম লোক! দোকানভরা জিনিস, পকেটভরা টাকা, তবু কেমন নিশ্চেতন! হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলাম তবু কিনা লোকটার সাড়া নেই।

'কিছু একটা কিনতেই হবে, না? একটা চুরুট কিনি।' চুরুট কিনল স্বামীজি। ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

রাজা জিগগেস করল, 'স্বামীজি, আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।' বললে স্বামীজি, 'দেশের কাজই আমার কাজ।'

'দেশের কাজ?'

'হ্যাঁ, দেশকে বড় করে তুলুন।' স্বামীজির মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল: 'সম্পদে, সমৃদ্ধিতে, প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে। আপনি রাজা, আপনি না করবেন তো কে করবে? কিন্তু সকলের চেয়ে বড় রত্ন মানুষ। মানুষ গড়ে তুলুন।'

মুক্তি? কিসের মুক্তি? ক্ষুধার থেকে মুক্তি, দারিদ্র্যের থেকে মুক্তি, দৌর্বল্যের থেকে মুক্তি। এক হাত যে লাফাতে পারেনা তার কিসের সমুদ্রলঙ্ঘন! অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, বলছেন স্বামীজি, কিন্তু শাস্ত্র বলছে, তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। আততায়ী গুরু হোক ব্রাহ্মণ হোক বহুশ্রুত হোক বিনা বিচারে তাকে হত্যা করবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ করো। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড চার নীতি পালন করে পৃথিবী ভোগ করো, তবেই তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও নরকভোগ। সোজা স্বধর্ম করো। অন্যায় কোরো না, অত্যাচার কোরো না, আর যথাসাধ্য পরোপকার কোরো। গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহ্য করাই পাপ, তার প্রতিবিধানে তৎপর হওয়াই পুণ্য। মহোৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিজন দশজনকে প্রতিপালন করা, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করাই ধর্ম। এ যদি না করতে পারো তো তুমি কিসের মানুষ। গৃহস্থই হলে না, বলছ কিনা মোক্ষ চাই! নিজেই শুতে পেলে না, ডাকছ কিনা শঙ্করাকে।

ধার্মিকের লক্ষণ কি? ধার্মিকের লক্ষণ নিয়তকর্মশীলতা। যে অনলসভাবে অনবচ্ছিন্ন কর্ম করে সেই ধার্মিক। কার্মিকই ধার্মিক। ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি। হরিনামে সর্বপাপনাশ। শরণাগতিই সর্বাপ্তি। এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য, সাধুবাক্য সত্য। বলছেন আবার স্বামীজি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিণামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে, কিন্তু পাচ্ছে কি? পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে যথার্থ শরণ নিতে পারে? যার কর্ম করে করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্মিক।

কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভালো নয়? কিছু না করার চেয়ে—জড়ের চেয়ে ভালোমন্দমিশ্র কর্ম করা ভালো নয়? বলছেন আবার স্বামীজি। গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, দেয়াল ছাড়া আর কিছু হয় না। মানুষেই চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালোমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় হয়। এখন বাইরে থেকে, এটা সত্ত্বপ্রধান না তমঃপ্রধান বুঝি কি করে? সুখ-দুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াশূন্য মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি—এ কথার জবাব দাও। জবাব আর কী দেবে? ফলেন পরিচীয়তে। ফল দেখেই বুঝতে পাচ্ছি বৃক্ষটি তমোবৃক্ষ।

শোনো। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয় শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তিকেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য। তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায়-পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তার কপাল-ফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর আর জগৎ তাই অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। সেই অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতঃব্যথঃ। সেই তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।

কিন্তু ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা, সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, স্বামীজি জ্বলে উঠলেন, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—ক্লীবের ভাব, তমের ভাব প্রাপ্ত হয়ো না, তারপর শেষে আবার বললেন, 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'—যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, শত্রু জয় করে যশস্বী হও, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। ঐ জৈন-বৌদ্ধদের পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ পড়ে-পড়ে কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বছর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—তা ভগবান! এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' আর 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।'

'স্বামীজি, আপনার এই প্রাণোচ্ছল কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড করে রাখতে চাই।' রাজা পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

সহাস্যে রাজি হল স্বামীজি। রেকর্ড তোলা হল।

মহীশূরের রাজপ্রাসাদের সে রেকর্ড অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এত দিনে, কিন্তু স্বামীজির সমস্ত উপস্থিতিই তো 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ' এই উদার-উজ্জ্বল শঙ্খনাদ।

বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল।

রাজা বললেন, 'আমি আপনার পা পুজো করব।'

লাফিয়ে উঠল স্বামীজি। অসম্ভব। শত অনুনয়ে-অনুরোধেও টললনা এক পা।

'তবে যাবার আগে কিছু একটা উপহার নিন।'

'উপহার? কি উপহার নেব?'

'যা আপনার খুশি। যে কোনো জিনিস।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'যদি নিতান্তই দিতে চান একটি থেলো হুঁকো দিন।'

'সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই? অন্তত রূপো দিয়ে।'

'না, কোনো ধাতুস্পর্শ না থাকে। এমনিই সাদাসিদে একটি হুঁকো।'

একতাড়া নোট নিয়ে এল দেওয়ান, হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে চাইল।

'টাকা? এত টাকা নিয়ে কি হবে? তবে হ্যাঁ, কোচিনের একখানা টিকিট কিনে দাও। রামেশ্বরের পথে কোচিনে ক'দিন থেকে যাব ভাবছি।'

কোচিন থেকে ত্রিবান্দ্রমে এসেছে স্বামীজি। সঙ্গে একটি মুসলমান অনুচর। এসে উঠেছে প্রফেসর সুন্দররমনের বাড়িতে।

'কি খাবেন?'

'আমার জন্যে ভাববেন না।' বললে স্বামীজি, 'আগে এর খাবার ব্যবস্থা করুন।' বলে অনুচরের দিকে ইঙ্গিত করল।

'না, না, আমার জন্যে নয়।' অনুচর ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল: 'স্বামীজি দু'দিন শুধু দুধ খেয়ে আছেন—'

'আছি তো আছি। কিন্তু আগে আমার এই বন্ধুর ব্যবস্থা না হলে আমি নেবনা আতিথ্য।'

'কিন্তু এ তো মুসলমান।' সুন্দররমন কুণ্ঠিতের মত বললে।

'জানিনা। শুধু এইটুকু জানি আমার সহচর, আমার বন্ধু। কোচিন সরকারের একজন পিওন। আমাকে এখানে পেঁাছিয়ে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে এসেছে।' স্বামীজির হাত বন্ধুতায় প্রসারিত হল পিওনের দিকে: 'ওকে সম্বল করেই আমি এখানে চলে এসেছি। কারু কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি। বললাম, কোনো প্রফেসারের বাড়ি নিয়ে চল। ও আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। আমি যদি আপনার অতিথি, ও-ও আপনার অতিথি। ওকে দয়া করে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না।'

অগত্যা পিওনের আপ্যায়ন হল সর্বাগ্রে।

'কি দেব আপনাকে খেতে?' প্রশ্ন করল সুন্দররমন।

'যা দেবেন তাই খাব। যা জোটে তাতেই আমি আনন্দিত। যদি কিছু না

জোটে তাতেও।'

দু'দিন পরে পেট ভরে খেল স্বামীজি।

সন্ধ্যায় সুন্দররমন স্বামীজিকে ক্লাবে নিয়ে গেল। নারায়ণ মেনন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান-পেশকার। কিন্তু জাতে শূদ্র। আরো একজন দেওয়ান-পেশকার এসেছে ক্লাবে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ। ক্লাব থেকে বিদায় নেবার সময় নারায়ণ সেই ব্রাহ্মণ-পেশকারকে করজোড়ে নমস্কার করল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে সেই নমস্কার ফিরিয়ে দিলনা। শূদ্রকে প্রত্যভিবাদনের রীতি হচ্ছে ডান হাতটা বাঁ হাতের থেকে কিছুটা উপরে তুলে ধরা। তেমনি একটা ভঙ্গি করল ব্রাহ্মণ।

স্বামীজির চোখে পড়ল। ক্লাব ভেঙে যাবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে নমস্কার করল স্বামীজিকে।

স্বামীজি শুধু বললে, নারায়ণ।

রেগে উঠল ব্রাহ্মণ। বললে, 'নমস্কার ফিরিয়ে দিতে জানেন না এ কোন দিশি শিষ্টাচার?'

স্বামীজি শান্তস্বরে বললে, 'নমস্কারের বিনিময়ে নারায়ণ-উচ্চারণই সন্ন্যাসীর রীতি। আপনি যদি আপনার রীতিনীতি ছাড়তে না পারেন সন্ন্যাসীই বা ছাড়বে কেন?'

'আমার রীতিনীতি?'

'হ্যাঁ শূদ্রের বেলায় নমস্কারে তাকে সম্মানিত করেননি আপনি, হৃদয়হীন শুষ্ক রীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন। তবু তো আমি নারায়ণ বলেছি। আপনার মধ্যেও স্বীকার করে নিয়েছি নারায়ণের অস্তিত্ব।'

৪০

সুন্দররমনের বাড়িতে, খাবারের ডাক পড়েছে, স্বামীজি নেই। কোথায় গেলেন এমন সময়? যারা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল ফিরে এসে বললে সরকারী য্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথ ভটচাজের বাড়ি গিয়েছেন। বলে দিয়েছেন ওখানেই খাবেন এ বেলা। মন্মথ ভটচাজ তো মাদ্রাজে। সে এখানে এল কি করে? ত্রিবান্দ্রমে রেসিডেণ্টের ট্রেজারিতে তবিল-তছরূপ হয়েছে। তার তদন্তে এসেছে মন্মথ। শহরে কোথায় বাসা নিয়েছে।

বিকেলে সেই বাসায় সুন্দররমন এসে হাজির। স্বামীজিকে পাকড়াও করে বললে অভিমানের সুরে, 'এ কি, আপনি এখানে চলে এলেন কি রকম?'

'ভাই অপরাধ নিও না', স্নিগ্ধহাস্যমুখে বললে স্বামীজি, 'কত দিন মাছ-মাংস খাইনি। তোমাদের দেশে, দক্ষিণ-ভারতে এসে অবধি এই আমিষের দুর্ভিক্ষ। মন্মথ আমার বন্ধু, সহপাঠী, তার খবর পেয়ে মাছ-মাংসের লোভে ছুটে এসেছি।'

মাছ-মাংস! সুন্দররমন নাক সিঁটকালো।

ভাই, কাকে ঘৃণা করছ, এবং কেন? পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা রীতিমত মাংস খেতেন, তাঁদের যজ্ঞে অন্যান্য পশুবধ তো হতই, এমনকি গোবধ পর্যন্ত হত। অতিথিকে মধুপর্ক দেবার বেলায়ও তাই। মাছ-মাংস না খেয়েই আমাদের এই শারীরিক দৌর্বল্য। যদি ক্ষাত্রতেজ আনতে চাও তো মাংসাশী হও।

'তোমরা মাংসাহারী ক্ষত্রিয়ের কথা বলছ।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক আর নাই খাক, তারাই হিন্দুধর্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস রয়েছে তার জন্মদাতা। উপনিষদ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব্বাইকে ধর্মের অধিকার দিয়েছেন; আর যখনই ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। গীতায় সকল নর-নারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্যে পথ উন্মুক্ত রয়েছে; আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্যে বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করেছেন। ঈশ্বর কি তোমাদের মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান যে এক টুকরো মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এককড়া কানাকড়িও নয়।'

কিন্তু আবার লিখছেন অখণ্ডানন্দকে: 'বসে-বসে রাজভোগ খাওয়ার আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনো ফল নেই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করতে না পারো। গ্রামে গ্রামে যাও, উপদেশ করো, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান—এই তিন কর্ম করো, তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে, নতুবা ভস্মে ঘৃত ঢালার মত সব নিষ্ফল। রাজপুতানার গ্রামে-গ্রামে গরিব দরিদ্রদের ঘরে-ঘরে ফের। যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই মাংস ত্যাগ করবে। পরোপকারার্থে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করা ভালো।'

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় আর বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গেই মাংস খাওয়া উঠে যেতে লাগল দেশ থেকে। স্বামীজি বললে, এই উঠে যাওয়ার দরুনই প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের পতন ঘটতে সুরু করল। যদি হিন্দু জাতটাকে খাড়া হয়ে উঠতে হয়, পাল্লা দিতে হয় জগতের আর সব জাতের সঙ্গে, তাহলে তাদের নিরামিষ খাওয়া ছাড়তে হবে।

সুন্দররমন কিছুতেই মানতে চায়না। বললে, বুদ্ধের বাণী অহিংসার বাণী—

বুদ্ধের কথা উঠতেই বিহ্বল হল স্বামীজি। বললে 'আমি একমাত্র কর্ম বুঝি। সে কর্ম পরোপকার। বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই তো আমি শ্রীবুদ্ধের পদানত।'

ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাসী নন বুদ্ধ, কিন্তু একটা ছাগশিশুর জন্যে তিনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন। নিজের মুক্তির জন্যে ধ্যান করতে বনে যাননি, সকলের মুক্তির জন্যে গিয়েছেন। আর এই তত্ত্ব লাভ করে এসেছেন—মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা।

প্রাদেশিক কথ্য ভাষায়, পালিতে, উপদেশ দিয়েছেন বুদ্ধ। তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যরা বললে, আপনার কথাগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করে রাখি।

বাধা দিলেন বুদ্ধ। বললেন, 'আমি গরিবদের জন্যে, নিরক্ষরদের জন্যে, আপামর সর্বসাধারণের জন্যে। আমাকে জনগণের ভাষায় কথা বলতে দাও।'

আকাশবৎ অনাদি অনন্ত বোধির নামই বুদ্ধ। আমি গৌতম, লাভ করেছি সেই বুদ্ধাবস্থা। সাধনার দ্বারা তোমরাও এই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারো। এই বুদ্ধের চরম কথা। নাস্তিক ছিলেন কি আস্তিক ছিলেন তাতে কিছুই যায় আসে না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, যার কোনো দার্শনিক মতবাদ নেই, যে কোনো মন্দিরে বা গির্জায় যায় না, যে নিছক জড়বাদী সেও এই মহাবোধির পরাপ্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে। এই বুদ্ধের পরমবাণী।

'যদি বুদ্ধ-হৃদয়ের এককণাও আমার থাকত!' স্বামীজি বললে গদগদ হয়ে।

সুন্দররমন বললে, 'আপনার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করি—'

'ওরে বাবা! ভাবতেও গা কাঁপছে।' ত্রস্ত মুখে বললে স্বামীজি, 'কোনোদিন দিইনি বক্তৃতা।'

'একদিন দিন। লোকে শুনতে চায় আপনার কথা।'

'শেষকালে কথা বেরুবেনা, আমতা-আমতা করব, ঢোঁক গিলব, মাথা চুলকোব —যারা শুনতে চেয়েছিল তারাই বসে পড়তে বলবে। জনতাকে আমার ভীষণ ভয়।'

'তাহলে শিকাগোর ধর্মসভায় যাবেন কি করে?'

'যাব নাকি?'

'মহীশুরের মহারাজা যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে শুনেছি। কিন্তু সে তো বিদেশ, জনতার ভাষা বিদেশ। সেখানে তাদের সামনে দাঁড়াবেন কি করে?'

মুখমণ্ডল ভাস্বর হয়ে উঠল স্বামীজির। বললে, 'ঈশ্বর যদি আমার হাত ধরে আমাকে সেখানে নিয়ে যান ও আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠব। যদি আমাকে তিনি তার পতাকা দেন, তিনি নিশ্চয়ই তা বহন করবার শক্তিও দেবেন।'

সুন্দররমন মুখ ফেরাল। ভাবখানা এই, টিকিট কেটে জাহাজে চেপে শিকাগোতে গেলাম, সভামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম নিমন্ত্রিত হয়ে, আর যে আমি কোনোদিন কোনো বক্তৃতা দিইনি, ভিড়ের মধ্যে শুধু আত্মগোপন করে এসেছি, আমার মুখ থেকে তক্ষুনি-তক্ষুনি অনর্গল বাক্যস্ফূর্তি হতে লাগল—এ কখনো হয়?

'হয়।' বজ্রনাদ করে উঠল স্বামীজি: 'মূকও বাচাল হয়। মাটির যে স্তূপ সেও অগ্নিবর্ষণ করে। যিনি অনন্ত শক্তিমান তাঁকে তুমি তোমার দাঁড়িপাল্লায় মাপবে? স্থানে-কালে যাঁর অবধি নেই তাঁকে মাপবে তোমার ফুট-গজ দিয়ে? তিনি যাকে ডাকেন হাত ধরে তাকে তিনি শুধু সাধক করেননা, অসাধ্যসাধক করেন।'

সভামণ্ডে না হোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে দোষ কি।

বণ্ডিশ্বর শাস্ত্রী সুন্দররমনের ছেলেকে সংস্কৃত পড়ান। হেন শাস্ত্র-ব্যাকরণ নেই যা নয় তাঁর নখাগ্রে। ক'দিন ধরে আসতে পারছেন না পড়াতে। শুনেছেন উত্তর-ভারতের কে এক মহাপণ্ডিত সাধু সুন্দররমনের বাড়িতে অতিথি, এ যাত্রায় আলাপ হলনা বোধহয়। একবার পরীক্ষা করে দেখা হলনা তার ব্যুৎপত্তি। সেই দুঃখেই মরমে মরে আছেন। কত না জানি পণ্ডিতি করে নিচ্ছে লোকটা। জারিজুরি কেউ বোধহয় ধরতে পারল না। একবার দেখা হয়না কোনোরকমে?

না, পেয়েছেন সুযোগ। সুন্দররমনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে স্বামীজি, নামছে সিঁড়ি দিয়ে, বণ্ডিশ্বরের সঙ্গে দেখা। সুন্দররমন আলাপ করিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই সংস্কৃতে কি একটি দুরূহ প্রশ্ন জিগগেস করলেন বণ্ডিশ্বর। স্বামীজি হাসল। সংস্কৃতে উত্তর দিলে।

আবার একটা প্রশ্ন। আবার উত্তর। এমনি চলল প্রায় দশমিনিট।

'এবার আমি প্রশ্ন করি?'

বণ্ডিশ্বর বণ্ডিতের মত মুখ করে রইলেন। তাঁর সমস্ত অহঙ্কার হরণ করে নিয়েছে স্বামীজি।

সুন্দররমনকে বললে, 'শুধু ব্যাকরণে নয় ভাষাজ্ঞানেও এই সাধু অসাধারণ। এঁকে ছেড়ে দিলেন কেন?'

একে কে বাঁধে।

গিরিশ ঘোষ বলত, মহামায়া দড়ি দিয়ে দু'জনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এক স্বামীজি আরেক নাগমশাই। দু'জন দু' উপায়ে বাঁধন কাটালে। দড়ির যা দৈর্ঘ্য তার চেয়ে স্বামীজির আয়তন বড়, যত দড়ি জোড়েন মহামায়া ততই বেশি ফুলতে থাকে স্বামীজি, দড়িতে আর কুলোলনা শেষ পর্যন্ত। আর নাগমশাই? নাগমশাই কেবল ছোট হয়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে দড়ি কি করে পারবে? গ্রন্থির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল দুর্গাচরণ। একজন বেরিয়ে গেল জ্ঞানে, বীর্যে; আরেকজন বেরিয়ে গেল ভক্তিতে, দীনতায়।

দাক্ষিণাত্যের বারাণসী, রামেশ্বরে এসে পৌঁছুল স্বামীজি। লংকাজয়ের পর দেশে ফেরবার মুখে সেতু পার হয়ে এসে এইখানেই প্রথম শিবপূজা করেন রামচন্দ্র। এই সেই কর্পূরগৌরধবল দারিদ্র্যদুঃখদহন শিব। এই সেই সংসার-রোগহর অনঘ পুরুষ।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরের শেষ প্রস্তরটুকুতে এসে বসল স্বামীজি। ধ্যাননেত্র দিব্যদর্শন হল। জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ করল দেশমাতারূপে। রুক্ষকেশী চীরবাসা ধূলিধূসরিতা ম্লানমূর্তি। শৃঙ্খলবন্ধা। এ শৃঙ্খল দাসত্বের নয় দারিদ্র্যের।

'দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও সকলে।' স্বামীজি আহ্বান করল: 'আমি জানি ভগবান সাহায্য করবেন। আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি, কিন্তু তোমাদের কাছে গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্যে এই সহানুভূতি, এই

প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হননি, যিনি তাঁর বুদ্ধাবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক অধমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন—যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, এবং তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর—বলি, জীবন-বলি, তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্যে। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্যে ব্রত গ্রহণ করো—যারা দিন দিন ডুবছে।'

লণ্ডন ছাড়বার আগে মিস্টার সেভিয়ারকে বলছেন বিবেকানন্দ: 'আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ। আমার মন শুধু ভারতের দিকে ধাবমান।'

'প্রায় চার বছর কাটালেন পশ্চিমে', বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সমৃদ্ধিমান সভ্যতার সঙ্গে, এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাগবে? পদানত পরাধীন দেশ!'

'বলো কি!' গর্জে উঠলেন বিবেকানন্দ: 'যখন ছেড়ে আসি তখন সমস্ত দেশটাকেই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাবমূর্তিরূপে, এখন আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসছি।'

আর ঈশ্বর? ঈশ্বর এমন একটি বৃত্তের কেন্দ্র যার পরিধি কোথাও শেষ হয়নি আর যার কেন্দ্র সর্বত্র। যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে সে বৃত্ত আঁকো সে বৃত্তের বেষ্টনীরেখা খুঁজে পাবে না। আর যেখানেই কেন্দ্র নির্ধারণ করোনা সেইটিই সমানভাবে অনন্ত বৃত্ত নির্মাণ করবে। আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করো বিশ্বসত্তার বৃত্ত তৈরি হবে, আর তুমি জানতেও পারবেনা কোথায় তার সীমান্ত!

স্বামীজি বলছেন, ধরো পৃথিবী থেকে সূর্যের একটা ফোটোগ্রাফ নেওয়া হল। ধরো, আমরা সূর্যের দিকে এগুচ্ছি, বহু সহস্র মাইল এগিয়ে আবার একটা নেওয়া হল ফোটোগ্রাফ। দেখা গেল, যা আগে দেখা গিয়েছিল সূর্য তারও চেয়ে বৃহৎ। যাত্রাপথে বারেবারে ছবি নিচ্ছি, প্রতিবারেই বৃহত্তর প্রতিমূর্তি। যাত্রায় আমি যত বৃহৎ হব, উপস্থিতিতে সে ততই বৃহত্তর হবে। কিন্তু যাত্রা আমি ছাড়বনা। আমি জানি আমি এগোচ্ছি বলেই তাকে বৃহত্তর বলে দেখতে পাচ্ছি। শুধু চলাতেই এই বৃহত্তরের উপলব্ধি। আর কিছু করতে না পারো, চলো, পথ ভাঙো। না চললে বুঝবে কি করে পথ দীর্ঘ, বুঝবে কি করে তুমি পথিক হবার উপযুক্ত। যতই ক্লেশকণ্টকবন্ধুর হোক, তোমার উপযুক্ততার উপলব্ধির মত আনন্দ আর কি আছে!

'আমার যদি একটি ছেলে থাকত', স্বামীজি বলছেন, 'তবে সে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র আমি তাকে বলতে সুরু করতাম, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। পুরাণে মদালসার কাহিনী পড়োনি? তাঁর পুত্র হওয়ামাত্র তিনি তাকে দোলনায় শুইয়ে নিজ হাতে

দোল দিতে-দিতে গান গাইতে লাগলেন, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। নিজে মহান বলে ভাবো, মহান হয়ে যাবে। নিরঞ্জন বলে ভাবো নিরঞ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু ভাববে কি করে? ভাবনার সে বীর্য কই? কই সেই মাংসপেশী?'

আসলে কি জানো? শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল। আবার বলছেন স্বামীজি: তোমাদের জ্ঞানের কি কোনো কমতি আছে? ওরে বাবা, তোমাদের জ্ঞান যে অতিরিক্ত। যতটা জানলে কল্যাণ তোমরা তার চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছ এই হয়েছে মুশকিল। আসল অনিষ্টের মূল কারণ, আর কিছু নয়, তোমরা দুর্বল। তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, আত্মবিশ্বাস দুর্বল। শত শত বছর ধরে অভিজাত আর রাজা আর বৈদেশিকদের দল তোমাদের নিপীড়ন করে পিষে ফেলেছে। তোমাদের স্বজনরাই কেড়ে নিয়েছে তোমাদের বলবুদ্ধি, মেরুদণ্ডহীন কীট করে ছেড়েছে। কে আর তোমাদের বল দেবে যদি নিজে একবার না ওঠো না জাগো, যদি নিজে একবার না মুষ্টিবদ্ধ করে করাঘাত করো।

বীর্য লাভের উপায় কি? বীর্য লাভের উপায় বেদান্তে বিশ্বাস। আমিই সেই, এই জ্বলন্ত সিংহাসনে আরূঢ় হওয়া। আমাকে তরবারি ছিন্ন করতে পারেনা, শর আমাকে বিদ্ধ করতে পারেনা, প্রস্তর আমাকে দীর্ণ করতে পারেনা, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারেনা, বায়ু আমাকে শুষ্ক করতে পারেনা। আমিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বাত্মা। বারে-বারে এই আশাপ্রদ পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি উচ্চারণ করো। বোলোনা আমরা দুর্বল। বলো আমরা সর্বার্থসাধক, অসাধ্যসাধক। নচিকেতার মত বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন তার মধ্যে শ্রদ্ধা প্রবেশ করল। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হোক। বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও। ইঙ্গিতে জগৎ-চালক মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও। সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও। ঈশ্বরায়িত হও। উপনিষদই দেবে তোমাদের সেই অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য। দেহচৈতন্যের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত হও। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমাপ্নুতে। অথবা আত্মচৈতন্যে। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। কিম্বা ভাগবতচৈতন্যে। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। সেই অবস্থিতিই অমৃতত্ব।

সুখেদুঃখে যার সমভাব সেই এই অমৃতত্বের অধিকারী।

তাড়িঘাট জংশনে নেমেছে স্বামীজি। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন, অগ্নিস্পর্শ বালি ঝড় বইছে। প্রতপ্ত মরুভূমির নিশ্বাস। শুধু একটি কম্বল সম্বল, প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় বসতে চাইল স্বামীজি। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, এ কে ছন্নছাড়া বাজে লোক, চৌকিদার টিকিট দেখতে চাইল। থার্ড ক্লাশের টিকিট দেখাল স্বামীজি। কেন কে জানে চৌকিদার তাড়া করল। চোরছ্যাঁচড় হবে হয়তো, কে জানে কোথা থেকে একটা টিকিট কুড়িয়ে নিয়ে হয়তো সাধু সেজেছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে কম্বল পাতল স্বামীজি। একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল নিশ্চিন্তে। যদি এক প্লাশ ঠাণ্ডা জল খেতে পেতো। হায়, সঙ্গে একটি সামান্য কুঁজোও তার নেই। কুঁজো সামান্য কিন্তু তার মধ্যে যদি জলভরা থাকে,

পিপাসার সময় তবে তা অমৃতশ্রাবণ।

মনে পড়ল লাটুর কথা। কাশীপুরে থাকতে একবার তার খেয়াল হল নরেনকে লেকচার দিতে হবে। লাটু বললে, 'দ্যাখ ভাই লোরেন, কিশুব বাবু টাউন হোলে কিমন লিকচার কোরে। তুই ভাই ইমন লিকচার করবি আর আমি তোর জন্যে এক কুজু জোল নিয়ে বোসে থাকব।'

যদি এখন লাটু এক কুঁজো জল নিয়ে বসে, তবে নিশ্চয় স্বামীজি এখুনি এই ক্লান্ত দেহে শুষ্ক কণ্ঠে বক্তৃতা দেয়। হাততালি পাবার লোভে নয়, লাটুর কুঁজোর একটুকু জল খাবার প্রত্যাশায়।

নিদারুণ পিপাসা পেয়েছে। ক্ষুধার চেয়েও পিপাসা গুরুতর। মনে হচ্ছে দেহের রক্তও যেন তপ্তবালু, এতটুকু তাতে জলকণিকা নেই।

সমস্ত রাস্তা ঐ লোকটা জ্বালিয়েছে স্বামীজিকে, পশ্চিমা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বেনে। স্টেশনে যখনই গাড়ি থেমেছে, পানিপাঁড়েদের কাছে জল চেয়েছে স্বামীজি। পয়সা? পয়সা কিসের? পয়সা ছাড়াই তো জল দেবে। বয়ে গেছে, ঐ দেখ, পয়সা দিচ্ছে কেউ-কেউ। যারা পয়সা দিচ্ছে তাদেরকেই জল দেব।

স্বামীজির কাছে একটাও পয়সা নেই।

ঐ বেনে ভদ্রলোক একই ক্লাশে যাচ্ছে একই কামরায়। নিচু ক্লাশে যাচ্ছে বটে কিন্তু ট্যাঁক উঁচু। পয়সা দিয়ে লোটা-ভরতি জল যোগাড় করছে আর স্বামীজির দিকে তাকিয়ে মুচকে-মুচকে হাসছে। এক আঁজলা জল দেওয়া দূরের কথা, পরন্তু বলছে বিদ্রূপ করে অবজ্ঞা মিশিয়ে, 'কি হে সাধু, এমনই ত্যাগ করেছ একটি পয়সাও নেই যে জল কিনে খাও। আঃ, কি ঠাণ্ডা জল! ভগবানের এমন জিনিস তাও হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। শ্রম করে পয়সা রোজগার করে তবে তা কিনতে হয়। যদি একরকম সর্বত্যাগী সাধু না সেজে আমার মত, আর পাঁচজনের মত, শ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটাখাটনি করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে, তাহলে আজ আর এ দুর্দশা ভোগ হত না।'

সেই বেনেও নেমেছে এই স্টেশনে। বসেছে প্ল্যাটফর্মের ছাউনিতে। স্বামীজির দিকে চোখ রেখে। পুঁটলি খুলে একরাজ্যের খাবার বের করেছে সেই বেনে। ধারে-পারে কোথায় জল আছে কে জানে, তাই ধরে এনেছে লোটায় করে।

স্বামীজির দিকে তাকিয়ে সেই বেনে শ্লেষভরে বলছে, 'কি হে, একবার এদিকে একটু মুখ ফেরাও। পয়সার ক্ষমতাটা দেখ। পুরি কচুরি পেঁড়া রাবড়ির স্তূপটা দেখ। চারদিকে জলের এত টানাটানি, তবু, দেখ, পয়সার জোরে তাও যোগাড় হয়েছে এক লোটা। আর তোমার? ঠনঠন।'

স্বামীজি স্তব্ধ হয়ে রইল। শান্ত হয়ে রইল।

'বাবাজি, আপনি এই রৌদ্রে কেন বসে আছেন? ছাউনির ভিতরে চলুন, সেখানে বিশ্রাম করবেন।'

'কে?' চোখ মেলল স্বামীজি।

দেখল কে-একজন অপরিচিত হিন্দুস্থানী লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তার ডানহাতে একটা পুঁটলি আর লোটা আর বাঁ হাতে এক কুঁজো জল ও বগলের নিচে একটা ভাঁজ-করা শতরঞ্চি।

'কে তুমি ?' খাড়া হয়ে বসল স্বামীজি।

'আমি আপনার জন্যে খাবার আর জল নিয়ে এসেছি।'

'আমার জন্যে ? না। তোমার ভুল হয়েছে।' স্বামীজি আবার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। চোখ নিমীলিত হল।

'না বাবাজি, আমার ভুল হয়নি। কাছেই আমার এক পুরি-মেঠায়ের দোকান, আমি একজন হালুইকর।' বলতে লাগল সেই হিন্দুস্থানী। 'খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম এক সন্ন্যাসী এসে আমাকে বলছেন, আমার সাধু স্টেশনের হাতায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে আছে, কাল থেকে তার পানাহার নেই। তুই শিগগির গিয়ে ত্যর সেবা কর। ঘুম ভাঙতে মনে হল কি না কি স্বপ্ন দেখলাম, যত সব আজগুবি বাজে খেয়াল। আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বলব কি মহারাজ, আবার সেই স্বপ্ন ! সেই সন্ন্যাসী এসে তর্জন করে উঠল, কি রে গেলিনা এখনো ? আমার সাধুকে আর কত কষ্ট দিবি ? আবার খেয়াল ভেবে পাশ ফিরলাম। যেই আবার তন্দ্রার একটু ঘোর লেগেছে সেই সন্ন্যাসী আবার এসে উপস্থিত। এবার আর তর্জন-তিরস্কার নয়, আমার হাত ধরে টেনে তুলে দিল সেই সন্ন্যাসী। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি স্টেশনে, এই সামান্য কিছু খাবার আর জল নিয়ে। আপনি আসুন।'

'তোমার ভুল হয়েছে। দেখ তোমার সেই সন্ন্যাসীর সাধু অন্যত্র কোথাও হয়তো অপেক্ষা করছেন।'

'আমি দেখেছি।' সেই হালুইকর বললে জোড় করে, 'সমস্ত স্টেশনে আপনি ছাড়া আর কেউ সাধু নেই।'

সেই বেনে ভদ্রলোকের সামনেই শতরঞ্চি পেতে স্বামীজিকে বসাল হালুইকর। মেঠাই-মণ্ডার স্তূপ মেলে ধরল। পাশে বসে খাওয়াতে লাগল। কুঁজো থেকে লোটার পর লোটা জল ঢেলে দিতে লাগল। বেনের তো চক্ষুস্থির।

শুধু তাই ? খাওয়া-দাওয়ার পর সেই হালুইকর স্বামীজিকে পান খাওয়াল, তামাক সেজে দিল। শতরঞ্চির পুঁটলির মধ্যে হুঁকো কলকে নিয়ে এসেছে হালুইকর।

'কে হে এই সাধু ?' হালুইকরকে জিজ্ঞেস করল বেনে।

'জানিনা। শুধু এইটুকু বলতে পারি এমন একজন লোক যার কাছে কোন এক শক্তি তিন-তিনবারের ধাক্কায় আমাকে ঠেলে এনেছে।'

বেনে তখন যুক্তকরে বসল স্বামীজির পা ঘেঁষে।

সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি, আরেকখানি গীতা। এই স্বামীজির ইহজীবনের সম্বল। বাসুদেবঃ সর্বমিতি। সর্বাধিবাস বাসুদেব। যিনি সমস্ত বিশ্ব আচ্ছাদন করে আছেন, সর্বভূতে যাঁর বসতি, তিনিই বাসুদেব। লীলাবশে ব্যক্তস্বরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই গতি, তিনিই ভর্তা, তিনিই প্রভু, তিনিই সাক্ষী। নিবাসঃ শরনং সুহৃৎ। তিনিই বাসস্থান, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই বান্ধব-স্বরূপ। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহর্তা, তিনিই আধার, তিনিই নিধান। তিনিই অব্যয়বীজ, অবিনাশী কারণ।

মেথরদের সঙ্গে আছে স্বামীজি। ছিন্ন কাঁথার নিচেই রয়েছে উত্তপ্ত জীবন, পথের ধুলোর মধ্যেই ধনরত্ন। হাজা-মজা সংস্কার করে পূর্ণ ফসল, পুণ্য ফসলের আবাদ করো।

'পরোপকারই এই সার্বজনীন মহাব্রত।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি, 'শুধু নেগেটিভ ধর্মে কিছু হবেনা। পাথরে অন্যায় করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয়না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করেনা, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি করোনা, মিথ্যা কথা কওনা, অন্যায় করোনা, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—'মধু, তা কার কি?' কলকাতার ডোমপাড়া হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য করো। বোঝাও তুমি তাদের ভালোবাসো। দয়া আর ভালবাসায়ই জগৎ কেনা যায়। লেকচার বই ফিলসফি সব তার নিচে। গরিবদের সাহায্যের জন্যে শশীকে ঐরকম একটা কর্মবিভাগ খুলতে বলো। ঠাকুর পুজোফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশি ব্যয় না করে। এদিকের ঠাকুরের ছেলেপুলে যে না খেয়ে মরছে। শুধু জল-তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দাও। তাহলেই সব কল্যাণ।'

মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলছে স্বামীজি। সূর্যের চেয়েও বালির তাত বেশি। বাতাসে আগুনের হলকা। তবু পথ ভাঙছে স্বামীজি। যখন মরুভূমি আছে তখন নিশ্চয়ই আছে স্নেহময় শ্যামলতা। অদূরেই একটি গ্রাম চোখে পড়ল। কি আশ্চর্য, সরোবরের জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তীরে গাছগাছালির সবুজ স্তূপ। স্বামীজি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শুষ্ককণ্ঠ স্নিগ্ধ তো হবেই, বৃক্ষতলে মিলবে নিশ্চয় শীতল শান্তি। শ্যামলসজলের সংস্পর্শে এসে বাতাসও হবে সুখাবহ। জোরে পা চালাচ্ছে স্বামীজি। কিন্তু কোথায় সেই ঘনপল্লব গ্রাম। যতই এগুচ্ছে ততই সেই স্বপ্নচ্ছবি দূরে সরছে। বুঝতে আর বাকী রইলনা, এরই নাম মরীচিকা। গ্রাম মিথ্যা, শান্তির নীড় মিথ্যা, বৃক্ষচ্ছায়া মিথ্যা, মিথ্যা ঐ তৃষ্ণার পানীয়। জীবনও বুঝি এমনি। চারদিকেই শুধু মায়ার ছলনা কুহকের কুয়াশা। সর্বোর্ধ্বসংস্থিত সত্য কোথায়? কোথায় সেই অতন্দ্র সূর্য?

সত্য শুধু ঈশ্বর। সত্য শুধু পথ চলা।

আবার এগুলো স্বামীজি। আবার দেখল নয়নসম্মুখে সেই মনোহর গ্রাম,

সেই কালোজলভরা সরোবরের সংকেত। স্বামীজি মনে-মনে হাসল। গতি একবিন্দু শিথিল করলনা, চোখে আনতে দিল না স্বপ্নের মুগ্ধতা। উপেক্ষা করে চলল এগিয়ে। পিপাসিত মৃগের মত আর ধাবিত হল না ভ্রান্ত জলের পিছনে।

আমি তোমাতেই শরণ নেব।

হে অর্জুন, একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখো। আমাতেই প্রণত হও, পূজাপরায়ণ হও। তাহলে আমাতেই তুমি পরিণত হবে। পরিণত হওয়াই প্রাপ্ত হওয়া। সমস্ত ধর্ম ছেড়ে আমাতেই শরণাগত হও। শোক কোরোনা, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে ত্রাণ করব। বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

সমস্ত ধর্ম ছাড়ব ? হ্যাঁ, যেহেতু আমিই একমাত্র ধর্ম। সমস্ত ধর্ম ছাড়া অর্থ সমস্ত বিধিনিষেধের দাসত্ব ছাড়া। কোন ধর্ম গ্রহণ করব, গার্হস্থ্যধর্ম না সন্ন্যাস-ধর্ম, রাজধর্ম না দানধর্ম, বেদোক্ত ধর্ম না শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, শ্রুতি, স্মৃতি না লোকাচার—গোলমালের মধ্যে যেওনা, শুধু ঈশ্বরেরই শরণ নাও। ঠাকুর বলেছেন, গোলমালের মধ্যে গোলও আছে মালও আছে—গোলটুকু ছেড়ে মালটুকু নাও। তেমনি এ দিক না ও দিক, এ পথ না ও পথ, চিন্তার এ সব সংকটের মধ্যে যেওনা, শুধু ঈশ্বরকে আঁকড়াও। আর ধর্মসংমূঢ়চেতা থাকবার প্রয়োজন নেই, আমাতেই প্রপন্ন হও।

শরণাগতির ছয় লক্ষণ। ভগবানের অনুকূল কার্যে প্রবৃত্তি, প্রাতিকূল্যে বিতৃষ্ণা, তিনিই রক্ষক এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, তুমিই রক্ষাকর্তা এই বলে মনে মনে ঈশ্বরকে বরণ, তাঁতে আত্মনিক্ষেপ এবং রক্ষা করো বলে দৈন্য ও আর্তিনিবেদন।

অর্জুন কি বলল ? বললে, হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমার স্মৃতি আমার কর্তব্যজ্ঞান ফিরে এসেছে, আমি স্থির হয়েছি, নিঃসংশয় হয়েছি,—'করিষ্যে বচনং তব', তোমার কথামতই কাজ করব। অর্থাৎ যুদ্ধ করব।

'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।' আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধ করো।

এক হাতে ধনুক আরেক হাতে তীর। দু'হাতে সংগ্রামের আয়ুধ। দু'হাতে কাজ। আর বুকের মধ্যে ভগবান। হৃদয়সন্নিহিত সকলসুন্দরসন্নিবেশ।

হৃষীকেশে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। তুমি কোন সাধু ? আমি সেই চোর সাধু। স্বামীজি তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দেখনি ? যিনি শুধু নুন খেয়ে থাকতেন। শোননি তাঁর কাছে সেই চোরের গল্প ?' সাধুর দু'চোখ ছলছল করে উঠল।

শুনেছে সেই কাহিনী। পওহারী বাবার আশ্রমে এক চোর ঢুকেছিল। জিনিসপত্র চুরি করে পালাচ্ছে, টের পেয়েছে পওহারী। পওহারিও তার পিছু নিয়েছে। চোর যত ছোটে পওহারীও তত পা বাড়ায়। যখন প্রায় ধরো-ধরো চোর তখন হাতের পোঁটলা ফেলে দেয় পথের উপর। চোরাই মাল ফেলে দিয়েছি, এখন আর কেন অনুসরণ করো ? পওহারী তবুও বিরত হয়না, যে করে হোক যত দূরেই হোক, তোকে ধরবই ধরব। অনেক দূর ছুটে চোরকে ধরল পওহারী।

চোর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও। পওহারী সহসা করজোড়ে তাকে বন্দনা করতে লাগল, বললে, 'প্রভু, নারায়ণ, তুমি ছদ্মবেশে চোরবেশে আমার ঘরে এসেছিলে। আমি কিছুই তোমার সেবা করতে পারিনি। আমার এমন কিছু সম্পদ নেই যা দিয়ে তোমার যথার্থ প্রীতি উৎপাদন করতে পারি। এই পোঁটলা তুমি গ্রহণ করো। আরো চলো আমার ঘরে, দেখ, আরো কিছু তোমার নেবার মত উপযুক্ত আছে কিনা।'

এ কি আশ্চর্য ঘটনা! চোর যত অনুনয় করে, পওহারীর তার চেয়ে বেশি কাতরতা! শেষ পর্যন্ত চোরেরই হার হল। পওহারীর যথাসর্বস্ব গ্রহণ করতে হল তাকে।

সেই চোরের দিকে এখন তাকিয়ে দেখ। মর্চে-পড়া লোহা কাঞ্চন হয়ে গিয়েছে। পওহারীর সংস্পর্শে সাধু বনে গিয়েছে। 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি—' সে ধনের সন্ধানে দেশান্তরী হয়েছে।

স্বামীজি প্রণাম করল সাধুকে। এই সেই ঠাকুরের বাণীরূপ। 'ডাকাতরূপী নারায়ণ!' কে অবিশ্বাস করবে পাপীর মধ্যেও রয়েছে সাধুতার সম্ভাবনা।

কন্যাকুমারিকা থেকে স্বামীজি চলে এল পণ্ডিচেরি। সেখান থেকে মাদ্রাজ। হৈ-হৈ পড়ে গেল! পরনে গেরুয়া আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি হাতে দণ্ডকমণ্ডলু— কে এ জ্যোতিষ্মান সন্ন্যাসী! যেন এক প্রাণ-অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলছে অনির্বাণ। মৃত্তিকা থেকে যেন এক পুঞ্জীভূত স্তব উঠেছে আকাশের দিকে। কি উদাত্ত কণ্ঠস্বর, কি অনর্গল বাগ্মিতা। যেমন দার্ঢ্য তেমনি বিনয়। যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমনি আবার পরিহাসের তারল্য। তর্ক-যুক্তিতে কে এঁটে উঠবে? কার সাধ্য থাকবে অনভিভূত?

'আচ্ছা স্বামীজি, যাদের বেদান্ত আছে সেই তাদেরই আবার মূর্তিপূজো কেন?' কে একজন প্রশ্ন করল।

উদার হাস্যে স্বামীজি বললে, 'যেহেতু আমাদের মাথার উপরে হিমালয় বিরাজমান। কে আছে যে হিমালয় দেখে প্রণত হবেনা? প্রাণে জাগবেনা ভক্তির বিহ্বলতা?', পরে আবার বললে, 'ঠাকুর বলতেন যার যেমন পেটে সয় মা তার জন্যে তেমনি বন্দোবস্ত করেছেন। কারু জন্যে পোলাও-মাংস কারু জন্যে লুচি, কারু জন্যে বা খই-বাতাসা। দেয়ালের ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে যেমন আকাশ দেখা যায়, তেমনি প্রতিমার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ঈশ্বরকে।'

'ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কি?' আরেকজন কে প্রশ্ন করল।

'কি বলব! বেদ পড়েছ? অলৌকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ মানে ঋষিদের অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি।'

'অতীন্দ্রিয় আবার কি!'

'চোখের লেন্স্ বদলানো। এমনি শাদা চোখে দেখছ একটা পাতা—কতটুকু দেখছ? স্বচ্ছ কাচের উপর সেই পাতাটি রেখে যদি চোক্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাও দেখবে তার রূপের কি সূক্ষ্ম কারিকুরি! চোখে দেখা যায়না অথচ যা

আছে তাই অতীন্দ্রিয়। যেমন করে পারো চক্ষুষ্মান হও দেখতে পাবে সেই সুন্দরোজ্জ্বলকে।'

'রিয়্যালিটির কথা বলুন।'

'রিয়্যালিটি? যাকে রিয়্যালিটি বলছ তা হচ্ছে স্বল্প মনের আচ্ছন্ন দৃষ্টি। নৌকোয় বসে দেখছ তীরের গাছ চলেছে। ঐটেই হচ্ছে রিয়্যালিটির চেহারা।'

'মশাই', আরেকজন প্রশ্ন করল, 'আমি যদি ব্রহ্ম, তাহলে তো আমার সব দায়িত্ব চুকে গেল। তখন পাপ করলেও আমাকে লাগবেনা।'

গর্জে উঠল স্বামীজি: 'যদি সত্যি বিশ্বাস করতে পারো আমিই সেই ঈশ্বর, সাধ্য কি তুমি ক্ষুদ্র হও, নীচ হও, সাধ্য কি তুমি পাপ করো অন্যায় করো?'

সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার নামকরা নাস্তিক। খৃষ্টান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বামীজির সঙ্গে তর্ক করতে এসেছে।

বেশ তো নাই বা বিশ্বাস করলে। নাস্তিকও ধার্মিক হতে পারে। এস আমরা যার-যার আদর্শ নিয়ে কাজ করি। জল যখন আগুনে বসানো হয় একটার পর একটা বুদ্বুদ ওঠে। তারপর জল টগবগ করে, পাত্র আলোড়িত হয়। প্রত্যেক মানুষ বুদ্বুদ, সমস্ত উত্তপ্ত জলের আলোড়নই সমাজ। বৈজ্ঞানিকে-দার্শনিকে ভেদ নেই। এক জলের মধ্যেই বহু বুদ্বুদের সামঞ্জস্য।

নাস্তিকতা নিয়ে এসেছিল উর্জিতা ভক্তিতে রূপান্তরিত হল মুদালিয়ার।

'সেই মহান অজানা ব্রহ্মকে কি কখনো দেখা যায়?' রামনাদের রাজার প্রাসাদে একজন বিদ্রূপের সুরে জিগগেস করল স্বামীজিকে।

স্বামীজি হুঙ্কার করে উঠল: 'যায়। আমি দেখেছি সেই অজানাকে।'

'মশাই, ঈশ্বরের স্বরূপ কি বলতে পারেন?' খৃষ্টান কলেজের ছাত্র, সুব্রহ্মণ্য আয়ার জিগগেস করল স্বামীজিকে।

মহীশূরের রাজার দেওয়া হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে স্বামীজি। চোখ খুলে তাকালো একবার প্রশ্ন শুনে। বললে, 'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। শক্তি, এনার্জি জিনিসটা কি বলো তো বুঝিয়ে।'

ছাত্র হিমসিম খেতে লাগল। দেখল এমন জিনিসও আছে যা বোঝা যায় অথচ বোঝান যায়না।

'তুমি কুস্তি লড়তে পারো?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'একশোবার। লড়বেন?'

'এসোনা।'

মুহূর্তে ঘায়েল হল আয়ার। কি দেখছ? মাংসপেশীর দৃঢ়তা না ব্যায়ামের কৌশল? সমস্ত কাঠিন্য-নৈপুণ্যের মধ্যেই অদৃশ্য শক্তি। কাঠের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আগুন। বীজের মধ্যেই প্রসুপ্ত বনস্পতি। ঈশ্বরের স্বরূপ জিগগেস করছিলে না? ঈশ্বর কে? যার দ্বারা জন্ম স্থিতি ও লয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। যিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান। যিনি সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু। যিনি অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপ। তবে কি ঈশ্বর দুজন? এক নির্গুণ

ব্রহ্ম, আরেক সগুণ ভগবান? একই জিনিসের দুইরকম চেহারা। জল আর বরফ। তন্তু আর পট। মাটি আর মূর্তি। যিনি জ্ঞানীর সচ্চিদানন্দ তিনিই ভক্তের প্রেমের ঠাকুর। জ্ঞানে এমন এক অবস্থায় আসা যায় যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নেই, জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নেই, প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নেই। আমি তুমি বা তিনি নেই। সেখানে কে কাকে দেখে, কে কার কথা শোনে? সেখানে বাক্যও নেই, মনও নেই। শুধু নেতি-নেতি, শুধু একমেবাদ্বিতীয়ং। সে এক অনবচ্ছিন্ন মুক্তি, ব্রহ্মনির্বাণ। কিন্তু মুক্তির আনন্দ কোথায় যদি না একটা ব্যক্তিত্বের চেতনা থাকে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আমি চিনি হইতে চাইনা, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি। তাই যে জীবন্মুক্ত, আত্মারাম অর্থাৎ অন্তরেই যার সকল তৃপ্তি, সে জ্ঞানীমুনিরাও অবশেষে ভক্ত হয়ে ওঠে। ভক্তিই সমস্ত আস্বাদের গুরু। প্রহ্লাদ যতক্ষণ আত্মনিমগ্ন ছিলেন, জগৎ ও তার কারণ কিছুই দেখতে পেলেন না, সমুদয়ই অবিভক্ত, শুধু অনন্তরূপে প্রতীয়মান মনে হল। কিন্তু যখনই বোধ হল আমি প্রহ্লাদ অমনি তাঁর চোখের সামনে দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ ব্রহ্মাকে বললে, হে ভূতভাবন, আপনাকে নমস্কার। এখন বলুন এই বিশ্ব কার সৃষ্ট কার স্বরূপ, কাকেই বা আশ্রয় করে আছে আর কাতেই বা লীন হবে? আপনিই কি সেই স্ব-তন্ত্র পুরুষ?

ব্রহ্ম বললে, আমার চেয়েও আছে একজন শ্রেষ্ঠ। সূর্য অগ্নি চন্দ্র তারা যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায় আমিও তেমনি একই স্বপ্রকাশ বিশ্বকে সৃষ্টরূপে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করছি মাত্র।

কে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ? যা ভূতং ভব্যং ও ভবৎ, অর্থাৎ যা হয়ে গিয়েছে, যা হবে, বা যা হচ্ছে সকলই সেই পুরুষ। সর্বং পুরুষ এবেদং। তিনিই সমস্ত বিশ্ব আবৃত করে আছেন, বিতস্তি-পরিমিত হয়েও অধিকার করেছেন সমগ্রকে। আমি সর্বলোকপূজিত, তবু তাঁকে জানতে পারলাম না। কি করে জানা যায় তাঁকে? দেহ ও মন সম্পূর্ণ নির্মল হলেই তাঁকে জানা যায়। আর দেখা পাওয়া যায় কি করে? হৃদয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে অহরহ তাঁকে ডাকলে। শুধু জেনে আমার কী সুখ! আমার সুখ দেখে। আমার সুখ আস্বাদে। সে দর্শন-স্পর্শনের অধিকারী কে? সে আস্বাদন কার পুরুষার্থ; একমাত্র ভক্ত। একমাত্র ভক্তের।

সুতরাং অমৃতবর্ষিণী ভক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হোক। তুমি মধু হয়ে ওঠ, স্বাদু হয়ে ওঠ। শ্রীনিকেতন ভগবান প্রসন্ন হলে কী অলভ্য থাকতে পারে? কিন্তু অহেতুকী ভক্তির এমন মজা যে সে কিছুই আকাঙ্খা করেনা। তুমিও ভালোবাসো, আকাঙ্খা কোরোনা।

রাঁধুনে বামুন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হুঁকোর দিকে। স্বামীজি জিগগেস করলে, 'কি হে, তুমি হুঁকোটা চাও?'

এ যে একেবারে কল্পনার বাইরে। রসিকতারও একটা সীমা আছে। নইলে মহীশূরের মহারাজের দেওয়া চন্দনকাঠের হুঁকো দিয়ে দেবেন অনায়াসে?

'কি হে, কথা বলছনা কেন? নেবে এই হুঁকোটা?' হুঁকোশুদ্ধ হাত

বাড়াল স্বামীজি।

'আপনার এত সাথের হুঁকো, কতদিনের সাথী—' বললে রাঁধুনে বামুন।

'আমার প্রিয় যদি তোমারও প্রিয় হয় তো মন্দ কি। আমার নেই আর তোমার আছে এ একই কথা।' রাঁধুনে বামুনের হাতে হুঁকোটি গুঁজে দিল স্বামীজি।

' 'যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করছি, আবার আমি লক্ষ-লক্ষ দেহে সম্ভোগ করছি স্বাস্থ্য। যেমন সহস্র দেহে উপবাস করছি, তেমনি প্রচুর আহার করছি সহস্র দেহে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'যেমন সহস্র দেহে দুর্বহ দুঃখ তেমনি সহস্র দেহে দুঃসহ সুখ। কে কার নিন্দা করে, কে কার স্তুতি? কাকে চাইবে, ছাড়বেই বা কাকে? আমি কাউকে চাইনা, কাউকে ছাড়িও না। যেহেতু আমিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি নিজেরই স্তুতি করছি, নিজেরই অপযশ। নিজের দোষেই আমার কষ্ট, নিজের ইচ্ছাই আমার সুখ। আমি স্বাধীন, সর্বতঃ-স্বাধীন।'

এই হচ্ছে জ্ঞানীর ভাব, যে জ্ঞানী মহাসাহসী, ছিন্নসর্বসংশয়। যে জ্ঞানী সমুদয় পুতুল ভেঙে ফেলতে পারে, শুধু কুসংস্কারের পুতুল নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের পুতুল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে গেলেও সে হেসে বলে, এ জগৎ কোথাও ছিল নাকি, মিলিয়েই বা গেল কোথায়? ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ?

বিবেকানন্দ একদিকে জ্ঞানী, অন্যদিকে ভক্ত। একদিকে বৃহত্তেজা সূর্য, অন্যদিকে সুধাস্যন্দী চন্দ্র।

নৃসিংহ অবতীর্ণ হলে প্রহ্লাদ স্তব করতে লাগল : হায় আমি অসুর থেকে উৎপন্ন, হরিতোষণে আমার যোগ্যতা কোথায়? কিন্তু আমি জানি সম্পত্তি, সৎকুল, সৌন্দর্য, তপস্যা বা পাণ্ডিত্য—এ সব গুণে পরমপুরুষের আরাধনা হয় না। কারণ ভগবান শুধু ভক্তিতেই তুষ্ট। গুণমণ্ডিত বিপ্রের চেয়ে ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। তাই আপনার করাল-রূপ দেখে আমি ভয় পাচ্ছিনা। দেহে অহং-বুদ্ধি নিয়ে ভ্রমণ করছি এই আমার ভয়। আমি কালচক্রে ইক্ষুদণ্ডের মত নিষ্পীড়িত হচ্ছি, আমাকে উদ্ধার করুন। আমাকে ভক্তি দিয়ে দাস্য দিয়ে উদ্ধার করুন। আয়ু স্ত্রী বিভব কিছু যাচঞা করিনা, অণিমাদি সিদ্ধিও আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। সব আপনার হাতেই লয় পাচ্ছে। শ্রেয় শ্রবণমাত্রই সুখজনক কিন্তু আসলে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত মিথ্যা। শুধু সেবাই আপনার প্রসন্নতার কারণ। হে অচ্যুত, নানা ইন্দ্রিয় নানা দিকে আমাকে টানছে, আপনার দিকে টেনে আমাকে উত্তীর্ণ করুন। কিন্তু আমি একাকী মুক্ত হতে চাইনা, আমার সঙ্গী এই সব অসুর বালকেরা অত্যন্ত দীন, এদের আমি ছাড়তে পারবনা। তাই আমার সঙ্গে এদেরকেও টেনে তুলুন। শুধু ষড়ঙ্গ সেবা করেই ভক্তি লাভ করতে দিন। ষড়ঙ্গ সেবা মানে নমস্কার, স্তব, কর্মার্পণ, অর্চন, চরণস্মরণ আর কথাশ্রবণ। ভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই। আর সেবা ছাড়া ভক্তি কোথায়? আর দাস্যই সেবার ভিত্তি। সুতরাং আমাকে দাস্য দিন। সহাস্য দাস্য।

'কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে?' পথচারী যুবককে জিগগেস করল স্বামীজি।

'কি দেখছি? আপনাকে দেখছি না, দেখছি আপনার হাতের ঐ লাঠি! কি সুন্দর জিনিসটা!'

'তুমি নেবে?'

'সে কি কথা? এই লাঠি আপনার নিত্যসঙ্গী—'

'তা হোক। নিত্যসঙ্গী আমার ঈশ্বর।'

'তা ছাড়া তীর্থে-তীর্থে ঘুরেছেন এই লাঠি নিয়ে।' বললে যুবক, 'কত তীর্থের অম্লান স্মৃতি বহন করছে এই লাঠি—'

'তা করুক। তীর্থের স্মৃতি আমার অন্তরে, আমার দেহের অণুতে-রেণুতে।'

'তাহলে দেবেন আমাকে?' ঔৎসুক্যে যুবক কাছে এল এগিয়ে।

'দেব। কেননা তোমার প্রাণ যা চায় তা তোমারই।'

আমার প্রাণ ঈশ্বরকে চায়, অতএব ঈশ্বর আমারই।

প্রেতলোকের কতগুলি প্রাণী নির্জনে বারেবারে আবির্ভূত হয়ে স্বামীজিকে বিরক্ত করছে। কি চাই তোমাদের? কি তোমাদের বক্তব্য।

আমরা দুঃখী, শান্তিহীন, কামনাপীড়িত। আমাদের শান্তির ব্যবস্থা করুন।

একা-একা স্বামীজি চলে গেল সমুদ্রতীরে। দুই মুষ্টি বালি তুলে নিল। অন্নপিণ্ড কোথা পাব, এই বালির পিণ্ড গ্রহণ করো! সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে প্রার্থনা করি তোমরা শান্ত হও, তোমাদের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হোক।

প্রেতলোকবাসীরা কি স্থূলবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে? প্রার্থনারত মানুষের অন্তরের স্নিগ্ধতায়ই তারা তৃপ্ত। নিঃসীম শুভাভিলাষেই তারা পরিস্নাত। তারপর এ কার প্রার্থনা? কার শুভাভিলাষ? স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের।

সমস্ত মাদ্রাজ শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। মন্মথবাবুর বাড়ি, যে বাড়িতে আছে স্বামীজি, তীর্থস্থানে পরিণত হল। দলে-দলে আসতে লাগল জনতার ঢেউ। গৈরিকবসনে কি উজ্জলরূপ দেখ একবার তাকিয়ে। মুণ্ডিতমস্তকে কি সৌম্য শোভা! কি উদাত্তশান্ত শঙ্খকণ্ঠ! যেন বিশ্বের গভীর যে অন্তরাত্মা তাকেই সম্ভাষণ করছে নিভৃতে। বলিষ্ঠ, মোহমুক্ত উজর্স্বী। অথচ শিবের মত সদানন্দ, পরিহাসমুখর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট, অথচ অপার-অগাধ বিদ্যা। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ মুখস্থ। বেদান্তদর্শন থেকে সুরু করে আধুনিক পশ্চাত্ত্যদর্শন ও বিজ্ঞান নখদর্পণে। সমস্ত অন্ধতা ও অযুক্তির উপর খড়্গহস্ত। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করলেও এক ভালোবাসায় বন্দী। সে তার সুতীব্র দেশপ্রেম। এক দুঃখে আহত-আর্ত। সে তার দেশবাসীর অধঃপতন। বিদ্যুৎশিখার মত তার বাণী আর অস্ত্রের মত তার অর্থ। সমস্ত কিছু মিলে একটা উদ্বেল ঈশ্বর-উৎসাহ। ক্ষুদ্র প্রাণে নিয়ে এসেছে বিশ্বাস। অল্পদৃষ্টিতে অপরিমেয় আকাশের উন্মুক্তি। এবার তবে দাঁড়াই একবার জগতের মুখোমুখি।

সর্বদেশ-কালের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে। স্থানে-কালে কুলোচ্ছেনা আমাকে। প্রতিষ্ঠিত করি আমার অনশ্বর মহিমা।

চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল স্বামীজি বিদেশে যেতে ইচ্ছা করেছেন।

'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন', বলছেন বিবেকানন্দ, 'তুই কাঁধে করে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাব, সেখানেই থাকব। তা গাছতলাই কি আর কুঁড়েঘরই কি। বা রাজপ্রাসাদই কি।'

জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কাজ করে যাব এই হচ্ছে বীরের ভঙ্গি। কে কি বলছে কে কি লিখছে কাগজে কে মাথা ঘামায়। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং—মরলে স্বর্গ জিতলে বসুন্ধরা—এই সংকল্পে জাগ্রত হই।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব করণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

লোকে স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী আসুন বা ফিরেই যান, দেহপাত আজ হোক বা শতবৎসর পরেই হোক, যেন সত্যপথ থেকে স্খলিত না হই। বেদান্তই সেই সত্যপথ। তার বাণী নিয়ে যাব বিদেশে। উন্মুক্ত সূর্যকে দর্শন করার শক্তি নাই বা থাক, প্রতিবিম্বিত সূর্যকে দেখা কঠিন নয়। মানুষই সেই প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর। মানুষের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে নিশ্চয় করো।

৪২

দেখতে-দেখতে পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠে গেল। স্বামীজির ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। এবার বিদেশে গিয়ে হিন্দুধর্মের উদার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এস। কিন্তু এ কি আমি শুধু নিজের খেয়াল মেটাবার জন্যে চলেছি? নাকি ঈশ্বরের কোনো নির্দেশ আছে প্রচ্ছন্ন? জিজ্ঞাসায় দুলতে লাগল স্বামীজি।

মা গো, তোর কি ইচ্ছে তাই বল। তুইই তো কর্ত্রী, কারয়িত্রী, করণগুণময়ী, কর্মহেতুস্বরূপা। তোর হাতে আমি তো কলের পুতুলমাত্র। বল তোর কি ইচ্ছে? যাব, না, যাব না?

যারা চাঁদা সংগ্রহ করছিল তাদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'যা টাকা যোগাড় হয়েছে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।'

'সে কি কথা?' সবাই অবাক মানল: 'যাবেন না বিদেশে?'

'মার কি অভিলাষ তা না জানবার আগে ঝাঁপ দেব না অন্ধকারে।' বললে স্বামীজি।

কে মা? যিনি জগজ্জননী মহামায়া তিনি?

হ্যাঁ, তিনিই তো। তিনিই তো মর্ত্যের ঘরে সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের অভেদস্বরূপিণী।

'দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।' শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ: 'মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ? দাদা, ঐ যে বলছি ঐখানেই আমার গোঁড়ামি! রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।'

শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখল স্বামীজি। মাগো, বিদেশে যেতে চাই, তুমি কি বলো?

শ্রীশ্রীমা বলছেন আপন মনে: 'নরেন বলেছিল, মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়। আমি বললুম, দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না। নরেন বললে, মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়? আমি বললুম, জ্ঞান হলে? নরেন বললে, জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বর সব উড়ে যায়। মা, মা—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব তখন এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথা।'

'মাতৃভাবই সাধনার শেষ কথা। বলেছেন ঠাকুর।

'জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে।' বলেছেন বিবেকানন্দ, এই অবস্থায়ই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে চরম নিঃস্বার্থপরতা। শুধু আয়ত্ত করতেই পারে না, পারে প্রকাশ করতে।'

মাকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে।

ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'আমার নরেনকে তো দেখনি—'

'কি করে দেখব?' বললেন শ্রীমা, 'আমি কি ছেলেদের সামনে বেরুই?'

'না, তুমি দেখো। কি সুন্দর তার চোখ দুটি!'

শ্রীমা চোখ নত করলেন। পদ্মপলাশনেত্রকে কি করে দেখি যদি তুমি না দেখাও।

কি একটা জিনিস আনতে ঠাকুর নরেনকে পাঠালেন নহবৎখানায়। 'যা তো জিনিসটা চেয়ে নিয়ে আয় তো।'

'কার কাছে চাইব?' নরেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'কার কাছে আবার! তোর মার কাছে।'

দরমা দিয়ে ঘেরা নহবৎখানার খাঁচার বাইরে দাঁড়াল নরেন। ডাকল, 'মা আমি এসেছি।'

করুণাময়ী বেড়ার ফাঁকে রাখলেন তাঁর চোখ। দেখলেন কি বৃহৎ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ সেই চোখ। দুই চোখ নয় যেন তিন চোখ একসঙ্গে।

কুমারী পূজা করার সময় স্বামীজি একবার রক্তচন্দন তার কপালে পরিয়ে দিয়েছিল। শিউরে উঠে বলেছিল, 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত দিয়ে ফেললুম—'

তৃতীয় নয়নেই তৃতীয় নয়নকে দেখ।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর বলতেন শ্রীমাকে, নরেন আজ এখানে থাকবে, শ্রীমা তখুনি নরেনের জন্যে ময়দা ঠাসতে বসতেন আর চড়িয়ে দিতেন ছোলার ডাল। মোটা-মোটা রুটি আর ছোলার ডালই যে নরেনের পছন্দ এ কে না জানে।

'মা আমার জ্বর করে দাও।' মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপুজা হয়, লোকে লোকারণ্য, হাজার কাজের ঝক্কি, হঠাৎ নরেন এসে বললে মাকে। সঙ্গে-সঙ্গেই হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল নরেনের।

'ওমা, এ কি হল?' শ্রীমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : 'এখন কি হবে?'

'কোন ভয় নেই মা।' বললে নরেন। 'আমি সেধে জ্বর নিলুম। ছেলেগুলো প্রাণপণ করে খাটছে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাইকি দুটো থাপ্পড়ই বা দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট আমারও কষ্ট। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে।'

কাজকর্ম চুকে আসতেই মা বললেন, 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।'

'হ্যাঁ মা, এবার উঠি।' নরেন পাশ ফিরল।

'কই, উঠলেনা?'

'এই উঠে বসলুম।' সুস্থ হয়ে যেমন-তেমন উঠে বসল নরেন।

সেবার পুজার সংকল্প মায়ের নামে হয়েছিল। নরেন বললে, 'আমরা তো কপানিধারী, আমাদের নামে হবেনা।' মায়ের হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা প্রণামী দেওয়াল তন্ত্রধারককে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করলে।

'সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে ক'জন?' বলছেন শ্রীমা, 'মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐ সব দেখেই তো নিষ্কামকর্মের পত্তন করলে।'

নিষ্কাম কর্মযোগে ফলনাশের ভয় নেই যেহেতু ফলকামনাই নেই। কাম্যকর্মেই বিঘ্ন। নিষ্কামকর্ম বিঘ্নহীন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এর অল্প আচরণও সংসাররূপ মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে। নিষ্কামকর্মে অখণ্ড চিত্তশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধির নাশেই চিত্তশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধিই বন্ধন। চিত্তশুদ্ধিতেই চিরন্তন প্রসন্নতা। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।' বলছেন শ্রীমা, 'তিনি তাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলেই তাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন। নরেন যা লিখছে যা বলছে, খুব সত্যি, কালে সব হবে।'

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে আছেন তখন শ্রীমা। পুর্ণিমার রাত। নদীর ঘাটে বসে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলেন পিছন থেকে কে এসে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামছে দ্রুত পায়ে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল শ্রীমার। একি? এ যে ঠাকুর!

গঙ্গায় নেমে গেলেন, ডুবে গেলেন, মিশে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ!

আরো আছে বিস্ময়! দেখতে পেলেন পাড়ে বহু লোকের জনতা হয়েছে।

আর তাদের মধ্যে নরেন। নরেন কি করছে? দু'হাতে করে গঙ্গাজল নিয়ে সেই জনতার মধ্যে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর মুখে মন্ত্র বলছে শ্রীরামকৃষ্ণ। যার গায়েই সেই মন্ত্রপূত জল পড়ছে সেই পাচ্ছে সদ্য মুক্তি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কামারপুকুরে আছেন তখন শ্রীমা, মনে একটু বা ক্ষোভ, এখানে গঙ্গা নেই। নাই থাক, হেঁটেই চলে যাবেন কলকাতা, এমনি ভাবছেন মনে-মনে, হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর চলেছেন। একা নয়, তাঁর পিছু-পিছু নরেন আর রাখাল আর বাবুরাম।

এ কি! রাস্তা কই? এ যে নদী! ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে অনর্গল জলস্রোত বেরুচ্ছে, সে স্রোত ঢেউ তুলে সবেগে ছুটছে সামনে। পথঘাটের চিহ্ন নেই, শুধু জলতরঙ্গ।

'দেখছি, ইনিই সব। এঁর পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা।' উল্লাসে কথা কয়ে উঠলেন। রঘুবীরের ঘরের কাছ থেকে মুঠো মুঠো জবাফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলেন পুষ্পাঞ্জলি। যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই গঙ্গা, সেখানেই বারাণসী।

কত বড় বিশ্বাস তাঁর নরেনের উপর। নরেন নিজের গোঁতে চলত, নিজের মতে কাজ করত, কিছু বলতেননা। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়েছিল নরেন, সমাজে তার অবাধ যাতায়াত। সেখানে মেয়েরাও যায় বলে ঠাকুরের মনঃপূত নয়, মেয়েদের সামনে রেখে কি ধ্যান জমে? কিন্তু আশ্চর্য, নরেনকে কিছু বলতেন না। বরং বলতেন চুপিচুপি, 'তুই যাস যাস রাখালকে যেন বলিসনি। রাখালকে বললে ওরও যেতে ইচ্ছে হবে।'

তার মানে নরেনের মনের জোর বেশি। নরেন বেশি নির্ভরযোগ্য।

নরেন গান গাইছিল তানপুরা বাজিয়ে: নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে। গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের সমাধি হল। উন্নত দেহে পূর্ব-আস্য হয়ে বসে আছেন করজোড়ে। সমাধি দেখে তানপুরা ফেলে নরেন চলে গেল বারান্দায়। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর তাকালেন ব্যাকুল হয়ে, এক ঘর লোক কিন্তু নরেন নেই। শূন্য তানপুরা পড়ে আছে।

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল: কোথায় নরেন?

ঠাকুর বললেন, 'ও এখন থাকল আর গেল। আগুন জেবলে দিয়ে গেছে।' নরেন সেই নিরিন্ধন বহ্নি।

বলতেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবেনা। ওকে আমি ভুলিয়ে রেখেছি। যখন প্রথম আসে তখন ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁস হয়ে গেল। চৈতন্য হলে কাঁদতে লাগল, ওগো, আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, মা আছে। আমি বললুম কেউ তাঁরা তোর নন, সব ঈশ্বরের, আর তুই আমার।'

মাস্টার মশাইকে বলছে নরেন, 'ঠাকুর কি নম্র কি নিরহঙ্কার। কি সর্বঢালা বিনয়। বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয়? বুঝি আমার ভিতরে অহঙ্কার আছে। আমি বড় হাঁকডেকে।'

ঠাকুর বলতেন, 'এ অহং কার? এ কার দেওয়া?' বললেন মাস্টার মশাই: 'ঈশ্বরই তোমার মধ্যে এ অহংকারটুকু রেখে দিয়েছেন যাতে তুমি অনেক কাজ করো। যাতে পারো অনেক হাঁকতে-ডাকতে।'

'আমি বললুম আমাকে সমাধিস্থ করে দিন—'

'তিনি কি বললেন?'

'বললেন, সমাধি তো তুচ্ছ কথা। তুই সমাধির পারে যা।'

'তার মানে ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা কর। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান নিয়ে কারবার কর। তুমি যাবে কোথায়? তোমার পরে যে ঠাকুরের সব ভার অর্পণ করা। তুমি যে তাঁর আমমোক্তার।'

যখন আশার শেষ আলোটিও নিবে যাচ্ছে, ঠাকুর চলেছেন মহাযাত্রায়, শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। চোখ মেলে তাকালেন ঠাকুর বললেন, 'তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেনই তো আছে। আমার যেমন করেছে তোমারও তেমনি করবে।'

মা যখন যাচ্ছেন রামেশ্বরে, তখন রামনাদের রাজা লিখছেন তার কর্মচারীদের, 'আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন, ব্যবস্থার যেন এতটুকুও ত্রুটি না হয়।

রামেশ্বর তখন রামনাদের অধীন। রামনাদের রাজার গুরু বিবেকানন্দ। আর বিবেকানন্দের গুরু শ্রীমা।

'যার ঠাকুরকে বিশ্বাস নেই, মায়ের উপর ভক্তি নেই', ব্রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি: 'তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, শাদা বাঙলায় বললুম, মনে রেখো।'

মাদ্রাজ থেকে হায়দ্রাবাদে এল স্বামীজি। হায়দ্রাবাদের নবাব খুরশিদ জা স্বামীজির ঈশ্বরব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, 'আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি আপনার বিদেশ যাত্রার সাহায্যে।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'এখনো সময় হয়নি। এখনো পাইনি মার হুকুম।'

গণ্যমান্য কত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে রোজ, কত রাজা-রাজড়া, কত উঁচু দাঁড়ের সরকারী কর্মচারী, কিন্তু এমন লোক তো কখনো দেখিনি হায়দ্রাবাদের সে এক অদ্ভুত যোগী, অলৌকিক তার মনের ক্ষমতা। মন যা বলে তাই সে করে তুলতে পারে। ও ডালে ফুল ফুটুক, ফুল ফুটে ওঠে। এ ভারি বস্তুটা নড়ে উঠুক, জিনিস অমনি নড়ে ওঠে। বৃষ্টি পড়ুক, অমনি বৃষ্টি-পড়ে।

কিন্তু জ্বর ছাড়ুক বললেই জ্বর ছাড়ে কই? স্বামীজি যখন এল যোগীর কাছে, দেখল যোগী তীব্র জ্বরে শুয়ে আছে বিছানায়। নিজের জ্বর নামাতে পারো না কেমন তোমার মনোবল?

ভাবখানা এমনি, তোমার জন্যে বসে আছি।

স্বামীজি বসল তার শয্যাপাশে। যোগী স্বামীজির একখানা হাত টেনে নিয়ে রাখল নিজের মাথার উপর। ধীরে ধীরে তপ্ত জ্বর নেমে গেল শীতল হয়ে। কত দিনের রোগী উঠে বসল বিছানায়।

আমার মনের চেয়েও তোমার স্পর্শের শক্তি বেশি। আমি কি ছাই পারি, তুমি পারো লোহাকে কাঞ্চন করতে।

হায়দ্রাবাদেও টাকা তোলবার হিড়িক পড়ে গেল। চাঁদার দরকার কি, বেগম বাজারের মতিলাল শেঠ একাই দিয়ে দেবে সব টাকা।

স্বামীজি হাসল। বললে, 'ধনীর টাকা নেব না। যদি বিদেশে যাই ভারতের দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্যেই যাব। সুতরাং পাথেয় যদি তারা জুটিয়ে দেয় তবেই যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বাগ্রে মায়ের আদেশ।'

স্বপ্ন দেখলেন শ্রীমা। দেখলেন উত্তাল সমুদ্র, তার ঢেউয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ঠাকুর আর তাঁর পিছনে নরেন। মায়ের সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল। তক্ষুনি চিঠির উত্তর দিলেন স্বামীজির। লিখলেন, মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, নির্ভয়ে চলে যাও বিদেশে।

কি আশ্চর্য, অনুরূপ স্বপ্ন দেখল স্বামীজি। ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর তাকে ডাকছেন। সেই ডাকে সেও চলেছে ঠাকুরের পিছু-পিছু। ঘুম ভাঙবার পর দেখল মার চিঠি এসেছে।

মহাবীর যেমন রামনাম করে লাফ দিয়েছিল, আমিও তেমনি মা ও ঠাকুরের নাম করে লাফ দিলাম। আমি মায়ের ছেলে, আমাকে আর পায় কে। প্রলয়ংকরী কালীশক্তির অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তিনি আমার অষ্ট পাশের গ্রন্থি মোচন করে দেবেন। ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশ। মায়ের জন্যে ব্যাকুল হলে মা নিজে এসেই বন্ধন খুলে দিয়ে নিজের বুকে তুলে নেবেন।

'যাই যাই তোর বাঁধন খুলি দিগে যাই—'

গোদোহনকালে বাছুরকে দড়ি দিয়ে দূরে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত হয়ে বাছুর আর্তনাদ করছে। সে কান্না শুনতে পেয়েছে সারদা, সাত বছরের বালিকা। কান্না শুনে প্রতিধ্বনি করে উঠেছে, 'যাই যাই তোর বাঁধন খুলে দিগে যাই।' ছুটে এসে খুলে দিয়েছে বাঁধন। তেমনি আমরা অমৃতের সন্তান হয়েও অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি, আছি সংসাররজ্জুতে বাঁধা পড়ে। যদি পারি তেমনি আর্তনাদ করতে, মা মা বলে ডাকতে, বালিকা জগতের মাতা ছুটে এসে তুলে নেবেন তাঁর মুক্ত অঙ্কে।

কালী অর্থ কালশক্তি। সর্বভাবের কলন বা সংহার করেন বলেই কালী। কাল স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি, কালী গতির। আসলে স্থিতি আর গতি অভিন্ন। কালাতীত সত্তায় নিয়ে যাবেন বলেই মা আমার কালীমূর্তি। ভ্রূকুটিকুটিলাস্যা, করালবদনা, শুষ্কমাংসাতিভৈরবা, জিহ্বাললন-ভীষণা, নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। জীবত্বের সমস্ত সংস্কার বিলয় করবার জন্যেই মায়ের এই সংহারমূর্তি। এই মূর্তি ধরেছেন তোমাকে তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেবেন বলে। আসলে তিনি শ্যামা, মেদুর-কোমলা, পীযূষস্যান্দিনী। কালকঙ্কালের নিচে করুণার নির্ঝরধারা। তাঁর মাত্রাবিহীন মিত্রতা। জ্ঞানাধিদেবী চিদানন্দলতিকা।

আর আমার দোষ কি, কষ্ট কি। মা-ই ভবাব্ধিকষ্টহারিণী, সর্বদোষ-বিঘাতিকা।

অভিন্নচক্ষুতে দেখ। সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করো। যে সর্বভূতে আমাকে ভজনা করে সে যে অবস্থাতেই থাকুক আমাতেই অবস্থিত থাকে। গীতায় অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতেও সেই কথা। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমি সর্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত। তবু আমাকে অবজ্ঞা করে মানুষকে অবজ্ঞা করে যে শুধু প্রতিমার পূজা করে তার আরাধনা বিড়ম্বনামাত্র। তার ভজনা ভস্মে ঘৃতাহুতি। কিন্তু আমি সর্বমানুষে আছি জেনে যে সমান মৈত্রীর দৃষ্টিতে সকলকে দেখে, দান-মান দিয়ে অর্চনা করে আমি তারই পূজা গ্রহণ করি।

জীবে প্রেম হলেই ভগবানে ভক্তি। কিন্তু জীবে প্রেম অসম্ভব যতক্ষণ স্বার্থ প্রতাপান্বিত। স্বার্থত্যাগ ছাড়া জীবে প্রেম নেই। জীবে প্রীতি ছাড়া ভক্তি নেই ঈশ্বরে। তাই ভালোবাসাই ভগবান। কিন্তু ভালো তুমি বাসবে কি করে যতক্ষণ তোমার আমিত্ব-মমত্ব থাকে। সুতরাং স্বার্থের উচ্ছেদই সমত্ববুদ্ধির ভিত্তি।

তাই কেউই পর নয়, সকলেই পরম। সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুর বিস্তার। পুত্রকে পুত্রের জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসি। বন্ধুকে বন্ধুর জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসি। নিজেকে ভালোবাসি বলেই অন্যকে ভালোবাসা। তাই আপনও যা পরও তাই। সবই সেই একের পূর্ণতা। খণ্ডও যে সমগ্রও সে।

হিরণ্যকশিপু জিগগেস করল প্রহ্লাদকে, 'শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম ব্যবহার করা উচিত ?'

প্রহ্লাদ বললে, 'শত্রু ? শত্রু কে ? সকলই বিষ্ণুময়। শত্রুমিত্রের ভেদ কোথায় ?'

হে অর্জুন, সুখই হোক আর দুঃখই হোক যে আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী সেই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাই স্বামীজি যে আমেরিকা যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে না, যাচ্ছে যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে প্রকাশমান সেই আরেক প্রাণলোকে। বিশ্ববিধাতার থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়াবে সমুদয় মানুষের সামনে। এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। যে মহান আত্মা বিশ্বকর্মা জনগণের হৃদয়ে সমাসীন তিনি আমার হৃদয়ে জাগ্রত, উদবোধিত। তাই সেই অধিকারে এসেছি তোমাদের কাছে। যে নিখিলেশ্বরকে জেনেছে সেই সকলকে অবাধে আহ্বান করবার অধিকারী।

যাবার সব ঠিকঠাক, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি এসে উপস্থিত। কবে দু'বছর আগে খেতড়ির রাজাকে আশীর্বাদ করেছিল স্বামীজি, তোমার ছেলে হবে, তাই এখন ফলেছে নাকি সেই আশীর্বাদ। সন্দেহ কি, স্বামীজির জন্যেই নিঃসন্তানের পুত্রলাভ ঘটেছে, সুতরাং সেই শিশুর জন্মোৎসবে যাওয়া চাই স্বামীজির। মহারাজা অনেক করে বলে দিয়েছেন।

'কিন্তু, অসম্ভব, একত্রিশে যে আমি রওনা হচ্ছি আমেরিকা।' প্রতিবাদ করল স্বামীজি।

জগমোহনলাল, রাজার সেক্রেটারি ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, 'আপনি না গেলে উৎসব ম্লান হয়ে যাবে, রাজা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।'

'বলেন কি, আমার গোছগাছ এখনো বাকি।'

'তা হোক, সব ব্যবস্থা করে দেবেন মহারাজা। অন্তত একদিনের জন্যেও চলুন।'

সেই আন্তরিকতার আতিশয্য এড়াতে পারলনা স্বামীজি। বললে, 'চলো, কিন্তু একদিন।'

সে কি বিপুল সংবর্ধনা! সমস্ত নগর আলোক-আনন্দে ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠেছে। নৃত্যগীতবাদ্য উদ্বেলিত চারদিকে। কিসের উৎসব আজ? মহারাজের পুত্র হয়েছে তার জন্যে? না, মহারাজের গুরুজি এসেছেন তার জন্যে? প্রাসাদের সিংহদ্বারে দাঁড়াল এসে গাড়ি। প্রহরীরা খাপের থেকে তলোয়ার তুলে অভিবাদন করলে একযোগে। রাজা কোথায়? খবর পেয়ে রাজা ছুটে এসে স্বামীজির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। স্বামীজি তুলল তার হাত ধরে।

রাজসভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হল স্বামীজিকে। চারদিকে অতিথি-অমাত্যদের ভিড়। সবাই উঠে নতশিরে প্রণাম করল। সালঙ্কার সিংহাসনে বসানো হল স্বামীজিকে। একে-একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিল রাজা। সবচেয়ে বড় পরিচয় ইনি বেদান্তকেশরী ইনিই পুরুষোত্তম। যেমন সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী তেমনি নিয়তকর্মী। সম্প্রতি চলেছেন পশ্চিমে। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে।

যুদ্ধ ও যোগ এই ভারতবর্ষের সার কথা। যুদ্ধও করো ও যোগীও হও—এই গীতার মর্মবাণী। যিনি সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের সুহৃদ তিনি আবার সমস্ত বিষয়কর্মের ভোক্তা। সুতরাং জীবন্মুক্ত হয়ে কর্ম করো। সেই কর্মই জ্ঞানীর কর্ম। আর জ্ঞান হলেই ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি।

শিশু রাজকুমারকে আনা হল। তার মাথায় হাত রেখে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করল স্বামীজি।

এবার তবে যেতে হয় বম্বে।

'সেখানে কি?'

'সেখান থেকেই আমার জাহাজ ছাড়বে।'

'চলুন আপনাকে জয়পুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।' রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'কেন, জয়পুর কেন?'

'জয়পুরই আমার রাজ্যের শেষসীমা।' বললেন রাজা। 'অতিথিকে বিদায় দিতে হলে রাজ্যের শেষসীমা পর্যন্ত যাওয়া উচিত।'

রাজাকে নিরস্ত করা গেলনা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এমন আমার

সাধ্য কি, আপনি যান সমুদ্রপারে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আপনাকে ছেড়ে দিতে বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাজার দুই চোখ ছলছল করে উঠল।

স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। জগমোহনলালকে বললেন, একেবারে বম্বে গিয়ে তুলে দিয়ে এস জাহাজে। এই নাও টাকা, যা লাগে যত লাগে। সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়ে এস।

জয়পুরে রাজপ্রাসাদে এক প্রকোষ্ঠে রাত্রে বিশ্রাম করছে স্বামীজি, পাশেই দরবারকক্ষে মহারাজার নৃত্যসভা বসেছে। বীণা বাজিয়ে গান গাইছে নাচওয়ালী। মহারাজ স্বামীজিকে খবর পাঠালেন, একবারটি আসুন, গান শুনে যান।

স্বামীজি উত্তর পাঠাল : 'আমি সন্ন্যাসী, আমার অভিরুচি নেই।'

গায়িকা মর্মাহত হল। এ বুঝি তাকেই প্রত্যাখ্যান, যেহেতু সে হেয়, পংক-কলংকে তার বসবাস। মনে দুঃখ হল, কণ্ঠে এল সেই নম্র আকুতি। গান ধরল নর্তকী :

'প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়
দুঁহু এক কাঞ্চন করো।'

প্রভু, আমার দোষ ধরোনা। তুমি তো সমদর্শী। স্পর্শমণির অন্তর দ্বিধাহীন, সে সব লোহাকেই সোনা করে, সে পূজার ঘরের অস্ত্রই হোক বা ব্যাধের হাতের খড়্গাই হোক। তা হলে আমাকে তুমি কেন কৃপা করবেনা? আমি কলঙ্কী বলে তুমি কেন কৃপণ হবে?

বৈষ্ণবসাধু সুরদাসের গান। রাতের হাওয়ায় সে করুণ সুর স্বামীজির কানে গেল। এ আমি কাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছি? এ গায়িকাও কি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া নয়? আমার এখনো ভেদাভেদ? আমি সন্ন্যাসী আর ও পতিতা? এই আমার সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি? স্বামীজি দাঁড়াল এসে দরবার কক্ষে। প্রণামে লুণ্ঠিত হল নর্তকী। স্বামীজি আশীর্বাদ করে বিদায় নিল।

রাত্রে আবু রোড স্টেশনে নেমে পড়ল স্বামীজি। নিবিড় পর্বতপুঞ্জের মধ্যে যেন কোন গূঢ়গহনের শুনতে পেল সম্ভাষণ।

একটি রেলকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ ছিল, রাত্রে তার ওখানে গিয়ে উঠল। কোথায় রাজার বিলাসপুরী আর কোথায় রেলকেরানির কোয়াটার। উপল ও উৎপল দুইই স্বামীজির কাছে এক।

পরদিন সকালে দুই পদব্রজী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল পথে। কত সাধু চলেছে তীর্থভ্রমণে তার ঠিক কি। সন্ন্যাসীরা তাকাল পিছন ফিরে। এ কে গৈরিকের দীপ্তশিখা। হাতে তেজোদ্ধত লাঠি। চলেছে উদাসীনের মত, আবৃত্তি করছে সংস্কৃত শ্লোক। সে শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে অহংকার আর অলঙ্কার,

গৌরব আর প্রতিষ্ঠা—সমস্তই ভস্মমুষ্টি। কি হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে, কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে, বসনে-ভূষণে, কারণে-উপকরণে? স্তূপীভূত জড়ের জঞ্জালে? খেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কি দেবে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডই বা আমাকে কি দেবে যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাইনা, সম্মান চাইনা, সিংহাসন চাইনা, সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।

আরে, একি রাখাল যে। আর তুমি হরি?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ। দুইজনকেই প্রণাম করল স্বামীজি। বললে, 'জানিস রাজা, আমেরিকা যাচ্ছি।'

উৎসাহে ফেটে পড়ছে। নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'দেখছিস কি? এই এঁরই জন্যে এ সব হচ্ছে।'

'দেখবি আরো কত হবে।' বললে রাখালরাজা।

'মেতে যাবে, মেতে যাবে—চারিদিকে শুধু ঠাকুরের নাম আর ঠাকুরের প্রেম।'

'আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেই। কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কারু মাথায় আসেনা।' আমেরিকা থেকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ: 'সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে রুপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প দু'হাজার মারা হল—একেই ইংরেজিতে ইমবেসিলিটি বলে। ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দু'বার ঘুরবে না চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা ঘামাতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো—আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।'

তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাছে টেনে নিল স্বামীজি। বললে, 'হরি ভাই, তোমাদের ধর্ম কি জিনিস আমাকে বলতে পারো? আমি তো চারদিকে কেবল দুঃখই দেখতে পাচ্ছি, অপার অনপনেয় দুঃখ।' বলতে-বলতে স্বামীজির বিশাল চক্ষু থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা পড়তে লাগল। নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললে, 'সমগ্র মানুষের দুঃখ যেন এই বুকের মধ্যে এসে বাসা নিয়েছে। হৃদয় তাই বিস্তীর্ণ হয়েছে, দূরতম দীনতম মানুষের দুঃখও যেন আমারও দুঃখ। কে বোঝে আমার এই দুঃখের কথা? কেউ না কেউ না। শিশুর মত কাঁদতে লাগল স্বামীজি।

একটি বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প হচ্ছে ট্রেনের কামরায়। এমন সময় শ্বেতাঙ্গ এক টিকিট-কলেক্টর উঠে টিকিট দেখতে চাইল। ভদ্রলোক বললে, 'টিকিট নেই।' 'তবে এই কামরাতে বসে আছো কোন অধিকারে?' ভদ্রলোক বললে,

'গাড়ি স্টেশনে থেমে আছে, আমি তাই উঠে বসেছি। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমি যাত্রী নই।'

'নেমে যান বলছি।'

'কোন আইনে ?'

এই নিয়ে সুরু হল তর্ক। ক্রমে বিতণ্ডা, প্রায় হাতাহাতির কাছাকাছি। স্বামীজি এল মধ্যস্থতা করতে। বললে, 'আমাকে দেখে আমার সঙ্গে কথা কইতে উঠেছে। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিলেই নেমে যাবে।'

'তুম কাহে বাত করতে হো ?' শ্বেতাঙ্গ টিকিট-কলেক্টর হুমকে উঠল।

'তুম বলছ কাকে ?' পালটা গর্জন করে উঠল স্বামীজি : 'ভদ্রতা শেখনি ? আপ্ বলতে জানোনা ?'

স্বামীজির ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গেল সাহেব। ভেবেছিল সামান্য ভেকধারী কিন্তু এ যে দেখছি কেশরফোলানো সিংহ।

সাহেব বললে, 'আমি হিন্দি ভালো জানিনা কিনা। কিন্তু ঐ লোকটা—' এবার ইংরেজিতে বলল সাহেব।

'ঐ লোকটা ?' স্বামীজি আবার ধমকে উঠল : 'ইংরিজিও ভালো জানোনা দেখছি। লোক না বলে ভদ্রলোক বলতে পারো না ?'

গুটিগুটি নেমে গেল সাহেব।

জগমোহনকে বললে স্বামীজি, 'অপ্রতিবাদে নেবেন কখনো অপমান। আত্মমর্যাদাকে সব সময়েই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পরাধীনতার নাগপাশ এমনি করেই মোচন হবে।'

গাড়ী ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে গুনগুন করে আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি : 'রামং চিন্তয় চিত্তবর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলং।' রে বর্বরচিত্ত, সর্বদা রামকে চিন্তা করো, অন্য শত শত চিন্তাতে কি ফল ? মুখ, সর্বদা রামনাম করো, বহু অনর্থক কথায় কি ফল ? কর্ণ, রামচন্দ্রচরিত শ্রবণ করো, গীতবাদ্য শুনে কি হবে ? চক্ষু, সকল জিনিস রামময় দেখ, রাম ছাড়া আর সব কিছু ত্যাগ করো। চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম।

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীর অধিপতি, কিন্তু ভগবানে ভক্তি ছাড়া আর তার কোনো ধন নেই। আর যা সব তার পার্থিব বিষয়, সমস্ত মৃৎপিণ্ডের মত অসার, স্বপ্নের মত মিথ্যা। শ্রীহরির আরাধনায় সম্বৎসর দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করছেন অম্বরীষ। ব্রতশেষে ত্রিরাত্রি উপবাসে থেকে যমুনায় স্নান করে মধুবনে শ্রীহরির অর্চনা সুরু করলেন। ব্রতপারণের উপক্রম করছেন, দুর্বাসা এসে উপস্থিত। মহাভাগ অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ভোজনে আমন্ত্রণ করলেন। দুর্বাসা গেল নদীতে স্নান করতে, কিন্তু আর ফেরবার নাম নেই। দ্বাদশী অতিক্রান্ত হতে আর অর্ধমুহূর্ত মাত্র বাকি আছে তবু ঋষি অনুপস্থিত। ঋষিকে অভুক্ত রেখে কি করে পারণ সম্ভব, অথচ দ্বাদশী-মধ্যে

পারণ না করলে ব্রতবৈগুণ্য ঘটবে। নিরুপায় অম্বরীষ বাসুদেবকে চিন্তা করতে-করতে বিন্দুমাত্র জল পান করলেন। আর সেই মুহূর্তেই ফিরল দুর্বাসা। অতিথিকে না দিয়ে নিজে আগে খেয়েছে এই জেনে দুর্বাসা ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে উঠল। এই রাজ্যমত্ত ঈশ্বরদর্পিত রাজার ধৃষ্টতা দেখ, আমন্ত্রণ করেও আমাকে অভুক্ত রেখেছে। এর সমুচিত শিক্ষা না দিয়েছি তো কি। রোষে একটি জটা উৎপাটন করে এক কৃত্যা নির্মাণ করল, সেই কৃত্যা খড়্গহস্তা হয়ে ধাবিত হল রাজার দিকে। অম্বরীষ পদমাত্রও বিচলিত হলেন না। স্থিরশান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বস্থানে।

তখন কি হল? বাসুদেবের সুদর্শন চক্র এসে আবির্ভূত হল। নিমেষে দগ্ধ করল কৃত্যাকে। শুধু তাই নয় দুর্বাসাকে লক্ষ্য করল। প্রাণভয়ে ছুটল দুর্বাসা। যেদিকে ছোটে সেদিকেই চক্র, সাপকে যেন তাড়া করেছে দাবাগ্নি। সুমেরু পর্বতের গুহার দিকে ছুটল, সেখানেও চক্রের আগমন। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে কোথাও দুর্বাসার ত্রাণ নেই। এমনকি স্বর্গেও সেই দুঃসহ-সুদর্শন।

ব্রহ্মার কাছে আশ্রয় চাইলে দুর্বাসা। ব্রহ্মা বললে, বিষ্ণুর চক্রকে নিরোধ করতে পারি আমার এমন শক্তি নেই। তারপর গেল শংকরের কাছে। শংকর বললে, আমার কিছুই করণীয় নেই, তুমি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। দুর্বাসা বৈকুণ্ঠে গিয়ে বাসুদেবের শরণ নিল। বাসুদেব বললে, আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অম্বরীষের কাছে যাও। ভক্তই আমার হৃদয়, আমিও হৃদয় ভক্তেরই। আমাকে ছাড়া তাঁরা আর কিছু জানেনা, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানিনা। তোমার পরিত্রাতা তাই অম্বরীষ।

দুর্বাসা হেঁট মুখে চলল অম্বরীষের সন্ধানে। অম্বরীষের কথায় চক্র শান্ত হল।

চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা করো!

৪৪

বম্বেতে আলাসিঙ্গা পেরুমাল এসে হাজির।

'এ কি, কোত্থেকে?' এগিয়ে গেল স্বামীজি।

'সটান মাদ্রাজ থেকে।'

'কি মতলব?'

'অতি সামান্য।' হাসিতে বিস্তৃত হল আলাসিঙ্গা: 'আপনাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছি।'

'একা জগমোহনই যথেষ্ট ছিল—যথেষ্টরও বেশি।' স্বামীজি বললে সসম্ভ্রমে: 'জানো রাজপুতনার ও তাজিমি সর্দার। তাজিমি সর্দারদের নাম জানো তো? ওরা সভায়-দরবারে গিয়ে দাঁড়ালে স্বয়ং রাজাকেও উঠতে হয় আসন ছেড়ে। তারপর জানো তো, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি। কিন্তু একবিন্দু

জাঁক নেই শরীরে। বৃষ্টির জলের মতই অনাড়ম্বর। এমন তার সেবা আর পরিচর্যা যে লজ্জা হয় নিজের কাছে।'

বিদেশে যেতে এ লাগবে ও লাগবে কত জিনিস যে কিনে দিচ্ছে জগমোহন তার ইয়ত্তা নেই। এখন বলছে আলখাল্লা আর পাগড়ি সিল্কের হওয়া চাই। তা যেমন-তেমন সিল্ক নয়, একেবারে দামী প্রথম শ্রেণীর। তুমিও যেমন! সন্ন্যাসীর আবার ধড়াচূড়া কি—স্বামীজি আপত্তি করল—খানিকটা মোটা গেরুয়া কাপড় হলেই যথেষ্ট। তা কি হয়! 'রাজার মত সাজাব তোমাকে।' বললে জগমোহন: 'তুমি তো নিজের পক্ষে যাচ্ছনা, তুমি যাচ্ছ ভারতবর্ষের হয়ে। ভারতের জাগ্রতাত্মা হয়ে। তুমি তো দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী নও, তুমি জ্যোতিষাং রবিরংশুমান, পূর্বদিগন্ত থেকে তোমার নবীন উদয়, সেই বেশেই সাজবে তুমি।'

কিন্তু কি নাম নিই। আগে ছিল সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ, এখন মহারাজের কথায় বিবেকানন্দ!

মাদ্রাজে বালাজী রাও-এর ছেলেটি মারা গেছে, খবর পেয়ে মুষড়ে পড়ল স্বামীজি। ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাওকে সে সম্পর্কে লিখছে: 'প্রভুই দিয়ে থাকেন প্রভুই নিয়ে থাকেন, সুতরাং প্রভুরই জয় হোক। আমরা শুধু জানি কিছুই নষ্ট হয়না, সবই নিটুট থাকে, নিখুঁত থাকে। যাই আসুক না তাঁর কাছ থেকে শান্ত মনে নিতে হবে মাথা পেতে। সেনাপতি যদি সৈন্যকে কামানের মুখে যেতে বলে, সৈন্যের তাতে নালিশ করবার কিছু নেই। বালাজীকে বোলো আমরা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছি সে সেনাপতিত্ব।'

বালাজীকেই লিখল সরাসরি: 'ভাই, দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো, আর বোলো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কোনো প্রশ্নে আমাদের নেই অধিকার।
কাজ করো, করে মরো, এই হোক সার।

ভাই, শোকার্তরাই ধন্য, তারাই সান্ত্বনা পাবে। তারাই সমীপবর্তী হবে প্রভুর সিংহাসনের। দৃঢ়তা ও নির্ভরের সঙ্গে বলো, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু তোমার হৃদয়ে শান্তি দিন এই দিবারাত্রি সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।'

'এ জগতের সব কিছুই মূলতঃ সৎ।' বিহারীদাস দেশাইকে লিখছে স্বামীজি: 'উপরের ঢেউ যে চেহারারই হোক, তার গভীরতম দেশে শাশ্বত এক শান্তির ক্ষেত্র বিরাজমান। যতক্ষণ সেইখানে পেঁছুতে না পারছি ততক্ষণই অশান্তি, বিক্ষোভ-বিক্ষেপ। একবার সেই শান্তিমণ্ডলে পেঁছুতে পারলে ঝঞ্ঝার তর্জনগর্জন কিছুই করতে পারেনা। পাষাণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে গৃহ তার গায়ে একটা রেখাও পড়েনা।'

বিহারীদাসও শোক পেয়েছে। তাই লিখছে স্বামীজি: 'যে আঘাত আপনি পেয়েছেন তা আপনাকে বিরাট সত্তারই কাছাকাছি নিয়ে যাক, যিনি এলোক ও ওলোক উভয় লোকেরই একমাত্র প্রেমাস্পদ। আর তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তিনিই সর্বত্র, সর্বকালে সর্বভূতান্তরাত্মরূপেই তাঁর অধিষ্ঠান।'

ওরিয়েণ্ট কোম্পানির জাহাজ "পেনিনসুলার"-এ ফার্স্টক্লাশের টিকিট কাটা হয়েছে। আলাসিঙ্গা আর জগমোহন স্বামীজিকে তুলে দিতে এল। সব ব্যবস্থা নিখুঁত। খেতড়ির মহারাজা কোথাও ফাঁক রাখেননি।

১৮৯৩ সালের একত্রিশে মে স্বামীজির জাহাজ ছাড়ল।

কত পুরোনো কথা মনে পড়ছে এখন। বেশি করে মনে পড়ছে বরানগর মঠের কথা, গুরুভায়েদের কথা—কে কোথায় আছে নাজানি। কোন বনে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই যাক আর থাক, অন্তহীন রহস্য যে ঈশ্বর তাকে পাবারই তাদের অনির্বাণ অন্বেষণ।

শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে সবাই পড়ে আছে। মুষ্টিভিক্ষা করে চাল নিয়ে এসেছে তাই সেদ্ধ করে একটা কাপড়ে ঢেলে সবাই খাচ্ছে। কি দারুণ রুচ্ছ্র! রাত্রে উনুন জেবলে একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর বসে রুটি সেঁকা, হাঁড়ি মাজা, পুকুর থেকে জল আনা। কিন্তু দারুণ দুঃখদুর্দৈব সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি কি ভালোবাসা! কি অপার্থিব আকর্ষণ! কারু থেকে একবিন্দু সাহায্য নেবনা এই তখন পণ সকলের। অনিকেত ও স্থিরমতি হয়ে থাকব। সাধু ও সাপ পরের গর্তে বাস করে, নিজেদের জন্যে কোনো গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, আসক্তি নেই। আমরাও তেমনি নিরাশী, নির্মম, জবরশূন্য।

হীরানন্দ এসেছে, সিন্ধু প্রদেশে হায়দ্রাবাদে বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা বরানগরে মঠ করেছে খবর পেয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এসেছে এখানে। কেশব সেনের বাড়িতেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে আর সেই থেকে ঠাকুরেই মনপ্রাণ।

জিগগেস করল, 'আপনাদের চলে কি করে?' 'সকলে মুষ্টি ভিক্ষে করে নিয়ে আসে তাইতেই চলে যায় একরকম।' বললে নরেন।

হীরানন্দ পকেট হাটকিয়ে দেখল ছ আনা পয়সা আছে। বললে, 'এই পয়সায় এবেলা চলুক।' 'না, না, পয়সার দরকার নেই। এবেলার মত চাল আছে। আর আছে তেলাকুচো পাতা। তাই দিয়ে নুন লঙ্কা মিশিয়ে অপূর্ব ঝোল হবে। তুমি আজ থেকে যাও হীরানন্দ। জল খাবার কিন্তু একটিমাত্র ঘটি।'

লোভ সামলাতে পারলনা হীরানন্দ। থেকে গেল সেবেলা।

ছ আনায় কি হবে? বাড়ি নিয়ে নরেনের আবার মোকদ্দমার খরচ। শরীরের উপর আবার মনের যন্ত্রণা। একদিকে ঈশ্বর আরেকদিকে মা ভাই বোন। একদিকে মঠ আরেকদিকে মা ভাই বোনের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। উভয় সংকট। এই সংগ্রামে কে পারে নিরপেক্ষ থাকতে? নরেন পারে। কিন্তু টাকা কই?

শরৎ আর শশী বললে, 'ভাই আমরা এক কাজ করি। আমরা গিয়ে স্কুলের মাস্টারি নিই। যদি কিছু পাই মাইনেবাবদ তা যাবে না হয় আমাদের মামলার খরচে। কিছু অন্তত উপকারে আসতে পারি তোমার।'

নরেন বললে, 'তোরা আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারিস তা কি আমি জানিনা? কিন্তু আমার জন্যে টাকা রোজগার করতে যাবি এ পারবনা সইতে।' বলেই হাঁক দিল যোগেনকে: 'ওরে যোগে, আমার ঠিকুজি দেখবি? কি আছে জানিস?

তাম্রবর্ণ কেশ হবে, ভস্মমাখা দেহ হবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াব, আর—,
"আর ?" উন্মাদ হয়ে যাব। যা হবার হোকগে। মরণের যেন বড় ভয়-ডর রাখি !"

রাখালের বাপ হারান ঘোষ এসেছে সেবার মঠে। গুপ্ত মহারাজ, মানে সদানন্দ স্বামী তাঁকে খুব সম্মান করে বসাল। বললে, 'আপনার ছেলে তো সাধু হয়েছেন, আপনি কেন হননা ?'

'ওরে বাবা', ভয়ে আঁতকে উঠলেন হারান, বললেন, 'আমি সাধু হব কি। আমি ঘোর বিভবশালী, আরাম-বিরামের ডিপো। আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে ? আমাকে তামাক সেজে দেবে কে ? কে দেবে আমার গা টিপে ? তারপর তোমাদের মত এসব কচু-ঘেঁচু খেতে পারব ? বাবা, পালাই, চোখের উপর তোমাদের এই কষ্ট দেখতেও বুক ফেটে যায়।' তাড়াতাড়ি রওনা হলেন হারান ঘোষ।

সবাই বললে, 'দাঁড়ান, একটা গাড়ি ডাকিয়ে দি।'

'দরকার নেই, পায়ে হেঁটেই চলে যাব। ছেলের হালচালটা একটু দেখতে এসেছিলাম, এসে হালে আর পানি পাচ্ছিনা। তোমরা এত কঠোর সাধনা করছ আর আমি সামান্য পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবনা ?'

তখন বরানগর বাজার থেকে গরানহাটার চৌমাথার গাড়িভাড়া এক আনা, আর যদি গাড়ির ছাদে বসে যাও, তা হলে তিন পয়সা।

একদিন অমনি কোচবাক্সে চড়ে যাচ্ছে নরেন। খালি পা, ময়লা কাপড়, কোঁচা খুলে গায়ে জড়ানো, ছন্নছাড়ার মত দেখতে, কিন্তু দিব্য দীপ্তিতে স্নান করা। বাগবাজরের পোলের কাছে গিরিশ ঘোষের ভাই অতুলের সঙ্গে দেখা।

নরেনের পোশাক দেখে চমকে উঠল অতুল। 'এ কি, কি হল ?'

নরেন বললে, 'আমার মা মারা গেছে।'

'বলে কি ? কবে ? কি অসুখ করেছিল ?'

'আমার মা নয়, আমার মায়া মরে গেছে।' নরেন হেসে উঠল : 'যে মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ফেলতে পেরেছে তার পথই বা কি, বিপথই বা কি। কি তার নিয়ম কি বা তার বারণ ?

সে কি কথা ! এই সেদিনের ডেঁপো ইয়ার, দিব্যি বড় লোকের ছেলে, উকিল হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার এই তীব্র বৈরাগ্য ? এত তীব্র যে দিকবিদিক হুঁশ নেই। খালি পায়ে খালি গায়ে গাড়ির কোচবাক্সে চড়ে চলেছে। দু'জনেই তো যেতুম ঠাকুরের কাছে। হঠাৎ ওর এই অবস্থা আর আমি কিনা সামান্য এক হাইকোর্টের উকিল। কিন্তু কি করব, তিনি যেমন করান তেমনি করি। নরেনকে দিয়ে নরেনকে কাজ, আমাকে দিয়ে আমার। আমি তো আর নরেন নই !

শরীরে আর সহ্য হচ্ছেনা বৈরাগ্য, বহন করা যাচ্ছেনা আর কষ্টের গন্ধমাদন। অনেকেরই মুখ ম্লান হয়ে উঠেছে। তার উপর বাড়ি থেকে আসছে নানান সুরের অনুনয়বিনয়। নানান আরামের প্রলোভন। কেউ-কেউ ভাবলে ফিরে যাই, হ্রস্ব পরিমিত জীবনেই নিজের আয়তন খুঁজি। এখানে নিরবয়ব নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কী প্রাপ্তি, কী ভবিষ্যৎ ? প্রাণহীন, প্রতিধ্বনিহীন স্তব্ধতার সমুদ্রই

কি ঈশ্বর ? কী হচ্ছে দিবারাত্র এই দুঃসহ কষ্টের বোঝা টেনে, অনাহারে অনিদ্রায় নিরুত্থান আসনে বসে জপধ্যান করে ? দ্বার কি কখনো খোলে ? খোলে তো তার কত দেরি ?

শশী বললে, 'নরেন, আর তো পারিনা সইতে। এ তুমি কোথায় সকলকে নিয়ে এলে, কোন শোকাবহ মৃত্যুর গহ্বরে ?'

নরেনের মুখ মেঘাক্রান্ত আকাশের মত গম্ভীর। বললে, 'শশী, একখানা বাইবেল দে।' শশী বাইবেল এনে দিল। বাইবেলটা খুলেই সহসা এক জায়গায় আঙুল রাখল নরেন। বললে, 'পড়, কি আছে এখানটায় ?'

শশী পড়ল : 'লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকানো চলবে না। লাঙলে হাত দিয়েও যে পিছন ফিরে তাকায় তার ফসল হয়না।'

'কী বলতেন ঠাকুর ?' লাফিয়ে উঠল নরেন : 'বলতেন, যে খানদানী চাষা শত অজন্মা হলেও সে চাষ ছাড়েনা। এক ক্ষেপ বৃষ্টি হয়নি বলেই তোরা চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে দোকানপাট করবি ? এক ডুবে রত্ন না পেলেই কি বলবি সমুদ্রে রত্ন নেই ?'

সেই বজ্রভরা আশার মন্ত্রে সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

'কি হয় এক জন্ম যদি এমনি দরজায় করাঘাত করতে-করতেই কেটে যায়, দেয়ালে মাথা কুটতে-কুটতে ? কত জন্ম গিয়েছে এর আগে, না হয় আরো একটা গেল। সংকল্পের ধনেই আমরা বিত্তবান, আরেকটা জন্মের অপব্যয়ে কি এমন এসে যাবে আমাদের ? ডুব যখন দিয়েইছি তখন দেখেই যাইনা কোথায় সেই তল-অতল রসাতল !' অভয়মন্ত্রের, আশ্বাসমন্ত্রের প্রতিমূর্তি নরেনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'নে, পড় পড় আবার এ জায়গাটা।' বাইবেলের আরেক পৃষ্ঠা খুলে ধরল নরেন : 'সমস্ত জগৎ যদি লুপ্ত হয়েও যায় তবু আমি আমার পথ ছাড়বনা। সমস্ত পরাভূত মানুষ যদি তার আত্মসুখের বিবরে গিয়েও আশ্রয় নেয়, আমি একা সন্ন্যাসী হয়ে থাকব।'

'তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।' সবাই বলে উঠল একবাক্যে।

'কি, বৃষ্টি হয়নি সত্ত্বেও আরেকবার চাষ করবি', হাসল নরেন : 'না দোকান দিবি ?'

'দ্বিতীয়বার চাষ করব।'

'সহস্রবার চাষ করব। পাথর বিদীর্ণ করে ফোটাব তৃণাঙ্কুর।'

ডেকে দাঁড়িয়ে স্বামীজি তাকাল তটভূমির দিকে, তার ভারতবর্ষের তটভূমি। তার মহিমময় ভারতবর্ষ, তার পরাধীন পরপদপীড়িত ভারতবর্ষ। একদিকে সে কত ধনী আবার আরেকদিকে সে কত দুঃস্থ কত দুর্গত। একদিকে সে কত উজ্জ্বল, আরেকদিকে সে কত নির্জীব। মাথায় তার সোনার মুকুট পায়ে তার দাসত্বের শৃঙ্খল। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেনা স্বামীজি। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র স্বপ্ন।

আমি কি পারব ? প্রভু কি আমাকে এ সাধনের যোগ্য করে তুলবেন ?

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥



রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

এই গ্রন্থ লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীমকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ
স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত শ্রীমা সারদামণি
মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত গিরিশচন্দ্র
কুমুদবন্ধু সেন প্রণীত গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত গিরিশ-প্রতিভা
কিরণচন্দ্র দত্ত রচিত গিরিশচন্দ্র
শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রণীত শ্রীশ্রীমাসারদামণি দেবী
ইন্দ্র মিত্র রচিত সাজঘর

ভূমিকা

'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হয়ে গেল।'

একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে। যে কোনো পথ দিয়ে যেতে-যেতে। ভোগের পথ, ত্যাগের পথ, কর্মের পথ, ধর্মের পথ, সংসারের পথ, সন্ন্যাসের পথ। যে কোনো পথ। প্রশ্ন পথ নয়, প্রশ্ন ভালোবাসা।

কারুর ভাব নষ্ট করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ। কারুর পথের কণ্টক হননি। গিরিশেরও না। বলতেন, ওর রাবণের ভাব, যোগও আছে ভোগও আছে। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।

'আমি এখন কী করব?' গিরিশের প্রশ্ন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর : যা করছ তাই করো।'

তাই করেছে। নাটক লিখেছে, নাটক করেছে, নাটক শিখিয়েছে। নিজের প্রবণতাকেই শুধু অনুসরণ করেছে। থিয়েটারের মধ্য দিয়েই করেছে লোকসেবা। ধর্মের খাতে কোনো অনুষ্ঠান করেনি, একটু সামান্য স্মরণ-মনন, তাও নয়। কিছু ধরেনি কিছু ছাড়েনি। শুধু বিশ্বাস করেছে আর ভালোবেসেছে।

এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে পাপের পাহাড়। জীবনের সমস্ত শোককে শ্লোক করে তুলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব চিকিৎসা। কোনো নিষেধ নয় কোনো আরোপ নয়! শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামকে প্রেম করা, আমি-কে তুমি করা, অহংকারকে অলংকার করে তোলা।

'সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কী! সংসারে থেকে তুই যে ঈশ্বরকে ডাকিস, যেন তুই বিশমণ পাথর ঠেলে দেখছিস গহ্বরে কী আছে।'

শুধু বিশ্বাসে আর ভক্তিতে গিরিশ সেই বিশমণ পাথর-ঠেলা গহ্বর দেখা বীরভদ্র। আমাদের, সংসারীদের, একমাত্র ভরসা।

অচিন্ত্যকুমার

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন
অহং যন্ত্রং ভবান যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে ॥

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নং প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা ন হি
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥

১

'রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু'চার ডুবে ধন না পেলে।'

এই বুঝি বোসপাড়া লেন।

'মশায়, গিরিশ ঘোষের বাড়িটা কোন দিকে বলে দিতে পারেন?'

'ঐ যে—দেখতে পাচ্ছেন না দোরগোড়ায় বৈষ্ণব বাবাজীদের ভিড়—ঐ বাড়িটা। আপনারাও তো দেখছি ভেকধারী—বলি, ওখানে আপনাদের এত হঠাৎ আনাগোনা কেন?'

'আহা, কী বইই লিখেছেন উনি!'

'কী বই?'

'চৈতন্যলীলা!' গ্রন্থের উদ্দেশে নমস্কার জানাল বাবাজী। 'স্টারে প্লে হচ্ছে। দেখেননি আপনি?'

'না মশাই, থিয়েটার কি ভদ্দরলোকে দেখে?' প্রতিবেশী ভদ্রলোক নাক সিঁটকালো। 'তা আপনারা, বৈষ্ণব বাবাজীরা ওখানে ভিড় করেছেন কেন? কোন্ মধুর সন্ধানে?'

'নাম-মধুর সন্ধানে।' বাবাজী বিহ্বল কণ্ঠে বললে, শোনেন নি বুঝি থিয়েটারে গৌর নেমেছে।'

'কে নেমেছে?'

'গৌর প্রভু দয়াময়। নাট্যশালায় ভক্তমেলা বসেছে। তীর্থ হয়ে গেছে থিয়েটার।'

'যান মশাই, কেটে পড়ুন!' প্রতিবেশী সরে পড়ল।

গিরিশের বাড়িতে বৈষ্ণব বাবাজীদের মেলা বসেছে। চৈতন্যলীলা দেখে তারা ভীষণ বিচলিত। সর্বক্ষণ ঘিরে আছে গিরিশকে। গিরিশের কাজকর্ম সব শিকেয় উঠল। স্তবস্তুতি বেশি হলে কি আর ভালো লাগে? ওরা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা!'

মহাপ্রভুর কৃপা কার উপরে নয়? তাঁর কৃপার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা অকৃপণ। তাঁকে অনুসন্ধান না করলেও তা জীবনে এসে জোটে, ফলান্বিত করে।

'তাঁর অমৃতমধুর প্রেমফল আপনি পেয়েছেন।' বললে আরেকজন।

কে না পায়! যে ফল চায় তাকেও দেন, যে না চায় তাকেও দেন! পাত্রা-পাত্রের বিচার করেন না, সাধন-ভজনের অপেক্ষা করেন না। যাকে-তাকে ঢেলে দেন, বিলিয়ে দেন অকাতরে। নির্বিশেষে সকলকে দেব এই তিনি জানেন, দেব না—এ কোনোদিন জানেন না। তাঁর নামই যে বিশ্বম্ভর। প্রেমে বিশ্ব ভরবেন বলেই তো তাঁর ঐ নাম।

'আর কী সুন্দর সেই হরিনামের গানটা।' কে আরেকজন গেয়ে ওঠে গলা ছেড়ে। 'এমন সুধার হরিনাম, হরিনাম বলো না। সাধের পণে কিনবি হরি, সাধ কেন তোর হল না—'

উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আরেকজন : 'আপনি ভাগ্যবান—মহা ভাগ্যবান।'

এও না হয় সহ্য হয়। হরিনাম তো জলের মত সোজা—শুচি-অশুচি নেই, যে কেউ নিতে পারে, যে কোনো সময়, এমন কি উচ্ছিষ্ট মুখে। এমন কি সংশয়ে, অশ্রদ্ধায়, অবিশ্বাসে। কোনো বিধি নেই, বাধাও নেই। আদ্যোপান্ত নির্নিষেধ।

'কি ভক্তি ! এমন ভক্তি দেখা যায় না।'

এই আবার বাড়াবাড়ি শুরু করল ! অস্থির হয়ে উঠল গিরিশ। শুধু বই লিখলেই ভক্তি হয় ? ভক্তি করবার মত জলজ্যান্ত বিগ্রহ কই চোখের সামনে ? প্রাণে কই সেই আকুলতা ? কুলে থেকে কি কৃষ্ণ মেলে ? কুলে থেকেও নয়।

চুলোয় গেল সব কাজকর্ম। এদেরও কাজকর্ম কি সব ঝুলির মধ্যে ?

মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। হরি বললে মাগুর মাছের ঝোল ও যুবতী মেয়ের কোল পাওয়া যাবে—দলে দলে চলল বোরেগীরা। পরে বুঝি তাদের স্বপ্ন ভাঙল। মাগুর মাছের ঝোল মানে হরি নামে যে অশ্রু ঝরে সেই প্রেমাশ্রু, আর যুবতী মেয়ে মানে পৃথিবী—আর, যুবতী মেয়ের কোল মানে হরিপ্রেমে ধুলোয় গড়াগড়ি।

'যাই বলুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনার মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব হয়েছে।' পা ছুঁয়ে কেউ বুঝি এগুলো প্রণাম করতে।

এ উটের পিঠে শেষ কুটো। গিরিশ ডাকল চাকরকে। চাকর এলে কী বলল ইশারায়। চাকর বোতল আর গ্লাস দিয়ে গেল। ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালল গিরিশ।

'কী খাচ্ছেন ? ওষুধ ?' জিগগেস করল একজন।

গন্ধের সঙ্গে বুঝি পরিচয় নেই বাবাজীদের। নইলে স্থির হয়ে নিশ্বাস নিচ্ছেন কী করে ? আরেকজন আরো এক কাটি সরেস। জিগগেস করল, 'এ কি মহাপ্রভুর চরণামৃত ?'

'এ মশাই মদ, স্রেফ মদ !' দুঃসহ ক্রোধে বলে ফেলল গিরিশ।

এ শোনাও মহাপাপ ! ঘ্রাণে বুঝি বা অর্ধভোজন হয়ে গেল। নাকে-কানে কাপড় গুঁজে উর্ধ্বশ্বাসে পালালো বাবাজীরা। যাক, বিতাড়িত হয়েছে। আমার আর কাজ নেই, বসে-বসে যা নয় তাই প্রশংসা শুনি। নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে। তবু তারও একটা সীমা আছে। ভব্যতা-ভদ্রতা আছে। বলে কিনা চরণামৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ টলছেন। টলে-টলে ঢলে পড়ছেন। নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। শ্রীমাকে জিগগেস করছেন, 'হ্যাঁ গা, আমি কি মদ খেয়েছি ?'

শ্রীমা বললেন, 'না, তুমি কালীঘরের চরণামৃত খেয়েছ।'

ওদের এক বোতল মদে যে নেশা তার চেয়ে আমার বেশি নেশা কয়েক ফোঁটা চরণামৃতে। ওদের কত খরচ কত জ্বালা। আমার শুধু নীট ফূর্তি। কারণানন্দ। তারপরেই কারণের কারণ—সচ্চিদানন্দ। গান ধরলেন ঠাকুর। 'সুরা পান করি না রে, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।'

সেই কবে থেকে মদ ধরেছে গিরিশ। প্রথম মদ খায়, পরে-মদে খায়। কিন্তু বলো, কোনোকালেই কি সে রাক্ষসকে ছাড়া যায় না?

'খা না, কতটুকু খাবি? আর, কতদিন খাবি?' নিজের হাতে গিরিশকে মদ ঢেলে দিচ্ছেন ঠাকুর: 'তুই এ নেশা করছিস আরেক নেশার খবর পাসনি বলে। যখন তোকে সে নেশা পেয়ে বসবে তখন বুঝবি এ নেশা কোন্ ছার!'

তার নামই বুঝি সর্বনাশের নেশা।

অষ্টম গর্ভের সন্তান—মার প্রত্যক্ষ স্নেহ পায়নি গিরিশ। পায়নি বুকের দুধ। প্রসবের পরেই রাইমণি অসুখে পড়ে। এক বাগদি মেয়ে গিরিশের ভার নেয়। তারই স্তন্যে বেড়ে ওঠে গিরিশ। দুধ না দাও, গিরিশকে কাছে টেনে একটু আদর করতে দোষ কী। তুমি মা, তোমার ইচ্ছে করে না ছেলেকে কোলে নিতে? মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজে অমন বসে থাকো কী করে?

'আমি মা নই, আমি রাক্ষুসী।' প্রাণপণ চেষ্টায় দুই চোখ বন্ধ করে রাইমণি: 'আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যা। আমার থেকে দূরে থাকলেই ওর মঙ্গল।'

কিন্তু এখন যে গাল-গলা ফুলে প্রচণ্ড জ্বর হল গিরিশের। এখন কী করবে? সেবা-শুশ্রূষা করবে না?

স্বামীকে ডাকাল রাইমণি। বললে, 'যেমন করে পারো বাঁচাও ছেলেকে।'

'হঠাৎ ছেলের প্রতি দয়া?' নীলকমল গলায় বুঝি বা একটু ঝাঁজ আনে: 'কোনদিন তো দেখিনি এমন অনুরাগ। যাকে ছুঁতে পর্যন্ত তোমার ঘেন্না তার উপর এত স্নেহ?'

'তুমি তার কী বুঝবে কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখি!' রাইমণির চোখ ছাপিয়ে জল নামল গাল বেয়ে: 'আমার অযত্নে অবহেলায় ও কত কষ্ট পেয়েছে তা ভাবতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর জানেন, ওকে দূরে সরিয়ে রাখলেও আমি ওর মা, বুকের মধ্যে ধরে রাখলেও আমি ওর মা। আমার স্নেহে কি কোনো তর-তম আছে?'

এ সারদামণিরও কথা। জয়রামবাটিতে এসে আশু মিত্তিরের অসুখ করেছে। একটানা জ্বর, তার মধ্যে মায়েরও একটানা সেবা। ভালো হয়ে ওঠা-ওঠা অবস্থা, আশু জিগগেস করল মাকে, 'মা তোমার এই স্নেহ চিরকাল পাব তো!'

শ্রীমা বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, এখানে কি জোয়ার-ভাটা আছে? এখানে সমশীতল।' রোগেও আমি আরোগ্যেও আমি। উপেক্ষায়ও আমি অপেক্ষায়ও আমি একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে। একই চাঁদ রোজ-রোজ।

নীলকমল বললে, 'তবে কেন তোমার বিরাগ এই সন্তানে ?'

'তুমি বড় খোকাকে ভুলে গিয়েছ ?' চোখ তুলে তাকাল রাইমণি।

সে কখনো ভোলবার ? বাইশ বছরের জোয়ান সমর্থ ছেলে, প্রথম ছেলে, অকালে মারা গেল।

'আমি রাক্ষুসী, খেয়েছি বড় খোকাকে। আমার দৃষ্টিতে অমঙ্গল, স্পর্শে অমঙ্গল—এমন কি আমার ছায়াও অমঙ্গল।' অশ্রুতে ভেসে যেতে লাগল রাইমণি : 'তাই আমি গিরিশকে আসতে দিতাম না আমার কাছে। হাত নিশপিশ করত, তবু ছুতাম না ধরতাম না ছেলেটাকে, প্রাণটা খাঁ খাঁ করত তবু টেনে নিতাম না বুকের মধ্যে। সব—সব ওর মঙ্গলের জন্যে। ওর মঙ্গলের জন্যেই আমার এই কৃচ্ছ্রসাধন। আজও—আজও ওর এই দুরন্ত অসুখের মধ্যে আমি যাব না, বসব না, থাকব না ওর কাছে। আমি দূরে-দূরে থাকলেই ওর ভাল হবে—ও ভালো হয়ে উঠবে। তাই তুমি ওকে দেখ। তোমার ছেলে, তুমিই ওকে সারিয়ে তোলো—'

সন্তানের মঙ্গলকামনায় মার এই অপূর্ব ত্যাগস্বীকার আর কোথায় দেখেছি ?

আমি বাঁচব না—এই একটি নিত্যকালের ব্যথা হয়ে বেঁচে ছিলাম, বিঁধে ছিলাম মার বুকের মধ্যে। যত দিন মা ছিলেন মর্ত্যকায়ায়। মার মূল্য বুঝেছে গিরিশ।

এক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছে। প্রণাম করবার সময় তাঁর বুড়ো আঙুলের উপর সজোরে নিজের মাথাটা ঠুকে দিল ভক্ত। শ্রীমা সকাতরে উঃ করে উঠলেন।

'এ কী করলে ?' যারা যারা কাছে ছিল সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল।

এতটুকু ঘাবড়াল না ভক্ত। নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে ব্যথা রেখে দিলাম। যতদিন এই ব্যথা থাকবে ততদিন মা আমাকে মনে করে রাখবেন।'

যতদিন ব্যথা ততদিন তো মনে করে রাখবেনই, তারপর যখন আর ব্যথা থাকবে না তখনও মনে করে রাখবেন, ও এক দিন ব্যথা দিয়েছিল বলে।

গিরিশের যখন মোটে দশ বছর বয়স তখন মারা গেল রাইমণি। গিরিশ মাতৃহীন হল।

'মন কেন রে ভাবিস এত। মাতৃহীন বালকের মত ? ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত। কালেরও কাল যে মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত ॥'

বাপের আদরের দুলাল হয়ে ক্রমে-ক্রমে বয়ে গেল গিরিশ। যা আবদার করে তাই নীলমাধব জুটিয়ে দেয়। যদি তা কেনবার জিনিস হয় দামের জন্যে হটে না। কিন্তু সেদিন যে বায়না ধরল তা অভিনব। বাপের কাছে গিয়ে কান্না জুড়ল গিরিশ : তেষ্টা পেয়েছে।

'তেষ্টা পেয়েছে তো জল খা না। ওরে গিরিশকে জল দে।' চাকরের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল নীলকমল।

'জল খাবার তেষ্টা নয়।' রোল আরো উচ্চে তুলল গিরিশ।

'জল খাবার তেষ্টা নয় তো কী খাবার তেষ্টা?' বিরক্ত হল নীলকমল: 'শরবৎ খাবি?'

'না, না, ও সব নয়—'

'ও সব নয় তো তবে কী! খাবার খাবি? রসগোল্লা-সন্দেশ? দই-রাবড়ি?'

'না, আমার খাবার খাবার তেষ্টা নয়।' কান্নায় আরো তুমুল হল গিরিশ।

'তবে, হারামজাদা, কী খাবি? আমার মাথা খাবি?' নীলকমল এই মারে তো ঐ মারে। 'বুড়ো ছেলে, কাঁদছে দেখ না।'

'আমি ফল খাব।'

'ফল খাবি তো সে ফলের নাম নেই?' আবার তেরিয়া হল নীলকমল: 'বল না কী ফল?'

'শশা। আমি শশা খাব।'

'শশা খাবি তো আনিয়ে দিচ্ছি বাজার থেকে।' ধাতস্থ হল নীলকমল: 'তার জন্যে কান্না কিসের?' আবার চাকরের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল।

কিন্তু গিরিশের যেই কান্না সেই কান্না। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমার বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়, আমার খিড়কির বাগানের শশা খাবার তেষ্টা।'

'সে তো আরো সহজ, হাতের মধ্যে। তার জন্যে কাঁদে কে? যা না, নিজেই যা না বাগানে। কচি-কচি কত শশা ফলে আছে, ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খা না যত চাস। তোর আকণ্ঠ তেষ্টা মেটা।'

'আমার অনেক শশা খাবার তেষ্টা নয়, একটা মাত্র শশা খাবার তেষ্টা।'

'বেশ তো একটাই খাবি!' হাসল নীলকমল।

'যেটাতে কুটো বাঁধা আছে সেটা খাব।' গিরিশ এতক্ষণে স্পষ্ট হল।

এবার নীলকমলের বউদি, গিরিশের জ্যাঠাইমা আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'তা কি করে হয়? ওটা আমি শ্রীধরের জন্যে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। গৃহদেবতার জিনিস ওকে দেবে কি করে?'

এতক্ষণে বুঝল নীলকমল, কেন দুরন্ত গিরিশ ক্ষুদ্র একটা শশার জন্যে তার দ্বারস্থ হয়েছে। তৃষিত হয়েছে। গিরিশের মাথায় হাত রাখল নীলকমল। মিনতিভরা চোখে তাকাল-বউ-দিদির দিকে। বললে, 'ও যখন চেয়েছে তখন ওটা ওই নিক। বালক যার জন্যে এত কাঁদছে শ্রীধর কি তা পারবেন খেতে? তাঁর তৃপ্তি হবে?' তারপর পুত্রকে একটু আদর করল নীলকমল! বললে অস্ফুটে, 'কে জানে এই আমার শ্রীধর কিনা।'

শ্রীমায়ের টিয়ে পাখির নাম গঙ্গারাম। লোহার খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে আর মা-মা বলে। আর কোনো নাম নেবে না, ধরবে না, শুধু মা-মা। ঠাকুরের জন্যে নৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে, গঙ্গারাম মা-মা করে উঠল। নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ তুলে নিলেন মা। তুলে নিয়ে হাত বাড়ালেন গঙ্গারামের দিকে। বললেন, 'গঙ্গারাম, খাও বাবা।'

ঠোঁট বাড়িয়ে গঙ্গারাম খেল সেই মোহনভোগ।

ভক্তের দল আপত্তি করল। 'পুজো হয়নি, আগেই গঙ্গারামকে হালুয়া দিলেন।'

স্নিগ্ধ হেসে মা বললেন, 'বাবা, ওর ভেতরেও ঠাকুর আছেন।'

তেমনি আমার গিরিশের মধ্যেও শ্রীধর আছে।

সেই বাপও মারা গেল যখন গিরিশের বয়স মোটে চৌদ্দ। মাথার উপরে রইল না কেউ অভিভাবক। গিরিশ বিপথে পা বাড়াল।

একটি ভ্রষ্টা মেয়ে মা-ঠাকরুনকে এসে বললে, 'মা, আমি কি পথ হারিয়েছি?' মা তাকে বললেন, 'মা, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।'

তাই গিরিশেরও পথ পাবার জন্যেই বিপথ। বিদ্যালয়ী লেখাপড়াও বেশিদূর এগুলো না। বাপ মারা গেলে ইস্কুলে পড়া ছেড়ে দিল গিরিশ। কিন্তু না পড়লে, ইংরিজি না শিখলে চলবে কী করে? সবাই ধরাধরি করে গিরিশকে ঢুকিয়ে দিল ইস্কুলে। কিন্তু কোনো ইস্কুলই গিরিশের পছন্দ হল না। একটার পর একটা ছাড়তে লাগল পর-পর। কিছুতেই মতি যেন স্থির হবার নয়। তখন গিরিশের বড়দি কৃষ্ণকিশোরী গিরিশের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বউ এটকিনসন টিলটন কোম্পানির বুক-কিপার নবীন সরকারের মেয়ে প্রমোদিনী। মুরুব্বি হল নবীন। পাইকপাড়ার আধা সরকারী ইস্কুলে নতুন করে ভর্তি করিয়ে দিলে গিরিশকে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করতে পারল না গিরিশ। আর ইস্কুলমুখো হল না। বিয়েতে কিছু টাকা এসেছিল হাতে, তাই দিয়ে ইংরিজি কবিতার বই ও নাটক কিনে আনল। ঘরে দরজা এঁটে বাঙলায় অনুবাদ করতে বসল। সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিতে পাশ করতে লাগে না।

গিরিশ থিয়েটারের দিকে ঝুঁকল।

প্রথমে নামল সধবার একাদশীতে, নিমচাঁদের পার্টে। নিমচাঁদ পাঁড় মাতাল, স্টেজে বোতল-বোতল মদ ওড়াবে, সেটাও এক আকর্ষণ। মদের মত আর আছে কী। মানুষকে জব্দ করবার জন্যে শোক তৈরি হয়েছে। আর শোককে জব্দ করবার জন্যে মদ।

'কিন্তু যাই বলো', গিরিশ বায়না ধরল: 'ভান করতে পারব না। সেই যে বোতলে লাল জল ভরে দেবে আর তাই খেয়ে স্টেজে মাতলামোর অভিনয় করব, এ অসম্ভব। বোতল-বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে বুকে সর্দি বসে মারা যাই আর কী। আসল জিনিস দিতে হবে।'

'তাই দেব।'

দীনবন্ধু মিত্তির স্বয়ং দেখতে এসেছেন থিয়েটার। নিমচাঁদকে দেখে একেবারে অভিভূত।

'তুমি না থাকলে এ নাটক হবে না।' গিরিশকে অভিনন্দন করলেন: 'মনে হচ্ছে নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্যে লেখা।'

সিমলে স্ট্রীটের সুরেন মিত্তিরও মদ খায়। বলরাম বোসের বৈঠকখানায়

ঠাকুরকে ঘিরে বসেছে অনেকে। গিরিশ আর সুরেন মিত্তিরও আছে। সে কী! দুজনেই টেনে এসেছে নাকি।

সুরেনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি আর কী! ইনি—' গিরিশকে ইঙ্গিত করলেন : 'ইনি তোমার চেয়েও—'

করজোড়ে সমর্থন জানাল সুরেন। বিনীত মুখে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি আমার বড়দা।'

সকলে হেসে উঠল সশব্দে।

২

'বলি হাঁ হে, তোমরা কাউকে ঘুমুতে দেবে না? যদি পাঁচজন মিলেছ তো শেয়ালের মত ডাক তুলেছ, চিক্কুড়ি না করলে কি তোমার হরি শুনতে পায় না?'

'কেন মশাই, আমরা কেবল হরিগুণগান করি বই তো না—' প্রতিবেশীদের অভিযোগের উত্তরে বললে মুকুন্দ।

'হরিগুণগান করো তো, গাধার মত চেঁচাও কেন?'

'সংকীর্তন করি।'

'কেন মনে-মনে হরিনাম করলে হয় না? তোমরা যে সব নতুন শাস্ত্র করে তুললে হে। এত বদিয়াতি করলে লোক টেঁকতে পারবে কেন? তোমাদের দৌরাত্মিতে কি রাতদিন লোক ঘুমুবে না? আর কীর্তনের তো মাথামুণ্ডও কিছু বুঝতে পারি না—'প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে'—ও তো টপ্পাবাজি। এমন চেঁচামেচি করলে কিন্তু ভালো হবে না বাপু। মানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে একটু আলিস্যি রাখবে, না অমনি ডাকাতপড়া চিৎকার—'

মুকুন্দ গান ধরল : 'আর ঘুমাওনা মন। মায়াঘোরে কত দিন রবে অচেতন।'

তেড়ে গেল প্রতিবেশী : 'বলি তোমরা নেহাত বেহায়া। বলি, বৈষ্ণব হলে কি জেগে ঘুমোয়? 'ঘুমাওনা মন, ঘুমাওনা মন' করছ? আমি তোমাদের পরিষ্কার বলছি বাপু, নদেয় ওসব হবে না।'

'কী বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবে না তো কোথায় হবে?'

'আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি। গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে যাই। এর কি কোনো প্রতিকার নেই?'

প্রতিকার আছে। প্রতিকার জগাই-মাধাই।

'চৈতন্যলীলায়' জগাই স্বয়ং গিরিশ। আর মাধাই? মাধাই বুঝি দুকড়ি সেন! দুকড়ি আবার গিরিশের বড়দা। মদ না পায় তো মেথিলেটেড স্পিরিট খেয়ে হজম করে।

'আজ তোকে আমি দিব্যি করে বলছি, এক-এক শালাকে ধরব আর এক-এক পাত্র গালে ঢেলে দেব।' জগাই বললে।

'আর আমি একখানা পাঁটার হাড় গ‍ুঁজে দেব।' পাল্টা ঝাড়ল মাধাই: 'শালারা ভোর দিন মালপো ঠ‍ুসছে আর চেল্লাচ্ছে।'

'চেল্লায় কেন জানিস? খিদে বাগিয়ে নিচ্ছে। ব্যাটারা হাড়িকাঠ দেখলে চোখে হাত দেয় আর কপালের উপর হাড়িকাঠ আঁকে।'

'তুইও যেমন। শালাদের সব ভণ্ডামি। ল‍ুকিয়ে শালারা সের-সের মদ খায়। ব্যাটারা বদমাইসের জাস‍ু, এমন বিপরীত গানও কখনো শ‍ুনিনি।'

'আমি বলি, এক-এক শালাকে ধরি আর কামড়ে চাট করি।' জগাই টলতে-টলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'ওই নিমাই পণ্ডিতটার কী ঠাওরালি বল দিকি। ওকে দলে নিতে পারবি? ব্যাটা তো বৈষ্ণবদের সঙ্গে লাগত, কিন্তু মদে বড় এগোয় না।'

ভয় ভাঙেনি—এই রে, শালারা দোর দিয়েছে।' মাধাই হাত বাড়াল: 'দে, মদ দে।'

'গিল্লি, আর পাব কোথা?'

'তবে কি তুই ভণ্ডামি করতে এলি?' মাধাই ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'চল মদ নিয়ে আসি—দোরে বমি করে দে যাব।'

গিরিশের বাড়িতে এসেছে দ‍ুকড়ি। এসেছে মদের লোভে। মদের চাট মটর ভাজা। দ‍ুকড়ি তাকে বলে 'দোগ্ধ মটর'—ট্যাঁকে করে নিয়ে এসেছে একরাশ।

'সঙ্গে দোগ্ধ মটর আছে।' কর‍ুণ চোখে তাকাল দ‍ুকড়ি: 'এখন একট‍ু মদিরা পেলেই দাহ মেটে।'

গিরিশ তাকিয়েও দেখল না।

'দে না বাবা ছিটেফোঁটা। কতক্ষণ খাইনি বল দিকি।'

'মদ নেই।' গম্ভীর ম‍ুখ গিরিশের।

'তোর ঘরে মদ নেই এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস? সত্যি, কেন ছলনা করছিস বল তো?' দ‍ুকড়ি অন‍ুনয়ে কুঁকড়ে গেল: 'দে না মাইরি এক ঢোঁক। গলাটা কাঠ প‍ুড়ে আঙ্গার হয়ে রয়েছে।'

'বলছি নেই।' ধমকে উঠল গিরিশ।

'গা ছ‍ুঁয়ে বল।'

'গা ছুঁয়ে বলছি।' একট‍ু ব‍ুঝি বা দ্বিধা করল গিরিশ। বললে, 'তবে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে।'

'স্পিরিট?'

'মেথিলেটেড স্পিরিট। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্য আনা হয়েছে।'

'দে, তাই সই। তাই খাব।' দ‍ুকড়ি লাফিয়ে উঠল।

গিরিশ গ্রাহ্য করল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ, সেখানে উপস্থিত ছিল, বোতলটা কুড়িয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাসে। জল মেশাল না, দ‍ুকড়ি নীট সাবাড় করলে। অম্লান ম‍ুখে চিব‍ুতে লাগল দগ্ধ মটর।

'এ তুমি কী করলে?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ : 'ও প্রতক্ষ্য বিষ। লোকটা এখুনি মারা যাবে।'

বজ্রকণ্ঠে হেসে উঠল দুকড়ি। বললে, 'কচু যাবে। কিচ্ছু হবে না। ও আমি নিত্য খাই।'

'দ্যাখ ভাই ব্যাটাদের টিকিতে চালতা বেঁধে তাড়া দেব।' 'চৈতন্যলীলায়' জগাই বলছে মাধাইকে।

মাধাই বললে, 'আমি ধরতে পারলেই শালাদের তিলক চেটে নেব। গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখী হয়েছে। কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে—নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ি জোটেনি।'

'তুই নিমাই পণ্ডিতের বে-তে গিয়েছিলি ?'

'পাঁটার রোঁ গাছটা নেই, গিয়ে কী করব ? আমি কলসী করে পাঁটার রক্ত ধরে রেখেছি, অদ্বৈতের বাড়ির দোরগোড়ায় ঢেলে দেব। ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিশে গেছে, আগে ওকে দেখলে পালাত। কী বাবা নেড়ানেড়ীর হেঙ্গাম এল নদেয়—'

'একদিন ছটাকখানেক মদ আর একখানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস ? নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে-ঘরে তাড়া করি, বলি, তর্ক করো।'

'ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বিয়েতে দু'হাতে খরচ করেছে। এখনো বোধহয় পোঁতা আছে টাকা। দ্যাখ, বাড়িতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায়, হেউ-ঢেউ খেয়ে আসে।'

'চল না একদিন রাত্রিতে গিয়ে পড়ি।'

'না রে, তার চেয়ে দলে নিয়ে নে, সব রকম চলবে। ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হয়েছে। এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু' কথায় তাকে থ বানিয়ে দিলে।'

এক ভট্টাচার্যের প্রবেশ। মাধাইয়ের ভাষায় 'টিকিদাস ভটচায।'

'ওহে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথা বলতে পারো ?'

'নিমাই পণ্ডিত ?' জগাই আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত—'

'সে যে আজ দুদিন মারা গিয়েছে।'

'মারা গিয়েছে ?'

'আহা, বড় পণ্ডিতই ছিল বটে। জ্বরবিকার হল, আর নাই !'

'সে কী ?'

'আর সে কী !'

মশাই, আমার কী হবে ? আমি পাপী, ঘোর পাপী। হেন পাপ নেই যা আমি করিনি। থিয়েটারে, নিজের ঘরে, গিরিশ অভিনয়ের শেষে নিয়ে এসেছে ঠাকুরকে।

'যে সর্বদা পাপ-পাপ করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'আপনি জানেন না—পাপের পাহাড় করেছি আমি।'

'পাহাড় করেছিস?' ঠাকুর হাসলেন : 'সে তো তুলোর পাহাড়। মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

'কী যে বলেন! আমি যেখানে বসি সে মাটি পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়—'

'সে কী! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু-একটু করে আসে?' স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ঠাকুর : 'না, একেবারে দপ্ করে আলো হয়?'

দপ্ করে আলো হয়! আমিও আলো হয়ে উঠব! এ কখনো হয়, হতে পারে? যে 'চৈতন্যলীলা'র জগাই, তার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর কি একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে?

'জগাই, তুই নাচছিস কেন?' জিগগেস করল মাধাই।

জগাই বললে, 'বৈরাগী হব! ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, 'হরি হে দেখা দাও।' মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস? প্রেমসে কহো ভগী ময়রানী, হরি হে দেখা দাও।'

'আচ্ছা, হরে কে সে শালা, জগা জানিস? আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকে। আমার বোধ হয় এক শালা মালপোওয়ালা, খিদে পেলেই ডাকে। আর, আহা, মালপো যা মোলাম বানায়, ঠিক যেন পাঁটার মাস। তুই যে ওদের মালপো চুরি করতে গেলি, ওদের ভাবটা কী বুঝলি?'

'চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়। দেখলি তো আমাদের চারখানা খেতেই কুপোকাত। ওরা রাধা বলে আর এক-এক ব্যাটা বিশখানা ওঠায়।'

'এক শালাকে একদিনও বাগে পেলুম না—'

'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস।'

'দ্যাখ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনোদিন মাতাল দেখেছিস? তুই যেমন ছটাকে, আমি দু সের খেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'

'চল্ না, কেত্তন শোনা যাক গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, চাকুম চাকুম ভুশ ভুশ ভুশ।'

'তুই বড় গান শোনানেওয়ালা!'

'ওরে, বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'

'তুই দেখছি বৈরাগী হবি।'

'তোর চোদ্দ দুগুণে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'

'ভেয়ের চোদ্দ পুরুষ তোলে শালা?'

'নে, রাগ করিসনি, মিষ্টি করে বললুম, মদ দেব তোর গাল ভরে, আয় ছুটে আয় হাঁ করে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে গিরিশ। ঘোড়ার গাড়ি করে এসেছে। টেনে এসেছে

দু-এক পাত্র। কেমন টলছে দেখ না। আর কিছু দেখছ না? হ্যাঁ, কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে আসছে। ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে অঝোর চোখে কাঁদছে। ঠাকুর সস্নেহে তার গা চাপড়ালেন। একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে একে তামাক খাওয়া।'

কতক্ষণ পরেই গাড়োয়ান ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে। গিরিশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। দাঁড়াও, গাড়োয়ানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ, যাও শিগগির। সামলাও। মারবে না তো?'

অমানুষিক রাগ গিরিশের। আর মুখও খিস্তিখেউড়ের আঁস্তাকুড়। না, ফিরে এসেছে গিরিশ। রাগদ্বেষ নেই, কটুকাটব্য নেই। শান্ত হয়ে বসেছে হাতজোড় করে। বলছে, 'ভগবান, আমাকে পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না মনে আসে।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি। তুমি তো আনন্দে আছ।'

'আজ্ঞে না, মন খারাপ—অশান্তি। তাই মদ খেলুম।'

'তা খা না—কী হয় খেলে?' বললেন ঠাকুর: 'আমি যেমনই ছেলে হই, তিনি আমার আপন মা, আমাকে কোলে তুলে নেবেনই নেবেন। আশ্রয় না দিয়ে যাবেন কোথায়?' বলে গান ধরলেন:

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি—
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গোব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপানাদি বিনাশি নারী—
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥'

কিন্তু নিমাই চলে গেল সংসার ছেড়ে। আর কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল মথুরায়। বালক গিরিশ ঠাকুমার বুকের কাছটিতে শুয়ে কৃষ্ণের গল্প শুনছে। মথুরার রাজা কংস বন্ধু অক্রূরকে বললে, তুমি রথ নিয়ে ব্রজধামে যাও, কৃষ্ণ আর বলরামকে ভুলিয়ে নিয়ে এস এখানে। দেবর্ষি নারদ বলে গেল ওদের হাতে নাকি আমার মৃত্যু হবে। দেখি কেমন ফলে ওর কথা। ধনুর্যজ্ঞ করব আর সেখানে ওদের নিমন্ত্রণ হয়েছে এই বলে ওদের নিয়ে এস। সভার দরজায় আমার হাতি কুবলয়াপীড়কে রাখব, যেই ওরা ঢুকতে যাবে অমনি শুঁড় দিয়ে তুলে মাটিতে আছড়ে মারবে। যদি তাতে না মরে আমার দুই কুস্তিগীর পালোয়ান আছে, চানুর আর মুষ্টিক, তারা ওদের অনায়াসে যমের বাড়ি পাঠাবে। যাও, রাজধানীর শোভা দেখবে, অন্তত এই বলে ওদের নিয়ে এস। দেখি ঋষিবাক্য ওলটাতে পারি কিনা।

বৃন্দাবনে এসে অক্রূর নন্দকে রাজার নিমন্ত্রণ জানাল। নন্দ বললে, উপায় কী, রাখতেই হবে নিমন্ত্রণ। কৃষ্ণ-বলরাম তো আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু ব্রজপুরের আর সকলে? গোপ-গোপী, রাখাল বালকেরা? ব্রজপুরের তরুলতা, ব্রজপুরের গোধন, ব্রজপুরের যমুনা? জননী যশোদা? তাদের কী দশা? তাদের নয়নের মণি কৃষ্ণ চলে যাচ্ছে, তারা এ বিচ্ছেদ সইবে কী করে? তারা সরবে-নীরবে কাঁদতে লাগল অঝোরে। 'ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, কানু কানু করি সুর।'

ধেনু-বেণু সব ভুলে গেল সাথীরা, ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরল, নিয়ে যেতে দেবেনা কৃষ্ণকে। মেয়েরা পথের ধুলোয় শুয়ে পড়ল, যাবে তো রথের চাকায় আমাদের ধুলো করে দাও। গোপাল আমার, যাসনে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো যশোদা। তবু চলে গেল রথ। কারু কান্নায় কান দিল না অক্রূর। নামে অক্রূর কিন্তু কাজে নিষ্ঠুরশ্রেষ্ঠ।

'আর কৃষ্ণ?' জিজ্ঞেস করল বালক : 'সেও শুনল না কারু কান্না?'

'শুনল না। শোনে না।' ঠাকুমা বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এত যারা তাকে ভালোবাসে তাদের ছেড়ে দিব্যি চলে গেল বিদেশে?'

'চলে গেল।'

'আবার তবে কবে ফিরে এল?'

'আর ফিরল না। কংসকে মেরে মথুরায় রাজা হয়ে বসল।'

'আর ফিরল না?' বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল গিরিশ।

'সে কী! ফিরল না বলে কাঁদছিস কেন?' ঠাকুমা প্রবোধ দিতে চাইল : 'তখন তার কত ঐশ্বর্য, কত সৌভাগ্য, সে ফেরে কী করে?'

'যে ফেরে না, ছেড়ে চলে যায়, তার কথা চাইনা শুনতে।' কান্নাভরা মুখটা লুকোল বালক।

'না, এর পরে আরো কত কাণ্ড আছে। কৃষ্ণ-বলরাম কেমন মারবে সে হাতিকে, সেই দৈত্যকায় পালোয়ান দুটোকে, স্বয়ং কংসকে—' ঠাকুমা উৎসাহিত করতে চাইল।

'চাই না শুনতে। শুনে আমার দরকার নেই।' কানে আঙুল দিল গিরিশ।

গল্প ছেড়ে চলে গেল উঠে। কদিন আর ঠাকুমার সঙ্গই করল না। এমন কারু খবর দিতে পারো না যে ছেড়ে চলে যায় না কোনদিন? ছেড়ে দিলেও আবার ফিরে আসে? সেই তো গিরিশের আজীবন জিজ্ঞাসা। এমন কি কেউ নেই যে এমনিতে ছেড়ে তো যায়ই না, তাড়িয়ে দিলেও যায় না ত্যাগ করে? চারদিকে তাকায় গিরিশ। না, কেউ নেই, কিছুই নেই। শুধু অঙ্কের হিজিবিজি। হিসেব মেলে না কোনোখানে। শুধু এক এলোমেলো খামখেয়াল।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই গিরিশ নাস্তিক। আর সে-যুগে ঈশ্বর না মানাই প্রকাণ্ড পাণ্ডিত্য। কিছু আছে বলতে যাওয়াই তো নিজেকে ছোট করা। অহঙ্কারে মট-মট করছে গিরিশ। নিজেকে ছোট করবে কেন? আমি কি বানের

জলে ভেসে এসেছি ?

'শালা !' পথে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়ে গাল দিয়ে উঠল গিরিশ।

লোক নেই জন নেই কারু সঙ্গে ঝগড়া-বচসা নেই, হঠাৎ কাকে দেখে তেতে-পুড়ে উঠল ? পথের সঙ্গী সবিস্ময়ে বললে, সে কী রে, কাকে গালাগাল দিচ্ছিস ?'

ঐ যে ওকে।'

'কাকে ?' হাঁ হয়ে গেল বন্ধু। কোথাও একটা বিশ্বাস পর্যন্ত নেই।

'দেখতে পাচ্ছিস না ? ঐ যে ওটাকে।' ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করতে চাইল গিরিশ !

'ওটা তো একটা মন্দির।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বন্ধু।

'হ্যাঁ, মন্দির। ঐ মন্দিরে কে আছে ?'

'যতদূর দেখতে পাচ্ছি শিবের মন্দির।'

'হ্যাঁ, ঐ শালা শিবকে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে হাতে পেচ্ছাপ করে বিশ্বনাথের মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিল ঠিক করেছিল।'

'ছি ছি, ছি ছি', ধিক্কার দিয়ে উঠল বন্ধু: 'তোর এই মতিগতি ?'

'হ্যাঁ, এই মতিগতি। শালা পুজো খাবার আর বিষয় পেল না !' খিঁস্তি করে উঠল গিরিশ।

'দেখিস তোর কী হয় !'

'তাই তো চাই দেখতে। তোর শিব যদি সত্যি হয়, জাগ্রত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবে। এত বড় অপমান সে সইবে না মুখ বুজে।'

'দেখিস—'

'দেখেছি। এই কাঁচকলা করবে।' বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল গিরিশ।

কিছুই করল না ! একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটল না। করবে কী করে ? থাকলে তো করবে।

ক'দিন পরে আবার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

'কী রে, কিছু করল তোর শিব ?'

'তার বয়ে গেছে। তার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কোথাকার কে কীটানু-কীট, দাসানুদাস, তাকে কী বললি না-বললি, তাতে সে অমনি খেপে যাবে, তক্ষুনি তোকে তাড়া করবে ত্রিশূল নিয়ে—'

হো হো হো করে হেসে উঠল গিরিশ: 'তার মানেই তো শিব বলে কেউ নেই কিছু নেই—'

নিঃসীম নিঃশিব। একেবারেই কিছু নেই ? তা কি হতে পারে ? অন্তত আমি তো আছি। আমার থাকাটা কি থাকা নয় ? আমি যদি আছি, তবে কে আমি ? কী বলেছিল সেদিন বাবা। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার নৌকোয় বেড়াতে গিয়েছিল গিরিশ। নবদ্বীপের কাছে আসতেই মেঘ করে এল আকাশে। দেখতে দেখতে ঝড় ছুটল, নদীর জল ফুলে-ফুলে কালো হয়ে উঠল। দুলতে

থাকলো নৌকো। ভয় পেয়ে বাবার হাত চেপে ধরল গিরিশ। ডুবল বুঝি নৌকো। কালী নদীতে অন্ধকারে চোখ বুঝল নীলকমল।

কিন্তু, না, মাঝিরা সামলে নিয়েছে নৌকো। কালী নদী লক্ষ্মী হয়েছে। নীলকমল গিরিশকে শুধোলেন, 'তখন তুই আমার হাত চেপে ধরেছিলি যে? নৌকো যদি ডুবত, ভেবেছিলি আমি তোকে বাঁচাতাম?'

বাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গিরিশ।

'ককখনো বাঁচাতাম না। তোকে আমি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে নিজে বাঁচতে চাইতাম। আমার কাছে তোর প্রাণ বড়, না, আমার নিজের প্রাণ বড়?'

চুপ করে রইল গিরিশ।

নিজেই উত্তর দিল নীলকমল: 'আমার নিজের প্রাণ। শোন, তোর বিপদের দিনে তুই নিজে ছাড়া তোর আর কেউ পরিত্রাতা নেই। হাত ধরবার লোক নেই ধারে কাছে। তুই একাকী, তুই নিজেই তোর একলার উদ্ধারকর্তা।'

হ্যাঁ, আমিই আমার আছি। আমিই নিজেকে তুলব, নিজেকে বাঁচাব, নিজেকে উদ্ধার করব। উদ্ধরেদাত্মনা আত্মানম্। আমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

হ্যাঁ, নিজেকে বিশ্বাস করো। আত্মবিশ্বাস। আশ্চর্য, এখানেও সেই বিশ্বাসের কথা। কিন্তু কে আমি? নিজেকে যে বিশ্বাস করব, কী আছে আমার মধ্যে? আমার মধ্যে আছে বৃহত্তম সত্তা, ইয়ত্তাহীন পরিচ্ছেদ, অপরিমেয় প্রতিশ্রুতি। আমি মহত্তম বলী, প্রদীপ্ততম সাধু, মধুমত্তম আত্মীয়। নইলে নিজের কাছেই বা হাত পাতি কোন সাহসে? তবে আমি—আমিই কি ঈশ্বর নই? কিন্তু এ বলে আবার কোন্ কথা?

বলে, 'তুমি শুধু মার নামে বিশ্বাস করো। হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, হয়ে যাবে। শুধু বিশ্বাস।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর: 'শ্যামাধন কি সবাই পায়? কালীধন কি সবাই পায়? নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥'

গিরিশ হুঙ্কার করে উঠল: 'নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।'

গুণরহিত পুত্রে অধিক দয়া।

'প্রসীদ ত্বং মাতঃ, গুণরহিতপুত্রে অধিকদয়া। নিরালম্বো, লম্বোদরজননি, কং যামি শরণম্?'

কিন্তু মাকে যে বিশ্বাস করব সেই মা কোথায়? কোথায় তোমার সেই মাতৃমন্ত্রের প্রমিতা প্রতিমা?

যাকে স্বপ্নে দেখেছে ইনিই সেই মহিমময়ী। একটি মেয়ে শ্রীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'মা, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।'

মা হাসলেন। বললেন, 'হাত-পা ধুয়ে এস। এখুনি তোমাকে দীক্ষা দেব।' কল-ঘর দেখিয়ে দিলেন।

'কিন্তু মা, স্নান করিনি তো।'

'স্নান করতে লাগবে না।'

মেয়েটি তখন হাত-পা ধুয়ে এল। মা তাকে দীক্ষা দিলেন। বললেন 'এবার তবে দক্ষিণা দাও।'

দক্ষিণা? মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই তো আনিনি সঙ্গে করে। কী হবে!

মা তখন তার দু'হাত ভরে ফুল বেলপাতা কমলালেবু কুল তুলে দিলেন। বললেন, 'বলো, আমার পূর্বজন্মে, ইহজন্মে জানত অজানত যা কিছু পাপ-পুণ্য করেছি সব তোমাকে সমর্পণ করলুম।'

মেয়েটি তাই বলল। বলা হলে মা-ও সমস্ত ফুল-ফল হাত পেতে নিজে গ্রহণ করলেন।

বাস্তবে না হোক, স্বপ্নেও কি একটিবার দেখতে পাবে গিরিশ? ছি, ছি, তার কাছে কি আসে? স্বপ্নেও আসে না। সে যে পতিত, লম্পট, সুরাসক্ত, সে যে আছে বারবিলাসিনীদের সঙ্গে।

৩

ভগবতী গাঙুলির বাড়িতে হাফ-আখড়াইয়ের বৈঠক বসেছে। চল শুনি গে।

ছেলেবেলা থেকেই গানে-বাজনায় আকর্ষণ। কোথায় যাত্রা হচ্ছে, পাঁচালি হচ্ছে, হচ্ছে কবির লড়াই, হাফ-আখড়াই, গিরিশ ছুটেছে সেখানে। কথকতাও বাদ দিচ্ছে না।

নারায়ণ দাসের যাত্রা শুনতে গিয়েছে গিরিশ। প্রহ্লাদকে বিষ খাওয়ানো হবে অথচ আসরে কোনো পাত্র নেই। অগত্যা, কি আর করা, বাজনদারের হাত থেকে মন্দিরা কেড়ে নিয়ে সেটাকেই পাত্র বানানো হল। হেসে উঠল সকলে। কিন্তু যেই প্রহ্লাদ গান ধরল, 'দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি তায় কিছু হবে না, আমি মলে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণনাম কেউ লবে না।' তখন এক নিমেষে থেমে গেল পরিহাস। চকিতে হাজার-হাজার লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল, করুণায় আর্দ্র হয়ে কাঁদতে লাগল ভক্তিতে।

কতদিন আপনমনে গুনগুন করেছে গিরিশ: আমি মলে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণনাম কেউ লবে না, আর তার দুচোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

পাঁচালি কি পাঞ্চাল দেশ থেকে এসেছে? পাঞ্চালী থেকে কি পাঁচালি? কেউ বলে পাঁচমিশেলি থেকে পাঁচালি। কেউ বলে পা চালিয়ে আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গায় বলে পাঁচালি। কিংবা বলো, পাঁচ-অঙ্গ বলে পাঁচালি। প্রথম অঙ্গ, পদচারণা, ঘুরে ঘুরে পদগান ও ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় অঙ্গ, ভাবকালি, হাতে মুখে চোখে স্বরে ভাবের সংকলন ও বিকাশ; তৃতীয় অঙ্গ, নাচাড়ি, নাচ গান আবৃত্তি; চতুর্থ অঙ্গ, বৈঠকী, বসে জমাট হয়ে রাগরাগিণীতে আলাপ; আর পঞ্চম অঙ্গ, দাঁড়াকবি, সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের দাঁড়িয়ে সমবেত সঙ্গীত।

তারপর একই আসরে আসত আরেকদল—কাটানদারের দল। তারা একই বস্তু আরেক ভাবে গাইত, রসভঙ্গ করতে পারত না। যার পালা বা সংবাদ ভালো গাওয়া হত সেই বাহবা কুড়োত। পরে দেখা গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেই বুঝি রস বেশি জমে। তাই সেই দাঁড়াকবি আর কাটানদারের থেকেই জন্মাল কবিগান। আবার বাদ-প্রতিবাদ সুরু হলেই বুঝি বাদ পড়ে শোভনতা। দেখা দেয় খিস্তিখেউড়। আনন্দ এসে দাঁড়ায় হুল্লোড়ে। ভাষা অশ্রাব্যে। পাঁচালি আর কবি মিশিয়ে দেখা দিল আখড়াই। আর তারই মাজাঘষা ভদ্র রূপ হাফ-আখড়াইয়ে। এবার তবে কলকাতার ভদ্র সমাজ দু দণ্ড বসতে পারো আসরে। উপভোগ করতে পারো। কিন্তু গাঙুলি বাড়িতে আজ এত ভিড় কেন? শুধু গান শুনতে? না। কোন একজনকে দেখতে। কে সে? কোথায় সে?

'ঐ যে।'

গিরিশ দেখল তাকিয়ে। সাদাসিধে পোশাকে একজন সাধারণ প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু, যাই বলো, মুখখানা হাসিভরা, আলোভরা।

'কে উনি?'

সে কী? ঈশ্বর গুপ্তকে চেন না?

বা, নাম শুনেছি বৈকি। সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর কত কবিতার টুকরো আমার মুখস্থ। তিনিই তো ঈশ্বরকে "হাবা বাবা" বলেছিলেন। "কহিতে না পার কথা, কি বা রাখি নাম, তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।" তা তিনি এখানে কেন?

তিনি গান বাঁধবেন। তাই তো এ প্রচণ্ড ভিড়। এ উদাত্ত অভ্যর্থনা।

গিরিশের মনে বাসনা জাগল, আমিও কবি হব। পাব এমনি বিশুদ্ধ অভিনন্দন। হাফ-আখড়াইয়ের আসরে পরে গিরিশও গানের বাঁধনদার হয়েছে আর ছড়ার লড়াইয়ের গুপ্ত-কবির মতই পেয়েছে সমাদর। কিন্তু হাফ-আখড়াইয়ের আসরে নয়, বাঙলা সাহিত্যের পুরো আখড়ার আসরে সে আসন পাবে না?

কত বড় সাহিত্যরথীদের যুগ সেটা। যখন গিরিশ ভূমিষ্ঠ হয়, ইংরিজি ১৮৪৪ সাল, তখন বঙ্কিম ছ বছরের বালক, দীনবন্ধু চোদ্দ বছরের কিশোর, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর আর ঈশ্বর গুপ্ত যথাক্রমে কুড়ি, চব্বিশ আর তেত্রিশ বছরের যুবক, আর দাশরথি একচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়।

তারপর আবার সুরু হয়েছে যাত্রা—লোকা ধোপার যাত্রা! 'শ্রীমন্তের মশান' প্লে হচ্ছে। কোতোয়ালেরা শ্রীমন্তকে বেঁধে নিয়ে এসেছে আর শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করছে। শ্রীমন্তের শরীরে বন্ধন-পীড়নের কোনো চিহ্ন নেই, হাতে শুধু একটা লাল রুমাল জড়ানো। 'ডোঁক ব্যাটা ডোঁক' অর্থাৎ ডাক ব্যাটা, চণ্ডীকে ডাক, বলে কোতোয়ালেরা হম্বি-তম্বি করছে। দর্শকদের কাছে হাসবার অনেক উপকরণ। কিন্তু শ্রীমন্ত যখন গান ধরল, 'কোথায় আছ মা শঙ্করি, পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন জ্বালায় জ্বলিয়া মরি', তখন শ্রোতারা কেঁদে ভাসিয়ে দিল। লাল রুমালে ঢাকা বন্ধনজ্বালার তন্তুও দেখা যাচ্ছে না তবু

কান্নায় গলে যেতে কারু বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। সকলের মুখেই শুধু এক কথা : লোকা কী গায়! কী গায় আমাদের লোকনাথ!

দৃশ্য নেই পট নেই সাজ নেই সজ্জা নেই, শুধু কল্পনার সাহায্যে উপভোগ—যাত্রা শোনে 'ফাতরা' লোকে। দেখা দিল থিয়েটার। দেখা দিল পোশাক আর গয়নার চাকচিক্য, আলোর কারসাজি। 'বেলগাছিয়ার বাগানে রামনারানের অনুবাদ, রত্নাবলি প্লে হচ্ছে। প্লের শেষে চারদিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আহা, মুক্তোর মালাগাছটা দেখেছ? দেখেছ আগুনের ঝলক? আর কী ফার্স্টক্লাশ পোশাক-আশাক!

গিরিশও দেখতে গিয়েছিল। বলছে, 'আগুন লেগেছে দেখে রাজা, গলায় তার মুক্তোর মালা, সাগরিকাকে রক্ষা করবার জন্যে ছুটেছে। এক রাজভক্ত এগোলেন তাকে বাধা দিতে। রাজা বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটল। মুক্তোর মালা ছিঁড়ে গেল, রাজা ফিরেও দেখল না। দেখ ব্যাপারখানা! কারু মুখে কাব্যের প্রশংসা নেই, অভিনয়ের প্রশংসা নেই, কোনো সরস পঙক্তির আবৃত্তি নেই—কেবল মুক্তোর মালা আর মুক্তোর মালা!—কেবল সাজসরঞ্জামের প্রশংসা।'

আজও বোধ হয় সেই দশা। কেবল স্টেজের উপর ট্রেনের হুস-হুস, বন্যার জলের খলবল, ঝড়বিদ্যুতের ঝনঝন!

কথকতাও করেছে গিরিশ।

'এটা আবার কোন আর্ট!' তার বন্ধুবান্ধবেরা কথকতায় উৎসাহী নয়। শুধু পাঠ-আবৃত্তি নয়, ব্যাখ্যা-বর্ণনার মাঝে-মাঝে সঙ্গীত, হাবভাবভঙ্গি। জানো তো সোনামুখির গঙ্গাধর শিরোমণিই কথকতার প্রথম প্রবর্তক। আগে-আগে শুধু ভাগবতের পাঠ আর ব্যাখ্যা করত গঙ্গাধর। একদিন বেদীতে বসে পাঠ করতে গিয়ে দেখে শ্রোতা নেই। কী ব্যাপার? গ্রামে কোথায় রামায়ণ-গান হচ্ছে সেখানেই ভিড় করেছে সকলে। এই কথা? শিরোমণি ঘোষণা করল, সকলকে বলে দাও কাল এখানে আমি ভাগবত গান করব। আর যায় কোথায়! শিরোমণি যেমন পণ্ডিত তেমনি গায়ক, আবার তেমনি তার সুললিত ভাষা। ব্যাখ্যা-বর্ণনা নেই, কবিত্বরস নেই, ভাষার ঔজ্জ্বল্য নেই, কে আর রামায়ণ-গান শোনে। কবিত্ব ছাড়া গান, পাণ্ডিত্য ছাড়া ব্যাখ্যা, লালিত্য ছাড়া বর্ণনা সার-ছাড়া খোসাভুসি।

'কেদার চৌধুরীর বাড়িতে আমি ধ্রুবচরিত্র কথকতা করব।' গিরিশ বললে তার বন্ধুদের, 'তোরা যাস, দেখিস কেমন মাতাই সবাইকে।'

শুধু আগন্তুক দর্শকেরাই নয় বন্ধুর দলও অভিভূত হয়ে গেল। কত গুণই না ধরে আমাদের গিরিশ। কিন্তু গিরিশের মনে সুখ নেই। শুধু হাফ-আখড়াইয়ে আর কথকতায় প্রাণ ভরছে না। আরো-আরো কী যেন সে বলতে চায়, লিখতে চায়, জানাতে চায় উচ্চঘোষে। হায়, বিদ্যেবুদ্ধি হল কই?

কালী বেদান্তীর বাপ রসিকচন্দ্র চন্দ্রের কাছে পড়েছে গিরীশ। পড়েছে তার ভাই অতুল আর তার সাকরেদ সুরেন মিত্তির। কালীকে বলছে একদিন গিরিশ, 'তোর বাপ গৌর আঢ্যিদের স্কুলে পড়াত, আর সেই স্কুলেরই ছাত্র আমি।'

'কদিন আর পড়েছিলে ?' মুখ টিপে হাসল কালী ।

'তোর বাপের মার খেয়ে কার সাধ্যি সে ইস্কুলে পড়ে। উঃ বাপ রে, সে কী মার !'

'দুষ্টুর শিরোমণি ছিলে যে ।'

'তা ছিলুম। তোর বাবা ক্লাসে ঢুকেই প্রথমে সুরু করতেন, যারা অলস আর অমনোযোগী তারা লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বোসো। বুঝতেই পাচ্ছিস—'

'লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে ।'

'সে না হয় বসলাম। কিন্তু ক্লাসে বসাই যে কঠিন ।'

'কেন ?'

'বন্দী হয়ে অতক্ষণ বসে থাকা যায় চুপ করে ?' হাসল গিরিশ : 'একেবারে অলস আর উদাসীন হয়ে থাকা আরো শক্ত ।'

'তা হলে কী করলে ?'

'ইস্কুল ছেড়ে দিলাম ।'

দমদমে কোন ইস্কুলে মাস্টারি করত বলে যজ্ঞেশ্বর চন্দ্রের নাম হয়েছিল দমদম মাস্টার। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে প্রায়ই যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন দেবস্থানে রিক্ত হাতে যেতে নেই, তাই এক পয়সার বাতাসা নিয়ে যায়। গরিব মাস্টার, এর বেশি আর সে পাবে কোথায় ? কত ভক্ত কত কিছু নিয়ে আসত কিন্তু ঠাকুর সব ত্যাগ করে এই বাতাসাই চেয়ে খেতেন।

বরানগর মঠে যজ্ঞেশ্বরের আশ্রয় মিলেছে। সেখানে আর-আরদের সঙ্গে আছে কালী বেদান্তী, স্বামী অভেদানন্দ। একদিন বাজারের পথে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে হঠাৎ রসিকচন্দ্রের দেখা।

'কী হে দমদম মাস্টার, তোমাদের কালীর খবর কী ?'

দাঁড়িয়ে পড়ল যজ্ঞেশ্বর।

'বলি, এখন সে কী করছে ? তার কি creatorকে দেখা হল, না কি এখনো creation দেখেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ?'

হতবাক যজ্ঞেশ্বর।

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি ব্যাটা কী ধার্মিক !' রাস্তার মাঝখানেই বললে রসিক, 'আমার এক ব্যাটা খ্রীস্টান, এক ব্যাটা সন্ন্যাসী, আর এক ব্যাটা আছে সেটাকে মুসলমান করে দেব ।'

আর গিরিশের হাতে কিনা নাস্তিক্যের নিশান। দুর্গাপুজোর আগের দিন কারা উঠোনে প্রতিমা রেখে গেছে, দেখি গিরিশ কী করে। কী করেছে, একবার দেখ এসে সকলে। সকাল হতেই প্রতিবেশীদের ভিড়। গিরিশ মদে উন্মাদ হয়েছে। কালাপাহাড় সেজেছে। হাতে কুড়ুল নিয়েছে। অশ্রাব্য কোলাহল করতে-করতে নামছে নিচে। প্রতিমা টুকরো-টুকরো করে ফেলব তবে আমার নাম। এক তাল মাটি, সে কিনা দুর্গা। এক তাড়া খড়, সে কিনা মহিষমর্দিণী।

দিদি কৃষ্ণকিশোরী চিৎকার করে উঠল : 'যাসনি যাসনি গিরিশ, সর্বনাশ

করিসনি।'

মজা দেখতে এসেছিল বটে প্রতিবেশীরা, কিন্তু গিরিশের এই মারমূর্তি দেখে হায়-হায় করে উঠল। কেউ বা চাইল ঠেকাতে। গিরিশের গায়ে তখন অসুরের বল, কার সাধ্য তার প্রতিরোধ করে। সমস্ত বাধা বন্যার সামনে খড়-কুটো হয়ে গেল।

প্রতিমার গায়ে কুড়ুলের কোপ বসাল গিরিশ। শতখণ্ড হয়ে গেল প্রতিমা। শুধু ভেঙেই গিরিশের শান্তি নেই। যদি টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয় কেউ, তার জন্যে সেগুলোকে সে মাটিতে গোর দিল। শিবঘরণী, আমাকে নিশ্চিন্ত করো, ঘুম যাও অন্ধকারে। আর জ্বালাতন করতে এস না।

রাত্রেই গিরিশের ধুম জ্বর হল।

কৃষ্ণকিশোরী ভয় পেয়ে গেল। বললে, 'দেখলি তো—'

হাসল গিরিশ, উড়িয়ে দিল। 'অনিয়ম করেছি, তাই জ্বর হয়েছে। এতে অত ঘাবড়াবার হয়েছে কী।'

মুখচোখ ভীষণ ফুলে উঠল দেখতে-দেখতে।

'অত মাথায় হাত দিয়ে বসবার মত কিছু হয়নি।' গিরিশ লঘু করবার চেষ্টা করল: 'শহরে ডাক্তার নেই? তাদের একজনকে ডাকো। আর ডাক্তারিতে যদি না কুলোয় তখন না হয় দেবীমাহাত্ম্য বিশ্বাস করা যাবে। বিশ্বাসই তো করতে চাই কিন্তু চারদিকে এত গরমিল কেন, কেন এত হিজিবিজি?'

মা, এই অবিশ্বাসীকে কৃপা করো। দুর্গার কাছে মানত করল কৃষ্ণকিশোরী—চার বছর তোমার পুজো দেব। তুমি আমার গিরিশের দোষ ধোরো না।

'তা দেখ, লোকেরই বা দোষ কী।' ব্রহ্মচারী বরদাকে বলছেন শ্রীমা, 'আমারও আগে-আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করতুম, ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারিনে। অনেক প্রার্থনা অনেক অশ্রুজলের পর তবে দোষ দেখাটা গেছে। বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, তোমার রূপটি বাঁকা মনটি সোজা—আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও। দেখ, মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ করো, অমনি তার মুখটি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি কজন দেখে? গুণটি দেখা চাই।'

রাঁধুনি বামনি এসে বললে, 'কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।'

মা বললেন, 'এত রাত্রে স্নান করে দরকার নেই। শুধু হাত পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ো।'

'তাতে কী হয়?'

'তবে গঙ্গাজল নাও।'

বামনির মন এতেও উঠল না। স্তব্ধ হয়ে রইল। তখন মা বললেন, 'তাহলে আমাকে স্পর্শ করো।'

গিরিশ কবে মার পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারবে? কে মা? উপরালা

য়্যাটকিনসনের চেয়ে কি কেউ প্রবলতর আছে? কলিং বেলএর শব্দের চেয়ে কি আছে কিছু মধুরতর? কলিং বেলএ আঙুলের ঠোকর মেরে উর্ধ্বতন সাহেব ডাকছে নিম্নতন কেরানিকে। গিরিশ যখন নিম্নতন কেরানি তখন তাকেও সেই সম্ভাষণে অভ্যস্ত হতে হবে। এই এখন অফিসের নতুন রেওয়াজ। গিরিশের উদ্দেশে বেজে উঠেছে ডাক-ঘণ্টা। গিরিশ কানেও তুলছে না। বাজুক না যতক্ষণ বাজাতে পারে। চঞ্চল হয়ে ক্রুদ্ধ হলেই তো গিরিশের হার।

এ কী বেয়াদবি! আগুন হয়ে সাহেব নিজে এসে ঢুকল গিরিশের ঘরে। এ কি, শুনতে পাও না ঘণ্টার শব্দ।

ঘণ্টার শব্দ তো কানে ঢুকছে, তা অস্বীকার করি কী করে?

তা হলে সাড়া দিচ্ছ না কেন?'

ঘণ্টা যে আমাকেই ডাকছে তা বুঝি কী করে? ঘণ্টা তো আর গিরিশ-গিরিশ বলছে না।

'কি, জবাব দিচ্ছ না যে?' সাহেব হুমকে উঠল: 'কেন অবাধ্যতা করছ?'

গিরিশ গম্ভীর স্বরে বললে, 'দেখুন ঘণ্টার শব্দে উঠতে-বসতে অভ্যস্ত নই।'

'বটে?'

'না, নই। ঘণ্টা বাজিয়ে অধীনস্থ কর্মচারীকে ডাকা তাকে অপমান করা। আর যে কোনো কর্মচারীর অপমানই সেই অফিসের অপমান।' নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললে গিরিশ।

ব্যাপারটা উপরে গেল। কোম্পানি সিদ্ধান্ত করল গিরিশের আচরণই সঙ্গত হয়েছে। উঠে গেল কলিং বেল।

য়্যাটকিনসনদেরও নীলের কারবার। দিনের বেলায়, রোদ্দুরে, আপিসের ছাদে নীল শুকোতে দেওয়া হয়। আপিস বন্ধ হবার আগে নীল মজুত হয় গুদামে। সেদিন আকাশ দিব্যি পরিষ্কার দেখে ছাদের নীল ছাদেই পড়ে থাকল। গুদামে চালান করা হল না। বৃষ্টির যখন নামগন্ধ নেই তখন ছাদের নীল সম্পূর্ণ নিরাপদ। এক রাতের তো মামলা। কিন্তু, ভাগ্যের এমন রসিকতা, রাতের দিকে দিব্যি মেঘ করে এল। সন্দেহ নেই, কতক্ষণেই ঝরবে আকাশ ভেঙে। গিরিশের মনে পড়ল অফিসের ছাদের কথা। বৃষ্টি যদি নামে নীল রসাতলে যাবে। লালবাতি জ্বালাবে। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ছুটল গিরিশ। যাক, নামেনি বৃষ্টি। ডবল মজুরিতে কুলি লাগিয়ে সমস্ত নীল তুলে দিল গুদামে। বাঁচিয়ে দিল কোম্পানিকে। গিরিশকে লোক পাঠিয়ে সেলাম দিল য়্যাটকিনসন।

গিরিশ আসতেই বললে, 'এই লোহার সিন্দুক খুলে রেখেছি তোমার জন্যে, হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা টাকা তুলে নাও।'

'টাকা!' গিরিশ থমকে দাঁড়াল।

'প্রকাণ্ড লোকসান তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ কোম্পানির। কোম্পানি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চায়।'

'আমি যা করেছি তা এক কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর মর্যাদায়।' বললে গিরিশ,

'এতে টাকার কথা ওঠে না।'

সিন্দুকে হাত ঢোকাল না গিরিশ। এত করেও কোম্পানিকে টেঁকানো গেল না। কোম্পানি লাটে উঠল। সব আসবাবপত্র নিলেম হয়ে গেল। গিরিশ মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সে কি কোম্পানির শোকে ? না, তার ঘরের যে টেবিলটা বিক্রি হয়েছে তার টানার মধ্যে ছিল তার ম্যাকবেথের অনুবাদ। আপিসের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এতদিন সে অনুবাদ করে এসেছে। কত পড়াশোনা করেছে লুকিয়ে। নিজে আর কত বই কিনতে পেরেছে! পড়বার লালসায় এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর হয়েছে পর্যন্ত। সব ভুষ্টিনাশ হল! এখন কোথায় গিরিশ সে টেবিল খোজে! চোরাবাজারে টেবিল খুঁজে পেলেও ম্যাকবেথ আর পাবে না।

বাগবাজারে নতুন এক যাত্রার দল খুলেছে। দলের প্রধানদের মধ্যে গিরিশও একজন। কিন্তু প্লে হবে কী ? প্লে হবে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা।

বেলগাছিয়ার বাগানে 'রত্নাবলি' দেখেছে মাইকেল। দুঃখ করে বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলছে, 'কী একটা নগণ্য নাটকের জন্যে কী অজস্র অর্থব্যয়! পাইকপাড়ার রাজাদের কি ভীমরতি ধরেছে ?'

'কিন্তু আর বই কই ?' বললে গৌরদাস। 'তবে কি বলো বিদ্যাসুন্দর করব ? ভালো নাটক দাও, করে দিচ্ছি।'

'দাঁড়াও, আমি লিখব নাটক।'

কদিনের মধ্যেই মাইকেল লিখে আনল 'শর্মিষ্ঠা'।

গিরিশ যে যাত্রা করবে তাতে নতুন কখানা গান জুড়তে হবে। সে যুগের নাম-করা বাঁধনদার প্রিয়মাধব মল্লিক। অনেক সাধ্যসাধনায়ও তাকে রাজি করানো গেল না। দরকার নেই, গিরিশ বললে, আমিই গান বাঁধব।

ওস্তাদ হিঙ্গুল খাঁ সুর বলে দিল আর তাই অনুসরণ করে গিরিশ গান বাঁধল: 'সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে। সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে।'

কিন্তু সখের যাত্রায় পুরোপুরি সুখ কই ? গিরিশের বড় সাধ থিয়েটার করে। থিয়েটার ছাড়া তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ হবে কোথায়: কিন্তু থিয়েটার করতে যে অনেক খরচ। অত টাকা আসবে কোত্থেকে ?

'তা হলে সধবার একাদশী করি এস।' বললে গিরিশ, 'ওতে পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ নেই। দৃশ্যপটও সাদাসিধে।'

দলের নাম হল বাগবাজার য়্যামেচার থিয়েটার। আর প্রথম অভিনয় হল বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। সবাই প্রশংসায় উন্মুখর হয়ে উঠল। যেমন প্রশংসা নাট্যকারকে তেমনি নটকে, গিরিশকে। 'আর সব ভুলব, গিরিশের নিমচাঁদকে ভুলব না।'

নিমচাঁদ ভুলুক, কিন্তু গিরিশ যেন তার পিতৃতর্পণের তারিখটা না ভোলে। পিতৃতর্পণে ফল কী ? এখানে যদি আমি জল দিই তা হলে স্বর্গবাসী পিতা

পান কী করে? এ জলে স্বর্গের তৃষ্ণার কী করে নিবারণ হয়? আর স্বর্গ কি এমনি কঠিন জায়গা যেখানে জল পাওয়া যায় না? তৃষ্ণানিরসনের ব্যবস্থা নেই সে আবার কেমনতর স্বর্গ! বেশ তো, বিশ্বাস না করো, বাবাকে জল দিও না। যার শরীর নেই সে খায় কী করে? সুতরাং জল দিয়ে তর্পণ করা বিশুদ্ধ পাগলামি। উঠে পড়ো আসন ছেড়ে। কি জানি কী আছে! গিরিশ পারল না উঠতে। তবু বাবা যদি একটু স্নিগ্ধ হন, তৃপ্ত হন, শান্ত হন তাঁকে স্মরণ করেছি বলে। কে জানে এ জল হয়তো সেবাপ্রেমের নিদর্শন। যে ভালোবাসায় জলটুকু দিচ্ছি, জলের চেয়েও সেই ভালোবাসারই দাম বেশি। মরবার পরও বুঝি থেকে যায় এই ভালোবাসার ইচ্ছা।

'আমার মা কোথায় গেলে?' কাশীতে শ্রীমা আছেন, একদিন হঠাৎ শুনতে পেলেন দূরে থেকে কে গান গাইছে করুণ সুরে।

বারান্দায় এসে বসতেই একটি মেয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'এত দিনে তোমার দেখা পেলাম, মা। আজ আমার কী আনন্দ কাকে বলি।'

'তুমি কে মা?'

'আমি তোমার এক অনাথিনী ভিখারিনী মেয়ে।'

'থাকো কোথায়?'

'অন্নপূর্ণার দরজায়, নয় দশাশ্বমেধ ঘাটে, নয়তো বেহারী বাবার মন্দিরের কাছে।'

'ভিক্ষেয় চলে তো মা?'

'খুব চলে তোমার আশীর্বাদে। তোমার জন্যে ভিক্ষেয়-পাওয়া এই পেয়ারাটি এনেছি। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা। তুমি নেবে?'

'নিশ্চয় নেব। তুমি দেবে আর আমি নেব না?' মা হাত বাড়িয়ে নিলেন পেয়ারাটি, মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, শুধু নেব না মা, আমি খাব এটি। জানো না ঠাকুর কি বলেছেন! বলেছেন ভিক্ষের জিনিস খুব পবিত্র।'

গিরিশ বলছে, 'আমার জীবন যদি ভিক্ষে করো মা, তাহলে আমার জীবনও নিমেষে পবিত্র হয়ে ওঠে।'

৪

মিস্টার জাস্টিস সিটনকার থিয়েটার দেখতে এসে গ্রিন-রুমে ঢুকে পড়েছেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' অভিনীত হচ্ছে। প্রশংসায় সারা শহর সরগরম। সেই গরম হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁচেছে। স্বয়ং হুজুরকে এনে হাজির করেছে থিয়েটারে। কিন্তু কী কেলেঙ্কার, সাহেব ভুল করে সাজঘরে ঢুকে পড়েছেন।

'মাই গাড্। জেনানা! জেনানা!' মিস্টার জাস্টিস থমকে গেলেন। যে

মেয়েটি সাজগোজ করে বসে আছে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আই বেগ ইয়োর পার্ডন—'

মেয়েটি লজ্জার প্রতিমা হয়ে মধুর মৃদুরেখায় হাসল। মিস্টার জাস্টিসের বিচারে লিঙ্গভুল হয়েছে। আদালতে সর্বত্রই কুয়াশা, আদ্যোপান্ত ছদ্মবেশ। ছদ্ম ভেদ করতে পারেননি বিচারক। যে নির্দোষ মেয়ে সেজে বসে আছে, হাসছে মৃদু-মৃদু, সে আসলে জেনানা নয়, সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহেব পালাবার পথ পায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণও ভুল করে ঢুকে পড়েছেন সাজঘরে। স্টারে 'দক্ষযজ্ঞ' দেখতে এসেছেন। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সে পথ দিয়ে সটান চলে এসেছেন মেয়ে-মহলে। যে মেয়েগুলো সাজছিলো-গুজছিলো, হই-চই ক'রে উঠল।

ঠাকুর এতটুকু ভড়কালেন না, পিছু হটলেন না। বললেন, 'ওগো, গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

'কে তুমি ?' মুখিয়ে উঠল মেয়েরা।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছে।'

কেউ কিছু জানল না বুঝল না, গিরিশের কাছে নালিশ করতে ছুটল।

পড়ি-মরি করে ছুটে এল গিরিশ। এসেই ঠাকুরের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। সকলের চক্ষুস্থির, কোথাকার কে এক আলাভোলা লোক, তাকেই কিনা গণ্যমান্য গিরিশ এমন অঢেল প্রণাম করছে।

'ওঠো গো, ওঠো।' ঠাকুর গিরিশকে তুলতে গেলেন হাতে ধরে : 'জামায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল না, ময়লা গেল !' গিরিশ উঠে মেয়েদের লক্ষ্য করে উচ্ছ্বসিত হল : 'তোরা দাঁড়িয়ে থেকে কী করছিস ! পায়ে লুটিয়ে পড়, লুটিয়ে পড়। সবাইকে ডাক। দেখতে পাচ্ছিস না কে এসেছে—'

তবু বুঝি দ্বিধা যায় না মেয়েদের।

'ওরে ঠাকুর এসেছে। তোদের মহাভাগ্য, উনি পথ ভুলে তোদের ঘরে চলে এসেছেন।' গিরিশ উদাত্ত স্বরে উদ্বেল হয়ে উঠল : 'ওরে, এমন সুযোগ আর পাবি নে—'

সকলে সাজগোজ ফেলে ছুটে এল। নিষ্কুণ্ঠে প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

'ওঠো গো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' বরদ হাতে আশীর্বাদ করলেন ঠাকুর : 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বাস করো এই আনন্দে। যাও সাজগোজ করে তৈরি হও গে—'

মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের পার্টে প্রথম স্ত্রীলোক আমদানি হল। তার আগে পর্যন্ত পুরুষরাই শরীরের অনেক কারচুপি ঘটিয়ে মেয়ে সেজে এসেছে। পানের থেকে একবিন্দু চুন খসে নি এমন হুবহু

তাদের সাজপাট হাঁটাচলা, হেলা-দোলা। এমন ওজনকরা ঢঙ-ঢাঙ। কে বলবে কোনো ছলনা আছে। একেবারে যথাবৎ। 'নব-নাটকে' জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর নটী, সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলি বড় বউ, অমৃতলাল গাঙ্গুলি ছোট বউ।

'এ কী ভয়ানক!' প্রতিবেশী চাটুজ্জেমশাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: 'বাড়ির মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দিন কাল কী হল! কোথায় চলেছি আমরা!'

কে একজন জান্তা লোক আশ্বাস দিতে এল। বললে, 'ওরা আসলে যা ভাবছেন তা নয়।'

'তা নয়? তুমি বললেই হবে?' প্রতিবেশী ক্ষিপ্ততর হল: 'গেল, গেল, সব গেল। সমাজের মান-সম্ভ্রম কিছু রইল না।'

মিছিমিছি কেন উতলা হচ্ছেন? ওরা মেয়ে নয়। ওরা মরীচিকা। কটা ছোকরা থিয়েটারে মেয়ে সেজে নেমেছে। তারাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে।'

'তুমি বললেই হবে? আমি দেখিনি স্বচক্ষে? আমি মেয়েমানুষ চিনি না?'

বেঙ্গল থিয়েটারের ভার নিয়েছে শরৎ ঘোষ। একটা পরামর্শদাতা কমিটি বসিয়েছে। তাতে আছে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, উমেশ দত্ত, আরো অনেক কেষ্ট-বিষ্টু। শরৎ ঘোষকে মাইকেল বললে, 'যদি সত্যিকার থিয়েটার খুলতে চাও মেয়ের পার্টে মেয়ে নামাও। পুরুষ দিয়ে স্ত্রীলোকের পার্ট করালে অভিনয় জমবে না কিছুতেই। কখনোই পারে না জমতে। এ স্বতঃসিদ্ধ।'

বিদ্যাসাগর নারাজ। সমাজ তাহ'লে উচ্ছন্নে যাবে। শেষ পর্যন্ত মাইকেলের প্রস্তাবই গৃহীত হল। চারজন স্ত্রীলোক ভর্তি হল থিয়েটারে। স্বভাবশ্রীতে পাদপ্রদীপের আলোকে নটনাথকে প্রথম বন্দনা জানাল। সেই অগ্রবর্তিনী কে কে? জগত্তারিণী, এলোকেশী, শ্যামা আর গোলাপ।

আর এই গোলাপই পরে বেঙ্গল ছেড়ে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করল। সেই থেকেই তার নাম দাঁড়িয়ে গেল সুকুমারী। আর সঙ্গে অভিনয় করছিল যে গোষ্ঠবিহারী দত্ত, সেই সহ-অভিনেতাকে বিয়ে করে বসল। সেদিক থেকেও গোলাপ প্রথমতমা।

সেই থেকে ছড়া তৈরি হল:

আমি শখের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রী-পুরুষে এক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে—

কিন্তু বিদ্যাসাগর থিয়েটারের সংশ্রব ছেড়ে দিলেন এক বাক্যে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ভোলানাথ বসুকে তাড়িয়ে দিলেন স্কুল থেকে।

'তোমার মত ছাত্রকে রাখতে পারব না স্কুলে। তুমি চলে যাও।'

অপরাধ?

'তুমি ঠাকুর-বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর নাটকে বিদ্যা সেজেছিলে। রত্নাবলিতেও তুমি সখী সাজো।'

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা কী? পালা 'বিদ্যাসুন্দর। শেষ রাত্রে আরম্ভ হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে এসে ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনেছেন। যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছে তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তা হলে চেষ্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

'বলেন কী! আমি তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। আমার পক্ষেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব?' ছোকরা অবাক মানল।

'নিশ্চয়ই সম্ভব। কত অভ্যেস করেই না গাইতে-বাজাতে শিখেছ। সেই অভ্যাসযোগেই হবে ঈশ্বরলাভ।' ঠাকুর তাকালেন ছোকবার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটা কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যেই হলো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদিব কত আর।'

হেসে উঠল সকলে।

'সংসারে সুখ তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকবার দিকে: 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কী ক'রে।'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে, তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরসত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘয়ের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

গিরিশ মদ আগেই ধরেছে, এবার ধরল রঙ্গমঞ্চের রঙ্গিণীদের।

'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ গিরিশ ঘোষ, আর অটল নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে।' বলছে নিমচাঁদ, 'ব্রাণ্ডির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি রাইম করতে চাও তো মদ খাও।'

সুরাপান-নিবারণী সভা হয়েছে শুনে নিমচাঁদ বলছে, 'ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয়, আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব, এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—'

গিরিশে-নগেনে মতান্তর হল। গিরিশ দল ছেড়ে দিল। গিরিশকে বাদ দিয়েই 'লীলাবতী' উঠল রিহার্সেলে। আখড়া খরচ চালাতে লাগল গোবিন্দ গাঙ্গুলি। সে না হয় হল, কিন্তু অভিনয় হয় কোথায়? স্টেজ-খরচ, পোশাক-

খরচ, সঙ্গ-অনুষঙ্গের খরচ—এ সব আসে কোত্থেকে? এক কাজ করা যাক। টিকিট বেচে অভিনয় করি এসো। তারপর সেই টাকায় স্থায়ী স্টেজ বাঁধি। তারপর একবার নিজেদের স্টেজ হলে কে আর পায় আমাদের।

কিন্তু দলে গিরিশ ঘোষ না থাকলে কে গাঁটের পয়সা খরচ করে আসবে থিয়েটার দেখতে। সুতরাং চলো যাই গিরিশকে ডেকে আনি। ঝগড়া বেশিদিন মনের মধ্যে পুষে রাখবে, গিরিশ তেমনি ক্ষুদ্রচেতা নয়। নগেনের বাড়িতে 'লীলাবতী'র ড্রেস-রিহার্সেল হচ্ছে, চলো যাই বলতেই সেখানে হাজির হল। কিন্তু, যে যাই বলুক, টিকিট বেচে থিয়েটার করতে সে রাজি নয়। লোকের কাছ থেকে পয়সা নেব, অথচ থিয়েটারের ভালো ঘর-বাড়ি নেই, পাকা স্টেজ নেই, সে ভারি বিশ্রী দেখাবে। তার চেয়ে চাঁদা তোলা ভালো। মাইকেলেরও সেই কথা। পাঁচ হাজার টাকা উঠলেই শুরু করে দেয়া যায়। চাঁদার খাতা নিয়ে, যেমন রেওয়াজ, বড়লোকদের বাড়িতে যাওয়া হল।

'কি, ফুর্তির পয়সায় কম পড়েছে বুঝি?' টিপ্পনী কাটল কেউ-কেউ: 'আজকাল তো শুধু মদ নয়, আজকাল আমোদ।'

আরে, ছি, বড়লোকের কাছে কেউ হাত পাতে? গরীব গৃহস্থেরা যা দেয় সেই রাই কুড়িয়েই বেল হবে। হল না। মোটে আড়াইশো টাকা উঠল। চাঁদা তুলে হবে না। টিকিট বেচেই আয় করতে হবে।

কিন্তু গিরিশের ঐ এক গোঁ—টিকিট বেচা চলবে না। ঢাল নেই তলোয়ার নেই, সেই নিধিরামকে দেখিয়ে কে বলবে ট্যাক্সো দাও। এ যেন বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর। আগে উপযুক্ত বাড়ি-ঘর করো, সাজসরঞ্জাম আনো, তারপর টিকিট বেচ।

কিন্তু ওদিকে চুঁচুড়ার দল 'লীলাবতী' প্লে ক'রে বসেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বঙ্কিম আর অক্ষয় সরকার। তা হোক গে, তবু চুঁচুড়ার কাছে বাগবাজার হার মানবে না।

'কিছুতেই না', শ্যামবাজারের রাজেন পাল বললে, 'আমার বাড়ির উঠোনে নাট্যমঞ্চ বাঁধা হোক।'

দীনবন্ধু হাসলেন। অর্ধেন্দুকে বললেন, 'তোমরা পারবে না।'

'পারব না?' প্রায় আস্তিন গুটোল অর্ধেন্দু।

'কী ক'রে পারবে? আমার লীলাবতীতে বঙ্কিম আর অক্ষয় কলম চালিয়েছে।'

'বলেন কী। আপনি সহ্য করলেন?'

'একেকটি শব্দ কেটেছে আর আমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছে।'

বললেন দীনবন্ধু, 'কিন্তু কী করব বলো, বঙ্কিম ভাই আর অক্ষয় ছেলে—ওদের ভালোবাসি বলে আমার শরীরে জ্বালা লাগেনি—'

'ভয় নেই, আমরা অক্ষত রেখেই করব।'

'তোমরা পারবে না।' অনুকম্পার হাসি হাসলেন দীনবন্ধু।

'পারব না? আবার সেই কথা? চলো যাই গিরিশের কাছে।' অর্ধেন্দুর সঙ্গে নগেনও সুর মেলাল।

পা মেলাল ধর্মদাস সুর, গোবিন্দ গাঙ্গুলি। সবাই একযোগে ধন্না দিল গিরিশের বাড়ি : 'তোমাকে নামতেই হবে লীলাবতীতে। চুঁচুড়ার কাছে বাগবাজার হেরে যাবে—এ তোমাকে বসে-বসে দেখতে দেওয়া হবে না। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ—'

সপ্রশ্ন চোখে তাকাল গিরিশ।

'হ্যাঁ, তোমার কথাই থাকবে! টিকিট বেচা হবে না।'

গিরিশ নামল 'লীলাবতী'তে। ললিতমোহনের ভূমিকায়। গিরিশের ছোঁয়া লেগেছে, দারুণ জমে গেল অভিনয়। বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন পালের বাড়ির উঠোনে স্টেজ বাঁধা হয়েছে, দর্শকদের আসর খোলা মাঠে। কারুর থেকে পয়সা নিই নি, কিছু বলতে পারো না। কালবোশেখীর ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল, সকলে ভিজে গেল—তা আমাদের দোষ কী! কিন্তু কী আশ্চর্য, কেউ জায়গা ছেড়ে পালাল না। সিক্তগাত্রে বসে রইল শেষ পর্যন্ত।

নাট্যকার স্বয়ং ছিলেন উপস্থিত। গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল? ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড নাটকের একটি কথাও বাদ দিইনি আমরা—'

দীনবন্ধু সাহ্লাদে বললেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে চুঁচুড়ার দলের তুলনাই হয় না। আমি এবার চিঠি লিখব বঙ্কিমকে, দুয়ো বঙ্কিম!'

যেমন তোমার নিমচাঁদ, তেমনি ললিতমোহন।

মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথম দেখিল বঙ্গ নবনটগুরু তার।'

'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?' অশ্বিনী দত্তকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?'

'হ্যাঁ গো, থিয়েটার করে।'

'দেখিনি কখনো। নাম শুনেছি।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি?' অশ্বিনীর মুখে বুঝি কটা রেখা ফুটল অসরল।

উদার মমতায় ঠাকুর বললেন, 'তা খাক না। খাক না। কতদিন খাবে?'

মদের চেয়েও দুর্মদ কি কিছু নেই? যে নারী দুষ্কৃতাগ্নিশিখা, সে কি মূর্তিমতী ভক্তি হয়ে যেতে পারে না? সার্কাসে টানা তারের উপর দিয়ে যাতায়াত দেখেছ? তাই তো মহাযান। অবলীলাগ্ন কাম থেকে প্রেমে চলে আসা। আর যদি একবার প্রেমে ধরে তখন কামও প্রেম।

'আমি প্রেমে মত্ত হয়েছি—আমাকে সাবধান করা বৃথা।' এ হুঙ্কার গিরিশের হুঙ্কার।

লীলাবতীর সাফল্যে কর্তারা আবার চঞ্চল হল, টিকিট বেচেই নাট্যশালা তৈরি হোক। আর তার নাম হোক ন্যাশনাল থিয়েটার। কানা পুতের নাম পদ্মলোচন। গিরিশ আবার ঘাড় বেঁকাল। দৈন্যকে জাতীয় পোশাক করে দেখিও না জগতকে। আগে পালোয়ান হও, পরে কুস্তি করো।

কুস্তি করতে-করতেই পালোয়ান হব।

গিরিশের সঙ্গে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। গিরিশ দল ছাড়বে, কিন্তু মত ছাড়বে না। ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে 'নীল দর্পণে'র মহলা বসল। পরে প্লে হল চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের উঠোন ভাড়া করে। ব্যোম ভোলানাথ, প্রথম রাত্রেই দুশো টাকার টিকিট বিক্রি।

গিরিশ ভাবের দোরে নিদারুণ আঘাত পেল। তার মনে জাতীয় মর্যাদাজ্ঞান ছিল, নাটক ও অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-ঔজ্জ্বল্যের একটি স্থির পরিকল্পনা ছিল—সব যেন ভেঙে গেল নিমেষে। এই ন্যাশনাল থিয়েটারের চেহারা!

গিরিশ গান বাঁধল। যারা যারা ছিল ন্যাশনালে তাদের নাম ধরে ব্যঙ্গ করে। বাগবাজারে শখের যাত্রায় 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' হচ্ছে, সেখানে সঙ দিয়েছে—সাপুড়ে ও বাউল। রাধামাধব কর বাউল সেজে সেই গান গাইছে :

'লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধার।
তাতে পূর্ণ অর্ধ ইন্দুকিরণ
সিঁদুর মাখা মতির হার ॥
নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণা কায়
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার ॥
কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু কর পার ॥
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ;
মিছে করে আশা যত চাষা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার!
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিনে খসে—
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ॥'

'ওহে, গিরিশ তোমাদের ধোলাই দিয়েছে।' অমৃত বসুকে বললে এসে একজন, 'কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে। তোমাদের গালাগাল দিয়ে গান বেঁধেছে।'

কই দেখি।'

গান পড়ে অমৃত ভীষণ খুশি। সকলে খুশি। এস বাগবাজারের ঘাটে বসে

সকলে মিলে গাই গলা খুলে। যদি পারো তো গিরিশ ঘোষকেও ডেকে আনো। উনি আমাদের গুরু, উনি নিজের কানে শুনে যান।

গিরিশের কানে গেল, যাদের লক্ষ্য করে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তারাই সানন্দে সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে। ও কথা শুনে গিরিশের ভাবান্তর হল। মতান্তর আর মনান্তরে গিয়ে দাঁড়াল না।

ন্যাশনালের 'নীলদর্পণে' দীনবন্ধু খুশি নয়। বললেন, 'সবই আছে, শুধু একজনই নেই। যে সিরিয়াস পার্টের য়্যাকটর সেই অনুপস্থিত।'

অন্য আভরণে কী হবে, মাথার মুকুটই খোয়া গেছে।

তারপর যখন ন্যাশনাল মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ধরল, সমস্যা জাগল ভীমসিংহের পার্ট কে করে? উপায় নেই, চলো যাই গিরিশের কাছে। গলবস্ত্রে দ্বারস্থ হই। গিরিশের সমস্ত অভিমান ভেসে গেল। হ্যাঁ, সে সাজবে ভীমসিংহ। কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে পারবে না। লিখবে, এ ডিস্টিনগুইসড য়্যামেচার। তথাস্তু।

মাইকেল নিজে উপস্থিত ছিল সে অভিনয়ে। গিরিশকে প্রাণঢালা প্রশংসা করল। আর নাটোরের মহারাজা গিরিশকে স্বহস্তে নিজের রাজবেশ পরিয়ে দিলেন, কোমরে ঝুলিয়ে দিলেন নিজের তলোয়ার।

কিন্তু কদিন পরেই উঠে গেল ন্যাশনাল। অর্থই অনর্থ হয়ে উঠল। ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হল রাগারাগি। তাই বলে জনসাধারণকে তা জানতে দেওয়া কেন? শেষ অভিনয়ের রাত্রে যে বিদায়ের গান গাওয়া হল তাও গিরিশের লেখা।

'কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
নির্মাইয়ে নাট্যালয়
আরম্ভিলে অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয় এ মিনতি পায়॥

কে এক রাত-ভিখারি রামপ্রসাদের গান গেয়ে চলেছে: 'গেল দিন মিছে রঙ্গরসে। আমি কাজ হারালাম কালের বশে।'

গিরিশ তাকে ডাকিয়ে আনল। তিন-চারটি গান শুনল। পয়সা দিল।

শরৎ মহারাজকে বললে, 'জানো শরৎ, এই রামপ্রসাদী পদ এমন তেজী ভাবের যে মনের আর কোনো খোঁচখাঁচ থাকে না, মনটাকে একবারে সিধে চোস্ত করে দেয়।'

দুপুরবেলা কে এক জটাধারী সন্ন্যাসী এসে বসেছে ঠাকুরদালানে। হাতে চিমটে, গায়ে ছাইমাখা। প্রথমেই চুপিচুপি ঝিকে ডেকে ভাব করল, তার থেকে বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিল। যাও এবার বাড়ির ভিতর গিয়ে বলো গণৎকার এসেছে।

অন্দরে ঢুকে ঝি রব তুললে। ওগো হাত দেখাবে এস। ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী এসেছে। সন্ন্যাসীর সামনে কুলবধূদের পর্দা নেই। আর হাত দেখাবার জন্যে সব সময়েই তারা প্রসারিত। হাত দেখছে আর পট পট করে বলে দিচ্ছে সন্ন্যাসী।

বৈঠকখানা ঘরে দরজা ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে সব দেখছিল গিরিশ। রাগে সারা গা রি-রি করে উঠল। ছুটে বেরিয়ে এসে ঠাকুরদালানের সামনের করবী গাছের একটা ডাল ছিঁড়ে নিয়ে তেড়ে গেল সন্ন্যাসীকে। গলি দিয়ে পালাতে চাইল সন্ন্যাসী, এই মারে তো সেই মারে—শালা ঝিয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে বিদ্যে ফলাতে বসেছে!

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশের তর্ক লেগেছে। তর্কের মাঝখানেই গালাগাল।

'থাম শালা। ভিখির সন্ন্যাসী।' হুমকে উঠল গিরিশ।

'যা শালা ভাঁড়।' পালটা গর্জালি নরেন: 'তুই শালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শালা কি ব্রেন আছে?'

৫

ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে গিয়ে দু'ভাগ হল। এক ভাগে গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র বোস, ধর্মদাস সুর, আরেক ভাগে অর্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃত বোস, নগেন বাঁড়ুয্যে। প্রথমে দলের নাম ন্যাশনাল-ই থাকল, দ্বিতীয় দল নাম নিল হিন্দু ন্যাশনাল। যা পরে 'মেয়ো হসপিটাল', তার ভিত্তিস্থাপন করল সেদিনের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক। হাসপাতালের জন্যে চাঁদা তোলায় হিড়িক পড়ে গেল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন এক ইংরেজ ডাক্তার, মিস্টার ম্যাকনামারা, টাউন হল ভাড়া করে ডাকলেন ন্যাশনালকে। তোমরা প্লে করো। খরচখরচা বাদ দিয়ে যা বাঁচবে তা যাবে হসপিট্যাল ফাণ্ডে।

কী নাটক করব? কৃষ্ণকুমারী? কৃষ্ণকুমারীর শোকে ভীমসিংহ যেখানে উন্মাদ হয়ে মানসিংহকে বধ করবার সংকল্প করছে সেই দৃশ্যটা গিরিশ কী দুর্দান্ত ভালো করত তা কেউ ভুলতে পারছে না। 'মানসিংহ—মানসিংহ—মানসিংহ—তাকে তো এখনই নষ্ট করব। আমি এই চললেম।' এই তো কটা কথা। কিন্তু এমনভাবে বলত গিরিশ, সবাই বিহ্বল হয়ে যেত। প্রথম 'মানসিংহে' গিরিশ যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে; দ্বিতীয় 'মানসিংহে' সে যেন দুর্ঘটনা অনুমান করতে পারছে, আর তৃতীয় 'মানসিংহে' তার হিংস্রগম্ভীর গর্জন, বাস্তবে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে ব্যভিচার। এই তৃতীয় গর্জনে সামনের লাইনের ক'জন দর্শক ছিটকে পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

না, কৃষ্ণকুমারী নয়। ম্যাকনামারা বললে, নীলদর্পণ। উড সাজবে গিরিশ ঘোষ। কিন্তু মুস্কিল হবে সৈরিন্ধ্রীকে নিয়ে। অভঙ্গ ন্যাশনালে যখন অভিনয় হয়েছিল তখন সৈরিন্ধ্রী হয়েছিল অমৃতলাল। অমৃত তো এখন 'হিন্দু' হয়েছে। নতুন ন্যাশনালে সে এখন মৃত ছাড়া আর কী। এগিয়ে এল ডাক্তার আর, জি, কর—রাধাগোবিন্দ কর। বললে, আমি সৈরিন্ধ্রী হব।

গিরিশই সবাইকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিল। ভীষণ জমল অভিনয়। দর্শকেরা

কখনো চেচাচ্ছে ক্রুদ্ধ হয়ে, কখনো হাততালির উল্লাসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঘরদোর উডকে অনেকে গিরিশ বলে চিনতেই পারেনি। ভেবেছে ম্যাকনামারা কোত্থেকে এক বাংলা-জানা খাঁটি সাহেব জোগাড় করে এনেছে। দেখছ, কী হাবভাব, আদব-কায়দা, কেমন প্রবেশ-প্রস্থান! হুবহু সাহেবের মত।

দেওয়ান গোপীনাথ দাস বলছে স্বগত: 'লোকের সর্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ। এই যে আসছেন সাহেব।' তারপর নীলকর সাহেব উড এলে বলছে, 'হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহা মন্দ নয়, বেটা গোলোক বোসের পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে।'

উড বলছে, 'এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল। দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল; বলে, পুকুরের পাড়ে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে। জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।'

'ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।' বললে গোপীনাথ।

'মোকদ্দমা কিছু হইবে না। এ ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভালো লোক আছে।' উড বলছে সবজান্তার মত: 'দেওয়ানী করিলেও পাঁচ বছোরেও মোকদ্দমা শেষ হবে না। ম্যাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত।' স্পর্ধাভরে হাসল বোধহয় উড। সেই উড চরম চটেছে গোপীনাথের উপর। লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। বলছে: 'চপরাও ইউ ব্যাস্টার্ড অব হোরস বিচ। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা? শালা কাউয়ার্ড কায়েৎ বাচ্চা। ডেভিলিশ নিগার! এই তোম ক্যাওটকা মাফিক কাম ডেগা? জেলমে ভেজ দেগা টোমকো।'

উড চলে গেলে গা ঝাড়তে ঝাড়তে গোপীনাথ উঠল। বললে, 'সাত শো শকুনি মেরে একটি নীলকরের দেওয়ান হয়। কি পদাঘাতই করেছে বাপ!'

দর্শকেরা চরম খেপেছে যখন চাষী তোরাপের বেশে মতিলাল সুর রোগ্-সাহেবের বেশে অবিনাশ করের গলা টিপে ধরেছে। বলছে, সুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, বাক্যি হরে গিয়েছে। সুমুন্দির কি ইমান আছে যে ধরম কথা শোনবে। ও যেমন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর—' বলে গালে-মাথায় বেদম চড় মারতে লাগল।

মার, মার শালাকে—সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে এমনি আত্মহারা হয়েছে দর্শকেরা। ব্যারিস্টার উড্রোফ সাহেবের বাবু দীনদয়াল বোস লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে স্টেজের উপর। তোরাপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেও মারতে সুরু করেছে রোগ্কে। রোগ্-এর উপরে রাগ কেন? রোগ্ মূর্তিমন্ত 'রোগ'—আকাট লম্পট। নীলচাষীর মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে বেইজ্জত করতে নিয়ে এসেছে কুঠিতে। বলছে 'ডিয়ার, ডিয়ার, আইস, আইস—'

ক্ষেত্রমণি বলছে, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, তুমি মোর বাবা। হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।'

'তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।' বলছে রোগ্, 'আমি কোনো

কথায় ভুলিতে পারিনা, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।'

কেঁদে আকুল হচ্ছে ক্ষেত্রমণি। বলছে, 'মোর ছেলে মরে যাবে—দোহাই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে, মুই পোয়াতি।'

হেসে উঠল রোগ: 'তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।'

জানলার খড়খড়ি ভেঙ্গে তোরাপ ঢুকল কামরায় আর রোগ্-এর উপর সুরু করল প্রহার। 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের। পাঁচদিন খাবালি, একদিন খা।'

দর্শকদের ভিতর থেকে দীনদয়াল ছুটে এসেছে স্টেজে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেও পিটছে রোগ্‌কে। হৈ হৈ কাণ্ড। আর এমন উত্তেজনা, আততায়ী দীনদয়ালই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

অমৃতলাল দেখতে এসেছিল সৈরিন্ধ্রী কেমন করে। দেখলে রাধাগোবিন্দ, ডাকনাম গোবি, খাসা উতরেছে। অমৃতের বিদ্রূপের চোখ ঈর্ষায় কষায় হয়ে উঠল। ভীষণ জমেছে থিয়েটার। সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইংলিশম্যান লিখল, এমন অভিনয় শুধু একদিনের জন্যে?

এগারোশো টাকা উঠল টিকিট বেচে। চারশো খরচ বাবদ রেখে ম্যাকনামারার হাতে সাতশো দেওয়া হল।

দেখাদেখি হিন্দু-ন্যাশনাল লিণ্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস ভাড়া করে করল শর্মিষ্ঠা। জমল না, টিকিট-বিক্রিও অকিঞ্চিৎ।

টাউন হল ছেড়ে ন্যাশনাল বা গিরিশের দল চলে এল রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে। বিজ্ঞাপন দিল, কপালকুণ্ডলা হবে।

ভাগ্যের কী রসিকতা, অভিনয় আরম্ভ হবার ঠিক আগে দেখা গেল কপালকুণ্ডলার খাতাখানি হারিয়ে গেছে। কী সর্বনাশ! খোঁজ, খোঁজ, খাতা কোথায় যাবে, খুঁজে বার কর শিগগির।

প্রায় ফুল-হাউস, এ সময় খাতা নেই? খাতা ছাড়া প্লে হবে কী করে? কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দর্শকেরা টাকা ফেরত চাইবে। শুধু টিটকিরি করেই রেহাই দেবে না, ছুঁড়বে ইঁট-পাটকেল। আর বিকশিত দন্তে হাসবে শত্রুপক্ষ।

তখন সবাই ধরল গিয়ে গিরিশকে: 'মশায় উপায় করুন।'

রাজবাড়ির লাইব্রেরি থেকে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা বইখানা নিয়ে এস। আছে তো লাইব্রেরিতে? যদি থাকে, যদি পাও, তখন দেখা যাবে।

বই পাওয়া গেল। গিরিশকে তখন পায় কে! বললে, 'কোনো ভয় নেই, বই দেখে-দেখে আমি প্রম্পট করে যাচ্ছি, তোমরা রঙ্গমঞ্চে বার হও।'

গিরিশের সে এক অসাধ্যসাধন। একমাত্র উপন্যাস আর ছাপানো প্রোগ্রাম তার অবলম্বন। তাই ধরে মুখে-মুখে দৃশ্যে ও চরিত্রে সামঞ্জস্য রেখে দিব্যি সে নাটক খাড়া করে দিল। পার করে দিল ঝোড়ো নদী। কেউ জানতেও পারল না, হাল-পাল-ছাড়া নৌকোর সে কী চেহারা।

এদিকে ন্যাশনালের সাফল্য দেখে আশুতোষ দেব ওরফে ছাতুবাবুর দৌহিত্র

শরৎ ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার খুলল আর অভিনেত্রীর আমদানিতে চারদিক সরগরম করে তুলল। বিহারীলাল চাটুজ্জে দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ দিলেন আর জলজ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে শরৎ ঘোষ জগৎ সিংহরূপে আবির্ভূত হল। রঙ্গমঞ্চে সত্যিকার ঘোড়া—ভেঙে পড়ল দর্শকের দল। বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ আগাগোড়া মাটি দিয়ে তৈরি, মাঝখানে কয়েকখানি তক্তা—তারই জন্যে ঘোড়া নামানো সহজ ছিল। তাছাড়া শরৎ ঘোষ ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার। অভিনেত্রী বিনোদিনী বলছে, 'স্টেজে ঘোড়া বেরিয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়ার গায়ে হাত দিলেন, অমনি ঘোড়া শান্ত-শিষ্ট হয়ে গেল, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল, তিনি সেই ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের বাড়িতে একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তাঁর দিদিরা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল খেতে দিতেন ঘোড়াকে।'

পরে বিনোদিনীও পাদপীঠের আলোতে দাঁড়িয়েছে ঘোড়ায় চড়ে।

ন্যাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনাল দুই-ই গিয়েছিল ঢাকায়, দুই-ই হতোদ্যম হয়ে ফিরে এল স্বস্থানে। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় তার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে কলকাতায় লোক পাঠালেন থিয়েটার বায়না করতে। ন্যাশনাল না হিন্দু-ন্যাশনাল কাকে বায়না করে, ফাঁপরে পড়ল আমমোক্তার। সেই সংকটে দুই দল—হিন্দু আর অহিন্দু—একত্র হয়ে গেল। একত্র হয়ে গেল তারা দীঘাপতিযায়। সেখান থেকে রাজসাহী ও বহরমপুর হয়ে কলকাতা। দলাদলি মিটে গেল। মিটমিট করতে-করতে নিবে গেল অতঃপর।

হিন্দু-ন্যাশনাল-এর নগেন আর শুধু-ন্যাশনাল-এর ধর্মদাস বেঙ্গল থিয়েটারে নাটক দেখতে এসেছে। সঙ্গে ধনাঢ্য জমিদারের ছেলে ভুবন নিয়োগী। সেদিন থিয়েটারে এত ভিড় যে তারা চার টাকার টিকিট আট টাকায়ও কিনতে পেল না। নিজেদের অপদস্থ মনে করতে লাগল। এই কথা? ভুবন খেপে গিয়ে বললে, যত টাকা লাগে খোলো নতুন থিয়েটার। আনো চমকদার মেয়েমানুষ। নটী ভঙ্গি-পটীয়সী। বিডন স্ট্রিটে মহেন্দ্র দাসের জমি চল্লিশ টাকা মাস-ভাড়ায় ইজারা নেওয়া হল। কাঠের তৈরি স্টেজ হল। থিয়েটারের নাম হল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

গিরিশ বেঙ্গলেও নেই, গ্রেটেও নেই। সে শুধু এখানে-ওখানে মাঝে-মধ্যে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। এমনি একদিন গিয়েছে বেঙ্গলে। 'অশ্রুমতী' প্লে হচ্ছে, কিন্তু প্রতাপ সিংহ অনুপস্থিত। সকলে গিরিশকে ধরল, উপায় নেই, আপনাকে প্রতাপ সিংহ সাজতে হবে। নইলে আমরা পথে বসব।

'সে কী? আমি যে এ নাটকের কিছুই জানি না।' পাশ কাটাতে চাইল গিরিশ।

'আপনাকে কিছু জানতে হবে না। শুধু প্রম্পটিং-এর উপর চালিয়ে যাবেন।'

'বা, বইটাই যে আমার পড়া নেই।'

'তা না থাক। রানা প্রতাপকে তো আপনি জানেন। তাইতেই হবে।'

ধরেবেঁধে গিরিশকে প্রতাপ করে দেওয়া হল। একবার যখন সেজেছে, তখন উদ্ধার করে দেবেই দেবে। হাঁপ ছাড়ল ম্যানেজার।

দু'অঙ্ক অভিনয় হবার পর গিরিশের দেখা নেই। সে কী? যাবে কোথায়? গায়ের পোশাক পর্যন্ত ছাড়েনি। কাছেপিঠেই কোথাও রয়েছে। এদিক-ওদিক খোঁজো না একটু ভালো করে।

কে একজন এসে বললে, 'গিরিশ পীরুর হোটেলে বসে খাচ্ছে।'

খাচ্ছে? খাবার আর সে সময় পেল না? ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।

কী আশ্চর্য, প্রতাপের পোশাক-গায়েই খেতে বসেছে গিরিশ।

'সে কী মশাই? আপনার সীন এসেছে আর আপনি এখানে খাচ্ছেন?' ম্যানেজার হুমড়ি খেয়ে পড়ল: 'খবর পাঠালে তো থিয়েটারেই দেওয়া যেত খাবার।'

ভরামুখে গিরিশ বললে, 'আমি আর প্লে করব না।'

'প্লে করবেন না?' সে কী?' সাত হাত জলের তলায় পড়ল ম্যানেজার: 'কেন, আপনার পার্ট তো চমৎকার হচ্ছিল।'

'তা হোক। কিন্তু আর নয়, এইখানেই শেষ।'

'কেন, অপরাধটা কী হল?' হতভম্বের মত মুখ করল ম্যানেজার।

'ঘোরতর অপরাধ।' প্রায় গর্জে উঠল গিরিশ: 'রানা প্রতাপের মেয়ে অগ্রুমতী শেষকালে আকবরের বেটা সেলিমের প্রেমে উন্মাদিনী হবে?'

'তাতে আমার-আপনার কী হাত আছে?'

'আলবৎ আছে। আপনি ও বই নির্বাচন করবেন না। আর আমি অভিনয় করব না।'

'বা, ইতিহাসকে আপনি মুছে দেবেন কী করে?' যুক্তির পথ ধরতে চাইল ম্যানেজার: 'আপনি তো অভিনেতা। আপনিই তো আর প্রতাপ নন!'

'ও, নই বুঝি! তাহলে নিয়ে নিন পোশাক।' গিরিশ গা থেকে পোশাকটা খুলে দিল। বললে, 'যে প্রতাপ আকবরের কুটুম্ব বলে মানসিংহের সঙ্গে একত্র খেতে রাজি হল না তারই মেয়ে কিনা সেলিমের জন্যে পাগল! আগে জানলে কি মশাই এ কেলেঙ্কারিতে রাজি হই? যান মশাই, পোশাক নিয়ে ফিরে যান। আর কারু গায়ে চাপিয়ে দিন।'

পোশাক নিয়ে ফিরে গেল ম্যানেজার।

'ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংস মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তাই এখনো শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।' আবার বললেন, 'বেশ্যারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তাই হলোই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপনা হয়।'

ঘরেতে মাদুর পাতা, নরেন এসে প্রণাম করে বসল।

'ভালো আছিস?' ঠাকুরও এসে বসলেন মাদুরে: হ্যাঁরে, তুই নাকি

গিরিশের ওখানে প্রায়ই যাস ?'

'যাই।'

'কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন গন্ধ একটু থাকবেই।'

'তা থাকুক।'

'হ্যাঁ, ওর থাক্ আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে।' বললেন ঠাকুর, 'যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ ঘোষ।' নরেন বন্ধুর হয়ে বললে।

'আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম,' পরিহাসপ্রসন্ন মুখে ঠাকুর বললেন, 'একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। আমি জিগগেস করলুম, এ কী হল ? ও তো দামড়া। তখন গাড়োয়ান বললে, মশাই, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

'যাবে, একদিন যাবে, একদিন যাবে।'

আগের কথার জের টানলেন ঠাকুর : 'এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন একটু আড়চোখে চেয়ে দেখল। ব্যাপার কী জানো ?' হাসলেন ঠাকুর : 'সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।'

'কিন্তু—কিন্তু গিরিশের বিশ্বাস ?'

'গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস তেমনি অনুরাগ।' ঠাকুর বুঝি বা একটু অভিযোগের সুর আনলেন : 'কিন্তু এত গালাগাল মুখ-খারাপ করে কেন ?'

কী করবে। বাল্যকাল থেকেই একটার পর একটা শোক পেয়ে আসছে। অসৎ সঙ্গে মিশেছে।.আচার-বিচার মানে নি। মদ ধরেছে। থিয়েটারে ভিড়েছে। সঙ্গ করেছে বারাঙ্গনার। উচ্ছৃংখলতার কিছু বাকি রাখেনি। আজীবন যদিও বয়াটে নাম, পরোপকার করতে ছাড়েনি সাধ্যমত। পাড়ার পুকুরে কে এক ভদ্রলোক ডুবে গিয়ে মারা যায়। লাশ ভেসে উঠলেও তার আত্মীয়স্বজন তা তুলতে রাজি নয়। পুলিস এল মুদ্দাভরাস দিয়ে সেই লাশ তুলতে। গিরিশ জলে লাফিয়ে পড়ল, নিজেই সে বিকৃত ভারী লাশ পাড়ে তুলল, দলবল জুটিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে, সেখান থেকে ছাড়ান করে নিয়ে গেল শ্মশানে।

'বলিদান'-এ হিরণ্ময়ী বিধবা হবার পর শুধু এক গরিব প্রতিবেশিনী এসেছে তাকে সান্ত্বনা দিতে। বলছে, 'তা আমি এখন আসি বাছা। দিন কি আর যাবে না ? নাও, অমন করে থেকো না, কাল থেকে পড়ে রয়েছ, একটু মুখে জল দাও নি। হবিষ্যি চড়িয়ে দাও, কি করবে! আসি মা।'

প্রতিবেশিনী চলে গেল, হিরণ্ময়ী বলছে আপন মনে, 'আহা, এই গরিব অনাথা, এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মারলে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে তারা কাঁধে করে সৎকার করতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকে কেউ উঁকি মারলে না। কি করব, কি হবে!'

নিজের কথাই লিখেছে গিরিশ। সে বয়াটে কিন্তু তাই বলে সৎকার্যে সে বিমুখ নয়। গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে, গিরিশ শুনতে পেল রসিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে কে এক মুমূর্ষু আর্তনাদ করছে। সাহস করে ঢুকল গিরিশ। দেখল এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু একা শুয়ে আছে খাটে, আত্মীয়স্বজনরা বেপাত্তা। বৃদ্ধ ক্ষীনকণ্ঠে বললে, মরতে দেরি আছে বুঝে সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে, আর ফেরেনি। বাবা, একটু জল দিতে পারো? বৃদ্ধের মুখে গঙ্গাজল দিয়ে গিরিশ ছুটল দুধ জোগাড় করা যায় কিনা। আর কোথায় মিলবে, নিজের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। আর বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই শুরু হল ঝড়। ঝড়ের মধ্যেই গিরিশ ছুটল দুধ নিয়ে। পথে আলো নেই, জনমানব নেই; শুধু মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের ঝলসানি। আর বৃষ্টি।

পথ চিনে গিরিশ ঠিক পৌঁছুল ঘাটে। দেখল দরজা বন্ধ। ঠেলল, কিন্তু খুলল না। ভাবল মুমূর্ষুর আপনজনেরা কেউ এসেছে বুঝি। 'দরজা খুলুন', চেঁচাল গিরিশ। কেউ কোনো সাড়া দিল না। তখন জোরে ধাক্কা মারতেই দরজা ফাঁক হল, আর যেই গিরিশ ঢুকতে যাবে অমনি একখানা ঠাণ্ডা সরু হাত তার গলা টিপে ধরল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল সেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। জীবন্ত নয়, মৃত। স্পর্শে আর মুখের চেহারায়ই তা প্রকাশিত। বুঝল কলেরার রুগী হয়তো, বিকারের ফলে খাট থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিংবা বিকারের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়েই সেই দাঁড়ানো অবস্থায়ই মরে রয়েছে। চেঁচালে কে বা শুনবে, গিরিশ চেঁচাল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ল না, মৃত দেহকে খাটে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গিরিশের কি তখন মদের নেশা ছিল? আর যদি থেকেই থাকে, তার দোষ ধোরো না। তার জীবনে উৎপীড়নটা একবার দেখ। আর কে বলবে, একের পর এক এই শোককে জব্দ করবার জন্যেই তার মদ!

প্রথমেই শৈশবে মরল দিদি প্রসন্নকালী, এক রতি মেয়ে, জয় রাধাগোবিন্দ বলতে না পেরে বলত 'ধেও নাধার গোবিন্দ।' গিরিশকে ডাকত গিরি-ভাই বলে। তারপরে গিরিশের যখন দশ বছর বয়স, মরল বড়দাদা নিত্যগোপাল। এগারো বছর বয়সে মা, চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা। অভিভাবক বলতে কেউ রইল না। তারপর আরেক দিদি গেল, কৃষ্ণরঙ্গিনী। যখন তেইশ বছর বয়স, প্রথম ছেলে হল গিরিশের। দু'মাসের আয়ু ফুরিয়ে গেল এক ফুঁয়ে। দু'বছর পর আরেক দিদি, কৃষ্ণকামিনী চোখ বুজল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোটভাই কানাইলাল।

মেঘের গায়ে একটি মাত্র রুপোর পাড়, সেই বছরেই দ্বিতীয় পুত্র হয় গিরিশের। সেই সুরেন্দ্রদাথ বা দানিবাবু। সেই দানি ঘোষের অসুখ করেছে। ডাক্তার-বদ্যি যা আছে সব এনে ভিড় করিয়েছে, ওষুধপত্রের শেষ নেই, সেবা শুশ্রূষারও চরম, তবু স্বস্তি নেই গিরিশের। এই দুপুরবেলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকল। ছায়া-কায়া সমান, তাকাল ঠাকুরের পটের দিকে। বললে, 'সব অসুখের বৃত্তান্ত তো জানো, আর এও জানো এই আমার একমাত্র ছেলে। ভালো করে দাও বলছি। যদি ভালো করে না দাও, ভালো হবে না বলছি।' বলে মুখে যা এল

কদর্য ভাষায় গাল দিতে লাগল। চোদ্দপুরুষের অন্ত করে ছাড়ল।

পরে ক্রুদ্ধ মুখে বললে, 'তুই যদি অবতার হোস তো আমার ছেলেকে ভালো করে দে, তা না হলে আরো মুখ খারাপ করব বলে রাখছি।'

সে যাত্রা ভালো হয়ে গেল দানি ঘোষ।

দেবেন মজুমদারের বাড়িতে গিরিশকে বলছেন ঠাকুর, 'তুমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল, তা হোক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। বদরক্ত রোগ কারু কারু আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভালো।'

'পেটেমুখে এক হওয়াই ভালো।' বললে গিরিশ।

'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়চড় করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।' গিরিশের দিকে তাকালেন সস্নেহে, 'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন-দিন উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশি আসতে পারব না—তা হোক, তোমার এমনি হবে।'

'এমনি—এমনি কারু হয়?'

'হয়। যদি নীরন্ধ্র বিশ্বাস থাকে, যদি উর্জিতা ভক্তি থাকে।'

'কিন্তু আমি যে লম্পট, আমি যে দুরাচার।'

ভাবে ঘনীভূত হয়ে ঠাকুর মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। বলছেন, 'মা' যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় কী বাহাদুরি! মরাকে মেরে কী হবে? যে খাড়া হয়ে আছে তাকে মারবে তো তোমার মহিমা।'

আর দেবেনের সেই গানটা মনে করো:

'এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে ॥
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পান সমান ব্যথা,
এ কি মা দারুণ কথা, নাই ব্যথা কুপুত্র বলে ॥
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন করে থাকতে পারে ছেলে ভুলে ॥'

৬

বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল এঁটে উঠছে না। 'দুর্গেশনন্দিণী' করে খুব লুটছে বেঙ্গল, সুতরাং গ্রেট ন্যাশনাল-এও বঙ্কিমচন্দ্রকে চাই। গ্রেট ন্যাশনাল-এর ম্যানেজার ধর্মদাস গিরিশের শরণাপন্ন হল, মৃণালিনীকে নাটক করে দিন আর আপনি নিজে সাজুন পশুপতি।'

'পয়সা নেব না কিন্তু।' হাসল গিরিশ।

'যদি বলেন তাই। অবৈতনিক।'

সবাই জানত কাজ একবার হাতে দিলে গিরিশ কিছুতেই ফাঁকি দিত না।

টাকা দিলেও না, না দিলেও না।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধিকার পশুপতি। বখতিয়ার খিলিজির সঙ্গে তার এই ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে যদি যুদ্ধ না করে তা হলে নবদ্বীপ অধিকার করে তাকে বাঙলার সিংহাসন দেবে। পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বখতিয়ার বিনা আয়াসে বাঙলা জয় করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখল না। পশুপতিকে বললে, 'তুমি নরাধম, তুমি অবিশ্বাসী, দেশদ্রোহী। তুমি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নও। তোমার স্থান কারাগারে।'

কটি দৃশ নিজে লিখে দিল গিরিশ। আর উন্মাদ অবস্থায় পশুপতির যা অভিনয় করল তার জুড়ি নেই। বন্দী অবস্থায় পশুপতিকে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

'মহারাজ, চলুন, নৌকো প্রস্তুত।' বললে বখতিরারের সেনাপতি।

'মহারাজ! মহারাজ কে!' পশুপতি বলছে: 'মহারাজ তো আমি। লক্ষ্মণ-সেন, তোমার মুখকান্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার ন্যায় শত-শত শক্তির ছিন্নমস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসনে আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—জানু পর্যন্ত শোণিত দেখ—রাজপথ দেখে এস, শোণিতস্রোত ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে—'

'এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই?' বলছে সেনাপতি: 'মহারাজ, চলুন নৌকো প্রস্তুত।'

'কে ডাকে? কাকে ডাকে?'

'নৌকো প্রস্তুত।'

'বিশ্বকর্মা আমার সিংহাসন আনছে।' বলছে পশুপতি: 'দেখ, যম কেমন পুরোহিত, সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহলাদে নৃত্য করছে। ছত্রধারী, ছত্র ধর। মনোরমা—মনোরমা—সিংহাসনের বামপার্শ্বে কি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে!'

'আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্যে নৌকো প্রস্তুত। চলুন।'

'বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষ্মণ সেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল। পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।'

পশুপতি করে না কিন্তু পশুপতি যে সেজেছে সে গিরিশ করে। কে বিশ্বাসের যোগ্য? তার উত্তর পেয়ে গেছে সে জীবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আরেকদিন থিয়েটার দেখাবে?'

,যে আজ্ঞে, আপনার যেদিন ইচ্ছে হয়, দেখবেন।' গিরিশ বলল বিনীত স্বরে।

'দেখব তো কিছু নিতে হবে।' হাসতে লাগলেন ঠাকুর: বিনি পয়সায় দেখব না।'

'বেশ তো, আট আনা দেবেন।'

'আট আনা ?' যেন খুব কম, প্রায় না দেবার সামিল, এমনি মুখ করলেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, গ্যালারিতে বসবেন। গ্যালারির টিকিট আট আনা।'

'না, না, সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।' ঠাকুর বললেন, 'আমি এক টাকা দেব।'

'বেশ, তা হলে আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই বসবেন।'

'তা বসব। কিন্তু দেবো পুরো এক টাকা। ষোল আনা।'

'যে আজ্ঞে, তাই দেবেন!'

গিরিশের জন্যে দক্ষিণেশ্বরে অপেক্ষা করছেন ঠাকুর, কিন্তু গিরিশের দেখা নেই।

ভবনাথ বললেন, 'কোথায় কোন দলে ভিড়ে গেছে, সে আর আসবে না।'

স্নেহার্দ্র স্বরে ঠাকুর বললেন, আসবে হে আসবে। আমি তাকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলুম, সে আমাকে পাঁচসিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

ষোল আনার চেয়েও বেশি দিয়ে ফেলল। নিস্তর্ক বিশ্বাস আর দুর্বার বিশ্বাসেই দুর্ধর্ষ বিশ্বজয়।

গিরিশ আর অমৃতলাল বসু একসঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেছে থিয়েটার।

বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়াল গিরিশ। মাকে প্রণাম করল।

অমৃতলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি প্রণাম করলে না ?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।'

'না।'

গিরিশ কোনো কথা কইল না। যেমন হাঁটছিল হাঁটতে লাগল।

শোভাবাজারের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের কাছে এলে গিরিশ আবার প্রণাম করল হেঁট হয়ে।

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল অমৃত।

এগিয়ে চলল দু'জনে। গিরিশ জিজ্ঞেস করলে, 'ওখানে ঘাড়টা অমনি ফিরিয়ে ছিলে কেন ?

অমৃত বললে, 'ও বাবাঠাকুরটি অপয়া।'

'অপয়া বলে তোমার বেশ বিশ্বাস আছে ?'

'সবাই বলে, কাজেই বিশ্বাস করতে হয়।'

'বেশ তবে ঐ বিশ্বাসটাকেই ঠিক রেখো।' গিরিশ দৃপ্ত স্বরে বললে, 'ইহজীবনে ঐ ঠাকুরের মুখ আর দেখো না। খবরদার, না। কোনোদিন না।'

আর কোনো কথা হল না, কিন্তু একটা খটকা অমৃতের মনে বিঁধে রইল। যদি অপয়া বিশ্বাস করি তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন ?

'বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই।' বলছেন রামকৃষ্ণ: 'পাহাড়ে গুহায় নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে তা হলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতে ভয় নেই।'

গিরিশ তখন থেকে-থেকে মা-মা বলে হুঙ্কার করছে। যখনই ডাক ছাড়ে তখন ছাতিটা ফুলে ওঠে, মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়। বলে, 'বেটিকে গাল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাইব তাই পাব।'

কিন্তু 'মৃণালিনী' নাটকে পশুপতির পার্ট করতে-করতে একদিন তার কী হল, প্রতিজ্ঞা করে বসল, মার কাছে শক্তি চাইব না, কিছু চাইব না, রাজ্যপদ তৃণখণ্ড, অমনি-অমনি শুধু ডাকব। বুঝলে হে অমৃত, কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ নেই, অমনি ডাকো প্রাণ খুলে।

গিরিশের মোটে তখন ত্রিশ বছর বয়েস, স্ত্রী মারা গেল।

বিয়ের দিন নিমতলার এক কাঠগোলায় আগুন লেগেছিল। লেলিহান জিভ মেলে সে আগুন এগিয়ে এল বাগবাজারের দিকে। এগুতে-এগুতে একেবারে গিরিশের বাড়ির খিড়কির বাগানে। সেখানে এক প্রকান্ড তেঁতুলগাছে বাঁধা পড়ল।

এখন মনে হল সে-আগুন তার বাড়ি পর্যন্তই ধাওয়া করেছে।

চিকিৎসার আর বাকি রাখেনি গিরিশ, তবু থাকল না প্রমদা। শোকে ভেসে গেল গিরিশ। আর শোক ভুলতে মদে। আর যখন মদ নেই তখন কবিতায়।

'শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়ে কায় পেয়েছিনু প্রমদায়
ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন!'

তখনো তো বিশ্বাস নেই গিরিশের। তাই তখন তার সমস্তটা শাস্তি, শান্তি নয়।

আগের আপিসের ফেল পড়বার উপক্রম, গিরিশ ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানিতে গিয়ে ঢুকল। মালা-খরিদের কাজ। আর তারই জন্যে গিরিশকে যেতে হল ভাগলপুর। কিন্তু দূরে চলে গেলেও তুলতে পারল না সেই নিকটকে। কলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন সমস্ত চুরি হয়ে গেল গিরিশের। পরনের কাপড়খানা ছাড়া আর কিছু নেই সম্বল।

'ভাই, দশ টাকা ধার দিতে পারো?' প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হাত পেতে। দুঃখের কাহিনীটা ব্যক্ত করলে।

প্রতিবেশী বললে, 'দশ টাকা ধার দিতে পারি না, পাঁচ টাকা ভিক্ষে দিতে পারি।'

কান দুটো গরম হয়ে গেল গিরিশের। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, পাঁচটা টাকাই নিয়ে এল ভিক্ষে করে। অতি দুঃখেও গিরিশের চোখে জল আসে না, কিন্তু এখন তার চোখে জল দাঁড়াল।

ক'দিন পরে সেই লোকটি কলকাতায় এসেছে। খবর পেয়েই গিরিশ দেখা করতে গেল। পাঁচ টাকা বার করে এগিয়ে ধরল ভদ্রলোকের দিকে, বললে, তোমার সেই টাকা কটা—'

ভদ্রলোক হাসল। বললে, 'ও টাকা তো তোমাকে আমি দান করেছি। তার

আবার ফেরত কী।'

একটা লাগসই তীক্ষ্ণ উত্তর গিরিশের জিভে এসেছিল, ফিরিয়ে নিল। যাই হোক উপকার করেছিল তো লোকটা। টাকা পাঁচটা ভদ্রলোকের হাতের কাছে রেখে নমস্কার করে চলে গেল গিরিশ।

অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ গিরিশের বন্ধু। বললে, 'ফ্রাইবার্জার ছেড়ে দাও। বারে বারে বাইরে যেতে হলে শরীর টিকবে না।'

'কিন্তু ছাড়বো তো যাব কোথায়?'

'বলো তো 'ইণ্ডিয়ান লিগে' ঢুকিয়ে দিই।'

ইণ্ডিয়ান লিগে হেড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার হয়ে এক বছর কাজ করল গিরিশ। তারপর পার্কার কোম্পানিতে বুক-কিপার হয়ে ঢুকল।

'শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে পত্নীহীন।' নিজের কথা বলতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে গিরিশ। কিন্তু যৌবন তার এখনি চলে গিয়েছে কি? না, যায় নি। তাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করল গিরিশ। স্ত্রীর নাম সুরতকুমারী। ঘরে খানিক বোধহয় শ্রী এল, শান্তি এল। গিরিশের মন পড়ল গিয়ে আবার থিয়েটারে।

স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' দেখতে এসেছেন ঠাকুর। বিডন স্ট্রিটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার সেখানেই আগে স্টার থিয়েটার ছিল।

অভিনয়ের শেষে রঙ্গমঞ্চের বিশ্রামঘরে এসে বসেছেন। গিরিশ, নরেন আর মাস্টার আশেপাশে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যতীন দেবও উপস্থিত।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন গিরিশকে, 'এ থিয়েটার কার? তোমার না তোমাদের?'

গিরিশ বললে, আজ্ঞে, আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো। আমার বলা ভালো নয়।'

'সবই থিয়েটার।' বলে উঠল নরেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক। বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও অবিদ্যার।'

'সবই বিদ্যার।' নরেন বললে গম্ভীর স্বরে।

'হ্যাঁ, তাই, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের পক্ষে দুইই আছে, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া। তুই একটা গান গা।'

নরেন গান ধরল। গান শেষ হবার পর ঠাকুর বললেন, 'কই দেবেন আসেনি?'

গিরিশ বললে, 'না, আসেনি। তার অভিমান হয়েছে।'

'কেন, কিসের অভিমান?'

'সে বলেছে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর— আমরা এসে কী করব?'

'তার বুঝি নরেনের উপর হিংসে! কই আগে তো এমন ছিল না।'

জলখাবার এল, ঠাকুর খেতে লাগলেন। নরেনকেও খাইয়ে দিলেন।

যতীন দেব খেপে উঠল। বললে, সব সময় কেবল নরেন্দ্র খাও, নরেন্দ্র খাও,

নরেন্দ্র খাও,—আমরা শালারা ভেসে এসেছি।'

'ওরে, তোর কথা বলছে।' নরেনের দিকে সস্নেহে তাকালেন ঠাকুর। পরে যতীনের থুতনি ধরে আদর করতে-করতে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাস্, সেখানে খাস্।'

এর পর আবার বিবাহবিভ্রাট হবে। সেদিন শোনেন নি, আজ শুনবেন।

গ্রেট ন্যাশনালকে নিয়ে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে ভুবনমোহন। হিসেবপত্রের বালাই নেই, এক রাত্রি বেশি বিক্রি হল তো পান-ভোজনেই ফুঁকে দাও। পৈত্রিক বিষয় মায়ের নামে, হ্যাণ্ডনোট কাটা ছাড়া টাকা-সংগ্রহের পথ নেই। তাছাড়া ছদ্মবেশী বন্ধুরাই এখন মহাজন। এক হাজার দাদন করে হ্যাণ্ডনোটে লিখিয়ে নিচ্ছে দু'হাজার। ধারের থেকে উদ্ধার পাবে কি করে?

বেঙ্গলের দেখাদেখি অভিনেত্রী আমদানি করল। পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে—রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, যাদুমণি আর হরিদাসী। এবার তবে গ্রেট ন্যাশনালকে পায় কে? বেঙ্গলের 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকই নতুন করে চালাল গ্রেট ন্যাশনাল। ভীষণ জমে গেল। এত জমে গেল যে দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে—দিল্লী-লাহোর-মিরাটে। সঙ্গে নিয়ে গেল বিনোদিনীকে, রাধিকার পার্টে। বিনোদিনীর মা কিছুতেই মেয়েকে একা ছাড়বে না, সেও সঙ্গ ধরল।

লাহোরে গোলাপ সিংকে কে না জানে। বিরাট বড়লোক, ডাক-নামও রাজা। বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, ঐ মেয়েটিকে চাই। বিনোদিনীর মা চোখে অন্ধকার দেখল। বিপদ যে বাইরে থেকে আসতে পারে এ ভাবেনি। কিন্তু যাই হোক, তাকেই ঠেকাতে হবে।

গোলাপ সিংএর লোক বললে, 'তুমি ভড়কাচ্ছ কেন? রাজাসাহেব তোমার মেয়েকে দস্তুরমত বিয়ে করবেন। বিয়ে করে রানী বানাবেন।'

ও একই কথা। বিনোদিনীর মা রাজী হলনা কিছুতেই। থিয়েটারের ধর্মদাসকে বললে, 'লাহোরে আর কাজ নেই। শিগগির ফিরে চলুন কলকাতায়। নয়তো আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিন। যাতে জোর করে না ছিনিয়ে নেয়, পুলিশে খবর দিয়ে রাখুন। নইলে আমি নিজেই থানায় যাই।'

দলবল নিয়ে ধর্মদাস তাড়াতাড়ি চলল মিরাটে। বিনোদিনী রক্ষা পেল।

'সতী কি কলঙ্কিনীর' পর গ্রেট ন্যাশনাল ধরল জ্যোতি ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম'। কিন্তু পঞ্চকন্যার মধ্যে নায়িকা সাজবে কে? পরীক্ষা হোক। নাটকের এক জায়গায় নায়িকার মুখে কথা আছে—'পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ।' ও কথাটা যে একসঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারবে সেই পাবে নায়িকার পার্ট। পরীক্ষা দাও। বলো—'পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ।' সব চেয়ে ভালো পারল ক্ষেত্রমণি। অতএব সেই নেবে নায়িকা ঐলবিলার ভূমিকা।

এততেও লাভের অঙ্ক ডুমুরের ফুল হয়েই রইল। দিল্লী-লাহোর করে অনেক টাকা কামিয়েছিল ধর্মদাস, কিন্তু হিসেব যা দিল ভুবনমোহনকে, তার চেহারা নিতান্ত কাহিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত। লাহোরে একদিন কাশ্মীরের মহারাজা অভিনয়

দেখতে এসেছিল। অভিনয় দেখে অপরিসীম খুশি হয়ে অজস্র পুরস্কার দিল সকলকে—শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর, আরো কত-কী বহুমূল্য জিনিস। পুরস্কার বাবদ ধর্মদাস ভুবনমোহনকে সাধারণ একটা রুমাল ও পাথরের ছোট একটা রেকাবি মাত্র দিল। রহস্য প্রকাশ হতে দেরি হল না। ফলে শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যেকে থিয়েটারের ইজারা দিয়ে দিল ভুবনমোহন। নামল ধর্মদাস।

কিন্তু কৃষ্ণধন সুবিধে করতে পারল না। ভুবনমোহন আবার নিল নিজের হাতে, উপেন্দ্রনাথ দাস ডিরেক্টর আর অমৃতলাল বসু ম্যানেজর। নামাও আবার 'পুরুবিক্রম'। রঙ্গমঞ্চে সেই জাতীয়তার গান আবার ধ্বনিত হোক : 'জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়। নামাও 'সরোজিনী'। ধ্বনিত হোক ক্ষত্রিয় নারীদের জহরব্রতের গান : জ্বল্ জ্বল্ চিতা জ্বল্রে দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।'

সঙ্গে একটি প্রহসন জুটল—'গজদানন্দ'।

সপ্তম এডওয়ার্ড তখন যুবরাজ, ভারতদর্শনে কলকাতা এসেছে। বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুর দেখতে তার ভীষণ সখ, কিন্তু কে আছে তাকে আহ্বান করে? হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজী হলেন। তাঁর বাড়ির মহিলারা হিন্দু পদ্ধতিতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করে যুবরাজকে সংবর্ধনা করলেন।

আর যায় কোথা! সমস্ত কলকাতা নিন্দায় সহস্রমুখ হয়ে উঠল। হেমচন্দ্র 'বাজীমাৎ' লিখলেন। 'বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পোঁ, খেললে ভালো চোটে।' উপেন দাস প্রহসন লিখল 'গজদানন্দ', আর তাতে গান বেঁধে দিল গিরিশ। 'জজ হতে চাও গজ গিরিধন'। 'গজদানন্দের' অভিনয় বন্ধ করে দিল পুলিশ। নাটকের নাম বদলে রাখা হল 'হনুমান চরিত্র'। পুলিশ সেটাও নিষিদ্ধ করে দিল। শুধু নিষেধে হবে না, পুলিশ ঠিক করল প্রতিশোধ নেবে। শিক্ষা দেবে থিয়েটারওয়ালাদের।

আগে 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামে একটি নাটক হয়ে গিয়েছিল, পুলিশ সেটাকে অশ্লীল বলে সাব্যস্ত করল। বার করাল ওয়ারেন্ট। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও অভিনেতা কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

'সতী কি কলঙ্কিনী' প্লে হচ্ছে, পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট দলবল নিয়ে এসে পড়ল হুড়মুড় করে। ডিরেক্টর উপেন দাস, ম্যানেজার অমৃত বোস আর অভিনেতাদের মধ্যে মতিলাল সুর, বেলবাবু, শিব চাটুজ্জে, গোপাল দাস, গানের মাস্টার রামতারণ সান্যালকে গ্রেপ্তার করলে। ভীষণ হুলুস্থূল পড়ে গেল। দর্শকের দল পালাল ছত্রভঙ্গ হয়ে। অভিনেত্রীরা কাঁদতে লাগল চেঁচিয়ে।

উপেন ধমকে উঠল সকলকে। কী এমন ঘটেছে যে সবাই একেবারে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছ? সমস্ত দায়িত্ব আমার। আর কারুরই কোনো জবাবদিহি নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? যদিও ওয়ারেন্ট নেই তবু ধর্মদাস সুর স্টেজের

উপরে সিলিংএ উঠে লুকিয়েছে। মতিলাল পালাচ্ছিল ঝাঁকামুটে সেজে, পুলিশের চোখ এড়াতে পারল না।

'গিরিশ ঘোষ কই?'

'থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।' বললে উপেন।

'এসেছিল আজ এখানে?'

'এসেছিল, কিন্তু তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বার আগেই চলে গিয়েছে।'

বিচারে আর সকলে ছাড়া পেল, দোষী সাব্যস্ত হল উপেন আর অমৃতলাল। দুজনেরই একমাস করে সশ্রম কারাবাস।

মোশন হল হাইকোর্টে। ফিয়ার আর মার্কবির সামনে। সাহেবরা নাটকে অশ্লীলতার বাষ্পও দেখতে পেল না। দণ্ডাদেশ নাকচ করে দিল।

তবু মোশন করতে সামান্য যেটুকু দেরি, উপেন আর অমৃতকে তিন দিন থাকতে হল জেলে। তারপর এল অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ-আইন। বন্ধনের পর আরেক বন্ধন। ইচ্ছামত নাটক করার আর স্বাধীনতা রইল না। দেশ বা সমাজের কোনো বেদনা-বঞ্চনার কথা বলা যাবে না। তবে আর কী। শুধু গীতিনাট্য চালাও। রাধামাধব হালদার লিখে দিল গীতিনাট্য। চলল না। আট আনার গ্যালারিতেও বিশেষ লোক নেই।

গিরিশ গান বাঁধল : 'আমায় ফিরিয়ে দে না আধুলি—
কি ঠকানটা ঠকালি।

আবার : 'ও রাধানাথ বাঁশরী কই?
তোমার কোথায় গেল চুড়োধড়া।
কোচঁড়ভরা মুড়কি খই?'

ভুবনমোহন ঠিক করল থিয়েটার আবার ইজারা দেবে। কিন্তু লোক কই?

গিরিশ বললে, 'আমাকে দাও।'

শুধু উল্লসিত নয়, নিশ্চিন্ত হল ভুবনমোহন। তিন বছরের জন্য থিয়েটার ভাড়া দিল গিরিশকে। গিরিশ প্রথমেই গ্রেট ন্যাশনালের গ্রেট বাদ দিল। বিশুদ্ধ নাম হল : ন্যাশনাল থিয়েটার। আর নাটক নির্বাচন করল মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'।

গিরিশ একাই মেঘনাদ আর রাম।

তরঙ্গায়মান শব্দে আবৃত্তি করছে নরেন :

'ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মণ, নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়।'

তারপর বিভীষণকে বলছে :

'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভুনিভ

কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?'

'কী ভীষণ একটা নেমকহারাম !' সতেজে বলে উঠল নরেন, 'ট্রেইটর ! বংশটা ছারখার করল। নিজের কাছে নিজের বংশমর্যাদা নেই ? ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট হয়ে গেল ?'

আর প্রথম অভিনয়ের রাত্রে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গিরিশ কবিতা পড়লো :

'সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জন ;
ঝুনু ঝুনু নাহি আর কঙ্কণের ঝনৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন ।।'

৭

বেঙ্গলে যখন 'মেঘনাদবধ' প্লে হত তখন কী হত ? মন্দোদরীর থেকে যুদ্ধে যাবার আগে বিদায় নিচ্ছে মেঘনাদ। 'কেন মা ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে, রক্ষোবৈরী।' মেঘনাদের ভূমিকায় নামত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তরবারি কোষমুক্ত করে সবেগে ঢুকতো স্টেজে—হুঙ্কার করে উঠত। একবার কী হল ? খোলা তলোয়ারে মন্দোদরীর হাতের তাবিজের সুতো কেটে গেল। ছিটকে পড়ল তাবিজ।

সে এক মহাকেলেঙ্কার !

কিন্তু ন্যাশনালে গিরিশের মেঘনাদ কী রকম ? বীর ও মাতৃভক্ত পুত্রের যেমন হতে হয়। বিনয়, বীর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। আবার এদিকে মায়ের প্রতি স্নেহশীল। ব্যাকুল মায়ের আশঙ্কা দূর করবার জন্যে দৃঢ়তা। তারপর পূজাগারে লক্ষ্মণ যখন প্রথম ঢোকে তখন মেঘনাদের সে কী সৌম্য প্রশান্ত ভাব, আবার ক্ষণপরেই রোষক্ষিপ্ত বহ্নিমূর্তি, 'ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে লক্ষ্মণ—' যে দেখেছে সেই মুগ্ধের অধিক হয়ে গিয়েছে।

তারপরে আবার রামের পার্ট। দ্বন্দ্বের মধ্যেই তো গিরিশের জীবনের নাটিকা।

রামরূপে লক্ষ্মণকে বিদায় দিচ্ছে গিরিশ। লোকে শুনছে আর কাঁদছে।

তারও অধিক হয়ে গেল সেদিন।

দোতলায় চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা দেখছে। সেদিন কী হল, চিক ছিঁড়ে পড়ল হঠাৎ। কিন্তু অভিনয়ের গুণে সবাই এত তন্ময় যে কোনো গোলমাল হল না কোথাও। মেয়েদের খেয়াল নেই যে চিক নেই আর পুরুষদেরও খেয়াল নেই রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখবার আছে অন্যদিকে।

মাইকেলের পর নবীন সেনকে ধরল গিরিশ। মেঘনাদবধের পর 'পলাশীর যুদ্ধ'। গিরিশ ক্লাইভ সাজল আর বিনোদিনী সাজল ইংলন্ড-রাজলক্ষ্মী।

'দ্রুম করে দূরে তোপ গর্জিল অমনি—আপনার ঐ লাইনটা ভালো হয়নি।'

নবীনকে গিরিশ বললে সরাসরি: 'ওটা তো বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড থেকে নেওয়া, তাই না?'

'তাই।' স্বীকার করল নবীন।

অনুবাদটা ভালো হয়নি।'

'আপনি হলে কী রকম করতেন?'

'মুখে-মুখে বায়রনের অনুবাদ করা সোজা নয়।' গিরিশ এক মুহূর্তে চিন্তা করল, তারপর বললে, 'নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জন, অস্ত্র ধরো কামান ভীষণ॥ এ রকম করলে মন্দ হয় না।'

'চমৎকার হয়।' নবীন জড়িয়ে ধরল গিরিশকে। ডাকল ভাই বলে।

মুখে মুখে কবিতা বাঁধতে ওস্তাদ গিরিশ। অফিসের পথে বেরিয়েছে, এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ধরল। আগের চেনা, গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'ভাই, বেয়াইবাড়িতে লিচু পাঠাচ্ছি, তোমায় একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।'

'লিচুর কবিতা! সে কী কথা!'

'হ্যাঁ ভাই, কটা লাইন না লিখে দিলেই নয়।' ভদ্রলোক পেড়াপেড়ি করতে লাগল: 'তুমি বরং বলে যাও, আমি লিখে নি।'

গিরিশ তখুনি বেঁধে দিল কবিতা:

'সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু
সবিনয় নিবেদন পাঠাতেছি কিছু।
দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে,
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে বেঁটে।
সুরস রসেতে যদি রসে তব মন,
জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন॥'

'ভাইজী!' তেরো নম্বর বোস পাড়া লেন থেকে গিরিশ চিঠি লিখছে নবীন সেনকে, রেঙ্গুনে: 'আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই তুমি জানো আমি একটা বাউণ্ডুলে—তুমি আপনার গুণে আমায় মাপ কোরো। তুমি জানো কিনা জানিনা আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অন্য কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে মনে তোমায় পরম বন্ধু বলে জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নেই যে পড়ে। যার হস্তাক্ষর সে আমার সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে বসে লেখে। আমি যে যে কথা বললুম তা যে আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী।'

উত্তরে লিখছে নবীন সেন: 'হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি তোমার কনিষ্ঠ কি

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।'

'আম গেলে আমসি, যৌবন গেলে কাঁদতে বসি।' লিখছে গিরিশ : 'যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিল ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। এখন এ দূরদেশ ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছে করে। তোমার তো পত্র লিখতে ক্লান্তি নেই। যদি মাঝে মাঝে লেখো, শোবার সময় পাঠ করে শুতে যাই। সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনো আছি। মীরকাশিম নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বাজারে ওর সুখ্যাতি শুনছি। যে-কয়রাত্রি অভিনয় হয়েছে লোকেরও যথেষ্ট ভিড়। ব্রাহ্মরা পর্যন্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নয়। আমার ছেলে দানি মিরকাশিমের অংশ নিয়েছিল, তার সুখ্যাতি একবাক্যে। মীরকাশিম ছাপাখানায় পাঠিয়েছি, তবে কতদিনে প্রুফ দেখে উঠতে পারব, তা আমার আমিরি মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জানো—নেভার টু ডু টু-ডে হোয়াট ইউ ক্যান পুট অফ টিল টুমরো—এই আমার মটো। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক তার কল্যাণে নেহাৎ আমিরিটা চলবে না বেশি দিন। আমি তো হাঁপে ভুগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক দানির কথা বললুম, আর তো কারও কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার পরিবারবর্গ ছেলেপুলের সংবাদ লিখবে। সকলের শুভ সংবাদ শুনলে একটু মনটা খুশি হবে, ভাববো, যা হোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু শান্তিতে দিন কাটায়। বন্ধুবান্ধব তো বেশি নাই—এ একজনের সঙ্গে তবু কথা কই। কবিগিরি কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝছি, বলি—একটু দৃষ্টি খোলে, তাতে একটু আনন্দ আছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি খুলে আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয় বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব শোধরালো না।'

আশ্বিন মাসে পুজো উপলক্ষে গিরিশ 'আগমনী' লিখল, আর 'আগমনী' নামাবার চারদিন পরেই আবার নতুন নাটক 'অকালবোধন' সুরু করল। মেতে উঠল কলকাতা। সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল 'আগমনীর' গান : 'ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই। এবার জামাই এলে বলব তারে উমা আমার ঘরে নাই।'

ছোট ভাই অতুল, হাইকোর্টে নতুন উকিল হয়েছে, গিরিশকে এসে বললে, 'অসম্ভব। এভাবে পারে না চলতে।'

গিরিশ চোখ তুলে তাকাল।

'তার চেয়ে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো।'

'কেন, কী হল?'

'তুমি থিয়েটার চালাবে কী! পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। আর তুমি তলিয়ে যাবে লোকসানে।'

'কেন, আমার কি চোখ-কান নেই? আমি কি আকাট?'

'তুমি দিনে আফিসে কাজ করো, রাত্রে হয় বই লেখ, নয় রিহার্সাল দাও,

নয়তো থিয়েটার করো। তোমার ব্যবসা দেখবার সময় কোথায়? ভুবনমোহনবাবু এত হুঁসিয়ার, তিনি পর্যন্ত দেনার দায়ে ডুবলেন। তোমার না সেই দুর্দশা হয়!'

'টিকিট কী রকম বিক্রি হচ্ছে তা দেখেছিস?'

'দেখেছি। ওরকম হয় মাঝে মাঝে।' অতুলের চোখেমুখে তীব্র অবিশ্বাস: 'কিন্তু তোমার সাধ্য নেই সময়ও নেই যে সব দিক আগাগোড়া সামলাতে পারো। শেষকালে ধারেকর্জে তলিয়ে গিয়ে এজমালি সম্পত্তি না বিপন্ন করে বোসো।'

'কটা দিন দ্যাখ না—'

'দরকার নেই দেখে। তার চেয়ে সময় থাকতে পার্টিশন করে নাও।'

এই কথা? গিরিশ এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন। পরে বললেন, 'যা, নেব না থিয়েটার।'

'নেবে না মানে?'

'থিয়েটার করব, কিন্তু তার ভার নেব না। মানে য়্যাকটর হব, প্রোপ্রাইটর হব না। বড়জোর, মাইনের মধ্যে থাকব, লাভের মধ্যে যাব না। কী, হল?' অতুলের কাঁধে হাত রাখল গিরিশ: 'কি, এবার নিশ্চিন্ত হলি?'

কথা রেখেছে গিরিশ। শ্রমিক হয়ে রয়েছে, মালিক হয়নি। মাইনেই খেয়েছে, মুনাফার ঘরে থাবা বসাতে চায়নি। আমার শিল্পই বড় হোক, ধর্মই বড় হোক, তুচ্ছ মালিকানা নিয়ে আমি কি করব?

এই অতুলকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শোনালেন তাদের বাড়িতে: আত্মীয় কালসাপ আর সংসার পাতকুয়ো।'

'আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে।' অতুলকে বললেন ঠাকুর, সংসারও করবে, ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।'

এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, জিজ্ঞেস করলে, ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয়?'

'কেন হবে না? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল—এ সব আছে।'

'এক জন্মে কি হয়?'

'তাঁর দয়া হলে কী না হয়!' বললেন ঠাকুর, 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায়? একেবারে একসঙ্গে আলো হয়।' লক্ষ্য করলেন অতুলকে: 'আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন। কী, অমন আঁট বুঝি হয় না—ব্যাকুলতা?'

অতুল নিশ্বাস ফেলল। বললে, 'মন কই থাকে?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না। রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে, তাহলে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'কেবল রাত-দিন বিষয়কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? যদু মল্লিক

আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত। আজকাল আর তত বলে না, রাতদিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, আর কেবল বিষয়ের কথা বলে।'

ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিল গিরিশ। এবার ভার নিল দ্বারকানাথ দেব। কয়েকমাস পরে দোয়ারীবাবু ছেড়ে দিলে কেদার চৌধুরী ইজারা নিলে।

দীনবন্ধু-মাইকেলের পর বঙ্কিমের যুগ পড়েছে।

কেদার চৌধুরী গিরিশকে 'বাদশা' বলে ডাকে। বললে, 'বাদশা, তুমি বিষবৃক্ষখানাকে নাটক বানিয়ে দাও আর তুমি নিজে নগেন্দ্রনাথ সাজো। আর বিনোদিনীকে কুন্দনন্দিনী হতে বলি।'

তথাস্তু। বিষবৃক্ষ অমৃতফল প্রসব করল। জমজমাট হয়ে উঠল ন্যাশনাল।

'বাদশা, এবার তবে দুর্গেশনন্দিনী ধরো। তুমি জগৎসিংহ, আর তিলোত্তমা আর আয়েষা দুই ভূমিকাতেই বিনোদিনী।' কেদার আবার গিরিশের দুয়ারে এসে ধর্না দিলে।

গিরিশ বললে, 'ঠিক আছে।'

ন্যাশনালের আবার জয়ধ্বনি উঠল, কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হল না সৌভাগ্য, গিরিশ পড়ে গেল স্টেজের উপর। আসমানি বিদ্যাদিগগজের ঘরে ঢুকে খিচুড়ি খাচ্ছে আর বিদ্যাদিগগজকেও খাওয়াচ্ছে—এই একটা দৃশ্য আছে। ফুটি চটকে খিচুড়ি দেখানো হত। ঐ খিচুড়ি খাওয়ার দৃশ্যের পরেই জগৎসিংহের প্রবেশ। এক টুকরো ফুটির খোসা পড়ে ছিল স্টেজে, জগৎসিংহের পা পড়ল সেই খোসার উপর। আর যায় কোথা? পা হড়কে বিরাটভাবে পড়ে গেল জগৎসিংহ। দর্শকেরা হায় হায় করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গেই ড্রপ পড়ে গেল। গিরিশের বাঁ হাতের কব্জি গুরুতর ভেঙে গিয়েছে। তিন তিন মাস থিয়েটার-ছুট হয়ে রইল গিরিশ। বিক্রি যাচ্ছেতাই কমে গেল। সভাপতি ছাড়া সভা চলে, গিরিশ ছাড়া থিয়েটার চলে না।

অতুল ঠিক বলেছিল, কেদারবাবুও রাখতে পারল না, গোপীচাঁদ কেঁইয়া, মাড়োয়ারী, সাব-লিজ নিলে।

কলকাতার বাজার নিস্তেজ, চলো ঢাকায় যাই দল নিয়ে।

কিন্তু ঢাকায় পোস্টার পড়ল, ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা, তাই ওই থিয়েটার দেখতে যাওয়া কোনো ছাত্রের কর্তব্য নয়। যদি তবু কোনো ছাত্র যায় তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ন্যাশনালের অবস্থা তখন প্রায় বারোটা বাজার কাছাকাছি। 'সাবিত্রী' নাটকে বারাঙ্গনা সাবিত্রী সাজবে এ অসহ্য।

ঢাকা থেকে সুরু করে অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত কাশী এল ন্যাশনাল। ম্যানেজার অবিনাশ করকে গোপীচাঁদ বললে, 'তুমি পারো তো চালাও গে থিয়েটার, আমি আর ফিরছি না।'

অবিনাশ থেকে ভার নিলে কালিদাস মিত্তির। কালিদাসও ফেল মারল। এবার লংকাবাবু, যোগেন মিত্তির এলেন। তিনি আবার দর্শকদের উপহার দেওয়া

সুরু করলেন। আয়না-রুমাল-সাবান-সেণ্ট তো বটেই, আংটি-ইয়ারিং পর্যন্ত। গ্যালারি আর পিটের দর্শকের সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে লাগল। কিন্তু কত আর উপহার দেওয়া যায়! চরম করলেন ফুটি-তরমুজ-লাউ-কুমড়ো উপহার দিয়ে।

অতুল ঠিকই বলেছিল, দেনার দায়ে ন্যাশনাল নিলেমে উঠল। আর কোর্ট-সেলে প্রতাপচাঁদ জহুরি কিনে নিল এক ডাকে। প্রতাপচাঁদ জানে কী করে ব্যবসা চালাতে হয়, দোরস্ত রাখতে হয় খাতাপত্র। কাকে রাখতে হয় সর্বাঙ্গীণ ম্যানেজার।

গিরিশকে বললে, 'আপনি আসুন। পুরোপুরি ভার নিন। ন্যায্য মাইনে দেব আপনাকে।'

'বেশ তো, আগে যেমন করতাম, সন্ধ্যের পর আফিস থেকে ফিরে এসে, তেমনি অভিনয় করব। বলেন তো শেখানো, তাও শেখাব। কিন্তু মাপ করবেন, গিরিশ বললে 'করজোড়ে, 'মাইনে নিতে পারব না। আগে যেমন বিনা-টাকায় করেছি এখনো তাই করব।'

প্রতাপচাঁদ বাস্তবদর্শী। বললে, 'মশাই, একসঙ্গে দু নৌকোয় পা দেওয়া চলবে না। আফিস আর থিয়েটার—আফিস ছেড়ে আপনাকে পুরোপুরি থিয়েটারে ভিড়তে হবে। আসুন আমি আপনাকে একশো টাকা মাইনে দেব।'

'আমি যেখানে কাজ করছি—পার্কার কোম্পানি—সেখানে দেড়শো টাকা পাচ্ছি।'

'আমার কাছে আপাতত একশো নিন, থিয়েটারে আয় বাড়লে আপনারও মাইনে বাড়বে।'

গিরিশ ছেড়ে দিল চাকরি। পঞ্চাশ টাকা ক্ষতিস্বীকার করে প্রতাপচাঁদের আশ্রয় নিলে। কেন? শুধু থিয়েটারকে ভালবাসে বলে। নাটকরচনার সফলতর সুযোগ পাবে বলে। নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করবে বলে।

পার্কার গিরিশকে ঠেকাতে চাইল। 'বেশ তো, যখন খুশি তুমি আফিসে আসবে যখন খুশি চলে যাবে, কেউ কিছু বলতে আসবে না। তুমি থাকো। আফিসও করো থিয়েটারও চালাও।'

'না সাহেব, আর ফাঁকির কারবারে থাকব না। এবার দেশসেবা করি। লোকশিক্ষার কাজে লাগি।'

হ্যাঁ, থিয়েটারের ভিতর দিয়েই আমার দেশসেবা। লোকশিক্ষা। নবীন সেন লিখছেন গিরিশকে: ভাই গিরিশ, আমার অনুরোধ তুমি সাত দিনে এসব না করিয়া কিছু বেশীদিন সময় লইয়া আমাদের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরি-বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি কমিকো-ট্র্যাজিক নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। আমার পিড়াপিড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার

হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃতফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি 'আনন্দমঠে' দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।'

গিরিশের বাড়ি আসছেন রামকৃষ্ণ। দ্বারপ্রান্তে গিরিশ দাঁড়িয়ে। ভক্তসঙ্গে যেই ঠাকুর সমীপস্থ হলেন, গিরিশ দণ্ডের মত সামনে পড়ল। ঠাকুর বললেন, 'ওঠো', তখন উঠল। দোতলার বৈঠকখানায় নিয়ে এসে বসাল সবাইকে।

ঠাকুর দেখলেন একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। বললেন, 'ওটাকে সরিয়ে নাও। ওটাতে শুধু বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা। শুধু কূটকচাল।'

ঠাকুরের অমৃতকথা শুনতে-শুনতে সবাই বিভোর হয়ে রয়েছে। রাত যে কত হয়ে গেছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ গিরিশ হরিপদকে বললে, 'ও ভাই হরিপদ, একখানি গাড়ি যদি ডেকে দিস্—থিয়েটারে যেতে।'

'দেখিস যেন আনিস।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে।

সকলে হেসে উঠল।

হরিপদ বললে, 'আমি আনতে যাচ্ছি—আমি আর আনবো না!'

গিরিশ কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'দেখুন কী কর্মবন্ধন! আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইদিক-উদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। ইদিক-উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই।'

'না, না, ও বেশ হচ্ছে।' বললেন ঠাকুর, 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।'

নরেন বিদ্রূপ করে উঠল। মৃদুস্বরে বললে, 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'হ্যাঁ, এই তো মজা। একদিকে ঈশ্বর, আরেকদিকে সংসারকর্ম। একদিকে রাম, আরেকদিকে কাম। আর', বলছেন ঠাকুর, 'কাম না থাকলে তো ঈশ্বর-কামনাও থাকবে না।'

'কাজ করো আর কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখো।'

'কিন্তু আমরা যে পাপী, আমাদের কী হবে?'

'তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়।' বললেন ঠাকুর; 'দেহবৃক্ষে পাপ-পাখি। তাঁর নামকীর্তন আর কিছুই নয়, যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখি পালিয়ে যায়, তেমনি নামকীর্তনে দেহের পাপ চম্পট দেয়। মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকোয়, তেমনি নামকীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জলও আপনা-আপনি শুকিয়ে যাবে।'

ঈশ্বর যাকে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করবার ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন সংসারে, তাকে

সদাগরী আফিসে কে আটকে রাখবে? ছিসেবনিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল গিরিশ। পার্কারের চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দি। সামান্য স্মৃতিচিহ্ন।'

ছোট একটা বাক্স। গিরিশ খুলে দেখল তাতে একটি হীরের আংটি।

দেবেন মজুমদারের ভাই সুরেন মজুমদারের লেখা হাসির নাটক নিয়ে প্রতাপ-চাঁদের থিয়েটার খোলা হল। জমল না। চলল না। তখন গিরিশ নিজেই গীতি-নাট্য লিখলে—মায়াতরু। গানের ঝড় বইয়ে দিল। গায়িকা বিনোদিনী আর বনবিহারিণী। বিনোদিনী ফুলহাসি আর বনবিহারিণী ফুলধুলা।

'না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি!' বিনোদিনীর গাওয়া এই গান সবাইকে মাতিয়ে দিল। 'সাধের' নয়, কথাটা ছিল 'স্বাধীন', কিন্তু যেহেতু বিনোদিনী ভুল করে 'সাধের' গেয়েছে তখন 'সাধের'ই থাকবে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত গানের প্রশংসা করে গেলেন। গায়িকাকে তত নয় যত রচয়িতাকে।

একটা বুঝি বা আধ্যাত্মিক গান ছিল: 'পবিত্র সঙ্গীতরসে মাতাও হৃদয়।' রাজনারায়ণ বসু শুনে বললেন, 'সন্দেহ নেই, রচয়িতা একজন উঁচুদরের কবি, আর আমার বিশ্বাস, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হবেন।'

পর-পর অনেকগুলি নাটক লিখল গিরিশ। একটার নাম 'আনন্দে রহো'। 'আনন্দে রহো'র প্রধান চরিত্র বেতাল। তার বৈশিষ্ট্য—জীবনের সকল অবস্থাতেই সে আনন্দে থাকবার পরামর্শ দিত। প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে অঘটন ঘটায়। সুখে-দুঃখে লাভালাভে সমভাব, সে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী!

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে হয়কে নয় করতে পারে গিরিশ।

থিয়েটারের সামনে হঠাৎ একদিন 'কামিনীকুঞ্জে'র লেখক গোপাল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা।

'কি হে গোপাল, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেল কিসে?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'আর বোলো না। অম্বলের ব্যারামে ভুগছি।'

'তাই প্রথমে চিনতেই পারিনি। কীরকম অম্বল?'

'সাবু-বার্লি খেলেও অম্বল হয়।' গোপাল হতাশ মুখে বললে, 'এখন উপোস করে আছি। মরতে আর দেরি নেই।' নিশ্বাস ফেলল গোপাল: 'এখন মলেই বাঁচি।'

'সে কি কথা!' গিরিশ গর্জে উঠল: 'এখুনি—এখুনি তোমার অসুখ আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

এ কি পরিহাস! গিরিশের মুখের দিকে চেয়ে কষ্টে হাসল গোপাল: 'সারিয়ে দিচ্ছ?'

'এই মুহূর্তে সারিয়ে দিচ্ছি। দেখ না আমার উইল-ফোর্সের কী ফল।' গিরিশ আবার গর্জে উঠল: 'দেখ না আমার ওষুধ খেয়ে।' বলে এক ঠোঙা গরম

কচুরি কিনে আনল। বললে, 'খাও।'

'এই ওষুধ ?'

'হ্যাঁ, এই ওষুধ। পরিতোষ করে এই এক ঠোঙা কচুরি সাবাড় করো।'

'মরে যাব।' প্রায় কেঁদে ফেলল গোপাল।

'গেলে যাবে। এই তো বলছিলে মলেই বাঁচি। না-খেয়ে মরতে, এখন না হয় খেয়েই মরবে। আমার কথায় বিশ্বাস করো। আজ তোমার মৃত্যুর দিন নয়, আরোগ্যের দিন।'

গিরিশের মুখের দিকে অভিভূতের মত তাকাল গোপাল। দিব্যি খেতে লাগল কচুরি। পুরো ঠোঙাটা শেষ করল।

গিরিশ বললে, 'নাও, ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল খাও। তারপর হাঁটা দাও বাড়ির দিকে। দেখবে আর তোমার অসুখ নেই।'

গোপালের আর খোঁজও নিল না গিরিশ।

একদিন থিয়েটারে গোপাল নিজেই এসে হাজির।

'এ কী, তোমাকে আর চেনা যায় না যে!' উল্লাসে লাফিয়ে উঠল গিরিশ।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে গোপাল। হাসিমুখে বললে, 'তোমার ওষুধে অসুখ সেরে গিয়েছে।'

৮

ঘুমোবার আগে গা-হাত-পা টিপিয়ে নেয় গিরিশ। আর, একবার ঘুমিয়ে পড়লে পাথর। কেউ হঠাৎ ঘুম ভাঙালে আর তার রক্ষে নেই। তার অদৃষ্টে মার আছে বেপরোয়া। নতুন চাকর গা টিপছে গিরিশের।

গিরিশ বললে, 'দরজায় খিল দে। কেউ না হঠাৎ দোর খুলে আমার ঘুম ভাঙায়। আমি ঘুমুলে তুই বেরিয়ে যাস আস্তে আস্তে।'

চাকর গা টিপতে লাগল। আরামে ঘুমিয়ে পড়ল গিরিশ! এখন চাকর বেরোয় কি করে! দরজায় খিল যে। আর বাবুর হুকুমেই খিল লাগানো। তবে উপায় ? এদিক-ওদিত তাকাতে লাগল। কোথাও আর কোন ছিদ্র-রন্ধ্র নেই।

'বাবু!' মৃদুস্বরে ডাকল চাকর।

গিরিশ ঘুমে গভীর!

'বাবু!' আবার ডাকল চাকর।

ঘুমে তবু এতটুকু আঁচড় নেই।

'বাবু!' এবার ডাকল তারস্বরে।

মারমূর্তি হয়ে লাফিয়ে উঠল গিরিশ : 'তবে রে, তুই—তুই—'

বেপরোয়া হাত-পা চলবার আগেই চাকর কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, 'আমি বেরোই কী করে ?'

'তার মানে ?' গর্জে উঠল গিরিশ।

,আপনি বললেন, আমি ঘুমিয়ে পড়লে বেরিয়ে যাস। কিন্তু বেরুব কোনখান দিয়ে ? দরজায় যে খিল—'

কৌতুকের দিকটা বুঝল গিরিশ। বললে, 'জানলা নর্দমা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিলি ?'

'করেছিলুম। পারিনি বেরোতে।'

'যা, বেরো।' খিল খুলে দিল গিরিশ।

কিন্তু নিজের ঘরের দরজা খুলে নিজের বেরিয়ে যাওয়া চারটিখানি কথা নয়।

স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসেছেন রামকৃষ্ণ। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বসেছেন বক্সে। একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে, যবনিকা পড়েছে। বালকস্বভাব রামকৃষ্ণের খিদে পেয়েছে। লুচি-তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছে গিরিশ।

দেড়খানা লুচি খেয়েছেন, গিরিশ এসে হাজির। মদে টুপভুজঙ্গ।

বললে, আমাকে একটা বর দাও।

'বর ? কী বর ?' খেতে-খেতে তাকালেন ঠাকুর।

'তুমি আমার ঘরে পুত্র হয়ে জন্মাবে।'

'সে কী, তোর বয়েস হয়েছে কত ?'

'তা যাই-হোক না, তুমি ছেলে হবে কিনা বলো।' চেয়ারের হাতল ধরে গিরিশ ঝুঁকে দাঁড়াল।

'আমার বয়ে গেছে।'

'বটে ?'

'তুমি একটা থিয়েটারের লোক, মাতাল, লম্পট, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোর ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাচ্ছি !'

'তবে তুমি বেরোও, বেরোও আমার থিয়েটার থেকে।' গিরিশ গর্জ্জন করে উঠল।

'সে কী, চলে যাব ?'

'আলবৎ চলে যাবে। তবে তোমাকে থিয়েটার দেখিয়ে আমার লাভ কী ?' বলে গিরিশ গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল। আর সে কী গালাগাল !

হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। টলছে, সামলাচ্ছে, লাল চোখ গোল করে ঘোরাচ্ছে

'এ কী উঠছ না ? ওঠো বলছি।' প্রায় ঘাড়ে হাত রাখে গিরিশ : 'এটা তোমার বাপকেলে থিয়েটার নয়।'

সঙ্গের লোকেরা উঠে পড়ল। পাছে আরো অপমানিত হন সেই ভয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ঠাকুরকে। রাম দত্তের গাড়িতে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন ঠাকুর। শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর কত দূর ? তা মন্দ কী ! সারা রাস্তা ঠাকুর একটাও কথা কইলেন না। পাথর হয়ে রইলেন। সঙ্গের লোকেরাও চুপ করে রইল। কী যে বলা যায় কে বলবে। এ সহ্যের অতীত দুঃখ, সান্ত্বনার অতীত

লাঞ্ছনা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে মুখ খুললেন ঠাকুর। আর্তস্বরে বললেন, 'নোটো নেচো গিরিশ আমাকে দেড়খানা লুচি খাইয়ে থিয়েটার থেকে বার করে দিলে গা ?'

'দেবেই তো।' সঙ্গের কে একজন বললে, 'আপনি ঐ লম্পটটার কাছে যান কেন ?

'যাই কেন ? বাঃ, তাই বলে ও আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করবে ?'

'ঠিক করেছে, উচিত কাজ করেছে।' বলে উঠল রাম দত্ত।

'তুমি এ কথা বলছ ?' ভ্যাবাচাকা খাবার মতন মুখ করলেন ঠাকুর : 'উচিত কাজ করেছে ?'

'একশোবার উচিত।' রাম দত্ত বললে জোর গলায়।

'তার মানে ?'

'মানে সেই কালীয়দমন। কালীয় যখন বিষ ঢেলে সমস্ত যমুনার জল নষ্ট করে দিল আর সেই জল খেয়ে কৃষ্ণের রাখাল আর গরু যখন মরে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয় মারবার জন্যে তেড়ে গেলেন। বললেন, হতভাগা, তুই বিষ ঢেলে আমার এতগুলো রাখাল-গরু মেরে ফেললি, তখন কালীয় কী বলেছিল ?'

কী বলেছিল! ঘরের দেয়াল প্রতিধ্বনি করে উঠল।

'বলেছিল, ঠাকুর, তুমি আমাকে কি সুধা দিয়েছ যে সুধা ঢালব ? তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ তাই ঢেলেছি। তেমনি আপনি গিরিশকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে ও আপনার সেবা করেছে।'

'তা হলে বলতে চাও ওর বাড়িতে আমি আর যাব না ?'

'ককখনো না।' সকলে একবাক্যে ঘোষণা করে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ঠাকুর। পরে গম্ভীর স্বরে ডাকলেন রামকে। বললেন, 'রাম, গাড়ি জোতো। আমি গিরিশের বাড়ি যাব।'

'কার বাড়ি ?'

'আর কার! গিরিশের বাড়ি।'

'যাবেন ? এত গালাগাল অপমানের পরেও যাবেন ?'

'যাব।'

'এখন রাত যে অনেক।' আরেকজন কে বললে।

'তা হোক। সব রাতই ভোর হয়। এও না হয় যেতে-যেতে ভোর হবে।'

কিন্তু কেন, কী হল, কেন হঠাৎ সমস্ত নির্যাতন ভুলে, গলে গেলেন গিরিশের প্রতি ? গিরিশ কী মন্ত্র পাঠাল বাতাসে যাতে তার এত বড় রূঢ়তাও ক্ষমার্হ বলে মনে হল ? রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, গিরিশের বাড়ির দরজায় ঠাকুরের গাড়ি এসে দাঁড়াল। কড়া নড়ে উঠল। গিরিশ, গিরিশ, আমি এসেছি।

ধড়মড় করে উঠে বসল গিরিশ। কে এল ? কে ডাকে ?

দরজা খুলে দেখল, এ কী। যাকে বার করে দিয়েছিল সেই এসে আবির্ভূত হয়েছে। যাকে অপমান করেছিল সেই এসে দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে। ঠাকুরের

পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়ল গিরিশ। এও হয় নাকি ? কী করব বলো, গিরিশ যে অন্তরে বসে কেঁদেছে। দয়া চেয়েছে। ক্ষমা চেয়েছে। চেয়েছে পদচ্ছায়া।

যতক্ষণ থিয়েটারে ছিল, অভিনয়ে ছিল, মাতাল হয়ে ছিল, ততক্ষণ ভুলে ছিল ঠাকুরকে। ততক্ষণ ঠাকুরও কথা বলেননি, শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে সারা পথ নিঃসাড় হয়ে ছিলেন। যেই বাড়ি ফিরে এসে গিরিশ মুখের রঙ তুলে স্বাভাবিক হয়েছে, নেশায় ভাঁটা পড়েছে, ফিরে পেয়েছে নিজের পরিমাপ, অমনি হাহাকার করে উঠেছে—এ আমি কী করলাম ! কাকে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম ! আর সেই সদানন্দ শিশু, সে ধুলো গায়ে মাখল না, হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁদতে লাগল গিরিশ। অনুতাপের আগুনে পুড়তে লাগল দেহমন।

যেই গিরিশ কেঁদেছে অমনি শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। বলে উঠেছেন, রাম, গাড়ি জোতো, আমি গিরিশের বাড়ি যাব।

যেই শুনেছেন আর্তি, আন্তরিকতার ছোঁয়ালাগা আকুলতা, অমনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এক পলক কালহরণ করবারও সময় নেই।

বলছেন, ঈশ্বর কানখড়কে। যত কান্না কেঁদেছিস যত ডাক ডেকেছিস তিনি শুনে রেখেছেন, টুকে রেখেছেন। কান্নার মধ্যে আন্তরিকতার বহিস্পর্শ সঞ্চারিত হয়নি বলেই তিনি সাড়া দেননি। যে মুহূর্তে ডাক আন্তরিক হয়েছে সেই মুহূর্তেই, যে ডাকছে সে যতই অধম হোক অক্ষম হোক পাপী হোক কামার্ত হোক, যাঁকে ডাকছে তিনি ক্ষমাই শুধু বহন করে আনবেন না, নিজে এসে দাঁড়াবেন চোখের সামনে।

অন্তরের অস্ফুট সে কান্না তিনিই শুধু শুনতে পান। অনন্ত মাধুর্যের নিকেতন শ্রীরামকৃষ্ণই চলে আসেন সশরীরে। সংসার-সময়-সাগরে যিনিই একমাত্র ভেলা।

গিরিশ ভেবেছিল, ভোর হলেই নিজে গিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আসবে। সে পথও ঠাকুর অবরোধ করে দাঁড়ালেন। হয়তো ভোর হলে, গিরিশের আবার মতিচ্ছন্ন হত, দক্ষিণেশ্বরের নাম করে বেরিয়ে উঠত গিয়ে হয়তো থিয়েটারে বা বারাঙ্গনার বাড়িতে, আর যাওয়া হত না দক্ষিণেশ্বর।

সেই বিপদের পথও আবৃত করলেন। গিরিশের পালিয়ে যাবার আর পথ কই ? সমস্ত লজ্জামোচনের আচ্ছাদন হয়ে দাঁড়ালেন। শরণাগতি না নিয়ে আর গিরিশ করে কী। যায় কোথায় ?

রামও সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। গিরিশই লিখেছে তার 'রাবণ-বধ' নাটকে, নিজে অভিনয়ও করেছে রামের ভূমিকায় :

শুন শুন জনকনন্দিনী
রঘুকুলবধূ তুমি
করিলাম দুষ্কর সমর—

রাখিতে বংশের মান ;
ছিলে দশ মাস রাক্ষসের ঘরে
অযোধ্যা নগরে
না পারিব লইতে তোমারে
না পারিব কুলে দিতে কালি,
যথা ইচ্ছা করহ গমন।

বিনোদিনী সীতা সেজেছে। উত্তরে বলছে :

কোন দোষে অপরাধী শ্রীচরণে ?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি ?
কহি চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী করি—
সাক্ষী মম দিবস-শর্বরী
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর।
সাক্ষী পবননন্দন হনু
সাক্ষী বিভীষণ—
সাক্ষী, নাথ, তোমার অন্তর

তবু, কই, সীতাকে গ্রহণ করল না রাম। প্রত্যাখ্যান করে দিল।

'রাবণ-বধে'র পর 'সীতার বনবাস' লিখল গিরিশ। নাটকখানা বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করল : 'গুরুদেব দীননাথ, মাতৃভাষা জানি না বলা ভালো নয়, মন্দ। মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। আচার্য ! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে-মনে বন্দনা করি।'

'সীতার বনবাসে'ও রাম গিরিশ। বিনোদিনী এবার লব, কুসুমকুমারী কুশ। ভীষণ জমল থিয়েটার, স্ত্রী-দর্শকদের আসন বাড়াতে হল। সবচেয়ে বেশি মাতিয়েছে লবকুশ।

প্রতাপ জহুরি খুব খুশি। গিরিশকে বললে, 'পরে যখন আবার কিতাব লিখবেন তখন ওই দুই ছোকরাকে ঢুকিয়ে দেবেন।'

'কোন দুই ছোকরা ?'

'ঐ আমাদের বিনোদ আর কুসুম। মানে ঐ লবকুশ।'

'যে নাটকই লিখি না, লব-কুশ ঢোকাতে হবে ?'

'মানে, ঐ আর কি, বিনোদ আর কুসুমকে ছোকরা সাজিয়ে ছেড়ে দেবেন স্টেজে।' সমজদারের মত হাসল প্রতাপ : 'সিধে ছুকরির চাইতে ছোকরার পোশাকে ছুকরির বেশি খুবসুরৎ। তাছাড়া বিনোদ আমার জাদুকরী।'

কিন্তু বেশিদিন টিকল না জাদুবিদ্যা। তবলা বাজায়, বিধুমৌলি বাগচি, থিয়েটারেই একখানা ঘর নিয়ে থাকে। কী খেয়াল হল প্রতাপচাঁদের, হুকুম দিল অভিনয় বা মহড়ার পর কেউ থাকতে পারবে না থিয়েটারে।

ফলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হল বিধুকে। আর যায় কোথা। সন্ধেয় এসে প্রতাপ দেখে থিয়েটার ফাঁকা, কোনো অভিনেতারই দেখা নেই। কী ব্যাপার? ব্যাপার বিধুমৌলি।

গিরিশের বাড়িতে ছুটে এল প্রতাপচাঁদ। এ যে দেখি আরেক রকম ভেলকি। ভরা-ভরতি থিয়েটার একদম খাঁ-খাঁ করছে।

চাকরকে জিগগেস করলে প্রতাপ, 'বাবু ঘরমে হ্যায়?'

'বাবু নেই হ্যায়।'

চাকর নয়, কে আরেকজন উত্তর দিল। আর উত্তর দিল মুখোমুখি নয়, উপর থেকে যেন আকাশবাণী হল। উপর দিকে তাকাল প্রতাপ। দেখল, ভেলকির উপর ভেলকি, উপরের বৈঠকখানার জানলা থেকে মুখ বের করে স্বয়ং গিরিশই বলছে, 'বাবু নেই হ্যায়।'

'বা, সে কী! আপনি সশরীরে বর্তমান আর আপনিই বলছেন, নেই হ্যায়।' প্রতাপচাঁদ মুখভঙ্গি করে উঠল।

'নেইই হ্যায় তো।' গর্জে উঠল গিরিশ: 'আমি কি বাবু?'

'বা, আপনি আমার থিয়েটারের ম্যানেজার না?'

'ম্যানেজার, না, মুণ্ডু। সত্যিকার ম্যানেজার হলে আমার পরামর্শ না নিয়েই আপনি তাড়াতে পারতেন বিধুবাবুকে? যান, আমি ম্যানেজার-ট্যানেজার কেউই নই। আমি ঘরমে নেই হ্যায়।' জানলা বন্ধ করে দিল সজোরে।

প্রতাপ তখন কাকুতি-মিনতি করতে বসল। আগে তবে বিধুকে তার পুরোনো ঘরে থাকতে দাও, তাকে নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এস। তাই সই। বিধুকে ঘরছাড়া করব না। কথা দিল প্রতাপচাঁদ। তবে গিরিশ গেল। আলো জ্বলল থিয়েটারে।

কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারল না গিরিশ। প্রতাপকে বললে, দেখুন, থিয়েটার খুব ভালো চলেছে, অনেক কামাচ্ছেন আপনি, এবার য়্যাক্টর-য়্যাকট্রেসদের মাইনে বাড়িয়ে দিন।

প্রতাপ কেবল হবে-হচ্ছে করে।

'আর কত দিন গড়িমসি করবেন? নিজে একাই পকেট বোঝাই করবেন আর যাদের জন্যে আপনার এত জমজমাট তাদের ম্লান করে রাখবেন এটা ঠিক নয়।'

প্রতাপের তবুও গয়ংগচ্ছ।

গিরিশ প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও বেরিয়ে এল। এস দেখি নতুন থিয়েটার খোলা যায় কিনা। কোনো শাঁসালো লোকের খবর আছে কারু কাছে? বিনোদিনী যার কাছে বাঁধা সে এক সুদর্শন ধনী যুবক, সম্ভ্রান্ত তো বটেই, তার উপর অবিবাহিত। কিন্তু গোড়াগুড়ি থেকেই তার ইচ্ছে নয় বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চের রঙ্গিণী হয়।

'কত টাকা দেয় তোমাকে থিয়েটার? হিসেব করো। আমি সেই টাকাটা

বাড়তি দেব।' যুবক বলে দৃঢ়স্বরে।

'বা, তুমি বেশ লোক।' বিনোদিনী কোমল কটাক্ষ করে: 'আমার এত বড় একটা গুণ মাঠে মারা যাবে? গুণ আছে বলেই তো রূপে এত জৌলস। রঙ্গিণী বলেই তো সঙ্গিনী করেছ! নইলে চাও কি আমি তীর্থে-তীর্থে ঘুরি, নীলাচলের সমুদ্রপারে চুপ করে বসে থাকি।'

যুবক অস্থির হয়ে ওঠে, বলে, 'না, না, থিয়েটার করতে চাও করো, কিন্তু য়্যামেচার হয়ে। মাইনে নিতে পারবে না।'

'বা, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করব, মাইনে নিতে পারব না?'

'না, যা মাইনে বলে ঠিক হবে, বলো তো আমি দেব। আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, তাতে তোমার আপত্তি হবে কেন? সে তোমার আর্টের জন্যে, যাকে তুমি ভালোবাসো জীবন দিয়ে।'

'পাওনা টাকা মাঠে মারা যাবে?'

'যা মাঠে মারা যাচ্ছে না তারও অনেক আমাদের পাওনা নয়।'

বিনোদিনী গেল তার মার কাছে।

সে কি, মাইনে নিবি নে কেন? ও বাবু কত দিন? ছাড়াছাড়ি একদিন তো হবেই, হয় তুই ওকে ছাড়বি নয়তো ও তোকে ছাড়বে। তখন যাবি কোথায়? পাওনা টাকা কেউ খেলাপ করে? এত দিন মজুরো খেটে আজকে য়্যামেচার? কখনো না। যার লক্ষ্মী যেখানে। তোর লক্ষ্মী যদি থিয়েটারে হয় সে থিয়েটারকে তুই অমান্য করবিনে।

বিনোদিনী গেল এবার গিরিশের কাছে। সমাধান কঠিন কী! কত আর টাকা আছে ও ছোঁড়ার? ওকে ছেড়ে দিলেই তো চুকে যায়। বুঝল, এতে বিনোদিনীরই ব্যথা বেশি। যুবককে ছাড়ার কথা তো উঠতেই পারে না, আবার থিয়েটার ছাড়া, থিয়েটারকে খাটো করাও অসহ্য।

'তা হলে এক কাজ কর।' বললে গিরিশ, 'তোর মাইনের টাকা আমি নেব। আমি নিয়ে তোর মার হাতে দিয়ে আসব।'

'কিন্তু উনি যদি জিগগেস করেন?'

'বলবি, মাইনে নিই না।'

বুকে যেন বিষম বাজল বিনোদিনীর। যে তাকে এত ভালোবাসে তাকে সে মিথ্যে বলবে? গিরিশ হাসল। সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখল। বললে, 'কখনো কখনো কোনো কোনো মিথ্যে কথা সত্যের চেয়েও সুন্দর।'

৯

কিন্তু সত্য কি সুন্দর? সত্য নৃশংস। বিনোদিনীর বাবু সেই যুবক দেশে ফিরে গিয়ে দিব্যি বিয়ে করে বসল। বুক ভেঙে গেল বিনোদিনীর। থিয়েটার থেকে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে কাশী চলে গেল।

এত ম্রিয়মান হবার কী হয়েছে! বিনোদিনী ঠিক করল আর পাপের পথে যাব না। দেহপণ্যে আর বিক্রীত হব না কারু কাছে। ভগবান যখন আমাকে অভিনয়ের শক্তি দিয়েছেন, স্বাস্থ্য দিয়েছেন, আমি তাই খাটিয়ে জীবিকার্জন করব।

কাশী থেকে ফিরে এলে প্রতাপচাঁদ বললে, 'ছুটির মাসের মাইনে পাবে না।'

'সে কী কথা!' বিনোদিনী বসে পড়ল।

'তুমি তো কাজ করনি। কাজ করবে না অথচ মাইনে নেবে এটা কোন্ আইন?'

বাক্যব্যয় না করে বিনোদিনী চলে এল থিয়েটার ছেড়ে।

গিরিশ গেল তাকে বোঝাতে। বললে, "দ্যাখ বিনোদ, এখন গোলমাল করিসনে। কটা দিন একটু থাক ধৈর্য ধরে।'

অর্থ খোঁজবার জন্যে বিনোদিনী গিরিশের চোখের দিকে তাকাল।

'শোন, এক ভদ্রলোক নতুন একটা থিয়েটার খুলতে চাইছে। মস্ত বড়লোক, টাকার তিমি মাছ।' আশ্বাস দিল গিরিশ: 'কটা দিন চুপচাপ থাক, তারপর সেই থিয়েটারে গিয়ে উঠবি। আমি তোর সঙ্গ নেব। প্রতাপের সঙ্গে আমারও ঠিক বনছে না।'

থিয়েটারকে ভালোবাসে বিনোদিনী। থিয়েটারই তার জপতপ, তার জলবায়ু। তাই থিয়েটার ছেড়ে দেবার কোনো মানে হয় না। বরং মাইনের দাবি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে গিয়েই উঠি। যদি সত্যিই নতুন একটা থিয়েটার তৈরি হয়, স্টেজ-ছুট হয়ে থাকাটা ভুল হবে। সুতরাং বিনোদিনী থিয়েটারেই ফিরে এল গুটিগুটি।

কিন্তু নতুন যে থিয়েটার খুলবে তার নাম কী? বাড়ি কোথায়? নাম গুরুমুখ রায়। মুখে মুখে গুমুর্খ রায়। অবাঙালী।

'নতুন থিয়েটার খুলতে যত টাকা লাগে সব দেব।' গুমুর্খ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: 'কিন্তু বিনোদিনীকে চাই।'

'বা, বিনোদিনী তো নতুন থিয়েটারে আসবার জন্যে ব্যস্ত।' বললে সকলে।

গুমুর্খ দুমুর্খ। বলল, 'তার জন্যে আমি ব্যস্ত নই। আমি বলতে চাইছি বিনোদিনী আমার রক্ষিতা হবে।'

জ্বলে উঠল বিনোদিনী। ওর আস্পর্ধার মুখে নুড়ো জেবলে দিই।

'যত টাকা চাও তত টাকা দেব। অগাধ চাও তো অগাধ।' গুমুর্খ বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকাল।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল বিনোদিনী। কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। সেই মল তো একদিন খসাবিই তবে মিছিমিছি আর লোক হাসাচ্ছিস কেন? একটা নতুন থিয়েটার যদি হয় দেশে কী ভীষণ একটা কাণ্ড হবে বল দেখি। তাই বলে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে ধরব? আগের বাবু তো বিয়েই শুধু করেছে, বিনোদিনীকে এখনো পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু তার

বিয়ে করাটাই কি বিনোদিনীকে প্রতারণা নয় ? কে জানে ! হয়তো অভিভাবকদের উৎপাতে বাধ্য হয়েছে বিয়ে করতে। বিয়ে করলেই বা কী। আসলে বিনোদিনীই হয়তো তার ভালোবাসার বস্তু। তার হৃদয়ের মাংস। না, না, যাব না গুমুর্খের কাছে। রাতের নিঃসঙ্গ বিছানায় ছটফট করে বিনোদিনী।

কিন্তু যাই বলো একটা থিয়েটার হয়। কলকাতা গমগম করে ওঠে। একটা বারনারীর দেহের আর দাম কী। তার চেয়ে তার শিল্পীসত্তা মর্যাদা পাক, মূল্যবান হোক। আর বলতে গেলে, ভালোবাসা না শ্মশানের ছাই ! আনকোরা নতুনকে ভুলে সে কিনা আসবে এই প্রাক্তনীর দুয়ারে। রাজী হয়ে গেল বিনোদিনী। আর সব যাক, থিয়েটার হোক। প্রেমিক যুবক নতুন বউ পেয়েছে, বিনোদিনী নতুন থিয়েটার পাক।

ভোরবেলায় একবার উঠে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিনোদিনী।

'অ কী মেনি, এত ঘুম কিসের ?'

মেনি ! ধড়মড় করে উঠে বসল বিনোদিনী।

দেখল তার সেই প্রণয়ী যুবক। যে তাকে চলতি 'বিনি' না ডেকে একটু গাঢ় করে 'মেনি' বলে ডাকত। কিন্তু এ তার কী সাজসজ্জা ! একেবারে একটা মিলিটারি পোশাক পরে এসেছে। কোমরে জ্বলছে একটা খাপে ঢাকা তলোয়ার।

ভয় পেল বিনোদিনী। শুকনো মুখে বললে, 'তুমি ? এই অসময়ে ?'

'মৃত্যুই অসময়ে আসে। শোনো,' যুবক এগুলো খাটের দিকে, বললে, 'এই দশ হাজার টাকা নাও, গুমুর্খকে ছেড়ে দাও।'

শুধু টাকা ! শুধু দেহের উপর প্রভুত্ব ! সঘৃণে তাকিয়ে রইল বিনোদিনী।

'কত দিয়েছে, কত দেবে তোমাকে গুমুর্খ ?' যুবক আরো এগিয়ে এল : 'বেশ, দশে না মন ভরে কুড়ি নাও। কুড়ি হাজার। গুমুর্খকে ল্যাং মারো।'

'না। তুমি টাকার অঙ্ক দেখিয়ো না।' বিনোদিনী বললে দৃঢ়স্বরে, 'তুমি ফিরে যাও।'

'ফিরে যাব ?'

'হ্যাঁ, গুমুর্খকে আমি কথা দিয়েছি। কথা যখন দিয়েছি তখন আর তার নড়-চড় হবে না।'

'দেখি হয় কিনা।' খাপ থেকে বিদ্যুৎঝলকে তলোয়ার বের করল যুবক।

শুধু ভয় দেখাবার জন্যে নয়, সত্যি সত্যি আঘাত করবার জন্যেই চালাল তলোয়ার। আর একেবারে বিনোদিনীর মাথা লক্ষ্য করে। পলকে বসে পড়ল বিনোদিনী। তলোয়ারের ঘা তাকে আড়াল করা টেবিল-হারমোনিয়ামের উপর গিয়ে পড়ল।

আবার তলোয়ার তুলেছে, যুবকের উদ্যত হাত বিনোদিনী ধরে ফেলল সাহস করে। বললে, 'আমাকে খুন করায় বীরত্ব কী। আমার কলঙ্কিত জীবন শেষ হয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার কী হবে ? একটা বারাঙ্গনাকে হত্যা করে ফাঁসি যাচ্ছ তাতে কী মুখোজ্জল হবে তোমার ? তোমার স্ত্রীর ? তোমার

পরিবারের ?'

তলোয়ার খসে পড়ল হাত থেকে। দুহাতে মুখ ঢেকে যুবক বসে রইল অভিভূতের মত। তারপর কখন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিনোদিনীও কলকাতার বাইরে গা ঢাকা দিল।

গুর্মুখ বললে, 'বিনোদিনী আমার কব্জায় না এলে আমি থিয়েটার-ফিয়েটার কিছু করতে পারব না।'

বিনোদিনী খবর পাঠাল : 'আগে থিয়েটার পরে আর সব।'

অগত্যা বিডন স্ট্রিটে থিয়েটারের জন্যে জমি ইজারা নিলে গুর্মুখ।

বিনোদিনী ফিরে এল কলকাতা।

খবর পেয়ে গুর্মুখ এল দেখা করতে। বললে, 'বিনোদ, কী হবে ছাই থিয়েটারে? তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই, তুমি একেবারে আমার হয়ে থাকো।'

'কত দেবে বললে ?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

চোখে যেন ঝাপসা দেখল বিনোদিনী। কিন্তু থিয়েটার? তার স্বপ্নের অলকাপুরী ?

'থিয়েটারে আরাম কী! শুধু চেঁচানো, শুধু মেহনৎ। হাজার রকমের ঝামেলা। তার চেয়ে রুপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুয়ে ঘুমোনো, সে অনেক ভালো।'

অসম্ভব। তোমার পঞ্চাশ হাজারে আমার রুচি নেই। আমার থিয়েটার, আমার শিল্পতীর্থ, আমার ধ্যানজ্ঞান, আমার আরাধনা।

পঞ্চাশ হাজারের লোভ ছেড়ে দিল বিনোদিনী। পারল ছেড়ে দিতে। তার জীবসত্তা থেকে তার জীবনসত্তা বড় হয়ে উঠল। থিয়েটারের বাড়ি উঠতে লাগল ক্রমে-ক্রমে। বিনোদিনীর আনন্দ দেখে কে। উৎসাহে সে কতদিন নিজেই ঝুড়ি করে মাটি বয়ে এনেছে। থিয়েটারের বাড়ি তৈরি হল। এখন তার কী নাম রাখা যায় ?

সবাই বললে, বিনোদিনীর ত্যাগের উপরই এই থিয়েটারের সৌধ সুতরাং থিয়েটারের নামের সঙ্গে যেন বিনোদিনীর কিছু যোগ থাকে।

অনেক মাথা খাটিয়ে হোমরাচোমরারা বললে, নাম রাখা হোক বী থিয়েটার। বী মানে ভ্রমর। আর সেই সঙ্গে ইংরিজিতে বিনোদিনীর নামের আদ্যাক্ষর। বী থিয়েটার। তার মানেই 'বিনোদিনী থিয়েটার।' নামের স্বপ্নে বিভোর বিনোদিনী। টাকা যেমন হল না, নামও হল না। নাম হল স্টার থিয়েটার। একটা গণিকার নামে কি থিয়েটার হয়? না তা হলে কি চলে ?

গণিকা অচল! অচল তো লক্ষহীরা বৈষ্ণবী হয়ে যায় কী করে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কী করে এই বিনোদিনীর মাথায়ই আশীর্বাদের হাত রাখেন ?

কলকাতার রাস্তায় গাড়ি করে যাচ্ছেন, দেখতে পেলেন দোতলার বারান্দায়

রেলিং ধরে কতগুলি পণ্যাঙ্গনা দাঁড়িয়ে আছে। হাসাহাসি করছে।

তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বলছেন, 'মা আনন্দময়ী, আনন্দে থাকো।'

হাঁ, গণিকাও মহামায়া। তার মধ্যে শুদ্ধ নিরঞ্জন আনন্দ।

'বেশ্যারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলই বা।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপনা হয়।'

রতির মার বেশে কালী দেখা দিল ঠাকুরকে।

বলছেন, 'আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম করছে এ মন্দের ভালো! মল্লিকের মা, চেনো তো? খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে। বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞেস করলে ওদের কি কোনোমতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা। তাই বুঝি মনে ডাক দিয়েছে। আমি বললুম, হ্যাঁ, হবে, যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে, আর করব না। শুধু হরিনাম করলে কী হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে।'

বিনোদিনী কি আন্তরিক কাঁদেনি? আর গিরিশ? বললে, 'ঠাকুর, আমি পাপের পাহাড় করেছি।'

ঠাকুর হাসলেন, বললেন, 'পাহাড় করেছিস নাকি রে? ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে উড়ে যাবে।'

'মা বলব?'

'হ্যাঁ, আর কী নাম আছে মায়ের মত? এই একাক্ষর মন্ত্রই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।' অভয়প্রসন্ন স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মায়ের সন্তান কি কখনো পাপী হয়? মায়ের সন্তান বড় জোর দুঃখী হয়। মায়ের ছেলে কখনো ফেল করে না, মায়ের ছেলেকে মাস্টার কম নম্বর পাইয়ে দেয়। মায়ের ছেলে কখনো বকে যায় না, পাড়ার পাঁচটা ছেলে তাকে বকিয়ে দেয়। মারই তো আরেক নাম অহেতুকী কৃপা। নিশাচর ছেলে কখন বাড়ি ফেরে তার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে বাপ ঠ্যাঙা নিয়ে বসে আছে সদরে। আর মা? মা কখন খিড়কির দরজার ছিটকিনিটা আলগোছে খুলে রেখেছেন ছেলে যাতে নিঃশব্দে চলে আসতে পারে চুপিচুপি।'

সুতরাং কোনো ভয় নেই। ছেলে শান্ত হলেও মার সন্তান, দুরন্ত হলেও মার সন্তান। মা তাকে ফেলবেন কোথায়? কিন্তু মা কই?

'তুমি কী রকম, মা?' জয়রামবাটিতে গিরিশ একদিন জিজ্ঞেস করল সারদামণিকে।

সারদামণি উত্তর দিলেন: 'আমি সত্যি মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি মা।'

আবার বললেন, 'আমি কি শুধু সতের মা? আমি অসতেরও মা।'

এই মাকেই গিরিশ একদিন দেখেছিল স্বপ্নে। কলেরা হয়েছে, নাড়ী প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে। আত্মীয়স্বজনেরা কান্নার রোল তুলেছে। মূর্ছাহত গিরিশ স্বপ্ন দেখল কে এক দেবীমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লাল পেড়ে শাড়ি, চুল খোলা আর আকর্ণবিস্তৃত বিশাল চোখে কী অগাধ শ্যামস্নেহ। অনেকক্ষণ

তাকিয়ে রইলেন গিরিশের দিকে। বললেন, 'তোমার জন্যে পুরীর জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছি। নাও, হাঁ করো।'

গিরিশ হাঁ করল। মা তার মুখে একটু মহাপ্রসাদ ফেলে দিলেন।

অলৌকিকের খেলা। গিরিশ ক্রমে ক্রমে ভালো হয়ে উঠল।

'সে কোন দেবী ? কার ঘরনী ?' জিজ্ঞেস করলে কেউ-কেউ।

'আমি তার কী জানি!' গিরিশ উত্তর দিল হাসিমুখে: 'আমি কি আগে কখনো দেখেছি ? আমার সঙ্গে কি তার চেনাজানা আছে ?'

'তবে দেবী বুঝলে কী করে ?'

'দেবী না হলে কি অমনটি দেখতে হয় ? আসার সঙ্গে সঙ্গে অমন আলো হয়ে ওঠে ঘরদোর ?'

কী জানি কী দেখেছে! করাল ব্যাধি যে সারল এই যথেষ্ট। কিন্তু গিরিশ দেখে কী করে ? কোন সুবাদে ? এত দূর যে নষ্ট আর পানাসক্ত তার কী করে দেবীদর্শন হয় ?

কতবার কামকে বলি দেবার জন্যে কালীঘাটে গিয়েছে গিরিশ। হাড়কাঠের কাছে বসে মা-মা বলে ডেকেছে, আর্তনাদ করেছে। মন্দিরচত্বরে কি আর জায়গা নেই, হাড়কাঠের কাছে কেন ? কত শত ছাগ বলি হচ্ছে এ হাড়কাঠে। মৃত্যুকালে নিরীহ পশুগুলির অসহায় কান্না শুনে মা নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকায়। যদি আমার কান্নাকে বিপন্ন ছাগশিশুর কান্না বলে ভুল করে আমার চোখে চোখ রাখে। যদি দয়া হয়। যার চোখের আলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সে আলো যদি আমার চোখের উপর ঠিকরে পড়ে।

জয়রামবাটিতে এসেছে গিরিশ নিরঞ্জন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে। খোকামহারাজও আছে। কামারপুকুর থেকে পালকি করে এসেছে গিরিশ আর সকলে পায়ে হেঁটে। মার যাতে কিছুটা সুবিধে হয় গিরিশ ঠাকুর-চাকর সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর মুটের মাথায় চাল-ডাল।

'আগে তালপুকুরে গিয়ে স্নান করুন।' গিরিশকে বললে মহারাজেরা, 'তারপর মাকে দর্শন করবেন।'

তালপুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়েই চলে এল গিরিশ। হাতে একটি পাকা আম। মা'র বাড়িতে এসেই উঠোনে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম! কোথায় মা ?

এই তো সামনে।

'তুমি ? তুমি ?' বিস্ময়বিগাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল গিরিশ; 'কবে সে স্বপ্ন দেখেছিলাম দেবীমূর্তি প্রসাদ দিচ্ছেন! তুমিই সেই দেবীমূর্তি ?'

আশ্বাসভরা হাসি হাসলেন শ্রীমা। আমিই সেই আমিই সেই।

চোখের জল এসে নয়নের নিমেষকে আচ্ছন্ন করে ধরল। চোখের জলকে শাসন করতে চাইল গিরিশ। এখন তুই দূরে থাক, মাকে দেখতে দে। হায়, জল যে আনন্দেও আসে। কিন্তু আর কী চাই! মা তো চোখের দিকে তাকিয়েছেন।

এক ভক্ত ছেলে মাকে গিয়ে বললে, 'মা, আমার বড় অশান্তি।'

মা হাসলেন : 'কেন অশান্তি কিসের ?'

'মা, মন বড় চঞ্চল।'

'কিসের জন্য চঞ্চল ?'

ভক্ত ছেলে নির্ভয়ে বললে, 'কামের জন্যে। কাম কিছুতে যায় না।'

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন!

ছেলে ফিরে এল। মনে কঠিন আত্মগ্লানি এল। ছি ছি, ওসব কথা কেন মাকে বলতে গেলুম। ওসব কি গুরুজনকে বলতে আছে ?

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে সোজা মাস্টার মশায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রণাম করে বললে, 'আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথা বড্ড গরম, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন।'

'সে কী, আপনি মার কাছে উদ্বোধনে যাননি ?

'গিয়েছিলাম। কিছু হল না।'

'হল না মানে? মা কি আপনাকে চেয়েও দেখেন নি ?

'না, না, চেয়ে দেখেছেন বৈকি।' ভক্ত ছেলে বললে অনুতপ্ত কণ্ঠে, 'কিন্তু একটিও কথা বললেন না। আমার ব্যাধির কোনো প্রতিকার করলেন না।'

'সে কী? আপনার দিকে তাকিয়েছেন তো? চোখে চোখ রেখেছেন ?'

'তা রেখেছেন। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।'

'তবে আর কী!' মাস্টারমশাই উৎফুল্ল হয়ে গান গেয়ে উঠলেন : 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'

গানের কলিটা তিন-তিনবার গাইলেন।

ভক্ত ছেলে তখন বুঝল মার অমনি চেয়ে থাকার অর্থ কী। নিষ্কলঙ্ক মমতাদ্রব চোখদুটি বুঝি আবার মনে পড়ল। শান্ত হল ছেলে। স্নায়ুমণ্ডলী ঠাণ্ডা হল। কী যেন পেল শক্ত করে এঁটে আঁকড়ে ধরবার মত। মার মুখ, মার চোখ, মার কেশদাম।

এবার একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে মার কাছে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে।

বললে, 'মা, তোমার সঙ্গে একটু একান্ত হতে চাই।'

মা নির্জনে নিয়ে এলেন মেয়েকে। বললেন, 'কী ব্যাপার? কী চাই ?'

'মা আশীর্বাদ করো, আমাদের যেন আর ছেলেপিলে না হয়।' অপরাধীর মত মুখ করে কুণ্ঠিতস্বরে মেয়ে বললে, 'আমাদের ভোগলালসা একেবারে কাটিয়ে দাও।'

মা হাসলেন। হাসিতেই তার সমস্ত যন্ত্রণার নিবারণ করে দিলেন। বললেন, 'সে কী কথা মা? তোমাদের ঘরে ছেলে না হলে আমার ভক্ত সংখ্যা বাড়বে কী করে ?'

যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যখন যেমন তখন তেমন। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন।

আবার আরেক ভক্তকে বলছেন, 'বাবা, বে করনি, শান্তিতে ঘুমুতে পারবে।

যে বে না করে সে তো অর্ধমন্ত্ত।'

'কিন্তু তুমি ?' আরেক ভক্তকে ইঙ্গিত করলেন মা, 'তোমাকে বে করতে হবে।'

'এই তো বললেন বিয়ে করলেই অশান্তি।

'তা হোক গে অশান্তি, তোমার করতে হবে। আর তোমার যে সন্দেহ হচ্ছে তা বলি। বিয়ে করলেও সৎ হওয়া যায়। মন—মন দিয়েই সব। কেন, ঠাকুর কি আমাকে বিয়ে করেন নি ?'

'মা, যত চেষ্টা করি, কিছুতেই কুচিন্তা দূর করতে পারি না।' আরেকজন বললে কাতর হয়ে।

মা অভয় দিলেন : 'ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কার হচ্ছে। জোর করে হঠাৎ কি ও ছাড়া যায় ? সৎসঙ্গে মেশো, ঠাকুরকে ডাকো, ক্রমে সব হবে। আমিই তো রইলুম।'

'কত আর মনের সঙ্গে লড়াই করা যায় ?' আরেকজন এসে আক্ষেপ করল, 'এক বাসনা যায় তো অন্য বাসনা ওঠে।'

'বাসনাকে ভয় কী। যতক্ষণ অহং আছে ততক্ষণ বাসনা থাকবেই। ও সবে তোমাদের কিছু ভয় নেই। যে ঠাকুরে শরণাগত, তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।'

'মা, ধ্যান-টানে তো কিছুই হয় না।' এক নাছোড়বান্দা ছেলে মার কাছে এল ফরিয়াদী হয়ে।

'মা তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'তা নাই বা হল। ঠাকুরের ছবি আছে ঘরে ? ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে।'

দেখবে তো খানিকক্ষণ দেখ। অনিমেষে দেখ। সেই অনিমেষেই দেখে মা গিরিশের সমস্ত সংশয় ব্যাধি হরণ করলেন।

'কতদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছি ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিছু বলেন নি, শুধু অপলকে তাকিয়েছেন চোখের দিকে। আমার রাঙা চোখ শাদা করে দিয়েছেন। আমার দু বোতলের নেশা বিলকুল মাটি হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু এরা, এরা কারা আসে মার কাছে ? এরা থিয়েটারের অভিনেত্রী। তারাসুন্দরী আর তিনকড়ি। এরা কেন আসে ? গণ্যমান্য স্ত্রী-ভক্তের দল আপত্তি করে উঠল। এরা তো পতিতা।

'হোক।' মা বললেন, 'এদের ঠিক ঠিক ভক্তি। এরা যেটুকু ভগবানকে ডাকে, একমনে ডাকে। আর', মা উদ্দীপ্ত হলেন : 'এরা যদি পতিতা হয়, আমি পতিত-পাবনী নই ?'

তবু বুঝি আপত্তি নিবে যায় না, তুষের মত জ্বলতে থাকে। তখন মা রাগ করে বললেন, 'ওদের যদি আসতে না দাও, তাহলে আমিও এখানে থাকব না। কেন, গিরিশ ঘোষ যায়নি ঠাকুরের কাছে ? আর বিনোদিনী ঠাকুরের পায়ের উপর মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে কাঁদেনি আকুল হয়ে ? কে ওদের রুখতে পেরেছে ?'

আপত্তিকারীরা নিরস্ত হল।

গিরিশ মূর্তিমান বিশ্বাস আর বিনোদিনী? বিনোদিনী মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।

১০

স্টার থিয়েটারে প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'। গিরিশের লেখা। আর অভিনয়ে দক্ষ গিরিশ, সতী বিনোদিনী। গিরিশের অভিনয়ে, টঙ্কারে-হুঙ্কারে সমস্ত স্টেজ গমগম করে উঠল। 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।' গিরিশের সে কী লম্ফঝম্প।

রামলালকে নিয়ে রামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসেছেন। গিরিশের কথা শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হবার ভাব করলেন। বললেন, 'এ শালা আবার বলে কি রে।'

গিরিশ আবার গর্জন করে উঠল : 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

'সে কি রে? শিবনাম ঘোচাবি কি রে?' বালকস্বভাব ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন : 'তোকে এতদিন তবে শেখালাম কী!'

সিন-এর পর গিরিশ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, আপনি ভাববেন না, আমি আবার শিবনাব নেব।'

'নিবি তো? দেখিস।'

দক্ষরূপী গিরিশ সতী-সাজা বিনোদিনীকে বলছে, 'অপমান—মান আছে যার। ভিখারীর মান কি রে ভিখারিনী?'

'দেখেছ, শালা যেন অহংকারে মট-মট করছে!' বলে উঠলেন ঠাকুর।

'না, এ দক্ষের অহঙ্কার, গিরিশের নয়।' রামলাল আশ্বস্ত করল।

স্টারে দ্বিতীয় নাটক, 'ধ্রুবচরিত্র।' এও গিরিশেরই রচনা। এতে গিরিশের কোনো পার্ট নেই, বিনোদিনী সুরুচি।

তৃতীয় রচনা 'নলদময়ন্তী।'

স্টার থিয়েটার দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ গুর্মুখের কী খেয়াল হল, বললে, 'আমি থিয়েটার আর রাখব না। বেচে দেব।'

'কাকে বেচবেন?'

'এই থিয়েটার যার জন্যে তৈরি হয়েছিল, কিংবা বলতে পারো যার ত্যাগে তৈরি হয়েছিল, তাকে।'

'বিনোদিনীকে? তাকে টাকায় বেচবেন?'

'না, না, সে যদি নেয় তাকে অমনি দান করে যাব। ষোল আনা না নেয়, আট আনা। কিন্তু নেবে সে? চালাবে সে থিয়েটার?'

'দেখি ডাকাই বিনোদকে।' গিরিশ বললে।

'বা, কেন সে নেবে না? কেন চালাবে না? থিয়েটারই তো তার সব, তার দেহ, মন—আত্মা—'

কিন্তু গিরিশের ইচ্ছে নয় বিনোদিনী থিয়েটারের মালিকানা পায়।

বিনোদিনীর মাকে গিরিশ বললে, 'বিনোদের মা, তোমরা ও সব ঝঞ্ঝাটে যেয়ো না। তোমরা মেয়েমানুষ, পারবে না সামলাতে।'

গিরিশ মূর্তিমান বিশ্বাস আর বিনোদিনী? বিনোদিনী মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।

১০

স্টার থিয়েটারে প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'। গিরিশের লেখা। আর অভিনয়ে দক্ষ গিরিশ, সতী বিনোদিনী। গিরিশের অভিনয়ে, টঙ্কারে-হুঙ্কারে সমস্ত স্টেজ গমগম করে উঠল। 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।' গিরিশের সে কী লম্ফঝম্প!

রামলালকে নিয়ে রামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসেছেন। গিরিশের কথা শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হবার ভাব করলেন। বললেন, 'এ শালা আবার বলে কি রে।'

গিরিশ আবার গর্জন করে উঠল: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

'সে কি রে? শিবনাম ঘোচাবি কি রে?' বালকস্বভাব ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন: 'তোকে এতদিন তবে শেখালাম কী!'

সিন-এর পর গিরিশ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, আপনি ভাববেন না, আমি আবার শিবনাব নেব।'

'নিবি তো? দেখিস।'

দক্ষরূপী গিরিশ সতী-সাজা বিনোদিনীকে বলছে, 'অপমান—মান আছে যার। ভিখারীর মান কি রে ভিখারিনী?'

'দেখেছ, শালা যেন অহংকারে মট-মট করছে!' বলে উঠলেন ঠাকুর।

'না, এ দক্ষের অহঙ্কার, গিরিশের নয়।' রামলাল আশ্বস্ত করল।

স্টারে দ্বিতীয় নাটক, 'ধ্রুবচরিত্র।' এও গিরিশেরই রচনা। এতে গিরিশের কোনো পার্ট নেই, বিনোদিনী সুরুচি।

তৃতীয় রচনা 'নলদময়ন্তী।'

স্টার থিয়েটার দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ গুর্মুখের কী খেয়াল হল, বললে, 'আমি থিয়েটার আর রাখব না। বেচে দেব।'

'কাকে বেচবেন?'

'এই থিয়েটার যার জন্যে তৈরি হয়েছিল, কিংবা বলতে পারো যার ত্যাগে তৈরি হয়েছিল, তাকে।'

'বিনোদিনীকে? তাকে টাকায় বেচবেন?'

'না, না, সে যদি নেয় তাকে অমনি দান করে যাব। ষোল আনা না নেয়, আট আনা। কিন্তু নেবে সে? চালাবে সে থিয়েটার?'

'দেখি ডাকাই বিনোদকে।' গিরিশ বললে।

'বা, কেন সে নেবে না? কেন চালাবে না? থিয়েটারই তো তার সব, তার দেহ, মন—আত্মা—'

কিন্তু গিরিশের ইচ্ছে নয় বিনোদিনী থিয়েটারের মালিকানা পায়।

বিনোদিনীর মাকে গিরিশ বললে, 'বিনোদের মা, তোমরা ও সব ঝঞ্ঝাটে যেয়ো না। তোমরা মেয়েমানুষ, পারবে না সামলাতে।'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু—'

'ওর মধ্যে কিন্তু কী! বিনোদকে তো সেই থিয়েটারই করতে হবে। সে তো মালিকানা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। একদিকে আদার ব্যাপার, অন্যদিকে জাহাজের খবর, নাজেহাল হয়ে যাবে! তোমরা পারবে না অত ঝামেলা পোয়াতে।'

গিরিশের কথাই বজায় রইল। বিনোদিনী নিলে না মালিকানা।

থিয়েটার কিনে নিল চার সরিক, অমৃত বসু, অমৃত মিত্র, দাসু নিয়োগী আর হরপ্রসাদ বসু। সবাই গিরিশকে পিড়াপিড়ি করতে লাগল: 'আপনিও টাকা আনুন। একটা অংশ নিন।'

গিরিশ বললে, 'ছোট ভাই অতুলকে কথা দিয়েছি কোনোদিন মালিক হব না থিয়েটারের। সেই কথা রাখব। তাছাড়া আমরা কাজ করবার লোক, বোঝা বইবার লোক নই।'

নতুন আমলে প্রথম নাটক 'কমলে কামিনী'।

বনবিহারিণী—ভুনী—সাজল শ্রীমন্ত, আর বিনোদিনী খুল্লনা।

'নাটকে যেমন সমুদ্রবর্ণনা করেছেন পুরীতে গিয়ে ঠিক-ঠিক সেই সমুদ্র দেখে এলাম।' বললে ভুনী, 'আপনি বোধ হয় সব নিজের চোখে দেখে মিলিয়ে নিয়ে লিখেছেন?'

গিরিশ হাসল: 'আমি এখনো সমুদ্রই দেখিনি।'

'তা কি কখনো হয়? স্বচক্ষে না দেখে কি অমনি হুবহু লেখা যায়?

'বা, লিখলাম তো।'

'না, না, তা কী করে হয়!' ভুনী মানতে চায় না কিছুতেই।

'কল্পনার জোরে হয়।'

তারপর ক্রমে ক্রমে 'চৈতন্যলীলা' লেখা হল। বিনোদিনী নিমাই সাজল। তার আগেই অবশ্য গিরিশের দেখা হয়েছিল রামকৃষ্ণের সঙ্গে। প্রথম দেখা বোসপাড়া লেনে দীননাথ বসু এটর্নির বাড়ি। মস্ত বড়লোক। রাব-দাব অনেক।

গিরিশের যাবার কী দরকার পড়েছিল? গিরিশের বড় অশান্তি। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, চারদিকে শত্রুতা, বিপদের বেড়াজাল। সবাই বলে, গুরুকরণ ছাড়া কিছু হবে না। কিন্তু কে গুরু? কোথায় গুরু? 'গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে।' কত দিন শিবের কাছে প্রার্থনা করেছে, পদব্রজে গিয়েছে তারকেশ্বর। দাড়িগোঁফ রেখেছে, নিত্য গঙ্গাস্নান করেছে, হবিষ্যান্ন করেছে। আমার সংশয় ছেদন করো, যদি গুরুর উপদেশ ছাড়া এ সংশয় না যায় তা হলে তুমি আমার গুরু হও। শুধু গুরুতে বুঝি গিরিশের তৃপ্তি নেই। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শন কি সম্ভব নয়?

অনবরত মা-মা বলছে আজকাল। কে শিখিয়ে দিল ডাকতে, তা কে জানে। মা বলতে বলতে গিরিশের বুক ফুলে ওঠে, মুখ জ্বলজ্বল করে। বেটিকে গাল ভরে বুক ভরে ডাকলে সাড়া পাবই পাব। কিছু চাইব না? শক্তি? যশ?

অর্থ ? না। কিছু চাইব না। থিয়েটারের সবাইকে তাই বলে বেড়ায় গিরিশ। মাকে ডাকো কিন্তু কিছু চেয়ো না।

'সত্যি, কিছুই চাইবি না ?' কে যেন গিরিশের অন্তরে বসে ডাক দিল।

না চাইব, শুধু তোমার দর্শন চাইব। বলব, মা, একটিবার দেখা দে।

সেদিন নির্জনে অন্ধকারে বসে সকাতরে মাকে ডাকছে, গিরিশ হঠাৎ অনুভব করল, কে যেন বলছে তুই আমাকে দেখতে চেয়েছিস, এই দ্যাখ, আমি এসেছি।'

'কই, দেখতে পাচ্ছিনা তো।' গিরিশ অন্ধকারে চোখ মেলল।

'জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আরাম-আনন্দ বিসর্জন দে।' কে যেন আবার বলল মনের কানে-কানে : 'নিজে শব না হলে কেউ শিব-শিবাকে দেখতে পায় না। আর, দেখতে পেলে ফিরে আসে না সংসারে। সুতরাং শব হয়ে আমাকে দেখতে প্রস্তুত হ, আমি এখুনি দাঁড়াচ্ছি তোর সামনে।'

'তার মানে, বলতে চাও, আমি মরে যাব ?'

'তা ছাড়া আবার কী।'

'আমি এখুনি মরলে আমার ছেলেমেয়ের কী অবস্থা হবে ? কত গরিব বন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে মাস-মাস. তাদেরই বা কী দশা ?' গিরিশ চোখ বুজল : 'না মা, ঐরূপে দেখতে পারব না তোমাকে।'

'বেশ, দেখা না চাস, বর নে।' স্বর স্পষ্টতর হল : 'আমার আসা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। এ সংসারে যা তোর কাম্য তাই নে চেয়ে।'

ভীষণ মুস্কিলে পড়ল গিরিশ। কী চাইবে, কী চাইলে ঠিক হবে, ঠিক করতে পারল না। বললে, 'বর চাই না।'

'সে কী. বর নিবিনে ? মিছিমিছি কেন তবে ডাকলি ? তা হলে অভিসম্পাত নে।'

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল গিরিশের। অশরীরী স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে, 'বল, আমার ঐ উদ্যত খড়্গ কিসের উপর ফেলব ?'

আমার কামনার উপর ? লালসার ওপর ? ছি ছি, নিজের মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল গিরিশ। দেবতাকে মন্দ জিনিস দেব ? খড়্গ ফেলবেন বলে একটা তুচ্ছ জিনিস তাকে দিতে পারব না। যদি কাটবেনই, আমার ভালো জিনিসই কাটুন।

বললে, 'মা, সুনট—ভালো অভিনেতা বলে আমার যে সুনাম আছে তার উপর তোমার খড়্গ পড়ুক।'

'তথাস্তু।' তারপর আর কিছু নেই। দেখারও নেই, শোনারও নেই।' ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ। দেবতার ক্রোধও বরের সমান। গিরিশের নট-খ্যাতি ক্রমেই ম্লান হতে লাগল। বাড়তে লাগল লেখক-খ্যাতি। গিরিশ বলতে আর তত নট নয়, যত নাট্যকার।

গিরিশের কথায় অমৃতলাল বসুও মা-মা করে। মা কালী করালবদনী।

ডাকে বটে কিন্তু প্রাণ ভরে না। শুকনো লাগে। ফাঁকা ঠেকে।

'ওর চেয়ে না ডাকা ছিল ভালো।' রিহার্সালের পর স্টেজের উপর বসে আছে, অমৃতলাল বিরসমুখে বললে গিরিশকে।

সে কী, মা-মা করে ডাকো মনে আনন্দ পাও না ?' গিরিশ অবাক হবার ভাব করল।

'না, কই আর পাই ? বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে।'

স্টেজের পেছনে যে সিন খাটানো তার পেছনে চলে গেল গিরিশ। ডাকল অমৃতকে। জায়গাটা অন্ধকার। অমৃত থমকে দাঁড়াল।

গিরিশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। বললে, 'এমনি বোসো আমার মুখোমুখি।'

বসল অমৃত। অমৃতের দু উরুতে দু হাত রেখে গিরিশ প্রচণ্ড-চণ্ডিকার স্তোত্র পড়তে লাগল। বললে, 'তুমিও এমনি আমার দু উরুতে দু হাত রাখো আর আমারই সঙ্গে পাঠ করো স্তোত্র।'

অমৃতও যথাদিষ্ট স্তোত্রপাঠ করতে লাগল। ক্রমে, এ কী হল অমৃতের ? সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলতে লাগল, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। হঠাৎ অমৃত গিরিশের পা আঁকড়ে ধরে উল্লাসে আর্তনাদ করে উঠল : 'আজ আমার কী আনন্দ, কী শান্তি, তুমি আজ সত্যি-সত্যি আমায় ডাকিয়েছ মাকে। এত সুখ এত পূর্ণতা আমি আর কোনোদিন অনুভব করিনি। তুমি, তুমিই আমার গুরু। শুধু আমার নাট্যকলার গুরু নয়, আমার মনুষ্যত্বের গুরু।'

নাট্যকলার গুরুকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে অমৃত :

'আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার ॥
বিয়ার ফুরায় পুন আনায় বিয়ার।
তিনশত্রুবধ তবু চাগে না চিয়ার ॥
উঠি উঠি বাধা পড়ে—'আর এক পাত্র'।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র ॥'

পরের গুরুগিরি করতে যাচ্ছি, নিজের গুরু কই ? নরবেশে কোথায় সে প্রত্যক্ষীভূত ?

ভাগলপুরে একবার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছে গিরিশ। কবেকার সে প্রথম যৌবনের কথা। বেড়াতে গিয়ে সবাই একটা পাহাড়ে উঠে পড়ল। দেখল কাছেই একটা গুহা। সবাই নেমে পড়ল গুহাতে। নেমে, পরে আর বেরুবার পথ পায় না। কী হল ? বেরুবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না যে।

এখন উপায় ?

বন্ধুরা সকলে গিরিশকেই দায়ী করতে লাগল। বললে, 'তুমি নাস্তিক, তোমারই জন্যে এই অঘটন।'

'তোমরা তো সব আস্তিক। তোমাদের খাতিরে এ অঘটনটা তো না ঘটলেও পারত।' গিরিশ ফিরিয়ে দিল অভিযোগ।

কিন্তু বন্ধুরা ওসব মানতে প্রস্তুত নয়। এস আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরকে ডাকি। 'তোমাকেও ডাকতে হবে।' গিরিশের উপরে সকলে তম্বি করে উঠল।

এখন আপত্তি করবার সাহস হবে কার ? প্রার্থনা করলে কী হয়, কার কাছে

প্রার্থনা করব এমন কোনো প্রশ্নই আর তুলল না গিরিশ। সবার সঙ্গে সেও বসল প্রার্থনায়। হঠাৎ, কে জানে কী হল, মিলে গেল রাস্তা।

'সেই দিন থেকেই বুঝি আপনার ঈশ্বরে বিশ্বাস এল?' জিজেস করল কেউ কেউ।

'না। সেই দিন থেকে ঈশ্বরকে ডাকা একেবারে ছেড়ে দিলাম।'

'সে কী?'

'ঠিক করলাম, যদি কোনো দিন ডাকি, যেন ভয়ে নয়, যেন ভালোবাসায় ডাকি।' গিরিশ বললে তন্ময়ের মত : 'ভয় কি ডাক? ভালোবাসাই ডাক।'

সেই ডাক কি এল?

'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে গিরিশ নাম শুনেছে রামকৃষ্ণের। চলো দেখে আসি।

বেজায় ভিড়। ঐ বুঝি কেশব সেন।

'ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, খোলকত্তাল ধরেছে, এবার এক পরমহংসও খাড়া করেছে দেখছি।' মনে-মনে ভাবছে গিরিশ : 'ভেলকি মন্দ নয়। খদ্দের বাগাবার মতলোব। কিন্তু এ কেমনতর পরমহংস?'

পরমহংস কী যেন উপদেশ দিচ্ছে আর উৎসুক হয়ে শুনছে তাই কেশব আর তার চেলারা। কী এমন তত্ত্বকথা! শুনেও শুনল না গিরিশ।

সন্ধে হয়েছে। ঘরে আলো দিয়ে গেল। হঠাৎ গভীর আচ্ছন্ন গলায় পরমহংস জিজ্ঞেস করল, 'সন্ধে হয়েছে?'

কী আশ্চর্য। সন্ধে না হলে আলো কেন? লোকটার কি সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নেই?

আবার প্রশ্ন : 'হ্যাঁ গা, সন্ধে হয়েছে?'

লোকটার ঢং দেখ। একজন বলে দেবে তবে উনি বুঝবেন সন্ধে হয়েছে কিনা। সন্ধে হয়েছে কি না হয়েছে নিজের চোখ চেয়ে বোঝবার সাধ্যি নেই? বিরক্তিতে তিক্ত হল গিরিশ। আর কী হবে দেখে! যার সন্ধে-সকাল জ্ঞান নেই সে আবার কেমন পরমহংস?

বাড়ি ফিরল গিরিশ। তার পিসেমশাই সদরালা গোপীনাথ বসু জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন দেখলে হে?'

'স্রেফ বুজরুকি।' এক কথায় উড়িয়ে দিল গিরিশ।

কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় দেখা। রামকান্ত বসু স্ট্রিটে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ আসবেন। অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশও বাদ পড়েনি। সেও চলল মজা দেখতে। বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। কিন্তু এ কী? এ সমাবেশে স্ত্রীলোক কেন? গিরিশের চমক লাগল। কে ও? চিনলে না? ও বিধু কীর্তনী। রামকৃষ্ণকে গান শোনাতে এসেছে।

ভিড় সরিয়ে বিধু একেবারে রামকৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত। নত হয়ে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! হাত জোড় করে নয়, একেবারে মাটিতে মাথা রেখে অত্যন্ত দীনভাবে রামকৃষ্ণ নমস্কার করলেন

বিধুকে। শুধু বিধুকে নয়, যেই পায়ে প্রণাম রাখছে তাকেই মাথা দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। এমন অভিনব পরমহংস তো কোথাও দেখিনি। পরমহংসরা তো জানতাম কারু সঙ্গে কথা বলেন না, কাউকে নমস্কার করেন না, শুধু পদসেবা নেবার আগ্রহে মাঝে মাঝে পা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এ'র তো দেখছি দৈন্যের ভাব, বিনয়ের ভাব, অহংকারের লেশমাত্র নেই। সকলকে সমানজ্ঞানে নমস্কার বিতরণ করছেন। শুধু তাই নয়, বিধুর সঙ্গে পরিহাসসরস স্বরে কথা বলছেন।

গিরিশের আগের দিনের এক ইয়ারবন্ধু দৃশ্য দেখে ব্যঙ্গ করে উঠল। বললে, 'বুঝলে না হে, বিধু ওঁর আগের আলাপী, তাই একটু রঙ্গ হচ্ছে।'

কেন কে জানে, বন্ধুর কথাটা ভালো লাগল না গিরিশের।

'চলো হে গিরিশ, আর কী দেখবে ?' পাশ থেকে বলে উঠল শিশিরকুমার। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার।

গিরিশের ইচ্ছে ছিল আরো একটু দেখে। কী কথা হয় না হয় শোনে। কিন্তু শিশিরকুমার ভীষণ জেদ করতে লাগল। আর দেখে না। দেখবার কিছু নেই এখানে। চলে গেল গিরিশ।

আরো কিছু দিন ধরে স্টারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় হচ্ছে, বাইরের প্রাঙ্গণে পাইচারি করছে গিরিশ, এমন সময় মহেন্দ্র মুখুজ্জে এসে উপস্থিত।

'পরমহংসদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন।' বললে মহেন্দ্র, 'তাঁর টিকিট লাগবে ?'

'তিনি একা এসেছেন, না, সঙ্গে লোক আছে ?'

'তা আছে কয়েকজন।'

পরমহংসদেবের লাগবে না, কিন্তু আর আরদের লাগবে।' বলে গিরিশ নিজেই এগিয়ে গেল অভ্যর্থনা করতে।

কে কাকে অভ্যর্থনা করে। ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই গিরিশকে নমস্কার করলেন। গিরিশ নমস্কার ফিরিয়ে দিল। সে কী! ঠাকুর দেখি আবার নমস্কার করছেন। কী করা, গিরিশ আবার ফিরিয়ে দিল। এমনি চলল কতক্ষণ প্রতিযোগিতা। তবু, কী আশ্চর্য, নিরস্ত হন না ঠাকুর। আবার নমস্কার। প্রতিযোগিতায় হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের।

গিরিশ বললে, 'কিছুতেই দক্ষিণেশ্বরের ত্যাড়া ঘাড় সিধে করতে পারলাম না। হেরে গেলাম।'

উপরে নিয়ে এসে রামকৃষ্ণকে বক্সে বসিয়ে দিল গিরিশ। একটা পাখাওয়ালাকে বললে হাওয়া করতে। শরীর খারাপ ছিল তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পালাল। এদিকে ঠাকুর অভিনয় দেখছেন আর ঘন ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন। কে, কে নিমাই সেজেছে ?

প্রথম অভিনয়ের দিন সকালে বিনোদিনী গঙ্গাস্নান করেছে। একশো আট বার দুর্গা নাম লিখেছে। মহাপ্রভুর উদ্দেশে কাতরে প্রার্থনা করেছে, হে গৌরহরি,

যেন এই মহাসংকটে কূল পাই, যেন তোমার কৃপা আমাকে না ছাড়ে। তুমি আমার দেহ-মনে স্ফুরিত হও।

প্রথম দিন থেকেই চৈতন্যলীলা ভীষণ জমে গেল। গিরিশ বললে, 'কত-কত প্লেই তো বিনোদিনী করেছে আর কত প্রশংসাই না সে কুড়িয়েছে এত দিন। কিন্তু চৈতন্যলীলায় তার নিমাইয়ের অভিনয় সব চেয়ে সেরা। এ একেবারে ভাবুকচিত্তবিনোদন।'

অভিনয়ের শেষে কত লোক ছুটে এসেছে বিনোদিনীর পায়ের ধুলো নিতে। দেশের কত অগ্রগণ্য মানুষ জানিয়ে গেছে অভিনন্দন।

'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়।' গাইতে গাইতে নিজেই আকুল হয়ে কাঁদছে বিনোদিনী। কতদিন ভাবাবেগে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। 'প্রভু, কেবা কার। সকলই সেই কৃষ্ণ।' অধ্যাপকের সঙ্গে তর্কে নিমাইয়ের আর অহংকার নেই। বিনোদিনীও তেমনি আত্মহারা। কেউ কারু নয়, একমাত্র কৃষ্ণই সমস্ত।

অভিনয়ের শেষে বিনোদিনী দেখা করতে এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে। আনন্দময় ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন, নাচতে নাচতে বললেন 'হরিগুরু, গুরুহরি, বল মা হরিগুরু, গুরুহরি।'

বললে তাই বিনোদিনী। বিনোদিনীর মাথার উপর দু হাত রেখে ঠাকুর বললেন, 'মা, তোমার চৈতন্য হোক।'

১১

'স্টার থিয়েটারে যাবেন কী!' ভক্তেরা কেউ-কেউ ঠাকুরকে বাধা দিতে চাইল : 'ওখানে বেশ্যারা অভিনয় করে। ভাবতে পারেন, নিমাই নিতাই পর্যন্ত ওরা সেজেছে।'

'তা হলই বা।' রামকৃষ্ণ উদার হাস্যে উড়িয়ে দিতে চাইলেন : 'আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখব। শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়। মেঘ বা ময়ূরকণ্ঠ দেখলে শ্রীমতী কৃষ্ণময়ী হয়ে উঠত।'

থিয়েটারে যাবার রাস্তায় হাতীবাগানে মহেন্দ্র মুখুজ্জের ময়দার কলে খানিক বিশ্রাম করে যাচ্ছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে তামাক সেজে দিয়েছে।

আর কিছু নয়, সন্ধে কি হয়েছে?' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর : 'তা হলে আর তামাকটা খাই না। সন্ধে হলেই আর কিছু নয়, সব কর্ম ছেড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে।'

দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসেছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে হাওয়া করবার জন্যে লোক লাগিয়েছে গিকিশ।

'বাঃ, এখানে বেশ! এসে বেশ হল।' চারদিকে লোকজন আলো দেখে ঠাকুর

খুব খুশি! বললেন, 'অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মাস্টার সায় দিল।

'আচ্ছা, এখানে কত নেবে?'

'কিছু নেবে না।' মহেন্দ্র আশ্বস্ত করল: 'আপনি এসেছেন তাইতে ওদের খুব আহলাদ হয়েছে।'

'আহাহা, কেমন দেখ।'

ড্রপ উঠে গেছে। মুনি ঋষিরা গান গাইছে:

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী॥'

মাস্টারকে বললেন ঠাকুর, 'দেখ যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং মনে করবে।'

নিমাইয়ের টোলের শিক্ষক, গঙ্গাদাস, বলছে শ্রীবাসকে, 'আমরাও তো বিষ্ণুপুজো করে থাকি। আপনারা সবাই মিলে সংসারটা ছারখার করলেন!'

'দেখলে তো, এ সংসারীর শিক্ষা।' বললেন ঠাকুর, 'এও করো ওও করো। সংসারী যখন শিক্ষা দেয় তখন দুদিক রাখতে বলে।'

নিমাই বলছে, 'আমি ইচ্ছে করে সংসারধর্ম উপেক্ষা করিনি। আমার বরং ইচ্ছে যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—কোন হেতু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি কি করি; ভাবি কূলে রই, কূলে আর রহিতে না পারি। প্রাণ ধায়, বুঝালে না ফেরে, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।'

ঠাকুর বললেন, 'আহা।'

খড়দার নিত্যানন্দবংশের এক গোস্বামী এসেছে, দাঁড়িয়েছে ঠাকুরের চেয়ারের পিছে। তাকে দেখে ঠাকুরের মহা আনন্দ। তার হাত ধরে বললেন, 'এখানে বোসো না। তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।'

নিমাই শচীমাতাকে সন্ন্যাসের কথা বলছে: 'মা গো, হরিপ্রেমে হইব সন্ন্যাসী।'

শচী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছা দেখে দর্শকেরা হাহাকার করছে। ঠাকুর নির্বিচলে দেখছেন এক দৃষ্টে। দুচোখে জল উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

অভিনয় শেষে গাড়িতে উঠছেন, এক ভক্ত জিজ্ঞেস করল ঠাকুরকে, 'কেমন দেখলেন?'

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

থিয়েটারে ঠাকুরের এই প্রথম আসা। নটনটীর জীবন পুণ্য হয়ে গেল, ধন্য হয়ে গেল রঙ্গালয়।

অমৃন বোস লিখল: 'বখাটে নট ও অখাঁটি নটী দ্বারাই দেশে ধর্মপ্রচার হল! ছি ছি, এ কথা মনে এলেও মুখে স্বীকার করতে নেই, তাতে যে মহাপাপ। কিন্তু কে জানে কেন, এ নগণ্য সম্প্রদায়কে জঘন্য বেদীতে বসে কৃষ্ণমহিমাকীর্তন

করতে শুনে বীর ধর্মধ্বজেরা ভয় পেল আর ধর্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জেগে উঠে ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করতে আরম্ভ করল। নগরে গ্রামে পল্লীতে সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছেয়ে গেল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও সগর্বে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আর লজ্জিত হল না।'

শিলা হীরক হয়ে গেল। নাট্যশালা তীর্থের চেহারা নিলে।

'লিখিলা চৈতন্য লীলা, হীরক হইল শিলা,
নাট্যশালা হল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার।'

অমৃতলাল বসু আরো লিখলে :

'বাজে শিঙা বাজে খোল রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণ-পায়॥
গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে।
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে
সেই ইষ্টে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত বক্ষে॥
জপতপ পূজাকর্ম জ্ঞান ভক্তি ধর্মাধর্ম
মর্মের নৈবেদ্য পদে ধীর ধরিলেন ডালি।
দেখে রাম রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ স্রষ্টাসৃষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ কালী॥'

বাড়ির কাছে চৌরাস্তার রকে বসে আছে গিরিশ, ঠাকুর যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বলরাম বোসের বাড়ি যাবেন বুঝি!

ঐ গিরিশ ঘোষ রকে বসে। ঠাকুরের সঙ্গে যাচ্ছে নারান, দেখিয়ে দিল।

গিরিশের সঙ্গে চোখাচোখি হল ঠাকুরের। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর নমস্কার করলেন। গিরিশ ফিরিয়ে দিল নমস্কার। সেদিন আর নমস্কারের প্রতিযোগিতা হল না। কিন্তু কোনো কথাও হল না। ঠাকুর দক্ষিণ দিকে চললেন। যেমন বসে ছিল গিরিশ তেমনি বসে রইল। কিন্তু বসতে দিচ্ছে কই স্থির হয়ে? মনে হচ্ছে কে যেন বুকে বসে টানছে দক্ষিণে। প্রাণ চাইছে আমিও সঙ্গ ধরি। যাই তাঁর পিছু-পিছু। উঠি-উঠি করেও উঠল না শেষ পর্যন্ত। কেন যাব? কেন উঠব? কই আমাকে তো তিনি ডাকেন নি। সামান্য একটা ইশারা পর্যন্ত করেন নি।

কত দিন থেকে গুরুর সন্ধান করছে গিরিশ। একবার তারকনাথ দয়া করেছিলেন, সেই তারকনাথকে ডাকলেই তো চলে যায়। তবে সবাই বলে কেন গুরু ছাড়া উপায় নেই। তারকনাথকে যে ডাকবে, সবাই বলে, গুরু ছাড়া ডাকায় জোর পাবে না, সব এলোমেলো হয়ে যাবে। গুরু জুটলে ঠিক-ঠিক হবে, তাড়াতাড়ি হবে, হাতে-নাতে হবে। বটে! গুরুকে যে ঈশ্বর জ্ঞান করতে হবে,

তেমন মানুষ কোথায় ? মানুষ তো আমার মতই মানুষ। তাকে ঈশ্বর ভাবি কী করে ? আর যাই করি ভণ্ডামি করতে পারব না। আমার গুরুটুরু মিলবে না কোনোদিন।

সেই গুরুভক্ত চিত্রকরের কথা মনে পড়ল। নাটকে দৃশ্যপট আঁকে চিত্রকর। তার গৌরভক্তি আছে বলেই দৃশ্যপটে বুঝি এমন সজীব পেলবতা এসেছে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল গিরিশ, 'তোমার গৌর কী করছেন ?'

'কী আর করবেন !' বললে চিত্রকর, 'ভোগের রুটি খেয়ে যাচ্ছেন !'

'খেয়ে যাচ্ছেন ! বলো কী আশ্চর্যের কথা !'

'আর কী বলব ! সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌরহরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। পরে দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে দাঁতের দাগ।'

'তোমার কী ভাগ্য !' গিরিশ তার হাত চেপে ধরল : 'কী করে এটা হয় বলতে পারো ?'

'গুরুকরণ ছাড়া এ হবার নয়।' চিত্রকর গম্ভীর হল : 'গুরুর নিকট উপদিষ্ট হলেই এ সম্ভব !'

'গুরু—গুরু কোথায় পাব ?'

গিরিশ বাড়ি গিয়ে ঘরে দোর বন্ধ করে কাঁদতে বসল। হে অন্তর্যামী, যদি গুরু ছাড়া এ অন্ধকার না কাটে তাহলে কৃপা করে গুরু মিলিয়ে দাও। নয়তো তুমি নিজেই গুরুরূপে অবতীর্ণ হও।

'পরমহংসদেব আপনাকে ডাকছেন।'

চমকে উঠল গিরিশ। তাকিয়ে দেখল চোখের সামনে নারান দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

'কোথায় ?' গিরিশ উথলে উঠল।

'বলরামবাবুর বাড়ি।'

এক নিশ্বাসে উপস্থিত হল গিরিশ। বৈঠকখানায় এক ধারে বসল নীরবে। বলরাম পীড়িত, তবু উঠে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

'বাবু, আমি ভালো আছি—বাবু, আমি ভালো আছি।' হঠাৎ বলে উঠলেন ঠাকুর।

এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা ? বলরাম পীড়িত হতে পারে কিন্তু আমি সুস্থ, আমি প্রকৃতিস্থ। আমি বিকৃতিশূন্য। বলতে-বলতেই ঠাকুরের কীরকম ভাবান্তর হল। গিরিশের কি মনে হল, এ এক ঢং ?

'না, না, এ ঢং নয়, ঢং নয়।' আপনমনে বলে উঠলেন ঠাকুর। যেন বা গিরিশকেই শাসন করলেন।

কী আশ্চর্য, মনের কথা টের পেলেন কী করে ?

এগিয়ে বসল গিরিশ। জিজ্ঞেস করল, 'গুরু কী ?'

'গুরু আর কী ! কুটনী। যে মিলন ঘটায়। বলতে পারো ঘটক।'

'আমার গুরু মিলবে কবে ?'

'তোমার ভাবনা কী ! তোমার তো গুরু হয়ে গিয়েছে।' ঠাকুর হাসলেন।

'হয়ে গিয়েছে।' স্তব্ধ হয়ে গেল গিরিশ। খানিক পরে জিজ্ঞেস করলে, 'মন্ত্র কি ?'

'শুধু ঈশ্বরের নাম। যে কোনো নাম। যাতে মন খুশি তাই। কবীর কী করে নাম পেল জানো ?' বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'গঙ্গার ঘাটে শুয়ে ছিল কবীর। প্রাতঃস্নান করতে এসে রামানুজ অন্ধকারে কবীরের দেহ মাড়িয়ে দিল। সমস্ত দেহেই রাম বর্তমান এই জ্ঞানে রামানুজ 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করল। সেই শব্দ কানে গেল কবীরের। আর সেই শব্দকেই সে মন্ত্র করলে। রাম নাম জপ করেই তার সিদ্ধি হল।'

তা হলে আমার সিদ্ধি কে আটকায় ? গিরিশ আনন্দে ভরে উঠল। 'তোমার গুরু হয়ে গিয়েছে !' তবে আর কার কথা শুনি ?

রামকৃষ্ণ গিরিশের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। দম্ভ ছাড়া আর কী ! দম্ভের জন্যেই তো মানুষকে গুরু করতে সে রাজি ছিল না। মানুষ হয়ে মানুষের সামনে হাত জোড় করে থাকব, পদসেবা করব, কথায়-অকথায় ওঠবোস করব ? সেই দম্ভেই তো কঠিন হয়ে ছিল। রামকৃষ্ণ তাকে নরম করে দিলেন। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কোথাও যেতে হবে না। তোমার গুরু হয়ে গিয়েছে।

বলরাম এক থালা সন্দেশ এনে ধরল ঠাকুরের সামনে। একটা ভেঙে সামান্য একটুখানি নিলেন ঠাকুর। উপস্থিত অনেকেই প্রসাদ নিল। গিরিশ পারল না হাত বাড়াতে। সে কি লজ্জায় ? না, এখনো তার অহংকার। অহংকার কি সহজে উচ্ছিন্ন হবার ?

বেরিয়ে আসছে, ভক্ত হরিপদ জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন দেখলেন ?'

'বেশ ভক্ত।' উত্তর দিল গিরিশ ? 'বেশ বিনয়ী।'

চিত্তের দারিদ্র্য কি সহজে আরোগ্য হবার ?

ঠাকুর আবার এসেছেন থিয়েটারে।

সাজঘরে বসে আছে গিরিশ, দেবেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে, 'পরমহংসদেব এসেছেন।'

'বেশ তো।' গিরিশ বললে, 'বক্সে নিয়ে গিয়ে বসান।'

'সে কি, আপনি তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবেন না ?'

'কেন ?' বিরক্ত হল গিরিশ: 'আমি না গেলে কি তাঁর গাড়ি থেকে নামাও অসম্ভব ?'

তবুও গেল গিরিশ। ঠাকুরের মুখখানি দেখে তার মনে ধিক্কার জাগল। অমন যাঁর মুখভাব তাঁর প্রতি আমি নির্দয় হয়েছি ! কী হল কে জানে, নিজের থেকেই গিরিশ ঠাকুরের পা স্পর্শ করে প্রণাম করল। হাতে একটি গোলাপ ফুল ছিল, দিয়ে দিল ঠাকুরকে।

ঠাকুর ফুলটি নিলেন। নিয়ে আবার তখুনি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফুল দিয়ে আমি কী করব ? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার !'

'দুজনের অধিকার।' বললেন ঠাকুর, 'এক দেবতার, আরেক ফুল-বাবুর।'

স্টার থিয়েটারের দোতলায় ড্রেস সার্কেলের দর্শকদের বসবার জন্যে আলাদা একটা কামরা ছিল, সেই কামরায় ঠাকুর এসে বসলেন চেয়ারে। আরেকটা চেয়ারে গিরিশ বসল। দেবেন মজুমদারসহ অনেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তারা কেউ বসল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। দেবেনকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'বসুন না।' তবু দেবেন নিস্পন্দ।

গিরিশের বুঝি তখনো আসেনি নম্রতা। গুরুর সঙ্গে যে সমান আসনে বসতে নেই জাগেনি সে মূল্যবোধ। এটা-ওটা বলতে লাগলেন ঠাকুর। গিরিশের মনে হল একটা স্রোত যেন তার মাথা থেকে মেরুদণ্ডে ওঠা-নামা করছে।

একটি বালক ভক্তের সঙ্গে ঠাকুর ভাবাবস্থায় খেলা করতে লাগলেন। এ আবার কোন ঢং! গিরিশের মনে নিন্দার ছোঁয়াচ লাগতেই ঠাকুরের ভাবভঙ্গ হল। গিরিশের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার মনে বাঁক আছে।'

তাতে আর সন্দেহ কী ! বাঁক কি একটা ? বাঁক অসংখ্য।

'কিন্তু এ বাঁক যায় কিসে ?'

'বিশ্বাসে !' সহজ করে বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বিশ্বাস করা কি এতই সহজ ?

সেদিন, বেলা প্রায় তিনটে, থিয়েটারে আছে গিরিশ, একটা চিরকুট হাতে এল। চিরকুটে লেখা, মধুরায়ের গলিতে রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেব আসবেন। কে দিল এ চিরকুট ? কোত্থেকে এল ? কেউ বলতে পারে না। তা রাম দত্তের বাড়িতে আসবেন তো আমার কী। চিরকুটে তো আমার নাম লেখা নেই। তবু গিরিশের বুকের মধ্যে বসে কে টানতে লাগল। সেই টানের কাছে বুঝি কোনো যুক্তিই টেঁকে না।

অজানা বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাব ? ভাবতে-ভাবতে অনাথবাবুর বাজার পর্যন্ত চলে এল গিরিশ। আমাকে সেখানে কে চেনে ? সেখানে পরমহংসদেব এসেছেন তো আমার কী। ভাবতে-ভাবতে একেবারে রাম দত্তের বাড়ির দুয়ারে এসে উপস্থিত।

দোরগোড়ায় সুরেশ মিত্তির বসে। গিরিশকে দেখে অবাক হবার ভাব করল : 'একী, আপনি এখানে কী মনে করে ?'

গিরিশ পস্টাপস্টি বললে, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করতে।'

গিরিশকে ধরে সুরেশ মিত্তির, কাছেই, তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। শুনুন আমাকে তিনি কী দারুণ কৃপা করেছেন! সে সব জেনে গিরিশের কী লাভ! গিরিশ যদি কৃপা পায় তা হলেই সে বরং চরিতার্থ।

'শুনে কী হবে ? চলুন দেখি, প্রত্যক্ষ করি।'

গিরিশই টেনে নিয়ে গেল সুরেশকে। দেখল উঠোনে রামবাবু খোল বাজাচ্ছেন আর নাচছেন রামকৃষ্ণ। গান হচ্ছে! 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কে বলে এ রাম দত্তের অঙ্গন? এ টলমল করা নদীয়া। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য এ আনন্দ থেকে গিরিশ বঞ্চিত। সে না পারছে গাইতে না বা বাজাতে। নৃত্য করা তো দূরস্থান। কিন্তু প্রণাম করতে বাধা কী!

নৃত্য করতে-করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ভক্তেরা প্রণাম করতে লাগল। গিরিশের ইচ্ছে হল, কাছে যাই, নত হই, কিন্তু লোকলজ্জায় পারল না এগোতে। লোকে কী ভাববে সে ভাবনাই বড় হয়ে রইল।

ঠাকুর বুঝি বুঝলেন তার মনের ভাব। সমাধিভঙ্গে আবার নৃত্য সুরু করলেন। আর এবার গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন সমাহিত ভঙ্গিতে। গিরিশের আর এগিয়ে যাবার পরিশ্রম করতে হবে না। ইচ্ছে হলে একটু নুয়ে পড়েই সে ঠাকুরের চরণস্পর্শ করতে পারে। আশ্চর্য, লোকলজ্জাকে আর ভয় নেই। ঠাকুর নিজের থেকেই অনেক এগিয়ে এসেছেন। আর নত হতে পরিশ্রম নেই। গিরিশ অসঙ্কোচে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করল।

সংকীর্তনশেষে ঠাকুর বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন।

গিরিশের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। জিজ্ঞেস করলে, 'সেদিন যে বাঁকের কথা বললেন, আমার সে বাঁক যাবে তো?'

'যাবে।' বললেন ঠাকুর।

'যাবে?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না গিরিশ।

'যাবে।'

'সত্যি যাবে?' গিরিশ প্রায় উচ্ছ্বসিত।

'যাবে।'

কাছেই ভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিল, সে ধমকে উঠল: 'যাও না, উনি বললেন, যাবে, তবু মিছিমিছি কেন ত্যক্ত করছ?'

অন্য সময় হলে মনোমোহনকে ছেড়ে কথা কইত না গিরিশ। আজ, আশ্চর্য, মনের মধ্যে কোনো রূঢ়তাই খুঁজে পেল না। সত্যিই তো, বিরক্তই তো করছি। ঠাকুর তো একবার বলেইছেন যে যাবে, তবে তাঁকে একশোবার বলাবার চেষ্টা কেন? যাঁর এক কথায় আমার বিশ্বাস নেই তাঁর একশো কথায়ও আমার বিশ্বাস হওয়া উচিত নয়। মনোমোহনের দোষ নেই। আসলে আমিই পাপী। আমিই অবিশ্বাসী।

থিয়েটারে ফিরে যাচ্ছে গিরিশ, দেবেন সঙ্গ ধরল। বললে, 'কেমন দেখলেন?'

'কী বলব। কিন্তু, বলুন তো, আমার প্রতি তাঁর কৃপা হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। আপনি একবার দক্ষিণেশ্বরে যান।'

যাব। কিন্তু যখন জানবেন আমি কত বড় পাপাত্মা, কত বড় দুরাচার, তখন নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু যাই বলি, ওঁর মুখে তো শুধু শান্তি আর ক্ষমা, শুধু প্রশ্রয়-আশ্রয়। কাউকে নিন্দা করছেন, প্রত্যাখ্যান করছেন এমন তো

একটাও কোথাও কুটিল রেখা নেই। সব বলব তাঁকে। আত্ম-পরিচয় দেব। বলব সব ব্যর্থতার কাহিনী। তিনি না শুনবেন তো কে শুনবে। তিনি না তুলবেন তো কে তুলবে।

'ও মশাই, কাল আপনার জন্যে একটা চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন ?'

পরদিন থিয়েটারে যাবার পথে একজনের সঙ্গে দেখা।

গিরিশ দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে ?'

আমাকে চিনবেন না। আমার নাম তেজচন্দ্র মিত্র।

'তা আপনি চিরকুট পেলেন কোথায় ? কে দিল ?'

'কে আবার দেবে। ও তো আমার হাতেই লেখা। থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতেই লিখলাম চিরকুট।'

'কিন্তু চিরকুটের সংবাদটুকু আপনাকে দিল কে ?' গিরিশ ঝাঁজিয়ে উঠল।

'কে আবার। স্বয়ং ঠাকুর দিলেন। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দাও আমি এসেছি।'

'স্বয়ং ঠাকুর বললেন ?' গিরিশ বিহ্বল হয়ে গেল : 'কিন্তু আমাকে কেন ডাকলেন বলতে পারেন !'

'তার আমি কী জানি।' তেজচন্দ্র স্তব্ধনেত্রে তাকাল : 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে সে কৈফিয়ৎ আমার জানা নেই।'

১২

হোমিওপ্যাথি করে কত লোকের অসুখ সারায় গিরিশ কিন্তু তার নিজের অসুখ সারায় কে ? শীতের রাত, আড়াইটে, থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরে শুয়েছে, গিরিশ শুনতে পেল রাস্তায় কে কাঁদছে। চাকরকে পাঠিয়ে দিল, দ্যাখ কে কাঁদে।

চাকর এসে বললে, একটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান।

'কী হয়েছে ?'

'জ্বর।'

'রাস্তায় কেন ?'

'ঘরবাড়ি নেই। গরুর গাড়ির নিচে শুয়ে কাঁপছে। গায়ের উপর একটা চাদর পর্যন্ত নেই।'

বিছানায় ছটপট করতে লাগল গিরিশ। মনে হল তার বিছানার এই গরম এই যেন এক জ্বর আর এই নরম আরাম এ এক কণ্টকস্তূপ। টিঁকতে পারলো না। গিরিশ উঠে পড়ল। লোকটাকে একটা কম্বল দিল। দিল ওষুধ। বললে, 'যা, ভয় নেই, এই এক দাগ ওষুধেই তোর জ্বর সেরে যাবে।'

'সংসার যে সাগর এ কথা ঠিক, কুলকিনারা নেই।' বলছে গিরিশ, 'ভ্রান্তি'

নাটকে রঙ্গলালের মুখ দিয়ে : 'কিন্তু অভ্রান্ত একটি ধ্রুবতারাও আছে। সেটি মানুষের দয়া মানুষের মমত্ববোধ।'

যোগেনের ভীষণ মাথা ধরেছে, বলরাম বোসের বাড়িতে একটা ঘরে তক্তপোশের উপর পড়ে আছে। তুই যা তো মহীন, গিরিশবাবুকে বল তো একটা কিছু ওষুধ দিক।

'কেন মাথা ধরা তা কিছু বলব ?'

'কেন আবার কী। ক'দিন অনবরত জপ করছি, রাত্রেও বিশ্রাম নেই, হয়তো তাই মাথাব্যথা।'

পাশের ছোট গলি দিয়ে মহীন ছুটে চলে এল গিরিশের কাছে।

'শিগগির চলুন। যোগেনের সাংঘাতিক মাথা ধরেছে।'

গিরিশ স্নান করতে যাচ্ছিল, থামল। বললে, আমি এখুনি যাচ্ছি। তুই গিয়ে যোগেনকে একটু ফিকে চা করে খাইয়ে দিগে যা, তা হলেই মাথার যন্ত্রণা ভালো হবে।'

'বলেন কী!' মহীন বিমূঢ় মুখে বললে, 'যোগেন যে চা খায় না।'

'তা আমি জানি।'

'সে কী! চা খেলে যে তার মাথা ধরে।'

'সেই জন্যেই তো বলছি ফিকে চা খেলে উপকার হবে। আমি পরে গিয়ে যা ওষুধ দেবার দিচ্ছি।'

দুধ-চিনি না দিয়ে ফিকে করে চা খাইয়ে দিল মহীন।

গিরিশ এসে দেখল তাকিয়া কোলে নিয়ে তাতে দু কুনুই চেপে তক্তপোশে বসে যোগেন গল্প করছে।

'কী রে, মাথাব্যথা কেমন আছে ?' গিরিশ হুমকে উঠল।

যোগেন হাসল। বললে, 'ফিকে চা-টা খেতে মাথাব্যথা ছেড়ে গিয়েছে।'

'দেখলি শালা, হোমিওপ্যাথিক ওষুদের গুণ দেখলি ?' গিরিশও আপন মনে হাসতে লাগল।

'তুমি কি চিকিৎসা করছ হে ?' ডাক্তার কাঞ্জিলাল বললে একদিন গিরিশকে, প্যাথলজি না জানলে কখনো চিকিৎসা করা যায় না।'

মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র, খ্যাতিমান অস্ত্র-চিকিৎসক, সে একথা বলতে পারে বৈ কি।

'কিন্তু তুমি যে এত কাশছ, আমাদের একটা দীনহীন ওষুধ খেয়ে দেখ না।' মৃদুরেখায় হাসল গিরিশ।

'খেতে পারি, কিন্তু যদি সেরে যাই, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে সেরে গেল বলতে পারব না।'

'সেরে গেলে তবে কী বলবে ?'

'বলব এমনিই সেরে গেছে।'

'তাই বোলো।' হাসল গিরিশ : 'ওষুধের গুণ তোমাকে স্বীকার করতে হবে

না। তোমার সেরে গেলেই হল।'

ওষুধ খেয়ে বাড়ি চলে গেল কাঞ্জিলাল।

পরদিন আবার এসেছে গিরিশের বাড়ি।

'কী হে, রাত্রে কেমন ছিলে ওষুধ খেয়ে?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'রাত্রে আর কাশি হয়নি বটে, কিন্তু তা তোমার ওষুধের গুণে নয়—ওষুধ না খেলেও আর কাশি হত না।'

'প্যাথলজি হত।' হাসতে লাগল গিরিশ।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা প্রহসনে ডাক্তার নন্দীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছে গিরিশ: 'বদ্যি হাকিম হোমিওপ্যাথ—এরা রোগের কী জানে! প্যাথলজি পড়েছে?'

লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করে গিরিশ। বাল্যবন্ধু নৃপেন বোসের পুত্রবধূ স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছে। লক্ষণ কী? ঘুমুলে পর কালো-কালো কুকুরের বাচ্চা স্বপ্ন দেখে। বার্লির জল পর্যন্ত হজম করতে পারে না, ডাক্তার শশী ঘোষের বোনের উপসর্গ, শশা খাবার ইচ্ছে। আর শৈলেশ্বর বসুর ছোট ছেলে আমোশায় ভুগছে, কিন্তু বায়না ধরেছে আদা খাবে। লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করে সমস্ত রোগের আরাম করল গিরিশ।

এবার আমার রোগের আরাম করো।

তোমার রোগের লক্ষণ কী?

তিন লক্ষণ। মদ। কাম। আর অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মদ খাচ্ছিস তো খা না। কতটুকু খাবি? আর কত দিন খাবি? তুই এ নেশা করছিস আরেক নেশার খবর পাসনি বলে। তোকে যখন সে নেশা পেয়ে বসবে, তখন এ নেশা কোন ছার!'

মদ খায় এ আমাদের ভালো লাগে না। ভক্তরা কেউ-কেউ আপত্তি করে ঠাকুরের কাছে।

'ও মদ খায় তাতে তোর কী!' ধমকে ওঠেন ঠাকুর: 'তুই তোর নিজের কাজ দ্যাখ, পরের ব্যাপারে তোর মাথাব্যথা কেন? ও শূরভক্ত, বীরভক্ত, মদে ওর দোষ হবে না।'

'হবে না?'

'না, ওরা ভৈরবের অংশে জন্ম, তাই মদ্যপানে এত আসক্তি।' ঠাকুর পূর্বকথা স্মরণ করলেন: 'তখন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের মায়ের জন্যে খুব কাঁদছি, একদিন দেখতে পেলাম এক উলঙ্গ উগ্র বালকমূর্তি নাচতে নাচতে এসে মন্দিরে প্রবেশ করল। তার মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে রুপোর গেটি, বাম কুক্ষিতে সুরাপাত্র, ডান হাতে সুধাভাণ্ড। জিজ্ঞেস করলাম, কে তুই? বললে, আমি ভৈরব। এখানে এসেছিস কেন? উত্তর দিল, আপনার কাজ করতে এসেছি। এই সেই ভৈরব। এই গিরিশই সেই ভৈরব। ওর ভয় কী। মদ ওকে বিপথগামী করবে না। ও মদ-মাতাল আছে মন-মাতাল হয়ে যাবে।'

আর কাম?

'দেহ ধরেছিস, কাম থাকবে না ?' বললেন ঠাকুর, 'কাম না থাকলে তো ঈশ্বর-কামনাও থাকবে না। একটু বেঁকিয়ে দে, কামকে প্রেম কর।'

আর অহংকার ?

অহং কার ? যখন এ বুদ্ধি জাগবে যা নিয়ে জাঁক করছি সে আমার কৃতিত্ব নয়, আরেকজনের কৃপা, তখন আর অহংকার কোথায় ?

মদ যাবে স্মরণে-মননে। কাম যাবে প্রেমে ভক্তিতে। আর অহংকার শরণাগতিতে, সর্বসমর্পণে।

ঠাকুর তাঁর ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় একখানা কম্বলের উপর বসে আছেন। পাশে বালক ভক্ত ভবনাথ।

'আসবে হে আসবে।' বলছেন ঠাকুর, 'ঠিক আসবে। না এসে যাবে কোথায় ? আমি ষোল আনা চেয়েছিলুম, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

ঠিক তখুনি গিরিশ এসে উপস্থিত। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু আবৃত্তি করছে মনে-মনে।

'এসেছিস ?' ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : 'আমি জানি তুই আসবি। মাইরি জিজ্ঞেস কর একে', ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন : 'এতক্ষণ তোর কথাই বলছিলাম। বোস, পাশে এসে বোস !'

পাশে বসল গিরিশ। বললে, 'আমি কিন্তু উপদেশ শুনব না। নিজে ঢের-ঢের লিখেছি উপদেশ—ওসবে কিছু হয় না, হবার নয়। আমার যদি কিছু করে দিতে পারেন তাই করুন।'

'আমার কিছু করে দিতে হবে না। তোরটা তুই নিজেই করে নিতে পারবি।' ঠাকুর হাসলেন। রামলালকে উদ্দেশ করে বললেন, রাম, কি রে সেই শ্লোকটা, বল্ তো—'

শ্লোক আবৃত্তি করল রামলাল। তার অর্থ,- নির্জনে পর্বতগহ্বরে বসলেও কিছুই হয় না। বিশ্বাসই একমাত্র পদার্থ।

'তোমার তো বিশ্বাস আছে গো।' বললেন ঠাকুর, 'আর তবে কী চাই ?'

'বিশ্বাস আছে !'

'বিশ্বাস না থাকলে কি ওসব জিনিস কলমে আসে !'

তা হলে শুধু বিশ্বাসেই হবে ? গিরিশ সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করল সে পাপী নয়, সে নির্মল নিষ্কলুষ। এমন ভাবনা ভাবাতে পারে কে এই আশ্চর্য পুরুষ !

জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে ?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'কে আপনি যার পায়ে আমার মত দাম্ভিকের মাথা নত হল ! এক নিমেষে একেবারে ভয়শূন্য হয়ে গেলাম !'

'আমার কেউ বলে রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ', হাসিভরা মুখে

বললেন ঠাকুর, 'আমি এইখানেই থাকি।'

প্রাণ ঢেলে প্রণাম করল গিরিশ। ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দর্শন পেলাম, এখন আমি কী করব?'

'কী করবি। যা করছিস তাই কর।'

'মানে, থিয়েটার?'

'তা কর না।'

স্বধর্মে ঠিক অবস্থিত রাখলেন। ভাব নষ্ট করলেন না।

চৈতন্যলীলার পর গিরিশ প্রহ্লাদচরিত্র লিখলে। নামল স্টারে, অমৃত মিত্র হিরণ্যকশিপু, বিনোদিনী প্রহ্লাদ। দু অঙ্কের ছোট নাটক, তার সঙ্গে লেজুড় জুড়ল অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'। ঠাকুর দেখতে এসেছেন। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম আর নারায়ণ।

'বা, তুমি বেশ সব লিখছ!' গিরিশকে বললেন ঠাকুর।

'শুধু লিখছিই। কিন্তু ধারণা কই?' গিরিশের স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

'না, তোমার ধারণা আছে।' আশ্বস্ত করলেন ঠাকুর: 'ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না।'

'কিন্তু মনে হয়', গিরিশ বললে, 'থিয়েটারগুলো আর করা কেন?'

'না, না, ও থাক। ওতে লোকশিক্ষা হবে।'

রঙ্গমঞ্চে প্রহ্লাদকে দেখে ঠাকুর প্রহ্লাদ-প্রহ্লাদ বলে ডেকে উঠলেন। প্রহ্লাদকে হাতির পায়ের তলায় ফেলেছে, ঠাকুর কেঁদে খুন। অগ্নিকুণ্ডে ফেলেছে, আবার কান্না। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ দেখে সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে গিরিশ তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, 'এবার কি বিবাহ-বিভ্রাট দেখবেন?'

'না, না, প্রহ্লাদচরিত্রের পর ওসব কী!' ঠাকুর আপত্তি করে উঠলেন: 'বেশ ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছিল, এখন আবার কিনা সংসারের কথা! যা ছিলুম তাই হলুম! আমি ওসব বিভ্রাট দেখব না।'

'আচ্ছা, বলুন, আমার আর কর্মই বা করা কেন?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'না, কর্ম ভালো।' বললেন ঠাকুর, 'জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে। যাঁরা জ্ঞানী, আপ্তসার, তাঁদের শুধু আমার হলেই হলো। কিন্তু যাঁরা প্রেমী তাঁরা ঈশ্বর লাভ করেও আবার লোকশিক্ষা দেন। তাঁরা কিন্তু পরের জন্যে রাখেন। তুমিও পরের জন্যে রাখবে।'

'আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন।' নত হল গিরিশ।

'তুমি মার নামে বিশ্বাস করো, হয়ে যাবে।'

'এ পাপীরও হয়ে যাবে?'

ঠাকুর গান ধরলেন:

'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে।
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে।
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—
ভরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।।'

আবার বলছেন : মহামায়া দ্বার ছাড়লে তবে দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব—সন্তানভাব, দাসীভাব আর সখীভাব। দাসীভাবে সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। সন্তান-ভাব খুব ভালো। বীরভাব ভালো নয়। নেড়া-নেড়ীদের ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা। এভাবে প্রায়ই পতন—

গিরিশ বললে, 'একসময়ে আমার ঐ ভাব এসেছিল।'

ঠাকুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন গিরিশের দিকে।

'আপনার কাছে লুকোব কী, ঐ আড়টুকু আছে। এখন উপায় কী বলুন।'

ঠাকুর বললেন, 'উপায় কী। তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা করবার তা করুন। কিন্তু, কী জানো, রজোগুণ না গেলে শুদ্ধ সত্ত্ব না এলে ভগবানে মন স্থির হয় না। তাঁর উপরে আসে না ভালবাসা।'

'কিন্তু আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন।'

'করেছি নাকি?' ঠাকুর তাকালেন সরল চোখে : 'তবে বলেছি, হ্যাঁ, আন্তরিক হলে হয়ে যাবে।' বলেই উচ্চকিত হয়ে উঠলেন : 'শালারা গেল কই?'

বাবুরাম আর নারায়ণ কোথায় কী দেখছে, মাস্টার তাদের ডেকে আনল।

ঠাকুর উঠি-উঠি করছেন, একজন এসে বললে, 'সে কী, বিবাহ-বিভ্রাট দেখবেন না?'

'এটা কী করলে?' ঠাকুর গিরিশকে লক্ষ্য করলেন, 'প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ-বিভ্রাট? আগে পায়েসমুণ্ডি তারপর সঙ্কীর্তন?'

ঠাকুর উঠে পড়লেন। গিরিশ নটীদের ডেকে আনল। প্রণাম করো ঠাকুরকে। নটীরা একে-একে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। কেউ কেউ বা স্পষ্ট পায়ে হাত দিয়ে।

ঠাকুর বলছেন, 'থাক মা, থাক।' পরে বলছেন ভক্তদের দিকে তাকিয়ে : 'সবই তিনি, এক-এক রূপে।'

স্টারে প্রহ্লাদচরিত্র জমল না। বেঙ্গল থিয়েটারেও নামিয়েছে প্রহ্লাদচরিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা। পূর্ণাঙ্গ নাটক, প্রচুর সংকীর্তনে বোঝাই, তাছাড়া ষণ্ড ও অমর্কের নিম্নস্তরের হাস্যরস। আর প্রহ্লাদের ভূমিকায় নতুন অভিনেত্রী কুসুমকুমারী গানের জৌলুসে টেক্কা দিল বিনোদিনীকে। কুসুমকুমারীর নাম হয়ে গেল 'প্রহ্লাদকুশী'।

গিরিশ তারপর 'নিমাই সন্ন্যাস' লিখল। শিশির ঘোষ বলে দিলেন, এবার এ

নাটকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা একটু প্রকট করো।

এবারও বিনোদিনীই নিমাই।

এবারও ঠাকুর এলেন দেখতে। দেখে এত ভাবাবিষ্ট হলেন যে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করে ধরলেন গিরিশকে।

হরিপদ চাটুজ্জে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাস ?'

'প্রায়ই যাই।' বললে হরিপদ, 'আমাদের বাড়ির কাছে যে বাড়ি।'

'হ্যাঁ রে, নরেন যায় ?'

'কখনো কখনো দেখি নরেনকে।'

'আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ এখানকার সম্পর্কে যা বলে তাতে নরেন কী বলে ?'

'নরেন তর্কে হেরে গেছেন।'

'না, না, তর্কে তাকে কে হারায় !' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধস্বরে, 'নরেন বললে, গিরিশ ঘোষের যখন এত বিশ্বাস তখন আমি কেন কথা বলতে যাব ?'

'গিরিশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন।' হরিপদ বললে তন্ময়ের মত : 'এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন। কত কী দেখেন !'

'তা আশ্চর্য কী।' বললেন ঠাকুর, 'গঙ্গার কাছে গেলেই তো অনেক জিনিস দেখা যায়। নৌকো, জাহাজ, কত কী।'

গিরিশ ঘোষ বলেন, 'এবার কর্ম নিয়ে থাকব। সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত-কলম নিয়ে বসব আর সমস্ত দিন লিখব।'

'যা বলে তা পারে ?'

'পারে না। আমরা যাই আর আমরা গেলেই এখানকার কথা বলে।' হরিপদ বললে গম্ভীর হয়ে, 'আপনি নরেনকে পাঠাতে বলেছিলেন, গিরিশবাবু বললেন, বেশ তো, আমি নরেনকে গাড়ি করে দেব।'

গিরিশের বাড়িতে নরেন এসেছে। গুন গুন করে গান গাইছে :

'নাহি সূর্য নাই জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥'

গান শুনে গিরিশের ছোট ভাই অতুল আনন্দবিহ্বল। বললে, 'এ গানটা নতুন শুনছি। এটা কার গাঁথা ? মেজদার ?'

মেজদা গিরিশ বললে, 'মেজদার সাধ্য নেই এমন গান বাঁধে। এ স্বয়ং নরেনের রচনা।'

'তুমি কী যে বলো।' নরেন বললে, 'তোমার গানের কি তুলনা আছে ? চৈতন্যলীলার কত গান বাঙালির মন-প্রাণ আকুল করে রেখেছে। আমিও কত গেয়েছি আর কেঁদেছি। 'তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ। কত পাষণ্ড তনয়, কত কথা কয়, তবু নাকি প্রেম যেচেছ ॥'

সেদিন নরেন যে এল, কী রকম এল বিভোর অবস্থায়, দেহের হুঁস নেই, বাস্তব সংসারকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। এসে রাস্তার দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে

বসল। বললে, 'দেখ জি-সি, আমার ভগবান পাওয়া হল না। সব ত্যাগ না করলে লাভ হয় না ভগবান। দেখ, আমি সব ত্যাগ করেছি কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ঐ পাগলা বামুনটাকে ছাড়তে পারছি না। ওই যত আমার কণ্টক হয়েছে।'

শুনে গিরিশ চুপ করে রইল।

'সে কি, তুমি কিছু বলছ না যে।'

'আমি এর আর কী বলব।' দুই চোখ ছল ছল করে উঠল গিরিশের : 'তুমি কাকে ছাড়তে পারছ কি পারছ না তার আমি কী জানি।'

গিরিশও কি থিয়েটার ছাড়তে পারছে ? বেশি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্যে 'নিমাই সন্ন্যাস' তেমন চলল না। তারপর গিরিশ লিখলে 'প্রভাসযজ্ঞ'। দেখাদেখি বেঙ্গল থিয়েটার নামাল 'প্রভাসমিলন'। স্টারের প্রভাসযজ্ঞে তিনকড়ি নিল যশোদার পার্ট। আর বিনোদিনী সত্যভামা সাজল। হিঙ্গনবালা ও সুশীলাবালাকে দেখ রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায়। 'চল লো বেলা গেল লো, দেখব রাধা শ্যামের বামে।' সকলের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল এ গান। কাপড়ের পাড়ের উপরও উঠল ছাপা হয়ে।

১৩

তারপর গিরিশ বুদ্ধদেবচরিত লিখল। অমৃত মিত্র সাজল সিদ্ধার্থ আর বিনোদিনী গোপা। আর পুত্রহারা মাতা ক্ষেত্রমণি। চৈতন্যলীলায় যদি প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস, বুদ্ধদেবচরিতে শান্তরসের নির্ঝরিণী। অন্তত একখানা গানের জন্যে বুদ্ধদেবচরিত অমর হয়ে থাকবে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে নরেনের। বাড়ির দালানে পাইচারি করছে আর উদাত্তমধুর স্বরে গান গাইছে। আশপাশের বাড়ির লোকেরা জেগে উঠে শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। যেমন প্রাণ দিয়ে লেখা তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া। বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেওয়া।

'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কি খেলায় ? আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর ?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই।
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়

কেনবা এসেছি কোথা নিয়ে যায়
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনি নাই ॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি
যাই যাই কোথা—কূল কি নাই ?'

গিরিশের বাড়ি এসেছে নরেন। থামে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে মেঝের উপর। ঔদাস্যের প্রতিমূর্তি। কাছেই অমৃত মিত্র বসে। সারা রাত থিয়েটার করেছে, এখন এসেছে 'জ্যান্ত বুদ্ধের' সঙ্গ করতে।

'আরে, আসুন, আসুন।' কাকে দেখে গিরিশ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আগন্তুক ঘরে ঢুকতে পরিচয় করিয়ে দিল গিরিশ। ইনি একজন মুন্সেফ। আমার অনেক দিনের চেনা।

আর কারু পরিচয় নেবার দরকার নেই এমনি উদ্ধত নির্লিপ্ততায় এক পাশে বসলেন মুন্সেফবাবু। তাকালেন নরেনের দিকে। ন্যাড়া মাথা, খালি পা, কে এ হতচ্ছাড়া! একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সশ্রদ্ধ চোখে দেখছেও না ধর্মাবতারকে।

'হ্যাঁ হে', গিরিশকে লক্ষ্য করলেন মুন্সেফবাবু, 'বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল? ইংরিজি বইয়ে অবশ্য তাই লিখেছে। একেবারেই নাকি ভগবান মানত না। ধরো না ওই বইটা—'বলে ইংরিজি বিদ্যে ফলাতে লাগল : 'তোমার কী মত ?'

'আমার আবার মত কী। ওই ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।' গড়গড়া টানতে-টানতে নরেনের দিকে ইসারা করল গিরিশ।

'ও কে ?' একটু বা বিরক্ত হলেন মুন্সেফ।

'একটা ভিখিরি। দুটো ভাতের জন্যে এখানে বসে আছে।' একমুখ ধোঁয়ার আড়ালে গিরিশ তার হাসিটি গোপন করল।

'ও আবার কী জানে!' মুখ-চোখে এমনি ভাব ফুটিয়ে মুন্সেফ তাকালেন নরেনের দিকে : 'কি হে, তুমি কিছু বলতে পারো ? বুদ্ধ কি নাস্তিক ?'

কাগজে চোখ নিবিষ্ট রেখে নরেন বললে গম্ভীর স্বরে, 'এই যে সামনেই বুদ্ধদেব বসে রয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করুন। সেই ভালো বলতে পারবে।'

অমৃত মিত্র হেসে উঠল। বললে, 'আমি থিয়েটারে নামি, পার্ট মুখস্থ বলি, ভাঁড়ামো করি, আমি কী বলব!'

'কী হে বলো না কী জানো ?' নরেনের উপর প্রায় হুমকে উঠলেন মুন্সেফ।

'বুদ্ধ নাস্তিক ছিল।'

'তুমি তা কোথায় পড়লে ? কোন বইয়ে ? অথরের নাম কী ?' একটা বেশ

জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নিয়ে মাততে পারবেন মুন্সেফ উৎসাহিত হলেন : কী বললে, কোন কাগজে লিখেছে ?'

'হায়রে-মজা-শনিবার কাগজে লিখেছে ।' কাগজে মুখ আড়াল করল নরেন ।

'কি, কী বললে ?' চটে উঠলেন মুন্সেফ । তিনি জানতেন হায়রে-মজা-শনিবারটা মাতালদের বুলি । 'হায়রে মজা শনিবার, বড় মজার রবিবার ।' মেঝেতে লাঠি ঠুকলেন মুন্সেফ : 'বলি কাজকর্ম কিছু করো না কেন ? বসে বসে গিরিশের অন্নধ্বংস করতে লজ্জা করে না তোমার ? দেখছ সবাই হাসছে তোমাকে দেখে ?'

'আমাকে দেখে কী ?' নরেন মুখের থেকে কাগজ সরাল : 'না, আপনার পাণ্ডিত্য দেখে ?'

'ভেভুড়ে ভিখিরি, তুমি তো তা বলবেই ।' চোখ লাল করে চলে গেলেন মুন্সেফ ।

কলকাতার বড় এক ডাক্তার 'বুদ্ধদেবচরিত' দেখতে এসেছে । দেখতে এসেছে শোকে সান্ত্বনা খুঁজতে । খানিকক্ষণের জন্যে যদি অন্যমনস্ক থাকা যায় । এই কিছু দিন হল একমাত্র পুত্র মারা গিয়েছে । নিজে ডাক্তার হয়েও পারেনি বাঁচাতে । চিকৎসায় কম পড়ে গেছে । এ কী, নাটকেও যে পুত্রহারা মা ।

বুদ্ধদেবকে বলছে, 'আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলো ।'

বুদ্ধদেব বললে, 'কিছু কৃষ্ণ তিল নিয়ে এস ।'

রমণী যাচ্ছে তিলের সন্ধানে, বুদ্ধদেব ডাকল : 'শোনো, তেমন বাড়ি থেকে নিয়ে এস যে বাড়িতে মৃত্যু হয়নি ।'

রমণী কোথাও পেলনা তেমন বাড়ি । ফিরে এল বুদ্ধের কাছে । মৌনমুখে নতনেত্রে দাঁড়াল !

'তবেই দেখছ মৃত্যুছাড়া জীবন নেই ।' বললে বুদ্ধ, 'মৃত্যুই জীবনের ছায়া । শুধু ধৈর্য ধরো ।'

রমণী বললে, 'পিতা তব উপদেশে
ধৈর্যের বন্ধন দিব প্রাণে ।
কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার ।'

আত্মহারা হয়ে ডাক্তার কেঁদে ফেলল সিটে বসে । 'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার ।' ছুটে চলে এল গিরিশের কাছে । বললে, 'আপনি ঠিক বলছেন, ঠিক বুঝেছেন । হ্যাঁ, পুত্রশোকে ধৈর্য ধরব বৈ কি । ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কী করবার আছে ! কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার ।' হু-হু করে কাঁদতে লাগল ডাক্তার ।

কোন এক অভিনেত্রীর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে গিরিশ । যতক্ষণই থাকুক, শেষ রাত্রির দিকে হলেও বাড়ি ফিরবেই, একবার নিজের শয্যায় শুয়ে নেবে । পুরো রাত কোনোদিনই গণিকালয়ে কাটাবে না, রাত ভোর হতে দেবে না সেখানে । কিন্তু সেদিন কী খেয়াল হল গিরিশ ঠিক করল বাড়ি ফিরব না কিছুতেই । এই

অপবিত্র আলয়েই থেকে যাব সারারাত। ঘুমুচ্ছে গিরিশ, রাত প্রায় আড়াইটে, হঠাৎ মনে হল তাকে বিছেয় কামড়েছে। সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

'কী হল?' সঙ্গিনী প্রশ্ন করল।

'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'বাক্সর চাবি বৈঠকখানায় ফেলে এসেছি।' দরজা খুলল গিরিশ: 'আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে তবে তার শান্তি। কী ব্যাপার, পরদিন গিরিশ সটান চলে এল দক্ষিণেশ্বরে। কী জানি কেন, সকল কথা ব্যক্ত করল ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'শালা, তুই কি ভেবেছিস তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাবি? ও তোকে জাত সাপে ধরেছে, তিন ডাক ডেকেই তোকে চুপ করতে হবে।'

'এখন থেকে আমি তবে কী করব?' গিরিশ আকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

'কী আবার করবি! যা করছিস তাই করবি।'

'যা করছি মানে? এই বই লেখা, থিয়েটার করা?'

'মন্দ কী এই সব? বই লেখা থিয়েটার করাটাও তো কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবি কী করে? জমি পাট করে রুইলেই তো ফসল ফলবে।'

নতুন কিছুই করবার নেই?

'শোন' ঠাকুর অন্তরঙ্গ হলেন: 'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল। তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে স্মরণমননটা একটু রাখিস, পারবিনে?'

গিরিশ চুপ করে রইল।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন?'

'আমার মত বাউণ্ডুলে কি কেউ আছে যে কথা দেব?'

'কেন কী হল?'

'সংসারী লোকের কাছেই কথা রাখতে পারি না আর আপনার কাছে কী করে স্বীকার করি? যদি না পারি?'

'কেন পারবিনে? এই দ্যাখ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু ভগবানকে মনে করবি।'

'রোজ ঘুম ভাঙে নাকি সকালে?' গিরিশের মুখে আর্তি ফুটে উঠল: 'কত দিন ঘুম ভাঙতেই দুপুর হয়ে যায়।'

'বিকেলে?'

'বিকেল যেখানে কাটে সে জায়গার নাম নাই শুনলেন। সেখানে আরেক রকম ঘুম। মোহঘুম।'

ঠাকুরের যেন নিজের কত গরজ তেমনি আকুলতা নিয়ে বললেন, 'বেশ, খাবার আগে ?'

'খাবার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।' বললে গিরিশ, 'কতদিন যায় খাওয়াই হয় না। কতদিন গন্ধের শিঙাড়া কচুরি খেয়েই দিন কেটেছে থিয়েটারে। ও পারব না মশাই।'

'বেশ তো, শোবার আগে ?'

'খুব ভাল সময়ই বের করেছেন যা হোক।' গিরিশ হাসল নিজের মনে: 'কোথায় শুই ? কখন শুই ? কোন বিছানায় ?'

পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে গিরিশ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুক ভরে।

কিন্তু ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। এ যে কেউটের ছোবল।

বললেন, 'যা শালা, তোকে কিছুই করতে হবে না। আমাকে তুই বকলমা দে।'

বকলমা ! সে আবার কী জিনিস ! গিরিশ অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল।

তার মানে, তোকে-কিছুই করতে হবে না, তোর সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দে। তোর হয়ে আমিই নাম করব, স্মরণ-মনন সমস্ত আমার। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে।

'তা হলে আর কী, আমার একেবারে ছুটি। আমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব।' আনন্দে লাফিয়ে উঠল গিরিশ।

হালকা মনে বাড়ি ফিরল। যাক, কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াব। যা করবার উনি করবেন। যদি ধুলোয় গড়াগড়িও দিই, উনিই ধুলো মুছে নেবেন কোলে তুলে।

পরদিন, কেন কে জানে, হঠাৎ মনে পড়ল, ঠাকুর আমার হয়ে নাম করেছেন তো ? কে জানে করেছেন কিনা ! কত লোক আসছে-যাচ্ছে, চারপাশে কত ভিড়, বয়ে গেছে তাঁর গিরিশের কথা মনে করে রাখতে। কে না কে এক পাঁকের পোকা, তার জন্যে তাঁর মাথাব্যথা। নাম করেছেন তো ! এ দেখি এক দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ল গিরিশ ! থেকে থেকেই উদ্বেগ, নাম করেছেন তো। সব ভার তাঁকে দিয়ে এসেছি, তবু কেন এই চাঞ্চল্য। এ তো আমি ছুটি পাইনি, আমি বাঁধা পড়লুম দ্বিগুণ শৃঙ্খলে। বকলমার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত। এ তো ফাঁকায় আসিনি, এ যে ফাঁদে পড়েছি। নাম হচ্ছে কিনা, আবার ঠাকুর করছেন কিনা। শুধু নাম নয়, নামের সঙ্গে আবার ঠাকুরের মূর্তি। দুবার করে হচ্ছে।

'কে জানত এমনি প্যাঁচের মধ্যে পড়ে যাব।' নির্জনে আপন মনে বসে বলছে গিরিশ, 'এমনি সময় করে নিজে একটু নাম করলে এত ঝামেলায় পড়তাম না। তার একটা শেষ থাকত, এ যে একেবার অশেষের মধ্যে এসে পড়লাম। কোথায় আর এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় ফাঁস জড়ানো। এখন যাই কোথা ?'

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেই হাজির হল।

'কি হে কী মনে করে?' ঠাকুর সম্ভাষণ করলেন গিরিশকে।

'জানতে এলাম—'

'কী জানতে এলি?'

'সেই যে আপনাকে বকলমা দিয়ে এলাম, আপনি আমার হয়ে নাম করছেন কিনা।'

'করছি কি না করছি তাতে তোর কি রে শালা।' ঠাকুর রুষ্ট হবার ভাব করলেন: 'তুই আমাকে তোর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছিস, সর্বস্ব সমর্পণ করেছিস, তোর আবার কিসের বাদানুবাদ। সংসারে তোর সমস্ত অধিকার, সমস্ত স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন সমস্ত আমার হাতে।'

তবে তাই হোক। গিরিশ একপাশে বসল করজোড়ে।

ঠাকুর বললেন সান্ত্বনার সুরে, 'একবার শ্রীহরির শরণাগত হও, আর কিছু ভাবতে হবে না। শরণাগতকে তিনি ত্যাগ করেন না কখনো।'

গিরিশের চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি একমাত্র তোমাকে। তোমাকেই আমি বকলমা দিয়েছি। তুমিই আমার ভার নিয়েছ, আমার পাপের ভার, দুঃখের ভার, ব্যর্থতার ভার। আর আমার কী চাই।'

অশ্বিনী দত্ত এসেছে ঠাকুরের কাছে।

'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?' জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'কোন গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?' অশ্বিনীর মুখে বুঝি বা একটু অসন্তোষের ভাব ফুটল: 'নাম শুনেছি, দেখিনি কখনো।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক। যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি।'

'শুনি মদ খায় নাকি?'

'তা খাক না। কত দিন খাবে?'

গিরিশ শেষ জীবনে বলছে নিজের কথা: এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ-গাঁজায় থাকত। কত কী ঠাকুরকে বলতাম, কত গালাগাল দিতাম, তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, ওরে দ্যাখ, গাড়িতে কিছু আছে কিনা। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপসোস করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে।

দুপুর রাত্রে এক বারাঙ্গনাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়েছে গিরিশ, বাগানবাড়ির উদ্দেশে। এত রাত্রে কোথায় বাগানবাড়ি মিলবে? কোন্ বাগানবাড়ির দরজা খোলা আছে তাদের জন্যে?

'একমাত্র বুঝি রাসমণির বাগানবাড়ি খোলা আছে। চলো সেখানে যাই।'

হ্যাঁ, একমাত্র রাসমণির বাগানবাড়ি, রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরই খোলা আছে। গাড়ি থেকে নামল গিরিশ। দারোয়ান বুঝি পথ আটকায়, বন্ধ গেট খুলে দেবে না। না, ঠাকুর টের পেয়েছেন। চটি পায়ে তিনিই আসছেন এগিয়ে। ওরে গেট খুলে দে। গিরিশ এখানে ফুর্তি করতে এসেছে—এটাই তো ফুর্তির জায়গা।

গেট খুলে দিল দারোয়ান। ঠাকুর এক হাতে গিরিশের হাত অন্য হাতে বারাঙ্গনার হাত ধরলেন। বললেন, বল হরিবোল, বল হরিবোল। বলে নাচতে লাগলেন। কী আশ্চর্য, গিরিশ আর তার সঙ্গিনীও নাচতে লাগল!

নামের মদিরায় কামের মদিরা ধুয়ে গেল।

একটা পাগলী আসে ঠাকুরের কাছে। এসে গান শোনায়। কখনো ব্রহ্মসঙ্গীত। কখনো বা কালীর গান। একদিন এসে গান না শুনিয়ে হঠাৎ শুরু করল কাঁদতে।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

পাগলী বললে, 'মাথাব্যথা করছে।'

মাথাব্যথা না মনোব্যথা—ঠাকুর হাসতে লাগল।

আরো একদিন এসে হাজির।

'দয়া করলেন না?' করুণ নয়নে তাকাল ঠাকুরের দিকে: 'মনে ঠেললেন কেন?'

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী ভাব?'

পাগলী বললে, 'মধুর ভাব।'

'কিন্তু আমার যে মাতৃযোনি। সব মেয়েরা যে আমার মা হয়।' বললেন ঠাকুর।

'তা আমি জানি না।' পাগলী মাথা নাড়তে লাগল।

কিছুতেই যায় না, ঠায় বসে থাকে।

রামলালকে ডাকলেন ঠাকুর, 'ওরে রামলাল, কী মনে ঠেলাঠেলি বলছে শোন দেখি!'

রামলাল এল। পাগলীকে তাড়িয়ে দিল।

সেদিন সে সব কথাই গিরিশকে বলছেন ঠাকুর। কিছুতেই যায় না কাছ ছেড়ে। তাড়িয়ে দিলেও ঘন-ঘন তাকায় ফিরে-ফিরে। আবার একদিন চলে আসে।

'দুঃখ হয় পাগলীটা এসে উপদ্রব করে। কিন্তু তার জন্যে সে নিজেও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কম সয় না।' রাখাল কাছে ছিল, রাখাল বললে।

সে কথা নিরঞ্জন শুনতে পেল। রাখালের উপর তম্বি করে উঠল। 'তোর মাগ আছে কিনা তাই তোর মন কেমন করে। আমরা ওকে বলিদান দিতে পারি।'

'কী বাহাদুরি।' রাখালও ঝলসে উঠল।

গিরিশ বললে, 'সে পাগলী ধন্য। পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে। সে যে ভাবেই করুক, তার কখনো

মন্দ হবে না।'

এই পাগলীই গিরিশের 'বিল্বমঙ্গলের' পাগলিনী।

'ধরা মাঝে উন্মাদিনী ধাই।
তার দেখা নাই
কোথা পাই, কে আমারে বলে দেবে ?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী,
ব্যোম আচ্ছাদন, নাহিক মরণ
কত আর আছে তার মনে।'

বারোশ' তিরানব্বুই সালের আষাঢ় মাসে স্টারে নামল বিল্বমঙ্গল। নাম-ভূমিকায় অমৃত মিত্র। চিন্তামণি বিনোদিনী। আর পাগলিনী গঙ্গামণি।

পাগলিনীর প্রথম প্রবেশ জগন্মাতার গান নিয়ে :

'ও মা, কেমন মা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে ?
মা বলে তো ডাকব না আর
লাগে কিনা দেখব তোমার
বাবা বলে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে
দেখে নাকো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে ॥

ভিক্ষুক জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কে গা ?'

'আমি বাছা পাগলিনীর মেয়ে।'

'হ্যাঁ গা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, পাগলদের বাড়ি।' বলে পাগলিনী আবার গান ধরল :

'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের
নাম শ্যামা।
বাবা বম বম বলে, মদ খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢলে
শ্যামার এলোকেশ দোলে,
রাঙা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে
শোন না ॥'

ভণ্ড সাধক বললে, 'এ পাগলীটাকে হাত কর, বেড়ে গায়।'

'ব্যাবসাটা শিগগির জমবে।' ভিক্ষুক সায় দিল।

'তোমার ভৈরবী করতে পার তো ভালো।'

'বটে, ওকে পেলে তো আমিও একটা দল করি।' আবার সায় দিল ভিক্ষুক।

শ্রীমা বিল্বমঙ্গল দেখতে এসেছেন। গিরিশই উদ্যোগ করে এনেছে। বসিয়েছে রয়্যাল বক্সে। সেদিন ভণ্ড সাধকের পার্টে গিরিশ নিজে নেমেছে।

সাধক বলছে থাকমনিকে, 'আমার বড় সাধ, তোমায় রাধাপ্রেম শেখাই।'

থাকমনি বললে, 'আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব না।'

সাধক। তবে মন দে শোন। বলি তরতে তো হবে। এ ভবসমুদ্র তরতে হবে।

থাক। তা বটে তো।

সাধক। তাই তোমায় বলছি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও, পাঁচজনের মুখ আর চেও না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই। যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়, আপনি বুঝতে পারবেন। আমি হরিনাম না করে জল খাইনি, আর যে মানুষ অনুগ্রহ করে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মত দেখি, আর পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দ্যাখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পারছ না। রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা!

থাক। তা তো বটেই, তা তো বটেই। হাজার হোক আমি মেয়েমানুষ, ভালো করে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব।

সাধক। দ্যাখ এক কথায় বলি—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুশি তা করো, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হতে পারবে?

থাক। আপনি আমায় ভালো করে বলুন; আমি বুঝতে পাচ্ছিনি।

সাধক। দ্যাখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান করবে, আমি পায়ে ধরে ভাঙব। আমি বাঁশি বাজাব—তুমি কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলে অধৈর্য হবে।

গিরিশের রঙ্গভঙ্গ দেখে মা ভারি মজা পাচ্ছেন। মৃদু হেসে বললেন, এ বয়সে আর কেন?

তারপর বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা দেখে মা একেবারে অভিভূত।

'এই দ্যাখ, দড়ি দ্যাখ।' বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে নিয়ে এল দেয়ালের কাছে।

'কই দেখি।' চিন্তামণি আঁতকে উঠল: 'ওগো মা গো, এ যে অজাগর গোখরো সাপ।'

'অ্যাঁ, গোখরো সাপ?' বিল্বমঙ্গলও পিছিয়ে গেল।

ভিক্ষুক বললে, 'ওগো ঠাকরুন হয়েছে,—সাপে যদি গর্তে মুখ দ্যায়, ল্যাজ ধরে টেনে মুখ বার কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে। (স্বগত) উঃ, মানুষটা যদি চোর হত, সাত মহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বার করে আনতে পারত।'

ভিক্ষুক প্রস্থান করল।

থাকমনি নিজের মনে বললে, 'একেই বলি টান, একেই বলি মনের মানুষ। নৈলে হৃদে পোড়ার মুখো—খেংরা মারি,—খেংরা মারি।'

'একি, তুমি কালসাপ ধরে উঠেছিলে?' জিজ্ঞেস করল চিন্তামণি: 'তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে?'

'তোমায় দেখছি।' নিষ্পলকে তাকিয়ে বললে বিল্বমঙ্গল।

'কী দেখছ?'

'তুমি বড় সুন্দর।'

'তুমি নদী পেরুলে কী করে?'

'আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম, সাঁতরে পার হব, কিন্তু বড় তুফান—' বললে বিল্বমঙ্গল, 'মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—'

'তোমার গায়ে এত দুর্গন্ধ কিসের?' চিন্তামণি নাক সিঁটকালো।

'তা বলতে পারি না।'

'সাপটা অনায়াসে ধরলে?' চিন্তামণির বিস্ময় তবু যায় না।

'চিন্তামণি,' বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে কান্না ফুটে উঠল: 'বোধহয় তুমি কখনো প্রাণ দাওনি। তা হলে বুঝতে, অতি তুচ্ছ, তা হলে জানতে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নেই।

'তুমি কি উন্মাদ?'

'যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।'

'কী ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ?'

'দেখছি তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি। তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে দশদিক শূন্যে দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে। এতেও কি বুঝতে পারো না আমি উন্মাদ কিনা? আমার সর্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্ছে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিছি। (সর্প দেখিয়ে) আমি উন্মাদ কিনা দ্যাখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্যাখ। সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর!'

'চলো, তুমি কি কাঠ ধরে এলে দেখব।'

'তোমার এখনো অবিশ্বাস!'

রাস্তায় টহলদারদের আবির্ভাব হল। তাদের মুখে বৈরাগ্যের গান:

'কি ছার! আর কেন মায়া
কাঞ্চন কায়া তো রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না তো
কি হবে তোর তবে?

আজ পোহালে কাল কি হবে ?
দিন পাবি তুই কবে ?
সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কারু নয় দ্যাখ না চেয়ে—
কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি ॥'

নদীতীরে বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি আর থাকমনি এসে দাঁড়াল।

বিল্বমঙ্গল বললে, 'সত্যি সকলই মায়া, কই, কেউ তো আমার আপনার দেখিনি। যার জন্যে ঝাঁপ দিলুম, সেও তো আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে ?'

'উঃ, এখনও নদী যেন রণমুখী !' বললে চিন্তামণি, 'নদী চার পো হয়েছে। ঝাঁপ দিতে সাহস হল ! কই কাঠ কই ?'

'ওই।' দেখিয়ে দিল বিল্বমঙ্গল।

'একি। এ যে পচা মড়া!' সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল চিন্তামণি : 'দেখ আর আমার অবিশ্বাস নেই, তুমি সত্যই উন্মাদ। তোমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধরো, কাঠ বলে পচা মড়া ধরো। আমি বেশ্যা, তোমার এই মন যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হত। তুমি পচা মড়া ধরে রাত্তিরে নদী পার হয়ে এলে। গায়ে কাঁটা দেয়। সাপের ল্যাজ ধরে উঠলে— দেখ, আমাদের সকলই ভান বোধ হয়, কিন্তু এ যদি ভান হয়, এমন কিন্তু কখনো দেখিনি।'

গান করতে করতে পাগলিনী প্রবেশ করল।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে
কত রাখে আদরে ॥
আজি জানতে এলেম তাই
কে বলে রে আপন রতন নাই
সত্যি মিছে দ্যাখ না কাছে
কচ্চে কথা সোহাগ ভরে ॥'

'আমার কি কেউ নেই ?' বলতে লাগল বিল্বমঙ্গল : 'অবশ্যই আছে, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। আছে—আমার কাছে-কাছে আছে। নৈলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে ? করাল কালসর্পের দংশন হতে কে আমায় বাঁচালে ? কে আমায় বলে দিলে, সংসারে আমার কেউ নেই ? কে আমায় এখন

বলছে, আমি তোমার আছি। কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর। দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে তুমি আমার কাছে-কাছে আছ, আমি অন্ধ, তোমায় দেখতে পাচ্ছিনি। কে আমায় চক্ষু দেবে?'

তন্ময় হয়ে শুনছে মা-ঠাকরুন। বলে উঠলেন, 'আহা! আহা!'

বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে মার কাছে। বলছে, 'আমার মনের চাঞ্চল্য দূর করে দিন, নয় তো ফেরত নিন আপনার মন্ত্র।'

এমন আকুল-করা কথা! মার চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'বেশ, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।'

সে কি! ভীষণ ঘাবড়ে গেল বৈকুণ্ঠ। তাহলে কি মার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল? পাংশু মুখে সে বললে; 'মা, আমার সব কেড়ে নিলে? আমি কি তবে রসাতলে গেলুম?'

মা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে তার জন্যে মুক্তি বাঁধা হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।'

গিরিশও তেমনি রসাতলে নয়, সে অতল রসে।

'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মায়ের কাছে চালান দিচ্ছি।' বললে বাবুরাম, 'মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অপার করুণা!'

'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।' সন্তানদের বললেন শ্রীমা, 'মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। মা থাকতে সন্তানের ভয় কী? যে যা খুশি করো না কেন, যে-ভাবে খুশি চলো না কেন, তোমাদের নিতে শেষকালে আসতেই হবে ঠাকুরকে। ঈশ্বর যে কালে হাত-পা দিয়েছেন, তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তো খেলবেই তাদের খেলা। তাতে ভয় কী?'

বিষ্ণুপুর হয়ে মা আসছেন কলকাতা। রাখাল বাবুরামকে বললে, 'একবার স্টেশনে গেলে হয় না? কত দিন পরে আসছেন বলতো?'

'মন্দ বলো নি।' সায় দিল বাবুরাম।

স্টেশনে এসে শুনল গাড়ি তিন ঘণ্টা লেট। তা হোক, যখন এসেছি প্রতীক্ষা করি। দারুণ গ্রীষ্ম। তা হোক, মায়ের চরণ দর্শন হলেই সমস্ত দাহের নিবারণ হবে। মা ট্রেন থেকে নামতেই ভক্তের দল প্রণামের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সঙ্গে গোলাপ-মা ছিল, রাখালকে দেখে মুখিয়ে উঠল: 'তোমাদের কি একটু আক্কেল নেই? এই রোদে মা তেতে পুড়ে এলেন, আর তোমরা কিনা প্রণামের জন্যে বিভ্রাট বাধাও? তোমরাই যদি অবুঝ হও তাহলে অন্যের আর কথা কী?'

রাখাল নিবৃত্ত হল। বাবুরামও তাই। উপস্থিত অন্যান্য ভক্ত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

মা বাগবাজারে 'উদ্বোধনে'র দিকে রওনা হলেন।

বাবুরাম বললে, 'প্রণাম করতে না পাই, চলো গিয়ে দেখে আসি ব্যবস্থা সব ঠিকমত হয়েছে কিনা।'

মা উপরে আছেন, নিচে স্তব্ধমুখে বসে রইল দুজন।

এমন সময় গায়ে সামান্য একটা ফতুয়া, ঘর্মাক্ত দেহে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল গিরিশ। মা এসেছেন? কখন এলেন? কেমন আছেন? তিন ঘণ্টা গাড়ি লেট? স্বাভাবিক গলায়ই কথা বলছে গিরিশ কিন্তু দরাজ আওয়াজ সহজেই উপরে গিয়ে পেঁছিুচ্ছে। শোনাচ্ছে বুঝি কোলাহলের মত।

'বলিহারি যাই ঘোষজার ভক্তি দেখে?' উপরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গোলাপ-মা টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'মা তেতে পুড়ে এলেন, কোথায় একটু জিরোবেন, না, এখানেও এসেছে কিনা জ্বালাতন করতে?'

গিরিশ কানেও নিল না সে তিরস্কার, রাখাল-বাবুরামকে বললে, 'চলো, ওঠো উপরে গিয়ে মাকে দেখে আসি।'

গোলাপ-মা আবার রুখে উঠল।

'ঝাঁজা মেয়ে বলে কিনা মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি।' গিরিশও মুখিয়ে এল: 'কোথায় এত দিন পরে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, তা নয়, মায়ের থেকে ছেলেদের উনি সরিয়ে রাখছেন! কত উনি শেখাচ্ছেন মাতৃস্নেহ!'

গিরিশকে কে রোখে! সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেল উপরে, পিছে-পিছে বাবুরাম আর রাখাল। ছেলেদের দেখে মা আনন্দে ঝলমল করে উঠলেন।

'শেষকালে গিরিশবাবু কিনা আমাকে এ রকম বললে।' মার কাছে এসে নালিশ করল গোলাপ-মা!

মা উলটে গোলাপ-মাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন: 'তোমাকে কত দিন বলেছি আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যেও না।'

মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিয়ে গিরিশ সগর্বে নেমে গেল। তার কেন এত জয় জয়কার? কিসে তার এই অবাধ স্বত্ব? তার একমাত্র ধন স্বচ্ছতা, সরলতা। আর বিশ্বাসই এনেছে এই সারল্য। সমর্পণই এনেছে এই প্রাণায়াম। অথচ প্রথম যখন বলরাম বোসের বাড়ির ছাদে মাকে দেখেছিল চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল গিরিশ, বলেছিল, 'না, না, আমার পাপনেত্রে মাকে দেখব না লুকিয়ে।'

বিল্বমঙ্গলের পর 'বেল্লিক বাজার'। সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও বিকৃতচরিত্র স্বার্থান্ধের উপর কটাক্ষপাত করে এই নাটক। নতুন ধরনের পঞ্চরং।

তুমুল হট্টগোল উঠল। বাবুর দল ভেবড়ে গেল।

তার পরেই 'রূপ সনাতন'।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে চৈতন্যদেব ভক্তদের পদধূলি নিচ্ছেন, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখাল গিরিশ।

'প্রভু, এ করছেন কি?' এক বৈষ্ণব জিজ্ঞেস করল শ্রীচৈতন্যকে।

প্রভু বলছেন, 'আমি কৃষ্ণবিরহে কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, কৃষ্ণকৃপা হবে।'

এই দৃশ্যে গোস্বামীর দল বিরক্ত হল! ভক্তের পায়ের ধুলো প্রভু গায়ে

মাখবেন এ কী করে হতে পারে ? কটূক্তি করতে লাগল গিরিশকে।

বা, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি।

দেখেছ—কী দেখেছ ?

দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের পায়ের ধুলো গায়ে মাখছেন। কীর্তন হয়ে যাবার পর বলছেন, হরিনাম হলে হরি স্বয়ং তা শুনতে আসেন। ভক্তের পাদস্পর্শে কীর্তন-অঙ্গনের ধুলো পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। বলছেন আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে মাখছেন।

'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ।' গিরিশকে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'নরেন খুব ভালো। যেমন গাইতে বাজাতে তেমনি লেখা পড়ায়। এদিকে জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী। তার অনেক গুণ।' মাস্টারকে লক্ষ্য করলেন, কি গো, ঠিক নয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ভালো।' মাস্টার সায় দিল।

'আর গিরিশ ?' গিরিশকে আড়াল করে তাকালেন মাস্টারের দিকে : 'গিরিশের খুব বিশ্বাস আর অনুরাগ।'

গিরিশ বললে, নরেন অবতার মানেনা। বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা অনন্ত তার আবার অংশ কী ? আকাশের কখনো অংশ হয় ?'

'কিন্তু, ঈশ্বর অনন্ত হোন, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু মানুষের মধ্য দিয়ে আসতে পারে। আসেও। এটা উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না। এর অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।'

'নরেন বলে, যিনি অনন্ত তাঁর সমস্ত ধারণা হবে কী করে ?'

'তাঁর সমগ্র ধারণা করা কী দরকার। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা হলেই তাঁকে দেখা হয়ে গেল।'

অনিমেষ চোখে গিরিশ তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে।

যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সবটাই তার হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। যদি তোমার পা-টা ছুঁই, তোমাকেই ছোঁয়া হল।'

সবাই হেসে উঠল।

আবার বললেন, 'অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায়ই আছে, তবে কাঠে বেশি।'

গিরিশ উদ্বেল কণ্ঠে বললে, যেখানে 'আগুন পাব সেখানেই বসে পড়ব। সেখান থেকে আর নড়ব না।'

'গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা।' বললেন ঠাকুর, 'তার বিশ্বাস ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না।'

'নরেন আমার কাছে তর্কে হেরেছে।' গিরিশ বললে।

নরেন ঠাকুরকে অবতার বলে মানতে চায় না, ঠাকুরের বিচারে তাতেও নরেনের দোষ নেই। নরেন যে তর্কে হারবে এও তাঁর ভালো লাগে না।

বললেন, 'না। নরেন আর তর্কই করতে চাইল না।' হাসলেন ঠাকুর, 'আমায়

বললে গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি বলব। অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে যাওয়া বৃথা।'

শুধু বিশ্বাস—বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস। অসীম বিশ্বাসই অসীম শক্তি।

'বিশ্বাস, বিশ্বাস, অগ্নিময় বিশ্বাস।' স্বামীজি বলছেন, 'আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। জয় প্রভু। প্রভুই আমাদের নেতা। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। প্রভুর জয় দাও। পশ্চাতে তাকিয়ো না। কে পড়ল যেও না দেখতে। শুধু এগিয়ে চলো। চলো এগিয়ে।'

নরেনও একদিন এসেছিল বিল্বমঙ্গল দেখতে। অভিনয় শেষ হবার পর নরেনকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এল গিরিশ। নর্তক-নর্তকীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। হলঘর নিরিবিলি, নরেন ভজন ধরল। নট-নটীরা আর চাপল্য করবার অবকাশ পেল না। এ কী গান! নরেনের দুই চোখ বোজা, গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। স্বর-সুগন্ধে ভরে উঠেছে সমস্ত ঘর। শুচিসুন্দর নটনাথ যেন নরনাথ হয়ে প্রমূর্ত হয়েছেন। নট-নটীরা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে। গিরিশ উদ্বিগ্ন হল। শেষ পর্যন্ত নরেনের না ভাব-সমাধি হয়ে যায়। নরেনের হাত থেকে তানপুরা কেড়ে নিল। হাত ধরে টেনে নামাল মঞ্চ থেকে। নিজের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে এল বাগবাজার।

'কি, হচ্ছিল কী!' গিরিশ বললে নরেনকে, 'ওখানে কি ধ্যানস্থ হতে হয়!'

নরেন হাসল। বললে, 'শ্মশানে-ভবনে সর্বত্রই আসন। সর্বত্রই রামের অযোধ্যা।'

পরদিন থিয়েটারে এলে নর্তকীর দল গিরিশকে ঘিরে ধরল, আপনি করেছিলেন কী! এক বিরাট মহাপুরুষকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা যদি অজ্ঞানে চাপল্য প্রকাশ করে ফেলতাম। আমাদের ইহকাল গেছেই, পরকালও যেত সেই সঙ্গে।'

'এখন তো দেখছ, ইহকাল-পরকাল কিছুই যাবার নয়।' আশ্বাসভরা হাসি হাসল গিরিশ।

১৫

কলুটোলার মতি শীলের নাতি গোপাললাল শীল। বড় লোক, খেয়াল ধরল, থিয়েটার খুলবে। যে জমির উপর স্টার থিয়েটার তা ঝপ করে কিনে ফেলল। নোটিশ দিল, বাড়ি হটাও। তার মানে বাড়িটাও বেচে দাও আমাকে। বড়লোকের সঙ্গে কে ঝগড়া করবে, স্টারের মালিকরা ত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ি বেচে দিল গোপাললালকে। কিন্তু থিয়েটারের নামযশ বা গুডউইল বেচা হল না। বিডন স্ট্রিট থেকে বিদায় নিল স্টার থিয়েটার।

শেষ দিন থিয়েটার দেখতে ভেঙে পড়ল কলকাতা। অভিনয়ের শেষে এত

দিনের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা চাইল অমৃত বোস। বললে, যদি একখানা পর্ণকুটির তুলতে পারি আবার আপনাদের দেখা দেব।

টাকার জোরে গোপাললাল স্টার থিয়েটারের বাড়িটাই পেল। কিন্তু স্টার থিয়েটার পেল না। গোপাললালের থিয়েটারের নাম হল এমারেল্ড থিয়েটার।

স্টারের দল হাতিবাগানের জমি কিনল। বাড়ি খানিকটা তুলতে না তুলতেই ত্রিশ হাজার টাকা শেষ হয়ে গেল। বাকি টাকা কে দেবে, কোথায় মিলবে?

এদিকে এমারেল্ডও নিষ্প্রভ। আলাদা ডায়নামো বসিয়ে আলো জ্বাললে কী হবে, তাপ নেই। ফতো জাঁকে মন ভরল না কারু। তখন সবাই গোপাললালকে পরামর্শ দিল, গিরিশকে ডাকো! গিরিশকে ম্যানেজার করো। যদি কারু হাতে জীবনমন্ত্র থেকে থাকে সে গিরিশ ছাড়া কেউ নয়।' গোপাললাল গিরিশকে ডেকে পাঠাল। স্টারের বন্ধুদের ছেড়ে সে যায় কী করে? তাদের এখন এমন অনটন অবস্থায় সে যদি তাদের ছাড়ে তা হলে ধর্ম তাকে ছাড়বে।

কিন্তু গোপাললালই কি ছাড়বার পাত্র? বললে, 'তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব।'

'আর?' কান খাড়া রাখল গিরিশ।

'আর নগদ কুড়ি হাজার টাকা বোনাস।'

'দাঁড়ান। একটু ভাবি।'

'যদি রাজি না হন, তা হলে ঐ কুড়ি হাজারে স্টারের সমস্ত লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আসব।' গোপাললাল চোখ লাল করল।

গিরিশ ভাবল, মন্দ কি, রাজি হই। বোনাসটা হাত করি। সেই টাকাটা দিয়ে দি স্টারকে। তাদের বাড়ি উঠুক। পাঁচ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হল গিরিশ। কুড়ি হাজার থেকে ষোল হাজার টাকা দিয়ে দিল স্টারকে। কোনো সর্ত নেই, নিঃস্বার্থ নিরাকাঙ্ক্ষ দান। যাতে স্টারের বাড়ি সম্পূর্ণ হয়। যাতে সত্যিকার অভিনয়-শিল্প প্রতিষ্ঠা পায়, মর্যাদা পায়। শিল্পীরা মুক্ত হয় বিপদ থেকে।

শুধু একটি মাত্র অনুরোধ। গিরিশ বললে, মালিকদের, 'তোমাদের লাঞ্ছনার অবসান হল। আর যে সকল ভদ্র সন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করবে তারাও যেন লাঞ্ছিত না হয়।'

এত বড় দান নিঃস্বত্ব নির্মল দান, কে কবে ভাবতে পারত?

আমার কথা ঠাকুর ভাববেন। আমি তাঁকে বকলমা দিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু নরেন মানতে রাজী নয় যে মানুষের দেহে ঈশ্বর অবতীর্ণ হবেন। অথচ গিরিশের দুর্দান্ত বিশ্বাস। গিরিশের বাড়ি এসেছেন ঠাকুর। দণ্ডবৎ প্রণাম করল গিরিশ। দোতলায় নিয়ে এসে বৈঠকখানায় বসাল।

বললেন গিরিশকে, 'নরেনের সঙ্গে একটু বিচার করো, আমি শুনি।'

নরেন বললে, 'ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন। শুধু একজনের মধ্যে এসেছেন —কী করে হয়?'

ঠাকুর সায় দিলেন। 'নিশ্চয়, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। তবে কোনো আধারে

বেশি কোনো আধারে কম।'

'এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা।' বললে বলরাম।

'তুমি কেমন করে জানলে ঈশ্বর দেহ ধরে আসেন না? নরেনের প্রতি রুখে এল গিরিশ: 'তিনি আর সব হতে পারবেন কেবল মানুষ হতেই তাঁর বারন? তিনি মানুষ হয়ে না এলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান-ভক্তি দেবার জন্যই তিনি দেহ ধরে অবতীর্ণ হন।'

'কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।'

নরেনকে আবার সমর্থন করলেন ঠাকুর: 'হ্যাঁ, নইলে তিনি কিসের অন্তর্যামী?

লেগে গেল তর্ক। খরতর ঘোরতর তর্ক। হ্যামিল্টন কী বললেন? হার্বার্ট স্পেনসারের কী মত? টিণ্ডেল, হাক্সলিই বা কোন দলে?

'চৈতন্য লাভ না করলে চৈতন্যকে জানা যায় না।' বললেন ঠাকুর, 'তিনি যদি নিজে তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন তা হলে আর বিচার থাকে না, কাউকে হয় না বুঝিয়ে দিতে। তিনি যদি আলো জেৰলে দেন কে আর অন্ধকারে থাকবে?

'আমাকে এখন একবার থিয়েটারে যেতে হবে।' বললে গিরিশ।

'জানি।'

'জানেন বেশিক্ষণ বসতে পারব না আপনার কাছে, তবু এলেন?'

'তাতে কী! খানিকক্ষণ যে বসলে এই যথেষ্ট।'

কী স্নেহ! কী করুণা! গিরিশের চোখ ছল ছল করে উঠল।

'এদিকে ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে, আবার চলেছে থিয়েটারে!' নরেন টিটকিরি দিয়ে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'না, ইদিক উদিক দুদিক রাখতে হবে! জনকরাজার মতো। ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদের ছেড়ে দিই।' গিরিশ কাতর স্বরে বললে।

'না, না, ও বেশ আছে।' ঠাকুর আশ্বস্ত করলেন: 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।

এমারেল্ডে গিরিশের 'পূর্ণচন্দ্র' নামল।

পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তার মধ্যে জল ঢোকে না, তেমনি যে ভক্ত সে শত দুঃখে কষ্টে আঘাত অপমানেও হতাশ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীরই নাট্যমূর্তি 'পূর্ণচন্দ্র'। এক 'পূর্ণচন্দ্রই' বিশ হাজার টাকার বেশি এনে দিল গোপাললালকে।

ওদিকে স্টার থিয়েটারের বাড়ি উঠে গেছে। কিন্তু নাটক কই? গিরিশ ছাড়া কে লিখবে? এমারেল্ডের ম্যানেজার হয়ে স্টারের জন্যে লেখে কী করে? তবু স্টার স্টার। তার জন্যে না লিখলে যে মন বুঝ মানে না। এমারেল্ড জীবিকা কিন্তু স্টারই তো জীবন। স্টারের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নসীরাম লিখলে। শুধু লিখলে না, য়্যাকটিং পর্যন্ত শিখিয়ে দিল। গোপাললাল যাতে টের না

পায় তার জন্যে খাল-ধারে খেলার ঘর ভাড়া নিয়ে রিহার্সেলের জায়গা হল। শাড়িসেমিজ পরা মেয়েমানুষ সেজে গিরিশ চলে আসে আর গভীর রাতে মহড়া বসে। কে ধরবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই 'নসীরাম' লেখা ! আর নসীরামে পাহাড়ী বালকের ভূমিকায়ই তারাসুন্দরীর প্রথম মঞ্চাবতরণ আর মুখে শুধু একটিমাত্র কথা : ওরে হরি বল, নইলে কথা কি কইবে না ?

এই একটি কথাতেই সে রঙ্গজগৎ মাতিয়ে দিল।

'মরতেও চাইনি বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়িও চাইনি, গাছতলাও চাইনি ক্ষীরসরও চাইনি, খুদকুঁড়োও চাইনি। ওসব ভাবিইনি, জানি একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছে, সুখ দুঃখ দু' শালাই সঙ্গের সাথী।'

নসীরামকে সকলে পাগল বলে

'লোকের কী, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মত পাগল না হয়, আপন মজায় থাকে তাকেই বলে পাগল।' বলছে নসীরাম, 'কোনো শালা ধনের কাঙাল, কোনো শালা মানের কাঙাল, কোনো শালা মেয়েমানুষের কাঙাল, কোনো শালা ছেলের কাঙাল, যে শালা এই ক্যাঙলাবৃত্তি না করে সে শালাই পাগল।'

'নসীরাম, তোমার সংসারে চাইবার কিছু নেই ?' জিজ্ঞেস করলে একজন।

'চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো সব ভুয়ো সব ভুয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ি পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে তার ঠিকানা নেই, টাকাকড়ি আজ বলছ তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার ? না যদি খরচ করো তো দুহাতে দুমুঠো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।'

রাজকুমার অনাথনাথ জিজ্ঞেস করলে নসীরামকে : 'হরি কে ? হরি কি আছেন ?'

'তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ?' বলছে নসীরাম, 'জল-জল করলে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাকল।'

'তা কি হয় ?'

'হয় না হয় পরখ করে দেখলে বুঝতে পারো। হরি নাই বলে কারা জানো ? যারা একবার হরি হরি করে, মনে করে হরিকে খুব কৃপা করেছি, তবু হরি কেন এসে তার বাপের বাগানের মালী হয় না ? আর হরি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে না কারা জানো ? যাদের হরিনাম করতে করতে প্রাণ ভরে যায়, যত হরি-হরি করে তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে জিজ্ঞেস করে, হরি তুমি আছ কিনা। ততক্ষণ আরো দুটো হরিনাম করে।'

'তুমি হরিনাম করো ?'

'হরিনাম করব না ? মজা ওড়াব না ? তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে ভাবব কী হবে কী করব।'

বেশ্যা সোনাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত নসীরামের নিবৃত্তি নেই। বলছে

সোনাকে, 'সেই বেটার উপর ফেলে দে, আর তোর যাই খুশি করে বেড়া। তোর ভয়েও কাজ নেই ভরসায়ও কাজ নেই। ভয়-ভরসা দু' শালাই শত্রু। আর কথায় কাজ নেই, শুধু হরি-হরি কর।'

'আমি কেন হরিনাম করব ?' আগুন হয়ে উঠল সোনা : 'আমায় বেশ্যা করলে কে ? আমায় মদ খাওয়ালে কে ? আমায় অনাথিনী করলে কে ?'

কিন্তু কালক্রমে সোনাও চিন্তামণি হয়ে উঠল। নসীরামের আকর্ষণ কে এড়াবে ? 'হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকার মুখে।'

নাটকের প্রারম্ভে গিরিশের একটি কবিতা পড়া হত স্টেজে। তার শেষ কটি লাইন :

হিন্দু প্রাণ কোমলতাময়
ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়—
ধর্ম—রঙ্গালয় ॥

কিন্তু 'নসীরাম' পয়সার দিক থেকে সফল হল না। আর ওদিকে গোপাল-লালেরও থিয়েটারের সখ মিটে গেল। এমারেল্ডকে ইজারা দিয়ে কেটে পড়ল। ছাড় পেল গিরিশ, স্টারে এসে ম্যানেজারি নিলে।

এদিকে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর অসুখ। এই স্ত্রী থেকেই তার গুরুলাভ, অর্থলাভ যশোলাভ—তার সর্বসৌভাগ্যের সমুদ্ভব। সেই কিনা এখন যেতে বসেছে। দু দুটো ঘা খেয়েছে! পর-পর দুটি মেয়ে মারা গেছে, দুটিই বিশ বছর বয়সে। তারপর একটি ছেলে হয়েছে। ছেলে প্রসব করার পর থেকেই এই অসুখ। কত শত চিকিৎসা, কোনোই সুরাহা নেই। কেউ-কেউ বললে, গঙ্গার ধারে কোনো বাড়িতে তাঁকে রাখা হোক, গঙ্গার হাওয়ায় রোগের উপশম হবে।

রাধাকান্ত দেবের 'মুমূর্ষু নিকেতনে' রুগীকে রাখা হল।

মরেও না তরেও না, ভোগান্তি সার।

গিরিশের ভাই অতুল, আত্মীয় দেবেন বোসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল।

'এর একটা বিহিত করো।' অতুল বললে সকাতরে।

'কেন, কী হয়েছে ? কেমন আছে তোমার মেজবৌদি ?'

'মৃত্যুমুখে পড়ে আছে, প্রাণ যাচ্ছে না।'

'ভালো হবার সম্ভাবনা নেই ?'

'মনে হয় না তো। এখন যন্ত্রণার শেষ হয় এই রুগীর কামনা। তুমি যদি একবার মেজদাকে বলো।'

'কী বলব ?'

'তার মন থেকে মেজবৌদিকে ছেড়ে দিতে।' বললে অতুল, 'তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন না বলেই মেজবৌদি যেতে পাচ্ছেন না। যন্ত্রণা দীর্ঘতর হচ্ছে। তুমি ভাই মেজদাকে বলো তাঁর দুটি পায়ের ধুলো দিন, তাই মাথায় নিয়ে যাত্রা করুন মেজবৌদি, তাঁর যন্ত্রণার অবসান হোক। মেজদাকে তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না রাজি করাতে। একবার দেখ না চেষ্টা করে।'

দেবেন সামনে এসে দাঁড়াতেই যেন বুঝতে পেল গিরিশ। জিজ্ঞেস করলে, 'কী অবস্থা ?'

'তাঁর যন্ত্রণা আর দেখা যাচ্ছে না।'

'তা হলে, কী বলো, ছেড়ে দিই ?' শূন্য চোখে তাকাল গিরিশ।

'আর কী হবে আটকে রেখে ?' বললে দেবেন, 'তোমার দুটি পায়ের ধুলো দাও। দুর্গা বলে যাত্রা করুক।'

গিরিশের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকানো মাত্রই রুগী শেষ নিশ্বাস চুকিয়ে দিল।

'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

কিন্তু গিরিশের শোক করবার অধিকার নেই। সমস্ত সে ঠাকুরে সমর্পণ করে দিয়েছে। বকলমা দেবার পর সে তো সর্বস্বশূন্য, সে নাবালক, সমস্ত কিছুর ভার তার আছি-র হাতে, আমমোক্তারের হাতে। কথাটি বলার উপায় নেই। কিন্তু অন্তর্দাহ যায় কিসে! গিরিশ শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। একবার পেন্সিল দিয়ে শ্লেট ভর্তি করে আবার শ্লেট মুছে ফেলে। অঙ্ক মেলে না। আবার সংখ্যা সাজায়। আবার মোছে। চিত্ত স্থির করবার পক্ষে অঙ্কের মত জিনিস নেই!

নল-দময়ন্তী নাটকে শোকের সময় নল গণনা করতে বসেছে। যখন ঋতুপর্ণ তাকে গণনাবিদ্যা শেখায়, বলেছিল, 'চিত্তস্থৈর্য এ বিদ্যার মূল।'

এবার আধ্যাত্মিক নাটক ছেড়ে সামাজিক নাটকে এস। ইতিমধ্যে 'স্বর্ণলতা' অবলম্বন করে 'সরলা' হয়ে গেছে, গিরিশ 'প্রফুল্ল' লিখল।

পরে 'মিনার্ভায়' গিরিশ নিজে নেমেছিল যোগেশের পার্টে। তার মত আর কে বলতে পারবে আন্তরিক হয়ে : আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

এখন গিরিশের একমাত্র আকর্ষণ দ্বিতীয় স্ত্রীর ফেলে যাওয়া শিশুটা। এমন সুলক্ষণ যেন হতে নেই, ঘর যেন আলো করে আছে। ঠাকুরের কাছে বর চেয়েছিল, তুমি আমার ঘরে পুত্র হয়ে জন্মাও। কে জানে এ সেই বাঞ্ছিত পুত্র কিনা। মধু রায়ের গলিতে গ্যাস ছিল না, ঠাকুরের দেহের জ্যোতিতে গলি আলো হয়ে থাকত। তেমনি অন্ধকার ঘরে ছেলে এনে রাখলেই ঘর আলো হয়ে যায়।

তাই ছেলে যখন পেটে তখন তার মা থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠত : হরিবোল হরিবোল! কুলবধূ এমনি উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে তিরস্কারও কম সহ্য করতে হয়নি তাকে। এ কে আমার পেটে এল ? এ কে দুঃসহ গুরুভার ? যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু যে-সে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়াও, যাবে না। ঠাকুরের ভক্ত সন্তানেরা আসুক, একেবারে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠাকুরের মূর্তি এনে দাও তাই নিয়ে খেলা করবে। কখনো কখনো চোখ বুজে বসে থাকে। ওমা, চোখ বুজে আছে কী ? তাকিয়ে দেখে সামনে ঠাকুরের মূর্তি! আপোগণ্ড শিশু ঠাকুরের ধ্যান করছে। একদিন তার কী কান্না!

দেয়ালে রামকৃষ্ণের ফোটো টাঙানো বারে বারে তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। সবাই বললে, ছবিটা চায়, ছবিটা নামিয়ে দাও।

ছবিটা নামালে দেখা গেল পিছনে অসংখ্য পিঁপড়ে। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলা হল আর অমনি ঠাণ্ডা হল শিশু।

কখনো-কখনো মাঠাকরুন আসেন গিরিশের বাড়ি। গিরিশের বোন দক্ষিণাই নিয়ে আসে। গিরিশের সাহস নেই মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তার ছেলে দিব্যি মার কোলের উপর চড়ে বসে। হাততালি দেয়। হাসে খিলখিল করে। তিন বছর বয়েস, এখনো কথা কইতে পারে না। হাবভাব সব দেখায়, উ-আ শব্দ করে।

বরানগরে সৌরীন ঠাকুরের বাড়িতে মা আছেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এসে বললে গিরিশকে, 'মাকে দেখবেন চলুন।'

'না, না, আমি মাকে দেখব কী!' গিরিশ আপত্তি জানাল।

'বা, সব ছেলেই তো মার ছেলে। শান্ত হলেও সে ছেলে, দুরন্ত হলেও সে ছেলে! এত দিনেও মাকে দেখেন নি সে কেমন কথা!'

পিড়াপিড়ি করতে লাগল। ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে চলল বরানগর। ছেলেই বুঝি তার ছাড়পত্র। দোতালায় আছেন মা। ছেলে কোলে গিরিশ নিচের ঘরে এসে উঠল। বারে বারে উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল। উ-আ শব্দ করে বোঝাতে লাগল, উপরে চলো। প্রথমে কেউ বোঝে না। শিশু কেন অমন শব্দ করছে। পরে একজনের খেয়াল হল শিশু মাতাঠাকরুনের কাছে যেতে চায়। সে তখন শিশুকে কোলে করে নিয়ে গেল উপরে। মাকে দেখেই কোল থেকে নেমে পড়ল শিশু, একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে প্রণত হল। তারপর সে নিজেই নিচে নামল। গিরিশের হাত ধরে টানতে লাগল। চলো তুমিও উপরে চলো।

'ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কী! আমি যে মহাপাপী!' গিরিশ কেঁদে উঠল।

শিশু কিছুতেই ছাড়ে না। মার কাছে আবার পাপ-পুণ্য কী! চলো।

ছেলে কোলে নিয়ে গিরিশ উপরে উঠল। ছেলেকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। অমনি মায়ের পদতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল লুটিয়ে।

'মা, এ ছেলের দরুনই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।' চোখের জলে ভাসতে লাগল গিরিশ।

তখনো সে মায়ের মুখ দেখেনি, শুধু চরণদুখানি দেখেছে।

সেই ছেলের ঘোর অসুখ করল। আর এমন অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি আস্কারা করতে পারল না। বলো কী করলে সারে, কিসে শিশু ভালো হয়। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবারও তার আর অধিকার নেই। সে যে সর্বস্বভার সঁপে দিয়েছে ঠাকুরকে। তখন সে নরেনকে ধরল। বললে, নরেন, তুমি এই শিশুর কানে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়ে দাও। তা হলে যদি সে বাঁচে।'

নরেন গিরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে দিলে যদি ও বাঁচে।'

নরেন সম্মত হল। শিশুকে সন্ন্যাস দিলে নরেন। তবু, তবু শিশু বাঁচল না

১৬

ছেলের অসুখে গিরিশ জেরবার হয়ে যাচ্ছে, নিয়মিত যেতে পাচ্ছে না থিয়েটার। কর্তৃপক্ষ নিদারুণ অসন্তুষ্ট। কী এসে যায় যদি বাদ দেওয়া যায় গিরিশকে। ঠিকমত আসবে না, খাটাখাটনি করবে না, শুধু মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাবে, এ অসহ্য। এক জনের মাতব্বরি চিরদিন বরদাস্ত করতে হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখেনি। দাও ওকে বরখাস্ত করে। স্টার গিরিশকে বরখাস্তের চিঠি পাঠাল। সেই স্টার যাকে এক মুঠোয় ষোল হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিল। আত্ম-গোপন করে লিখে দিয়েছিল 'নসীরাম।' স্টার থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেল গিরিশ। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে। অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ, শরৎ বাঁড়ুয্যে বা রানুবাবু প্রমদা, মানদা—প্রায় পনেরোজন নট-নটী। দলপতি নীলমাধব। তারা সবাই মিলে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে 'সিটি থিয়েটার' খুলল। অভিনয় করল বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেবচরিত।

আর যায় কোথা! গিরিশ আর নীলমাধবের বিরুদ্ধে স্টার মামলা ঠুকল হাইকোর্টে। বললে, ঐ সব নাটকের অভিনয়স্বত্ব স্টারের, সিটির অধিকার নেই কানাকড়ি।

গিরিশ তখন মধুপুরে, রুগ্ন ছেলের জন্যে হাওয়া বদলাতে এসেছে। খবর পেয়ে ছুটল কলকাতা। চিরকাল শান্তিই তার একমাত্র কাম্য, স্টারের সঙ্গে রফা করল। মাসে একশো টাকা সে ভাতা পাবে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনো থিয়েটারে যোগ দিতে পারবে না। না, কোনো ভাবে সাহায্যও করতে পারবে না। যদি নাটক লেখে তার খরিদের অগ্রাধিকার থাকবে স্টারের। যদি নাটক স্টারের অমনোনীত হয় তবেই গিরিশ তা বেচতে পারবে অন্যত্র। কিন্তু, খবরদার, খরিদদার দলকে অভিনয় শেখাতে পারবে না। কোনো পক্ষে চুক্তিভঙ্গ হলে পাঁচ হাজার টাকা খেসারত।

শান্তি চাই। যে কোনো দামে শান্তি কিনে নিল গিরিশ।

মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞানসভায় যোগ দিল। বিজ্ঞান যদি শান্তি দেয়। পড়তে লাগল বিজ্ঞানের বই। ঘাঁটতে লাগল যন্ত্রপাতি। লেবরেটরিতে শিশি পরিষ্কার করতেও বাধল না। কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, ডাক্তার সরকার, হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকেছে। ঠাকুরের চিকিৎসা করছে। কী যে মজা ঠাকুরের সান্নিধানে, এসে আর উঠতে চায় না।

গিরিশ বললে, 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন

কথা ! আর রুগী নেই আপনার ? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না ?'

'আর চিকিৎসা ! ডাক্তার সরকার নিশ্বাস ফেলল : 'যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল।'

কিন্তু ডাক্তার অবতার মানতে রাজি নয়।

'ঈশ্বর সব কিছু হতে পারেন, শুধু মানুষই হতে পারেন না, এ কথা কি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জোর করে বলতে পারি?' বললেন ঠাকুর, 'একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়।'

'যেটুকু ভালো বিশ্বাস করলুম।' ডাক্তার বললে সরল কণ্ঠে, 'ধরা দিলেই তো চুকে যায়, কোনো গোল থাকে না। নইলে বলুন, রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথমে দেখুন বালি বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলল। এ কি ঈশ্বরের কাজ ?'

গিরিশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'এ মশাই ঈশ্বরের কাজ। এ কখনো মানুষে পারে ?'

'তারপর দেখুন সীতাবর্জন।'

'এ কাজও ঈশ্বরেই সম্ভব। মানুষের অসাধ্য।' গিরিশ আবার হুমকে উঠল।

ঈশান মুখুজ্জে লক্ষ্য করল ডাক্তারকে : 'আপনি কেন মানছেন না ? এই যে বললেন যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। আপনি ঈশ্বরই যদি মানলেন তবে অবতার মানতে বাধা কী।'

'মানতে বাধা যেহেতু ওঁর সায়েন্সে এ লেখা নেই।' ঠাকুর হাসলেন : 'বইয়ে লেখা না থাকলে এ কেমন করে বিশ্বাস হয় !'

পরে বললেন আপন মনে, 'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ আমি মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং।

কিন্তু গিরিশ গর্জে উঠল : 'আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতেই হবে। কিছুতেই আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। হয় বলুন শয়তান নয় ঈশ্বর। কিন্তু মানুষ বলতে দেব না।'

মহেন্দ্র সরকার হাসতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'সরলা না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই নানা রকম সংশয় নানা রকম অহংকার।'

'মশাই কী বলেন ?' গিরিশ বাঁকা চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে : কুবুদ্ধের কি জ্ঞান হয় ?'

'রাম বলো ! তাও কখনো হয় ?'

সরল যদি কেউ থাকে তা গিরিশ। তার ষোল আনা বিশ্বাস। কিন্তু ভক্তি বুঝি তারও চেয়ে বেশি। ভক্তি পাঁচ সিকে পাঁচ আনা।

সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশের বিজ্ঞানসভা নিয়ে কথা হচ্ছে।

বালকের মতন স্বচ্ছ কৌতূহলে ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গা 'আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে ?'

ডাক্তার বললে, 'তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কাণ্ড কারখানা দেখে।'

'সত্যি ?' আনন্দে উজ্জ্বল ঠাকুরের চোখ।

'বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বাড়বে।' বললে ডাক্তার : 'আর আপনার নরেন বলে ঈশ্বরই প্রচণ্ডতম বিস্ময় আর তাঁকে জানাই মহত্তম বিজ্ঞান।'

কিন্তু ঈশ্বরকে কি দেখা যায় ? তিনি প্রত্যক্ষীভূত হতে পারেন ? বললেই হল ? যার অমন বিশ্বাস তার অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাসের দাম কী।

'অন্ধ বিশ্বাসটা কাকে বলিস আমাকে বলতে পারিস ?' নরেনকে বলছেন ঠাকুর, 'বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কী! হয় বল বিশ্বাস নয় বল জ্ঞান। তা নয়, বিশ্বাসের আবার কতগুলো অন্ধ, কতগুলো চোখওয়ালা, এ আবার কোন রকম ?' জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বস্তু, যেমন তোকে দেখছি তেমনি, তুই যদি চাস তুইও দেখবি।'

গিরিশের 'কালাপাহাড়'-এ এরই প্রতিধ্বনি।

সাধু চিন্তামণিকে জিজ্ঞেস করছে কালাপাহাড় : 'মশাই, ঈশ্বর আছে ?'

'খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু আছে কিনা জানি না।' উত্তর দিল চিন্তামণি।

'কোথায় ঈশ্বর ?'

'ঐ তেঁতুল গাছে।'

'এ পাগল নাকি ?'

'কেন, পছন্দ হল না ? আচ্ছা, ভালো করি বলছি—তোমার কাছে, অন্তরে, সর্বত্র। এই যে হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে।'

'অন্ধ বিশ্বাস।' কালাপাহাড় মুখ ফেরাল।

'আমায় বলছ অন্ধ বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে বসে আছি আর তোমরা চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে ভূতের মত অন্ধকারে ঘুরছ। আমার অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি। আর চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মরছ।'

কালাপাহাড় কঠিন। বললে, 'যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হতে হয় হোক, আমি কখনও প্রত্যয় করব না।'

'আহাহা কী যুক্তির চোট! যে বিশ্বাসে ভগবান পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কানা, তোমার মত ধানকানা না হলে কেউ বিশ্বাস করে না।'

কালাপাহাড় বিরক্ত হয়ে বললে, 'যাও আর বাক্যব্যয়ে কাজ নেই। যে কথার মাথামুণ্ডু নেই তা প্রত্যয় করব কেমন করে ?'

'ঈশ্বর আছেন এই কথাটারই মাথামুণ্ডু নেই আর দুনিয়ার বাকি যত কথা আছে সব দশমুণ্ডু রাবণ। বেশ, তোমার থেকে একটা মুণ্ডু কথা জেনে নিই।'

'এই সূর্য উঠেছে, দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ।'

'সত্যি ?' চিন্তামণি তাকাল সবিস্ময়ে।

'সত্যি না ? সে কি, দেখতে পাচ্ছ না চোখের উপর ?'

'কি করে জানব বলো। কাল রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলাম হাতী চড়েছি, তার পর কোথায় বা হাতী কোথায় বা কি !'

'তুমি নিতান্ত নির্বোধ। স্বপ্ন আর জাগা বোঝ না।'

'না, চক্ষুওলা অবিশ্বাসে তো বোঝা যায় না। যখন স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন মনে করেছিলাম সত্যি দেখেছি। এখনো মনে করছি সত্যি দেখছি। দেখছি চক্ষুওলা অবিশ্বাসে দেখলে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বোঝা যায় না। তবে অন্ধ বিশ্বাস করতে বলো। সে এক আলাদা—'

'কি বলছ' ?' কালাপাহাড় অস্থির হয়ে উঠল।

'দেখ একটা কথা তোমায় বলি।' চিন্তামণি বললে শান্তস্বরে, 'এক ফকির ছিল, রোজ দিনের বেলা ভিক্ষে করত আর রাত্রে স্বপ্নে বাদশা হত। জেগে যেমন আজ এ বাড়ি ভিক্ষে করলে আর রাত্রে স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দান নিলে কাল ওকে তালুক দিলে। বলতে পারো তার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে ? তুমিও যদি স্বপ্নে সূর্য দেখ, দেখে মিথ্যে বলতে পারো—তাহলে বোলো তোমার সে সূর্য মিথ্যা এ সূর্য সত্যি।'

'স্বপ্নে কি কখনো মনে হয় যে স্বপ্ন দেখছি ?'

'জেগেও কি কখনো মনে হয়না মিথ্যে দেখছি ? দেখ, চোখওয়ালা অবিশ্বাসে বড় ফ্যাসাদে ফেলে দিল।'

কালাপাহাড় সম্পর্কে চিন্তামণির কাছে নালিশ হচ্ছে : 'বলব কি বাবাজি, যেমন মড়া দেখলে শকুনি পড়ে তেমনি ছিষ্টির ছুঁড়িগুলো ওকে খাবার চেষ্টায় খালি ফেরে। কত বেটি কত ঠাট ঠমক করে কথা কইত, ও কিন্তু ফিরত না। কারুর কথায় কান দিত না, তাই বেটিরা বলত, কালা। আর ঠিক ঐ বসে ধ্যান করত, নড়ত না, তাই বেটিরা নাম দিয়েছিল পাহাড়। কিন্তু আজ তো পাহাড় কাত—উন্মাদিনী নবাবনন্দিনী—'

কালাপাহাড় নিজেই গেল চিন্তামণির কাছে। জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, রমণীর কটাক্ষ কি কোনদিন বিদ্ধ করেনি তোমাকে ?'

চিন্তামণি বললে, 'বড় জোর করে ফোটাতে পারেনি, অমনি ভাসা ভাসা গিয়েছে। একে তো বেটিদের ভয়ে সরে বেড়াতুম, ভাবতুম কোনোদিন গলায় কাপড় দেবে—তারপর ভাবতুম, বেটিদের অত জোর কিসের ? ঠাউরে দেখলুম, এক ফোঁটা রূপের। আমি মজা পেলুম আর কি। মনে মনে ঠিক করলুম যে, রোসো যার খুব রূপ, তাকে নেব। গুরু বললেন, খুব রূপ এক ভগবানের। এই সুন্দর সাগরে ভাসলুম আর কি। ছটাকে রূপ আর নজরে এল না। কিন্তু এখনো বলছি আমার গা-ছমছমানি কমেনি।'

'কেন ?'

'আর বোঝ না, বেটি আর রূপ পেয়েছে কোথা ? ও রূপ তা তাঁরই, ঈশ্বরের। ঐ ছটাকে রূপে তো জগৎ মজিয়ে রেখেছে। কাজ কি ওধার দিয়ে চলে ? কেউ কাছে এলে রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়ে বসে থাকি।

ঠাকুরেরই ভাবের প্রতিচ্ছায়া। ঠাকুর বলতেন, কামিনী চুম্বক পাথর—ছোট চুম্বক পাথর। ঈশ্বর সব চেয়ে বড় চুম্বক পাথর।—'কামিনী কী করবে ?'

চিন্তামণির পার্টে স্বয়ং গিরিশ। আর কালাপাহাড় অমৃত মিত্র।

সিটি থিয়েটারের বিরুদ্ধে স্টারের নালিশ টিকল না। বাজারের চলতি নাটকের অভিনয় সব থিয়েটারেই হতে পারবে। একক কোনো অধিকার নেই স্টারের।

পাথুরেঘাটার প্রসন্ন ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখুজ্জে 'মিনার্ভা' থিয়েটার খুলল। সিটি থিয়েটারকে ডাকল প্লে করতে! নীলমাধব অংশ চেয়ে বসল। গিরিশ বললে, 'আগে নাগেন্দ্রবাবুকে থিয়েটার তৈরির খরচটা তুলতে দাও, পরে শেয়ার নিও।'

নীলমাধব রাজি নয়। খেপে গেল গিরিশ। বললে, আমি নিজেই দল করব। অর্ধেন্দুশেখরকে ডাকো।

কিন্তু স্টারের সঙ্গে তার চুক্তির কী হবে ? নাগেন্দ্র স্টারকে পাঁচ হাজার টাকার খেসারত দিল। চুক্তি খারিজ হয়ে গেল। ছাড় পেল গিরিশ। ম্যানেজার হল মিনার্ভার। নতুন করে ম্যাকবেথ অনুবাদ করল। নামাল মিনার্ভায়। ম্যাকবেথ স্বয়ং গিরিশ। লেডি ম্যাকবেথ তিনকড়ি। আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী কী না সাজাল—পোর্টার, ডক্টর, মার্ডারার।

বিল্বমঙ্গলে প্রথম নামে তিনকড়ি সখীর ভূমিকা নিয়ে। কথা নেই, শুধু পাখা নেড়ে হাওয়া করা। তারপর বিবাহ-বিভ্রাটে। সেখানেও নির্বাক বাসর-জাগাদের একজন। রূপসনাতনে প্রথম মুখ খোলে। সখী হয়ে গান গাইল : 'দেখ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল ভুজঙ্গিনী।'

গানে হাততালি পড়ল। থিয়েটারের কর্তারা খুশি হয়ে তিনকড়িকে পুরস্কার দিল। তিনটি টাকাও নয়—মাত্র এক টাকা। সেই টাকাটাই আজীবন বাঁচিয়ে রেখেছে তিনকড়ি। তার প্রথম পুরস্কার।

কিন্তু তিনকড়ির মায়ের ইচ্ছে নয় যে তিনকড়ি এই থিয়েটারেই বাঁধা পড়ে থাকে। মায়ের হিসেব মত বাঁধা পড়ার আরো জায়গা আছে।

'আপনি দুশো টাকা চেয়েছেন তা দেব। বেশ, থিয়েটারে যা ও মাইনে পায় তাও দেব।' বললে ভদ্রলোক, 'কিন্তু ওকে থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।' আমি 'থিয়েটার ছাড়তে পারব না!' ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে তিনকড়ি বললে সদর্পে।

'মেয়ে যেন ঢঙ!' মা ধমকে উঠল। ভদ্রলোককে বললে, 'তা কাল আসবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।' মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানল : 'থিয়েটার ছাড়ার জন্যে কিছু আটকাবেনা।'

'আপনার যদি বিশ্বাস না-হয়, আমি ছ মাসের টাকা অগ্রিম দিচ্ছি।' বললে ভদ্রলোক।

'বেশ, কাল আসবেন।'

'হ্যাঁ, কাল সব টাকাকড়ি নিয়ে আসব। কাল সন্ধেয় আপনার মেয়ে যেন থিয়েটারে না যায়।'

মা অনেক প্রলোভন দেখাল মেয়েকে। সমস্ত গা একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। দালান বালখানা করে দেবে শেষ পর্যন্ত, আর তোর থিয়েটারে আছে কী। তবু পরদিন মার চোখে ধুলো দিয়ে থিয়েটারেই পালিয়ে গেল তিনকড়ি। সন্ধের সময় ভদ্রলোক এসে দেখল পাখি খাঁচায় নেই। খুব খানিক গালাগালি করে চলে গেল আগুন হয়ে। তার চেয়ে আগুন হয়েছে মা। রাতে বাড়ি ফিরতেই তিনকড়িকে বাঁকারি দিয়ে পিটতে লাগল। হতভাগী হারামজাদি যমের অরুচি—

মারের চোটে তিনকড়ি জ্বরে পড়ল। তিনদিন বেহুঁস হয়ে রইল। হ্যাঁ, মরব তবু আমার সাধনার ধন থিয়েটার ছাড়ব না। আমি আর যা হই না হই তা পরে কিন্তু প্রথমে ও প্রধানে আমি শিল্পী, আমি অভিনেত্রী।

'কে আপনি? কোত্থেকে আসছেন?' আগন্তুক ভদ্রলোকের প্রতি তিনকড়ি মুখিয়ে উঠল।

'আমি গিরিশবাবুর থেকে আসছি', বললে ভদ্রলোক, 'তিনি মিনার্ভাতে আছেন। তিনি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যাবে?'

'যাব।' তিনকড়ি লাফিয়ে উঠল।

'তা হলে ঠিক থেকো। সন্ধের সময়ে গাড়ি আসবে।'

গাড়ি এল। তিনকড়ি গিরিশকে প্রণাম করে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ আলাপ করেই গিরিশ বুঝল এ মেয়েটির মধ্যে প্রতিভা আছে। আদর্শের প্রতি আনুগত্য আছে—হয়তো বা অনুরাগ।

থিয়েটারের কর্তাব্যক্তি একজনকে ডেকে গিরিশ বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে এক বছরের একটা এগ্রিমেন্ট করে নাও আর কাল থেকে এর বাড়িতে যাতে গাড়ি যায় তার ব্যবস্থা কোরো।'

গিরিশের ঔদার্যে ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে গেল তিনকড়ি।

প্রমদার কিছুতেই লেডি ম্যাকবেথটা হচ্ছে না, ভুল দেখিয়ে দিলেও পারছে না শুধরে নিতে।

'ডাকো ঐ নতুন মেয়েটাকে ডাকো।'

প্রমদা মুখ ভার করে বসে রইল। আর যে পার্টটা সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করে উঠতে পারছে না তাই একটা নামগোত্রহীন পুঁচকে ছুঁড়ি আয়ত্ত করবে এ কল্পনারও বাইরে। থিয়েটারে শুধু আসছে-যাচ্ছে, পার্ট পাচ্ছে না, এই বলে তিনকড়ির যেটুকু অভিমান ছিল তা এই নিমন্ত্রণে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

'যাও না, ওঠ না, গিরিশবাবু ডাকছেন।' প্রমদার দলের একটা মেয়ে তিনকড়িকে ঠেলে দিল।

তিনকড়ি গিরিশের সামনে দাঁড়াল নত চোখে।

'আচ্ছা তুমি বলো দেখি, শুনি—'

পার্টের কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তিনকড়ি বললে, স্নিগ্ধস্বরে, 'কাল বলব।'

তার বিনয়ে খুশি হল গিরিশ। বললে, 'তাই ভালো। আজ রাত্রে পার্টটা ভালো করে দেখে রাখো। কাল বলবে।'

সারা রাত ঘুম হল না তিনকড়ির। নটনাথের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। যেন সফল হই। আমার মধ্যে গিরিশবাবুর স্বপ্ন যেন সার্থক হয়। বারে বারে পড়ে পার্টটা মুখস্থ করে ফেলল তিনকড়ি। কোথায়-কোথায় প্রমদার কী ভুল হচ্ছিল তাও শুধরে নিলে!

পরদিন রিহার্সালে বেজায় ভিড়। দেখি নতুন মেয়েটা কেমন বলে। মনে-মনে নটনাথকে প্রণাম করে আরম্ভ করল তিনকড়ি।

গিরিশবাবুর কিছু বলবার আগেই থিয়েটারের লোকেরা এক বাক্যে বললে, 'বাঃ, বেশ হবে। পারবে। প্রমদার চেয়ে অনেক ভালো করবে।'

শুধু প্রমদাই মানতে চাইল না।

লেডি ম্যাকবেথের পার্টে নামল তিনকড়ি। তার জয়জয়কার পড়ে গেল।

'আমি নিরক্ষর নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা অধম মেয়ে, কিন্তু আমি আজ অভিনেত্রী বলে গণ্যমান্য—এ কার কৃপায়?' বলছে তিনকড়ি, 'এ শুধু গিরিশবাবুর কৃপায়! তাঁর কী সুন্দর মিষ্টি কথা, কী সরল ভাব! কী বিপুল পরিশ্রমে লোহাকে সোনা করার চেষ্টা! তাঁর মত আর গুরু কে! সুহৃদ কে!'

গিরিশের সাহচর্যে কি শুধু অভিনয়ের কলাকৌশলই শিখেছে, না তার সংস্পর্শে শিখেছে কিছু ভক্তি, আর বিশ্বাস আর শরণাগতি?

'জানি কত অযোগ্য লোক আসে।' বলছেন সারদামণি: 'হেন পাপ নেই যা জীবনে করেনি। কিন্তু আমাকে যখন মা বলে ডাকে তখন সব ভুলে যাই। যা হয়তো পাওয়া উচিত নয় তারও বেশি দিয়ে ফেলি।'

তিনকড়ি আর তারাসুন্দরীও এসেছে মার কাছে। ঐশ্চর্যের বেশে নয়, দীনহীনার মত। বসেছে মার পায়ের কাছে। মা প্রসাদ দিয়েছেন। প্রসাদ খেয়ে জায়গাটা নিজের হাতে নিকোল দুজনে। শালপাতা নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

হ্যাঁ, ভক্তিতেই হবে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। কি বলছেন ঠাকুর? 'ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।'

থিয়েটারেও নটনাথ। থিয়েটারেও ভক্তি।

ডাক্তার সরকার গিরিশের বুদ্ধদেবচরিত দেখে এসেছে। দেখে যারপরনাই আনন্দিত।

বললে গিরিশকে, 'তুমি বড় বদ লোক। আমাকে রোজ থিয়েটারে যেতে হবে।'

'কেন, এ কথা কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

ডাক্তার বললে, 'ওর থিয়েটার বড় ভালো লেগেছে।'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।' বললেন ঠাকুর।

ডাক্তার ফোঁস করে উঠল : 'সব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্যে তোমার কেন এত মাথাব্যথা?'

'বলাচ্ছেন তাই বলি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।'

'তুমি যদি যন্ত্র তো চুপ করে থাকো।'

গিরিশ রুখে উঠল : 'কিন্তু সাধ্য কী চুপ করে থাকি? তিনি করান তাই করি। সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেউ এক পা যেতে পারে?'

'ফ্রি উইল তিনি দিয়েছেন তো?' বললে ডাক্তার, 'আমি মনে করলে ঈশ্বরচিন্তা করতে পারি, আবার না করলে নাও করতে পারি।'

'যদি করেন তো ভালো লাগে বলে করেন।' গিরিশ পালটা বললে, 'আপনি করেন না, সেই ভালো লাগাটা করায়!'

'কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি।'

'সেও কর্তব্য কর্ম করতে ভালো লাগে বলে।' গিরিশ আবার পালটা ছাড়ল।

'মনে করো একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে—'

'ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয় তাই আগুনের ভেতর যান।' বললে গিরিশ, 'আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া।'

সকলে হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক তাই। সাধু গাঁজা তৈরি করছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ।'

১৭

তুমি কি কষ্টিপাথর যে কে ভালো সোনা কে মন্দ সোনা পরখ করে-করে বেড়াবে? তোমার পরখ কে করে?

'কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না।' ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'

অদোষদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।

ঠাকুর যোগেনকে বললেন, 'আমার বাতি ফুরিয়ে গিয়েছে। বাগবাজারের গিরিশ ঘোষের কাছ থেকে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয় আমার নাম করে।'

একটা মোমবাতির জন্যে সেই বাগবাজার! যোগেন প্রায় হতভম্ব। কিন্তু গুরুর কথার উপর কথা কী! অবাক্যব্যয়ে তা মানতে হবে। কিন্তু গিরিশ ঘোষ তো শুধু নামেই শোনা। চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই। বাগবাজারে কোথায় বাড়ি তাই বা কে জানে। রাত হয়েছে, তা হোক, খুঁজে খুঁজে বাড়ি ঠিক বার

করল। কিন্তু গিরিশ ঘোষ কোথায়? কোন শ্রাদ্ধ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে। অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চুপচাপ বসে রইল যোগেন।

কতক্ষণ পরেই ফিরল গিরিশ। কিন্তু মদে একেবারে দুর্মদ হয়ে ফিরেছে। কাছা-কোঁচা বেসামাল, টলছে আর টলছে, এটা ধরছে, ওটা ধরছে। আগন্তুক দেখে এক পলক থমকাল গিরিশ। জিজ্ঞেস করেল: 'কে? কে তুমি?'

'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে?' নিমেষে স্থির হল গিরিশ। উত্তর দিকে মুখ করে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করল।

'কেন? কী চাই?' যোগেনের দিকে তাকাল গিরিশ।

'একটা বাতি।'

'বাতি! বাতি দিয়ে কী হবে?' প্রায় তেড়ে এল গিরিশ।

'ঠাকুর চেয়েছেন।'

'ঠাকুর চেয়েছেন?' গিরিশ এবার একেবারে মাটির উপরে গড় হয়ে প্রণাম করল: 'আহা, কী দয়া! একটা বাতির জন্যে এতদূরে পাঠিয়েছেন আমার কাছে? একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও। আজ আমার কী সৌভাগ্য!'

হঠাৎ, কোন্ খেয়ালে কে জানে, চাকা ঘুরে গেল। উলটো সুর ধরল গিরিশ। ঠাকুরের উদ্দেশে স্তবস্তুতি নয়, নির্জলা গালাগাল।

'বলি, বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? তোমার বরানগর আলমবাজারে বাতি মেলে না? সেখানকার দোকান সব উঠে গেছে? একেবারে আমার বাড়িতে ধাওয়া করেছ। কেন, পয়সা নেই কেনবার? আমি কী বাতির ব্যবসা করি? আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন?' বলে বস্তি-পচা খিস্তি সুরু করল। মাতালের মহাপ্রসাদ।

আকাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল যোগেন।

একটা বাতি তার দিকে ছুঁড়ে দিল গিরিশ: 'নাও, পালাও, অন্ধকার আলো করতে বলো।'

বাতিটা কুড়িয়ে নিয়ে যোগেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। মাতালটা যে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি তাই ভাগ্যি।

হন্তদন্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এসে পড়ল যোগেন। বললে, 'কোন্ এক ত্রেপণ্ডু মাতালের কাছে পাঠিয়েছিলেন—'

'কেন, কী হল?' ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন: 'দেয়নি বাতি?'

'বাতি দিয়েছে, কিন্তু কী বদ্ধ মাতাল! খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়!'

'কাকে?' ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'আর কাকে? আপনাকে।'

একটুকু ম্লান হলেন না ঠাকুর, বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'কী আবার করবে! এমন কদর্য গালাগাল কোনো ভদ্রলোকে করতে পারে, তাও আপনার সম্পর্কে, কল্পনা করা যায় না—'

'হ্যাঁ রে, আর কিছু করেনি?'

'সে সব কুকথা মুখে আনা যায় না।' উত্তেজনায় তখনো কাঁপছে যোগেন: 'এমন বদ্ধ মাতালও কেউ হয়!'

কিন্তু ঠাকুরের এতটুকু বিকার নেই। দরদভরা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন আবার, 'হ্যাঁ রে, শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'হ্যাঁ, প্রথমে দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি বলে হাত তুলে নমস্কার করেছিল, যোগেন বললে শান্তস্বরে, 'পরে আপনি পাঠিয়েছেন জেনে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল গড় হয়ে—'

'তবে?' আনন্দে উথলে উঠলেন ঠাকুর: 'তুই শুধু ওর মন্দটাই দেখলি, ভালোটা দেখলিনে? খালি মদ দেখলি, ভক্তি দেখলিনে? শুধু গালাগালই শুনলি, দেখলিনে আমার উপর কী টান, কী বিশ্বাস! শোন্ লোকের ভালোটাও একটু দেখিস, তাকে পুরোপুরি নিন্দের পাথারে ভাসিয়ে দিসনে।'

গিরিশ ঠাকুরের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বললে, আবার সেই কথা, 'আমি নিতান্ত পাষণ্ড। যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিই আপনাকে—'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো। —তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। বদরক্ত রোগ কারু কারু আছে। যত বেরিয়ে যায় তত ভালো।' সান্ত্বনায় বদান্য হলেন: 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময়ই কাঠ চড়চড় করে। পুড়ে গেলে আর শব্দ নেই।'

'কি উপায় হবে আমার?'

'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে। দিন-দিন তোমার উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে।'

'হবে?' গিরিশ কাতরস্বরে বললে, 'আমি তো কিছুই করি না।'

'তোমার এমনিই হবে।' বললেন ঠাকুর, 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।'

আবার ডাক্তার সরকারের সঙ্গে গিরিশের সেই তর্ক। ডাক্তার অবতার মানে না, বলে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের আত্মা অনন্ত উন্নতির পথে চলেছে ঈশ্বরত্বের দিকে।

'অনন্ত উন্নতি। ইনফিনিট প্রোগ্রেস।' বললে ডাক্তার, 'তা না হলে বাকি জীবনটা বেঁচেই বা কী হবে। গলায় দড়ি দেব।'

'তাই দিন।' বললে গিরিশ।

'কিন্তু অবতার আবার কী! যে মানুষ খায়-দায় ঘুমোয় তার পদানত হব?'

'আপনাকে কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না—'

'তবে রিফ্লেকশান অফ গডস্ লাইট—যদি বলো, ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ হয়েছে, তা মানতে পারি।'

গিরিশ ব্যঙ্গ করে উঠল: 'কিন্তু আপনি তো ঈশ্বরের জ্যোতি, গডস্ লাইট

দেখেননি—'

'আর তুমিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখছ না।' বললে ডাক্তার।

গিরিশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'আমি দেখছি। আই সি ইট। আমি আলোও দেখছি, প্রতিবিম্বও দেখছি। ইনি যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তা আমি প্রুফ করব। তা না হলে জিব কেটে ফেলব আমার।'

গিরিশের 'জনা'-তে সেই কথা। বিশ্বাসের জোরেই কৃষ্ণদর্শন।

লেডি ম্যাকবেথ ভালো চলল না। বিদগ্ধ মহল নিলেও সাধারণ দর্শক তৃপ্ত হল না। তখন কী আর করা? গিরিশ আবু-হোসেন লিখল। 'রাম রহিম না জুদা করো, দিলকি সাচ্চা রাখো জি।' এই গান ফিরতে লাগল মুখে-মুখে।

তারপরেই 'জনা'। পুত্রশোকে করালিনী কালভুজঙ্গিনী জনা-র ভূমিকায় তিনকড়ি। আর-এক অভিনব চরিত্র বিদূষক, পেটুক, সরল, বিশ্বাসী—রাজা নীলধ্বজের প্রণয়মন্ত্রী। সেই ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর।

নীলধ্বজ অগ্নির কাছে প্রার্থনা করছে, যেন নবঘনকায় নররূপী নারায়ণের দর্শন পায়। অগ্নি বললে, মিটবে এ বাসনা।

'কি হে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?' বিদূষককে অগ্নি জিজ্ঞেস করল: 'তুমি কিছু চাইলে না?'

বিদূষক বললে, 'আজ দেখছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি, তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম বললেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।'

'কেমন করে বললে, যে হরিনামে সর্বনাশ হয়?'

আমায় কি পেয়েছ ধানকানা, শুনবে তোমার হরির গুণপনা?' বললে বিদূষক, 'পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ দিশেহারা—আর রাধা? তার কাঁদা সার, একশো বছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কান দেন না কথায় কার, যেন কারু কখনো ধারেন না ধার—'

'ছি, ছি, তুমি কৃষ্ণনিন্দা করছ?'

'নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ।' বললে বিদূষক, 'যেখানে যান জ্বালান আগুন, যদি পদার্পণ হল মথুরায়, অমনি সেখানে উঠল হায়-হায়। পরে কৃপাময় হলেন পাণ্ডব সখা—বেজায় পীরিত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা গেলেন। তাই ভাবছি এমন সুখের এই পুরী, উদয় হয়ে শ্রীহরি না জানি কি কারখানাটা করবেন—'

'তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না।' অগ্নি বললে, 'হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন—'

'সে বহুকাল থেকে দেখে আসছি।' বিদূষক ব্যঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল: 'যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।'

'না, না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা, তুমি তাঁর রাঙা পায়ে স্থান পাবে।'

'তোমার সাতগুষ্টি সে স্থান পাক, তোমার দেবলোক উদ্ধার হয়ে যাক—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ, কৃষ্ণ ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না, তা নইলে তোমায় সাফ বলছি, আমি বামুনের ছেলে, হোম করতে তোমায় আবাহন করে ঘির বদলে জল ঢেলে দেব।'

'আচ্ছা। তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?'

'আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশবার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে তরে যায়। আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাবতে হবে না।'

বিদূষককে উদ্দেশ করে অগ্নি তখন বললে,

'ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম॥
হরিভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভবসাগর গোষ্পদ সমান তার।'

কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর অর্ধেন্দু হঠাৎ মিনার্ভা ছেড়ে দিল। এমারেল্ড ভাড়া নিয়ে নিজে আলাদা দল করে থিয়েটার চালাল। তখন আর কী করা, গিরিশ নিজেই বিদূষক সাজল। তাতে আরো জমল যেন অভিনয়। পুত্রশোকে উন্মাদিনী জনা। অর্জুনের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে পুরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর নীলধ্বজের প্রার্থনায় পুরীতে অর্জুনসহ আসছেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রান্তর মধ্যস্থ শুষ্ক তরুতলে বিদূষক আর তার ব্রাহ্মণী এসে দাঁড়িয়েছে। এই অশ্বত্থ গাছ মা জনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে গিয়েছে।

'ওমা, এই ডাইনেখেগো গাছতলাটায় বসব কী গো।' ব্রাহ্মণী আপত্তি করল।

বিদূষক বললে, 'না রে, ডাইনেখেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল, বোধহয় শ্রীমধুসূদন মাঝে এর তলায় এসে বসতেন, তুই দেখছিস কী—বাস্তুবৃক্ষও থাকবে না।'

ব্রাহ্মণী অনুযোগ করল: 'হ্যাঁ গো, তুমি দিনরাত কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলো তো?'

'বুঝতে পারিনে, তোর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই বলে। বললে বিদূষক, 'এই যে রাজবাড়িতে হাহাকার উঠে গেল, দেখলি নে? নামের গুণেই এইটুকু, এবার স্বয়ং উদয়। কে জানে কী হবে!' কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধতে লাগল বিদূষক।

'চোখে কাপড় বাঁধো কেন?' ব্রাহ্মণী উদ্বেগের সুরে বললে।

'তোমার বঙ্কিমনয়নের জ্বালায়।'

'আহা আমার আবার বঙ্কিমনয়ন কী!'

'তোমার নয়, তোমার নয়, তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর আমি

দেখিনি ? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিমনয়ন, মুরলীবয়ান।'

'ওঃ। হরি তোমায় দেখা দেবার জন্য অমনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিনসেকে বাহাত্তরে ধরেছে।'

'আরে রে থাম, থাম। ও নাম করিসনে। ওরে জানিস নে,. ডাকলেই এসে উঁকি মারে। তোকে কৃপা কল্লেই বা আমায় রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস কোথা।'

'হতচ্ছাড়া মিনসের আক্কেল শোনো।' ব্রাহ্মণী ঝামটা দিয়ে উঠল: 'যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্ছে।'

'তুই কী বুঝবি বল।' বিদূষক বললে, 'মুরারি অবতার হয়ে এসেছেন, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন আর নগর ভেঙে মরুভূমি করছেন। ওরে, কেউ এড়াবে না রে—কেউ এড়াবে না, তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না করে ছাড়ে না তা বুঝিছি, তবে রয়ে-বসে একটু হাত গজায়, তাই চেষ্টা করছি।'

'চতুর্ভুজ হবেন! উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগী ঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে ধ্যান করে কিছু করতে পারে না আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন।'

বিদূষক সোল্লাসে বললে, 'আরে রেখে দে তোর জপধ্যান, ও নামের ঠেলা জানিসনে ?'

'তা তোমার কি, তুমি তো ভুলে ও নাম কর না।'

'আরে, ঝকমারি করে ফেলেছি বই কি। তোর মনে নেই, সেই যেদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে মোণ্ডা তুলে রাখলি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বামনীর হাতের খাড়ু খোলো, সেই অবধি আমার গা-ছমছমানি একদিনের তরেও যায় নি।'

ব্রাহ্মণী আবার ঝাঁজিয়ে উঠল: 'উনি একদিন হরি ডেকেছিলেন—ডেকে বৈকুণ্ঠে চললেন। চল মিনসে ঘরে চল, ন্যাকামো করিসনে।'

'তবে দেখবি ? যা, তফাৎ গিয়ে একবার ডাক গে যা—যা থাকে কুলকপালে না হয় রেঁধে খাব।'

'ওগো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে!' ব্রাহ্মণী প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'তোর কথা শুনে আমি চোখ খুলি, আর সব ভণ্ডুল হয়ে যাক। একটা মধুর শব্দ এখান অবধি আসছে, গাছ তো গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না।'

'ওগো, চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই। সত্যি সত্যি নতুন পাতা গজাচ্ছে।'

'সত্যি নাকি ?' বিদূষক বললে, তুই এদিকে-ওদিকে উঁকি মার, কেউ কোথায় নেই তো ?'

'কে আবার তোমার এ ভুতুড়ে গাছতলায় আসবে ?'

'কে আর বুঝতে পাচ্ছিস নে ?'

'বুঝতে পেরেছি যে তোমার ঘাড় ভাঙবে।'

'এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছে পাতা অমন কত গজায়, তুই ওখানে চেপে বোস।' বিদূষক চঞ্চল হয়ে উঠল: 'দ্যাখ দ্যাখ যেন কার পার শব্দ পাচ্ছি।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করল।

ব্রাহ্মণী বললে, 'ও একজন বুড়ো বামুন।'

'ভয় দেখা', বিদূষক চেঁচিয়ে উঠল : 'সরে পড়ুক, নিদেন দূবার গাছ-তলায় বসে হাই তুলে নাম করবে।'

'আপনি কে মশায় ?' ছদ্মবেশী কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করল বিদূষককে।

বিদূষক পালটা জিজ্ঞেস করলে : 'আপনি কে আগে বলুন।'

'আমি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।'

'আর আমি এক অন্ধ কন্ধকাটা।'

ছদ্মবেশী বললে, 'মশায়, আমি ক্ষুধার্ত, আপনার বাস কি এই নগরে ?'

'পূর্বে ছিল, এখন অশ্বত্থ-তলায় এসে বাস করছি।' বললে বিদূষক।

'যদি কৃপা করে আমাকে কিছু খেতে দেন।'

'বুড়ো হলে তবু একটু আক্কেল হল না ? শুনছ না কার নাম করে ঐ গর্জন উঠছে, ঠাকুর যে স্বয়ং আসছেন রাজপুরে। যদি ভালোই চাও নদী থেকে দু' আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হয়ে যাও, নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বললে, 'আহা বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ বলো। তুমি বৈকুণ্ঠে যেতে চাও না !'

'এক দম না।'

'কেন ?'

'তোমার মতন অত সৌখিন নই, তোমার সখ থাকে তো নগরে গিয়ে সেঁধোও—'

'চোখে কাপড় বেঁধেছ কেন ?'

'চোখের ব্যামো হয়েছে।'

'ওগো ও বামুন ঠাকুর,' ব্রাহ্মণী আকুলকণ্ঠে বললে, 'এ মিনসের কথা শোন কেন ? পাছে কৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায় সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধেছে। খেপেছে গো খেপেছে, আমি ওকে কোনো মতে নিয়ে যেতে পারছি না।'

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বিদূষকের দিকে এগিয়ে এল : 'সত্যি তুমি কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ ? তুমি এমন কী পুণ্য করেছ যে কৃষ্ণ দর্শন পাবে ?'

ব্রাহ্মণী বললে, 'উনি কবে একদিন হরিনাম করেছিলেন, তাই হরি এসে ওকে চতুর্ভুজ করবেন, ন্যাকা মিনসে—'

'হ্যাঁ ঠাকুর,' জিজ্ঞেস করলে ছদ্মবেশী : 'একবার হরিনাম করলে কি চতুর্ভুজ হয় ?'

বিদূষক পুলকিত স্বরে বললে, 'তবে খোল খাড়ু বামনী, যা থাকে কপালে দিক হরি দেখা।'

শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিত মুরলীধর মূর্তিতে দেখা দিলেন। বললেন, 'দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি। দেখ তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থদেহ পল্লবিত হয়েছে, তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য।'

'তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যে।' গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদছে আকুল হয়ে।

ঠাকুর সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন, 'ওরে একে তামাক খাওয়া।'

'বড় খেদ রইল তোমার সেবা করতে পেলুম না।' মাথা তুলে বললে গিরিশ। সে শুধু নিজে কাঁদছে না, যে শুনছে সেও কাঁদছে। অন্তর দিয়ে মাখানো সেই আর্তি। বললে করজোড়ে, 'ভগবান্ বর দাও, এক বছর তোমার সেবা করব। মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব করে দি। বলো এক বছর সেবা করতে দেবে?'

ঠাকুর বললেন, 'এখানকার লোকজন ভালো নয়, কে কী সব বলবে তোকে নিয়ে—'

'রেখে দাও লোকের কথা। বলো দেবে—'

'আচ্ছা, তোর বাড়িতে যখন যাব—'

'না তা নয়, এইখানে—এইখানে পূর্ণ ব্রহ্মের সেবা করব।'

গিরিশের জেদ দেখে নরম হলেন ঠাকুর। বললেন, 'আচ্ছা সে ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

'বেশ, তা হলে বলো, গলার অসুখ আরাম হয়ে যাক।'

'সে কী রে, তা কী করে বলি।'

'বেশ, না বলো, আমি ঝাড়িয়ে দেব।' বলে গিরিশ মন্ত্র বলার মত করে বললে, 'কালী, কালী!'

'ওরে আমার লাগবে।'

গিরিশ তা গ্রাহ্য করল না, শূন্যে হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগল: 'ফুঃ! ভালো হয়ে যা। ভালো হয়ে যা।'

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা বাপু, আমি ওসব বলতে পারিনে।'

'বলতে পারো না?'

'না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বলতে পারিনে। তবে, যা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।'

'আমায় ভুলোনো।' গিরিশ প্রায় ধমকে উঠল: 'তোমার ইচ্ছায় হবে। তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয় তা হলে সবই মিথ্যে।'

'ছি, ও সব বলতে নেই।' ঠাকুর নম্র মধুর কণ্ঠে বললেন, 'ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবতে চাও তা ভাবতে পারো। নিজের গুরু তো ভগবানই—তা বলে ও সব বলায় অপরাধ হয়।'

কিন্তু গিরিশ নাছোড়বান্দা। আবার বললে জোর দিয়ে, 'না, বলো, ভালো

হয়ে যাবে।'

ভালো মানুষের মত ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা হয়েছে তা যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে আপন মনে গিরিশ বলছে, আশ্চর্য হচ্ছি, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কী তপস্যা করেছি যে আমি এই সেবার অধিকারী হয়েছি। আমার মতন ঘোর অপবিত্র আর কে আছে?

ঠাকুর বললেন, 'তুমি পবিত্র তো আছো। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।'

'ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝছ?' গিরিশ তাকাল চারদিকে, বললে, 'জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন তাদের উদ্ধার করবেন বলে।'

'গিরিশের পাপ নিয়ে আমার ব্যাধি।' এও তো ঠাকুরেরই কথা।

যা হয়েছে তা যাবে। তার মানে কি গিরিশের পাপ চলে যাবে? না, যে দেহ হয়েছে তা থাকবে না!

১৮

মিনার্ভায় 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্য নামাল গিরিশ।

'দিন গিয়েছে রাত হয়েছে ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা যায়নি নেশার ঘোর।'

মহেন্দ্র ডাক্তারকে বলছেন ঠাকুর, পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্যে আরেকটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্যে জ্ঞানকাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়।

'স্বপ্নের ফুল'-এ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করল গিরিশ।

'দেখলি কেমন মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা দিয়ে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে।'

তার মানে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হয়ে যাও। ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। পাপ-পুণ্যের পার। ধর্মাধর্মের পার। শুচি-অশুচির পার।

'দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়ার পর কী থাকবে?' জিজ্ঞেস করলে শ্যাম বোস।

'নিত্যশুদ্ধ বোধরূপম।' ঠাকুর বললেন, 'তা তোমায় আমি কেমন করে বোঝাব?' গিরিশও গানে প্রতিধ্বনি করল।

'দুটো কাঁটা ফেলে দে দ্যাখ সেই সেই রে।
দ্যাখ খুঁজে পেতে আর কি পাবি আমি তো কোথাও নেই রে॥'

এই তো সেই জীবন্মুক্তির ইঙ্গিত।

এই 'স্বপ্নের ফুল'-এই আবার লিখল গিরিশ:

'সাবধান সাবধান তোরে সদা বলি প্রাণ সাবধান কুটিল নয়ন।
যদি দেবীমূর্তি হয় চেও মাত্র রাঙা পায় সাহসে বদন তুলে দেখনা বদন॥'

তাই বুঝি শ্রীমার মুখের দিকে তাকায়নি গিরিশ। শুধু দুটি পায়ের উপর চোখ রেখেছে।

পুরোনো নাটক নামাল গিরিশ। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। কিন্তু পুলিশ সে নাটক বন্ধ করে দিল। অপরাধ? কীচকের পার্ট অশ্লীল। অনেক তর্ক করল গিরিশ। অনেক যুক্তি দেখাল। কিন্তু পুলিশ কি যুক্তিতর্ক শোনে?

'বেকুবের একজাই' নামে যে পঞ্চরঙ লেখা ছিল তাও পুলিশ পাশ করলে না। তখন কেটে-ছেঁটে নতুন করে 'বড় দিনের বকশিস' নাম দিয়ে নামাল। কীচককে সভ্য-ভদ্র করলে। গিরিশ নিজেই নামল সে ভূমিকায়। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসও চালু হল। টাকার মুখ দেখল মিনার্ভা। কিন্তু সবই যেতে লাগল সুদের শোধে। কিছুতেই দড়ির দু-প্রান্ত একত্র করা যাচ্ছে না। নাগেন্দ্র তখন তার আট আনা অংশ বেঁচে দিল যুবক প্রমথ দাসকে। ধার আর ধার। উদ্ধারের পথ নেই। যারা থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম যোগান দেয় তাদেরও প্রাপ্য বাকি। কাঁহাতক চলে এমন বাকির কারবার! পাওনাদারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কি থিয়েটার চলে? গিরিশ ক্যাশের ভার নিল। আবার এই নিয়ে নাগেন্দ্রের সঙ্গে বাধল মনান্তর। ফল কী হল? গিরিশ ছেড়ে দিল মিনার্ভা।

স্টারের নাটক লেখবার লোক নেই। এক ছিল রাজকৃষ্ণ রায়, সেও কাত হয়েছে। স্টার এবার গিরিশকে ধরলে। চলুন, ম্যানেজার না হোন, নাট্যাচার্য হোন। রাজি হল গিরিশ। আর লিখল 'কালাপাহাড়।' আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া। প্রেমভক্তিই যে ঈশ্বর লাভের উপায় তাই নাটকের উপজীব্য। আর, ঠাকুরের সেই সর্বধর্মসমন্বয়। যত মত তত পথ।

সাধক চিন্তামণির পার্টে স্বয়ং গিরিশ। অমৃত মিত্র কালাপাহাড় আর দানী ঘোষ লাটু। আর, প্রমদাসুন্দরী চঞ্চলা। সকলের জন্যে প্রাণ কাঁদে চিন্তামণির, সকলের পাপ-তাপ জ্বালাযন্ত্রণা নিজে টেনে নেবে বলে কেঁদে বেড়ায়। আর, শক্তির উপাসক যে বীরেশ্বর তাকেও বলছে, 'ভয় কি, তোর পাপ আমাকে দে।' তেমনি বাসনাদগ্ধা প্রতিহিংসাব্যাকুলা চঞ্চলাকেও বলছে, 'ওরে যাস নে, যাস নে, তোর সব জ্বালা আমাকে দিয়ে যা।' মানুষ দিনরাত ত্রিতাপে তপ্তখোলায় ভাজছে, একজন মানুষকে যদি সেই জ্বালা থেকে ত্রাণ করতে পারি তাহলে শত সহস্র জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজি আছি। এই হচ্ছে চিন্তামণির দর্শন।

এ সেই বিবেকানন্দের দর্শন। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম। আমি মোক্ষ চাই না নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে বারে আমি এই লোকসংসারে ফিরে আসব, মানুষকে তার সত্তার এক অধ্যায় থেকে বৃহত্তর সত্তায় আরেক অধ্যায়ে নিয়ে যাব। নিয়ে যাব ঈশ্বরসত্তার দিকে। এই আমার লোকসেবা। আমার মানবসেবাই মাধবসেবা।

কালাপাহাড়ের প্রতি চঞ্চলার অনুরাগ। কিন্তু কালাপাহাড় উদাসীন, নিস্পৃহ, নিশ্চল অথচ ইমানকে দেখে তার সংকল্পের বাঁধ বুঝি ভাঙে। ঘুরতে ঘুরতে চিন্তামণির সঙ্গে দেখা।

'কী করো ?'

চিন্তামণি বললে, 'চুপ করে বসে মন ব্যাটাকে দেখি। ব্যাটা খালি ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফিরছে। কেন যে ফিরছে তা মনের কথা মনই বোঝে না। বলে সুখের জন্যে ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখ জুটিয়ে আনে।'

'তুমি জ্ঞানী।'

তুমিও জ্ঞানী।' বললে চিন্তামণি, 'মন সুখের সন্ধানে ফেরে এই কথা জানার নাম যদি জ্ঞান হয়, তা হলে দুনিয়ায় সবাই জ্ঞানী! কিন্তু দেখছ মনের ফাঁকি অসুখই খোঁজে, আবার অসুখের নামেই শেওরায়। অষ্টপ্রহর বলছে, ভারি অসুখ, আর পারিনে, আবার ঘুরে ফিরে সেই অসুখের কাজই করছে। এক পাগল সৃষ্টির ফেলা হাঁড়ি ভেঙে বেড়াত। হাঁড়ি ভাঙত আর বলত, আর পারিনে।'

কালাপাহাড়কে অনেক বোঝাল চিন্তামণি, কিন্তু কিছুতেই বৈরাগ্য আনতে পারল না। চঞ্চলা কৌশল করে কালাপাহাড় আর ইমানের মিলন ঘটাল। শাহজাদীর অন্তঃপুরে পুরুষ ঢুকেছে চঞ্চলা খবর পাঠাল নবাবের কাছে। কালাপাহাড় ধরা পড়ল, বন্দী হল কারাগারে। এমনি গ্রহের চক্রান্ত, চিন্তামণিও ছাড়া পেল না।

'তুমি ক দিক রাখবে বলো? একবার ঈশ্বরতত্ত্বে ঘুরছ, আবার রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালাচ্ছ। একবার পীরিত, একবার প্রতিহিংসা, একবার বাসনা, আবার বৈরাগ্য,' বললে চিন্তামণি, 'এ তো একটা মানুষে চলে না।'

'ও, তুমি? বড় বিপদে পড়েছি, যবনিকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি,' বললে কালাপাহাড়, 'কোনো রকমে ফেরাতে পারছি না।'

'ফেরাতে পারছ না, না, ফেরাতে চাও না?'

'কত চেষ্টা করেছি, কোনোমতেই ভুলতে পাচ্ছিনে, কী সর্বনাশ হবে।'

'ভাবো সে তোমার শত্রু, তোমাকে ছল করে নিয়ে গিয়েছিল, কামিনী কামকলা তোমায় কামের দাস করেছে, তখন দেখ, মন কী বলে।'

'মুখখানি মনে পড়লেই অন্তর গলে যায়।'

'আচ্ছা একটা উপায় বলি,' চিন্তামণি বললে, 'তিনদিন হরি-হরি করো, তা হলেই তাকে ভুলে যাবে।

'আমার অবিদ্যামন্ত্র তো আমাকে ছাড়ে না।'

'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলো।' বললে চিন্তামণি, 'প্রেমে রিপু জয় করো।'

ঘুরে-ফিরে সেই ঠাকুরের কথা।

'কিন্তু আর সব করো ওঁকে ঈশ্বর বলে পুজো করো না।' বললে ডাক্তার সরকার, 'এমন ভালো লোকটার মাথা খাচ্ছ সকলে।'

'তার কী আর করি বলুন।' গিরিশ বললে গম্ভীর মুখে, 'যিনি এ সংসার-সমুদ্র এ সংশয়সাগর পার করালেন তাঁকে আর কী করব বলুন।'

'কিন্তু পায়ে পড়া, পায়ের ধুলো নেওয়া কেন?'

'যার অহংকার আছে সে নেয় না।'

'অহংকার? ভাবছ আমি এর পায়ের ধুলো নিতে পারি না? খুব পারি।' ডাক্তার ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল: 'এই দেখ নিচ্ছি।'

উল্লসিত হয়ে উঠল গিরিশ: 'দেবতারা স্বর্গ থেকে ধন্য-ধন্য করছেন!'

'শুধু ওঁর কেন সকলের নিচ্ছি।' ডাক্তার সমবেত সকলের পায়ের ধুলো নিতে লাগল: 'সবাই আমাকে কঠোর নির্দয় মনে করে।'

'না, না, সবাই তোমাকে ভালবাসে।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি আসবে বলে এরা বাসকসজ্জা করে জেগে থাকে!'

'সে কী কথা! সবাই আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে।' গিরিশ বললে অকপটে।

'কিন্তু সবাই মনে করে আমার স্নেহ-মমতা কিছু নেই। আমার স্ত্রী, আমার ছেলেও তাই ভাবে।' ডাক্তার বললে অনুশোচনার সুরে: 'আমার দোষ হচ্ছে আমি আমার ভাব চাপি, বাইরে প্রকাশ করি না।'

'কিন্তু মাঝে মাঝে মনের কপাট খোলা তো ভালো।' বললে গিরিশ, 'অন্তত আপনার বন্ধুদের প্রতি দয়া করে। নইলে তারা যে আপনাকে ভুল বুঝছে।'

'কিন্তু, কী বলব', নরেনের দিকে তাকালো ডাক্তার 'মাঝে মাঝে আমারও ভাব হয়। আমি একলা বসে-বসে কাঁদি।' বলেই ভাব গোপন করে ঠাকুরের দিকে শাসনের তর্জনী তুলল: 'দেখ, তোমার আর সবই ভালো, কিন্তু ভাব হলে যে লোকের গায়ে পা তুলে দাও এটা মোটেই ভালো নয়।'

'আমি কি জানতে পারি গা কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা।' নিষ্পাপ শিশুর মত বিহ্বল সারল্যে বললেন ঠাকুর।

'কিন্তু ওটা যে ভালো নয়, তা তো বুঝতে পারো।'

'আমার ভাবাবস্থায় কী হয় তা তোমায় কী করে বোঝাব! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়।' বললেন ঠাকুর, 'পরে কখনও এমন মনে হয়, এরই জন্যে বোধহয় রোগ হচ্ছে।'

ডাক্তার খুশি হয়ে উঠল? গিরিশও নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'দেখ ইনি মেনেছেন। কাজটা যে অন্যায় এ বোধ তাঁর আছে।'

ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নরেনকে বললেন, 'তুই তো খুব চালাক, বল না, একে বুঝিয়ে দে না।'

গিরিশ এগিয়ে এল। বললে, 'মোটেই উনি সে জন্যে দুঃখিত হন নি। এঁর দেহ শুচিশুদ্ধ পাপলেশহীন। জীবের মঙ্গলের জন্যে তিনি তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে তাঁর রোগসম্ভাবনা, এ কথাটা কখনো-কখনো তাঁর মনে হয়। তবু তৎসত্ত্বেও তাঁর কৃপাস্পর্শ বিতরণ করতে কুণ্ঠিত হন না। তার জন্যে তাঁর দুঃখ হবে?'

ডাক্তার কথা বলতে পারছে না।

'আপনার যখন শূলবেদনা হয়েছিল তখন আপনার দুঃখ হতে পারে কেন

রাত জেগে অত পড়েছিলেন—' গিরিশ বললে উত্তেজিত হয়ে, 'তাই বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় ? শুনুন, রোগের জন্যে দুঃখ-কষ্ট হতে পারে, তা বলে জীবমঙ্গলের জন্যে স্পর্শ করাকে অন্যায় বলতে পারেন না ।'

ডাক্তার বিনীতস্বরে বললে, 'তোমার কাছে হেরে গেলুম । দাও পায়ের ধুলো দাও ।' বলে আবার গিরিশের পদধূলি নিল ।

নরেন মুখ খুলল । বললে, 'আরেকটা দিক দেখুন । আপনি বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন—শরীরের অসুখ-বিসুখ কিছুই গ্রাহ্য করেন না । ঈশ্বরকে জানা সব চেয়ে বড় বিজ্ঞান, গ্র্যাণ্ডেস্ট অফ অল সায়েন্সেস । সেই বিজ্ঞানের জন্যে শরীর যায় তো যাক—এ রকল মনোভাব তাঁর হতে পারে না ?'

'যাই বলো, সকলেরই অহংকার ।' বললে ডাক্তার, 'সকল ধর্মাচার্যের । যীশু বুদ্ধ চৈতন্য—সমস্তের । বলে, আমি যা বললুম তাই ঠিক ।'

গিরিশ তড়পে উঠল, 'এ দোষ তো আপনারও হচ্ছে ।'

'আমার ?'

'হ্যাঁ, তাঁদের অহঙ্কার আছে এ দোষটা যে আপনি ধরতে যাচ্ছেন এটাও অহঙ্কার । যেন আপনিই সমস্ত বুঝেছেন তাঁদের, আপনিই এক প্রকাণ্ড বোদ্ধা ।'

ডাক্তার চুপ করে গেল ।

নরেন শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এঁকে আমরা পুজো করি আর সে পুজো ঈশ্বরপুজোর কাছাকাছি ।'

ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরের বাড়িতে, কালীপুজোর ঠিক আগের দিন ভক্তদের বললেন, 'কাল পুজো হবে, সব উপকরণের জোগাড় রাখিস ।'

ব্যস, এই পর্যন্ত । কোথায় পুজো, কোন কালী, পুজো বাড়িতে না মন্দিরে, আর কিছুই বললেন না । কী উপচার কী ভোগ কী দক্ষিণা কিছু না । উপকরণ আর কী, ধূপ হলেই যথেষ্ট । ভোগের জন্যে একটু না-হয় পায়েস । আর যদি বিশেষ কোনোকিছুর আদেশ করেন, তখন দেখা যাবে ।

কিন্তু, পরদিন, বেলা গড়িয়ে গেল, তবু ঠাকুরের কোনো চাঞ্চল্য নেই । কী জোগাড়যন্ত্র হল তারও কোনো জিজ্ঞাসা নেই । আজ রাত্রেই যে পুজো তা বোধ হয় ভুলে গেছেন । সাতটা বাজল । আটটা । শয্যায় যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে আছেন ঠাকুর । স্থির স্তব্ধ স্বগত-তন্ময় । কী আর করা ! পুজোর জিনিসগুলো ঠাকুরের চারপাশে মেঝের উপর সাজিয়ে দিল ভক্তরা । সকলে বসল চারপাশে । দীপ জ্বলল, উঠল ধূপগন্ধ । আর কী ! এই কালীপুজো । আর যিনি খাটে বসে আছেন সমাধিস্থ হয়ে তিনিই কালী । তিনিই অখিলজননী ।

'জয় মা ।' গিরিশই প্রথমে হুংকার দিয়ে উঠল । ঠাকুরের পাদপদ্মে ফেলল ফুল চন্দন । ঠাকুর অভয় মুদ্রা ধারণ করলেন ।

জয় মা, জয় মা ! আর সকলেও দিতে লাগল পুষ্পাঞ্জলি ।

কালী মানেই রামকৃষ্ণ । কালীপুজো মানেই রামকৃষ্ণপুজো ।

ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন তখন মা ঠাকরুন এই বলে কাঁদলেন : 'আমার কালী মা কোথা গেলে গো ?'

জন্মাষ্টমীতে মা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাবেন, তাঁর দর্শন পেতে বহু লোক সমবেত হয়েছে। গিরিশ গিয়ে মাস্টারমশাইকে বললে, চলুন যোগোদ্যানে। মাকে দেখে আসি। রাস্তায় নতুন কাপড় পাতা হয়েছে তার উপর দিয়ে মা এলেন, ধীরে পা ফেলে ফেলে। সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা, মাথায় মুখে ঘোমটা টানা। শুধু পা দুখানি দেখ। রাঙা জবা হয়ে রাঙা পা দুখানি দেখ।

কিন্তু এ কী, কেবল ভিড় আর ভিড়, কেবল প্রণামের আকুলিব্যাকুলি।

মাঝে মাঝে গোলাপ-মা ব্যস্ত হয়ে বলছে, 'আর কত ? এই পচা গরমে মাকে আর কতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে হবে। মাকে এবার ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

কে কার কথা শোনে ! গিরিশও অসহায়, মাস্টারমশাইও ততোধিক। ছুটি পেতে সন্ধে ছটা।

পরে বলছেন ভাবাবেশে, 'বার বার আসা, এ থেকে কি নিস্তার নেই ? যেখানেই শিব সেখানেই শক্তি—একসঙ্গে বার বার সেই শক্তি—নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না কত কষ্ট ঠাকুর করছেন তাদের জন্যে। কী তপস্যা। তপস্যার কী দরকার। শুধু লোকের জন্যে ! লোকে কি পারে ? তাদের তেজ কই ? শক্তি কই ? তাই তো ঠাকুরের সব করতে হয়। কাঁকুড়গাছির সেই গানটা মনে আছে ?'

আশু জিজ্ঞেস করলে, 'কোন গানটা মা ?'

'সেই যে—এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে। মা বলে ডাকলে কি না এসে থাকতে পারে।'

'কিন্তু মা, তোমার তো কত কষ্ট—নিজের কষ্টের কথা তো কিছু বলছ না।'

'দূর বোকা ছেলে ! সব ঠাকুর—আমি যে তাঁর দাসী। যেমনি করান তেমনি করি। আমার আবার কষ্ট কি ?'

তাই বুঝি যে আসে মন্ত্র নিতে তাকেই দিয়ে দাও মন্ত্র।'

'কত শোকতাপ পেয়ে কত জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জীব ছুটে আসছে।' বললেন সারদামণি, 'ঠাকুর ছাড়া কে তাদের জ্বালা ঘোচাবে ? তিনিই তো সকলের ব্যথার ব্যথী। জীবের জ্বালা যে তাঁরও জ্বালা।'

১৯

'ওরে ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ?' 'জনা' নাটকে কৃষ্ণের উদ্দেশে গাওয়া গানের এই কলিটা যেমন লোকের মুখে মুখে, তেমনি আবার 'পারস্যপ্রসূন' নাটকের এই কলিটা : 'ছেড় না দিন পেয়েছ আমোদ করে

নাও ভবে।' তেমনি 'মায়াবসান' নাটকের একটা ছত্র খুব চালু হল: 'জ্ঞানেও মানবদুঃখে অবসান নেই এক কণা'।

গিরিশের থিয়েটার স্টারই প্রচার করে বেড়াল গিরিশের মাথা খারাপ হয়েছে। মাথা খারাপ না হলে কেউ 'মায়াবসান' লেখে, 'কালাপাহাড়' লেখে?

যা গিরিশের পরিপক্ব মনীষার ফল তাই কিনা পাগলামি। ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হওয়ার কথা আর কে লিখবে?

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জানুক অমুক এখন ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে। পাগল নয় কে? কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের জন্যে, কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েকজন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল!'

স্টার সম্পর্কে গিরিশেরও মায়াবসান হল। কলকাতায় তখন প্লেগ লেগেছে, শহর থেকে লোক পালাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখে। রাজসাহীর জমিদার ললিত মৈত্র গিরিশকে ডাক দিলেন। দলবল নিয়ে আমার এখানে এসে থিয়েটার করুন। বোনাস তিন হাজার টাকা। গিরিশ রাজী হল। সব নট নটী নিয়ে গেল রাজসাহী। থিয়েটারের নাম হল মার্ভেল থিয়েটার।

এদিকে দর্জিপাড়ার সংকীর্তনের দল গিরিশকে দিয়ে প্লেগের গান বেঁধে নিল। পথে পথে চলল তার উচ্ছ্বাস-উল্লাস:

কলিকাতা আনন্দধাম
প্লেগ বন্ধু হয়ে এসেছে হে
ছড়াছড়ি হরিনাম।
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুংকারে উথলে ওঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য করে গর্জে শত খোল,
ঝংকারে করতালি ঝঞ্ঝাসম অবিরাম॥

* * *

প্লেগ, থাকবি যদি থাক,
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক।
হরিনাম প্রাণ ভরে শোন এই কথাটি রাখ,
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন
কিনবে হরি গুণধাম॥'

মার্ভেল থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল প্লে হল। সদর মফস্বল ভেঙে পড়ল। কৃষ্ণদর্শনের ফল কী? আহা, কী সুন্দর বলেছে, কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন। চল মাখনচোরা কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে আসি। লোকে লোকাকীর্ণ হতে লাগল। কিন্তু কত দিন?

অভিনয় আরম্ভ হবার আগে গিরিশ একটা কবিতা পড়েছিল :

'দুর্দান্ত দুর্দিনোদয় আসিয়াছি পেয়ে ভয়
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম।
এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয় তব দৃশ্যযোগ্য নয়
ত্যজি দোষ গুণ ধরো ওহে গুণধাম ॥
কর যদি তিরস্কার মানি লব পুরস্কার
বহুমানে শির পাতি করিব গ্রহণ।
সবিনয়ে নিবেদন জানায় হে আকিঞ্চন
বহু আগে আসিয়াছি করো না বঞ্চন ॥'

কদিন পরেই মার্ভেল বন্ধ হয়ে গেল। থিয়েটারে একটানা মত্ত হয়ে থাকবার মত মফস্বল শহরের অত ফালতু লোক কোথায় ? কলকাতায় প্লেগ তখন অনেকটা শায়েস্তা হয়েছে, তাই গিরিশ ফিরে এল কলকাতায়।

অমর দত্ত বললে, 'আমার ক্লাসিকে আসুন।'

এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ক্লাসিক প্রতিষ্ঠা করেছে অমর। হ্যাঁ, আসুন, নাট্যাচার্য হয়েই আসুন। এমন কি, একটা পত্রিকা বার করব, আপনি তার সম্পাদক হোন।

গিরিশ যোগ দিল ক্লাসিকে। তার গীতিনাট্য 'দেলদার' অভিনীত হল। আর তারই সম্পাদনায় বেরুল মাসিক পত্র, 'সৌরভ'। গিরিশের কত প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হল সেই কাগজে, এমন কি একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস। উপন্যাসের নাম 'ঝালোয়ার দুহিতা'।

তার পরে ক্লাসিকে শুরু হল 'পাণ্ডবগৌরব'।

গিরিশের ইচ্ছে ছেলে দানী ভীম সাজে আর অমর দত্ত শ্রীকৃষ্ণ।

না, না, আমি ভীম সাজব। অমর বায়না ধরল।

'সে কী,' গিরিশ আপত্তি করল, 'তুমি শ্রীকৃষ্ণ হবে বলে তোমার পার্টটা কত লম্বা করেছি। না, না, তোমাতেই শ্রীকৃষ্ণ বেশি খুলবে।'

'না, পাণ্ডবগৌরবে হিরো হচ্ছে ভীম।' দৃঢ়স্বরে বললে অমর, 'আমি হিরো সাজব।'

যেহেতু অমরই ক্লাসিকের মালিক সেইহেতু তার কথাই বলবৎ হবে। এমনি একটা ভাব ফুটে উঠল তার কথায়। গিরিশ ম্লান হয়ে গেল।

'বেশ, আমরা দুজনেই ভীমের পার্ট করি।' দুঃসাহসিক প্রস্তাব করল অমর, 'আপনি বিচার করে দেখুন, কার বলাটা ভালো হয়। যারটা বেশি ভালো হবে সেই ভীম সাজবে।'

অমর আর দানী দুজনেই ভীমের পার্ট বলল। সন্দেহ কী, অমরের বলাটাই বেশি ভালো। গিরিশ সহাস্যে বলল, 'তুমিই ভীমতর।'

পাণ্ডবগৌরবে অমর দত্তই ভীম সাজল।

'অতি ছল অতি খল অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব ?
সম তব মান অপমান,
নহিলে ক্ষত্রিয় হয়ে, কহ কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়সদনে
পরাজয়ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ।
নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা কয়ে ?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান ?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ
কৃষ্ণনাম আর কভু না আনিব মুখে।

কণ্ণুকী গিরিশ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রমদা। দানীর কোনো পার্ট নেই।

কৃষ্ণ বলছে কণ্ণুকীকে, 'তুই আমার সঙ্গে মিতে পাতাবি ?'

'সত্যিকার মিতে, না দমবাজীর মিতে ?' কণ্ণুকী প্রশ্ন করল।

'দ্যাখ মিতে, যে দমবাজী করে তার সঙ্গে দমবাজী করি।' বললে কৃষ্ণ, 'আর যে সত্যি মিতে হয়, যে দমবাজী জানে না, তার আমি সত্যি মিতে হই।'

'মায়ার সংসারে ধর্মমাত্র ধ্রুবতারা—' এই হল পাণ্ডবগৌরবের মূলকথা। সেই ধর্মের আবার সার কথা, আশ্রিতপালন। 'রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।' বলছে অর্জুন। 'রাজধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম—আশ্রিতরক্ষণ।' বলছে ভীম।

তারপরে কৃষ্ণসঙ্গিনীদের গান। 'ধীর মাধুরী গীত-লহরী মৃদুল রোল কানন ভরি। ধীর গহনে মঞ্জীর ধ্বনি, উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনী। হেলিছে দুলিছে চলিছে শ্যাম, ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম।'

সব মিলিয়ে একটা বিপুল হৈ-চৈ পড়ে গেল। কবি নবীন সেন লিখলেন : 'অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীদের গান শুনে আমি আর আমার স্ত্রী শুধু কেঁদেছি। আমরা গিরিশের গোলাম হয়ে রইলাম।'

আগে-আগে ক্লাসিক একদম জমে নি। স্টার ফেলে কে আসবে ক্লাসিকে ? কিন্তু দর্শক না জুটলে থিয়েটার চলে কী করে ? শেষকালে তো রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে ঘর ভর্তি করা হত। যদি এরা বাইরে গিয়ে প্রশংসা করে আর সে

প্রশংসায় যদি খদ্দের আকৃষ্ট হয়। তবে যদি দিন ফেরে। দিন ফিরতে শুরু করল ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবায়। তার পর পাণ্ডবগৌরবে একেবারে জয়জয়কার। পাণ্ডবগৌরব নয় তো গিরিশগৌরব। গিরিশ মুখে বলে আর অবিনাশ গাঙ্গুলি লেখে। রাত জাগতে গিরিশ ওস্তাদ কিন্তু বেচারা অবিনাশের চোখে ঢুল আসে।

'ঘুম পাচ্ছে বুঝি? তুমি দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ।' গিরিশ বুঝি বিরক্ত হয়: 'আচ্ছা, আজ তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত লেখ।'

'তৃতীয় অঙ্ক!'

'হ্যাঁ, কত আর রাত হবে? লেখ! বরং এক কাপ চা খেয়ে নাও।'

গিরিশের জিহ্বাগ্রে যেন সরস্বতী, তর তর করে বলতে থাকে। পাল্লা দিয়ে কলম চালানো দুঃসাধ্য। পরের রাত্রে চতুর্থ অঙ্ক শুরু। এক কাপ দু কাপ তিন কাপ চা খেল অবিনাশ। চতুর্থ অঙ্ক যখন শেষ হল, ঘড়িতে রাত আড়াইটে।

'আজ এই পর্যন্ত থাক।' গিরিশ গুটিয়ে নিতে চাইল: 'যাও তুমি শোওগে।'

'আমার ঘুম ছুটে গিয়েছে। আপনি যদি ক্লান্ত না হন, চালিয়ে যান—'

'আমি ক্লান্ত?' গিরিশ হাসল: 'বেশ লেখ। আমার সব সাজানো আছে। তুমি পারলেই হল। তুমি না ঢলে পড়।'

চলল পঞ্চমাঙ্ক।

লেখ, প্রথম গর্ভাঙ্ক বনপথ, দণ্ডী ও সুভদ্রা।

দণ্ডী। বৃথা মা করুণাময়ি কর গো ভর্ৎসনা।

জাননা যন্ত্রণা
হৃদিমাঝে জ্বলে তুষানল
প্রতিদানহীন প্রেমাগুন।
ধূমাচ্ছন্ন মস্তিক আমার
হিতাহিত নাহিক বিচার,
মরি মাতা, পিশাচীর প্রেমের তৃষায়।

সুভদ্রা। ধরায় না ফোটে কভু স্বর্গের কুসুম।

উর্বশী জননী, ইন্দ্রসোহাগিনী
কর তুমি প্রেমের গরিমা?
ধরায় বাঁধিতে চাও ত্রিদিবরঞ্জিনী?
জেন বৎস, প্রেম নয় স্বার্থপর
আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ
মোহ মাত্র প্রেমের এ ভানে!

'হয়ে গেল।' তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল গিরিশ: 'দুরাত্রেই পাণ্ডবগৌরব শেষ। এখন শুধু গানগুলো বেঁধে ফেলতে হবে। গানের জন্যে কাল এস। দাঁড়াও, সর্বশেষ গানটা এসে গিয়েছে। লেখ।'

অবিনাশ আবার কলম ধরল।

'হের হরমনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে।' গিরিশ নিজেই গেয়ে উঠল : 'আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে তো দ্যাখ না চেয়ে।'

হঠাৎ নিজেই অস্থির হয়ে উঠল গিরিশ। বলল, 'ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে। দোর জানলাগুলো খুলে দাও।'

দোর জানলা খুলে দিতেই চড়া রোদ ঘরে ঢুকে পড়ল। এ কী ব্যাপার! আর ব্যাপার! দু জনে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বেলা আটটা।

'যাও, যাও, পালাও।' প্রবল তাড়া দিল গিরিশ : 'বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করে লম্বা ঘুম দাও। সমস্ত দিন ঘুমিয়ে ঝরঝরে হয়ে সন্ধেয় আবার এস।'

ক্লাসিক যখন উন্নতির তুঙ্গে এসে উঠেছে, তখন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধল।

গিরিশ অমর দত্তকে বললে, 'আমার জন্যই ক্লাসিকের আজ এত রবরবা। আমাকে লাভের অংশ দাও।'

অমর দত্ত স্তম্ভিত হবার ভাব করল। বললে, 'আপনার জন্যেই সমস্ত, এ কে বললে? আমার—আমাদের অভিনয়ের গুণ নেই? তা ছাড়া ব্যবসায় আজ না হয় দু পয়সা হচ্ছে কিন্তু দুর্দিন আসতে কতক্ষণ? তখন কে সামলাবে? মাপ করবেন, লাভের অংশ-টংশ দিতে পারব না।'

গিরিশ ক্লাসিক ছেড়ে দিল। শ্রীপুরের নরেন্দ্র সরকার আদালতের নিলামে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিয়েছে। সে গিরিশকে লুফে নিল। এই কথা? অমর দত্ত ছুটে গিয়ে হাইকোর্টে মামলা ঠুকল। ইনজাংশানের প্রার্থনা করল। যাতে গিরিশ না মিনার্ভায় যোগ দিতে পারে। অমরের পক্ষে ব্যারিস্টার জ্যাকসন আর ডবলিউ সি বনার্জি আর গিরিশের পক্ষে ইভান্স আর গার্থ। অমর দত্ত হেরে গেল। পেল না ইনজাংশান।

মামলা করা কি ভদ্রলোককে পোষায়? সুস্থ মনে একটা নতুন নাটক লিখতে পারল না গিরিশ। বঙ্কিমের 'সীতারাম'কে নাটকায়িত করল। হ্যাঁ, নিজেই নামব নামভূমিকায়। দেখাদেখি ক্লাসিকেও 'সীতারাম' চালাল। সীতারাম অমর দত্ত। দেখি কে হারে কে জেতে। গিরিশ না অমর? দু জনেই মহাদেব। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তাদের গিয়ে ধরল অনেকে। এখন তো সর্বত্রই সীতারাম। আপনারাও নামান না ঐ বইটা।

'বা, আমরা তো নামিয়েছিলাম।' বললে বেঙ্গল, 'তবে আমরা যে নতুনত্ব দেখিয়েছিলাম তা গিরিশ বা অমর কেউই দেখাতে পারে নি।'

'নতুনত্ব!'

'হ্যাঁ, আমরা মৃন্ময়ের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'সে কি মশাই? জয়ন্তী যে সন্ন্যাসিনী। তার বিয়ে কী?'

'বঙ্কিমবাবু তাই লিখেছেন বটে। জয়ন্তীকে সন্ন্যাসিনীই রেখে দিয়েছেন বইয়ে কিন্তু আমরা অন্য রকম ভাবলাম।'

'অন্য রকম?'

'হ্যাঁ, আমরা ভাবলাম, বেঙ্গল বিজ্ঞ সমজদারের মত বললে, 'একটা সুন্দরী

যুবতী মেয়ে চিরকালটাই কি গেরুয়া পরে চিমটে কাঁধে করে বেড়াবে? তাই তার একটা গতি করে দিলাম। মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটায় ছুঁড়িটার বিয়ে দেওয়াতে দর্শকেরা খুশি হল আর ছুঁড়িটাও একটা আশ্রয় পেয়ে হাঁপ ছাড়ল। কি, ঠিক করিনি?'

গিরিশের বিরুদ্ধে নানারকম অশালীন বিজ্ঞাপন দিতে লাগল ক্লাসিক।

'ক্লাসিকের সীতারাম স্থবির নয়, ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা।'

একটা ব্যঙ্গ চিত্র বার করল। দাঁড়িপাল্লার একদিকে গিরিশ আরেক দিকে অমর দত্ত। অমরের দিকটা ভারি আর গিরিশের দিকটা হাল্কা। গিরিশ আর নরেন সরকারকে লক্ষ্য করে অমর দত্ত একটা ব্যঙ্গ নাটক পর্যন্ত নামাল, নাম 'থিয়েটার'। তা নামাক। নিন্দুকের সিন্দুকভরা নিন্দেতেও গিরিশ বিচলিত নয়। 'হস্তী চলে বাজরামে' কুত্তা ভুখে হাজার। সাধুনকে দুর্ভাব নাহি, মত্ত নিন্দে সংসার॥' হাতি যখন রাস্তা দিয়ে চলে যায়, পিছনে হাজার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাতি ফিরেও তাকায় না। তেমনটি সংসার যতই নিন্দে করুক, সাধুর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই।

মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' হচ্ছে, গিরিশ যোগেশ সেজেছে, ব্যাণ্ড মাস্টার নন্তিবাবু বললেন, 'একটা গীতিনাট্য না হলে চলছে না। নতুন দেখে দিন না একখানা লিখে।'

গিরিশ বললে, 'দেব।'

'দেবেন?' ব্যাণ্ড মাস্টার খুশি হয়ে উঠলেন: 'কবে নাগাদ?'

তীক্ষ্ন চোখে তাকাল গিরিশ, 'আজই।'

'আজই?'

'হ্যাঁ, এখুনিই। প্লে করতে-করতে।' গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'দেব-গুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে যে সরস্বতী। কাগজ-কলম নিয়ে কেউ বসে যাও এখুনি। মঞ্চে আমার যোগেশের পার্ট যা করবার তা করব, আর প্রস্থানের পর বাইরে এসে মুখে-মুখে বলে যাব আমার নতুন নাটক। লেখক, তৈরি থাকো। ঠাকুরের কৃপায় নাটক ঠিক লেখা হয়ে যাবে!'

কাগজ-কলম নিয়ে একজন বসে গেল তাড়াতাড়ি। গায়ে যোগেশের সাজ, গিরিশ একবার মঞ্চে নেমে যথারীতি অভিনয় করছে আর পার্ট হয়ে গেলে বেরিয়ে এসেই মুখে-মুখে বলে যাচ্ছে নতুন নাটকের সংলাপ। আবার ডাক পড়তেই ঢুকছে স্টেজে, আবার যা বলবার শেষ করেই চালাচ্ছে শ্রুতলিপি। এমনি অভিনয়ের ফাঁকে-ফাঁকে মুখে নতুন গীতিনাট্য 'মনিহরণ' লেখা হয়ে গেল।

'কী, গান বেঁধে দিতে হবে না?' গিরিশ তাকাল নন্তিবাবুর দিকে।

অভিনয়ের পর স্টেজে বসে গিরিশ পরের-পর আটাশখানা গান বেঁধে দিল।

'যদি বলো তো এর পর আরো একখানা নকশা লিখে দিতে পারি!'

সেই রাত্রে অমনি স্টেজে বসেই গিরিশ 'চ্যারিটেবেল ডিসপেনসারি' নামে লিখে দিল পঞ্চরঙ্গ।

কিন্তু এখানেও আবার মালিক নরেন সরকারের সঙ্গে বনল না গিরিশের। নরেন সরকারের ইচ্ছে গিরিশ এন্তার নাটক লিখবে আর সে একধার থেকে তার পরিচালনায় হিরো সাজবে। গিরিশ বললে, 'অপেক্ষা করো। ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমার মিনার্ভা আগে দাঁড়াক, পরে তোমাকে তৈরি করে দেব।'

নরেন সরকার অপেক্ষা করতে রাজী হল না। গিরিশের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা সরাসরি বাতিল করে দিল।

অমর দত্তের এক মুহূর্তও দেরি হল না। গিরিশের কাছে এসে সে মাপ চাইল। বললে, 'ফিরে চলুন ক্লাসিকে।'

মনোমালিন্য তখুনি মুছে ফেলল গিরিশ। বললে, 'চলো।'

নরেন সরকার এল ফের সাধাসাধি করতে। গিরিশ তাকে ফিরিয়ে দিল। বললে, 'না তোমাকে আর হিরো সাজানো গেল না।'

গিরিশের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, সূতিকায় ভুগছে।

বললে, 'বাবা, তুমি যদি তারকেশ্বরে গিয়ে আমার জন্যে চরণামৃত নিয়ে আসতে পারো, আমি তবে ভালো হব।'

গিরিশ তখুনি চলল তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরে মোহান্তের গদিতে পুজোর টাকা জমা দিচ্ছে, কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মশাইকে কি আগে কোথাও দেখেছি ?'

'কেন দেখবেন না ? থিয়েটারে যান ?'

'তাই যাই বই কি।'

'আমিই থিয়েটারের নোটো গিরিশ ঘোষ।'

'ওরে এই সেই—'

'হ্যাঁ, আমি সেই মাতাল গিরিশ ঘোষ।'

একদিন অভিনয় করছে, একটু বোধহয় বেশি টেনেছে সেদিন, দর্শকদের ভিতর থেকে কারা চেঁচিয়ে উঠল : 'মাতাল হয়েছে রে—মাতাল।'

গিরিশ হঠাৎ অভিনয়ের বাইরে এসে দর্শকের লক্ষ্য করে বলল, 'আমি যখন মদ খাই তখন আমি মাতাল। তোরা যখন মদ খাস্ তখন তোরাও মাতাল। কিন্তু আমি যখন মদ খাই না তখন আমি গিরিশ ঘোষ। তোরা যখন মদ খাস না তখন তোরা কী রে ?'

২০

'কী চাই ?' আগন্তুক দেখে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'আমি শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষ।' বললে আগন্তুক, 'লোকে বলে দানা-কালী।'

'তা তো হল, কিন্তু এখানে চাই কী ?'

আরো একটু বিশদ হতে চাইল কালীপদ। বললে, 'আমি গিরিশের বন্ধু।'

'সে তো ভালো কথা, কিন্তু কেন এসেছ, কি চাই তাই বলো না।'

'এখানে মদ আছে ?'

'মদ ?'

'হ্যাঁ, গিরিশ বলে দিল এখানে নাকি মদ আছে।' কালীপদ বললে অন্তরঙ্গের মত : 'একটু দিতে পারেন আমাকে ?'

ঠাকুর হাসলেন : 'তা হয়তো পারি। কিন্তু এখানকার মদ বড় কড়া, তুমি সইতে পারবে না।'

'কী, বিলিতি মদ ?' উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কালীপদ।

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণবারি।' ঠাকুর প্রসন্ন মুখে বললেন, 'এ মদের কাছে তোমার বিলিতি মদ দাঁড়াতে পারে না। একটু খেয়ে দেখবে ?'

হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল কালীপদ।

'কী, দেখ না খেয়ে। এই মদ খেলে নেশা আর ছুটতে চাইবে না কিছুতেই। বিলিতি মদও আর ভালো লাগবে না।'

তখন যেন কালীপদ বুঝতে পারল গিরিশ তাকে কী অর্থে ধোঁকা দিয়েছে। সে অশ্রুতে উথলে উঠল। বললে, 'দিন, আপনারই মদ দিন। এমন মদ দিন যেন নেশা না কাটে। সারাজীবন থাকতে পারি বুঁদ হয়ে।'

ঠাকুর অস্ফুটে বললেন, 'বারো বচ্ছর বউটাকে ভুগিয়ে তারপর এলে।'

বউ ?

হ্যাঁ, জন ডিকিনসনের বড় বাবু কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। বারো বচ্ছর আগে এখানে এসেছিল। এসে বললে, আমার স্বামীর মন ফিরিয়ে দিন।

কেন, স্বামীর কী হয়েছে ?

মাতাল, উচ্ছৃংখল। সংসারে পয়সাকড়ি দিতে চায় না, সব মদে আর অনুষঙ্গে উড়িয়ে দেয়। এর একটা কিছু বিহিত না করলেই নয়।

আমি তাকে নবতখানায় পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে যিনি মহামায়া আছেন তিনি তাকে একটি পুজো করা বেলপাতা দিলেন। বললেন, নিজের কাছে রেখে দিও। আর নাম কোরো প্রাণ ভরে।

সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে। তারপর তুই আজ হাজির হলি দক্ষিণেশ্বরে। স্ত্রীর সাধনায় স্বামীর উদ্ধার হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপদকে স্পর্শ করলেন। আর অসুরের মত বিরাট অয়স্কান্ত চেহারা—নরেন যার নাম রেখেছে দানাকালী—সে শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

বাড়িতে এসেও মন শান্ত হয় না। গিরিশের উদ্দেশে মনে মনে বলে, এ তুই আমাকে কী মদের সন্ধান দিলি ?

আরো আশ্চর্য, মনে পড়ল, তাঁকে প্রণাম করে আসেনি। অস্থির হয়ে আবার চলল দক্ষিণেশ্বর। সমস্ত দেহ-মন লুটিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

কালীপদকে দেখে ঠাকুর খুব খুশি : 'এই যে তুমি এসেছ। আমার কলকাতা

যাবার ভারি ইচ্ছে—'

'বেশ তো, চলুন না আমার নৌকোয়।'

নৌকো ঘাটে বাঁধা, ঠাকুরকে নিয়ে কালীপদ উঠল। সঙ্গে আরো অনেক ভক্ত। কলকাতায় কোথায় কী দরকার কে জানে।

মাঝনদীতে হঠাৎ কালীপদকে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'

কালীপদ দিব্যি জিব বের করে ধরল।

আঙুলের ডগা দিয়ে ঠাকুর তাতে কী লিখলেন। এইবার লাগল বুঝি নেশা। সর্বনাশের নেশা। দানাকালী এবার বুঝি কালীতে দানা বাঁধল।

ঘাটে নৌকো এসে লাগতে কালীপদ বললে, 'কোথায় যাবেন ?'

'কোথায় আবার যাব ?' ঠাকুর কণ্ঠস্বরে স্নেহস্বরে স্নেহসুধা ঝরিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি কোথায় নিয়ে যাবে।'

'আমার বাড়ি যাবেন ?'

'নইলে আর কোথায় !'

কালীপদর উল্লাস তখন দেখে কে। একেই বুঝি বলে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

গিরিশ মাধাই আর কালীপদ জগাই। গলায়-গলায় ভাব, গ্লাসে-গ্লাসে। দুজনেই উদ্ধার পেয়ে গেল। ওরা যদি উদ্ধার না পায় তা হলে ঠাকুর যে পতিতপাবন অনাথশরণ তা প্রমাণ হয় কী করে ?

কালীপদ বিনোদিনীর বাবু হয়েছে। আর কালীপদর কাছে বিনোদিনীর শুধু এক অনুরোধ : আমাকে একটিবার ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলুন।

'তোমাকে ঢুকতে দেবে না।' কালীপদ আপত্তি করল : 'তুমি একে স্ত্রীলোক, তায় নটী। ঠাকুরের ভক্তদের দরবারে তোমার স্থান নেই।'

'না, আমাকে নিয়ে চলুন। শুনেছি ঠাকুরের খুব অসুখ। শুনে অবধি তাঁকে দেখবার জন্যে মন ভীষণ ব্যাকুল হয়েছে।' বিনোদিনী কান্নায় ভেঙে পড়ল : 'তাকে না দেখে থাকতে পারছি না। যেমন করে হোক নিয়ে চলুন আমাকে।'

দানাকালীর মন গলল। সত্যি এত ভক্তি আর কোথায় দেখেছি, এত ব্যাকুলতা ! মাথায় বুদ্ধি খেলল। বিনোদিনীকে সাহেব সাজালে। প্যান্টে-কোটে হ্যাটে-বুটে বিনোদিনীকে কে বলবে স্ত্রীলোক। একেবারে ফিটফাট নিখুঁত সাহেব। দু'জনের সাহসকেও বলিহারি।

দরজায় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দাঁড়িয়ে। অবান্তর লোক না ঢুকতে পারে তারই জন্যে রয়েছে পাহারায়।

'এই আমার অফিসের এক ইংরেজ বন্ধু।' দানাকালী দিব্যি বললে নিরঞ্জনানন্দকে, 'ছোকরা ঠাকুরের খুব ভক্ত। অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। চোখের দেখা দেখেই চলে যাবে।'

সাহেব শুনে একটু বা অভিভূত হল নিরঞ্জনানন্দ। সসম্ভ্রমে তাকাল হ্যাট-

কোটের দিকে। দেখে সন্দেহ করবার জো নেই। এমনি অনবদ্য অভিনয় বিনোদিনীর। এমনি রূপসজ্জা।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি উঠে গেল ছোকরা ইংরেজ। ঘরে ঢুকে রোগক্লিষ্ট ঠাকুরকে দেখে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাথার হ্যাট ফেলে দিয়ে ঠাকুরের পায়ে চুল লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করল। বললে, 'আমি সেই চৈতন্য-লীলার বিনোদিনী।'

বালকের মত আনন্দিত ঠাকুর। দানাকালীকে বললে, 'খুব সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছ তো। একেবারে হ্যাটকোট পরিয়ে।'

'নইলে আনা যায় না যে।'

'হ্যাঁ, ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক, পেঁছে যাওয়া।' ঠাকুর আবার হাসতে লাগলেন: 'কিন্তু খুব তুমি বাহাদুর, কালীপদ। মেয়েছেলেকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছ। কেউ ধরতে পারলে না, রুখতে পারলে না।' বিনোদিনীর দিকে তাকালেন: 'আমার সেদিনের সেই আশীর্বাদ ফলেছে, মা। তোমার চৈতন্য হয়েছে। যার চৈতন্য হয়েছে তাকে কে প্রতিরোধ করে!'

ভক্তরা খবর পেল দানাকালী সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে। মেয়েমানুষকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। তারা সব আস্তিন গুটোলো। দানাকালীকে দেখে নেব। হোক সে ঠাকুরের আশ্রিত, গিরিশের বন্ধু, এই অনাচার বরদাস্ত করব না। কিন্তু তারা ঠাকুরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। সাহ্লাদ নয়নে বালকের মতন হাসছেন ঠাকুর: সাহেব সেজে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে এসেছে। জানতে-অজান্তে-ভ্রান্তে—চলে এলেই হল। আর অন্তরে যদি সত্যি ব্যাকুলতা জাগে কে রোধ করে ভক্তির নির্ঝরিণীকে। ভক্তের দল ফিরে গেল হেঁট মুখে।

কালীপদের বুকেও ঠাকুর একদিন হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'চৈতন্য হও।'

এমনি ধারা আশীর্বাদই তো বিনোদিনীকে করেছিলেন: 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'

চিবুক ধরে আদর করলেন কালীপদকে। বললেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক করেছে তার এখানে আসতেই হবে।'

ঠাকুর অপ্রকট হবার পর দুই বন্ধু, গিরিশ আর কালীপদ, কালীপদর বাড়িতে, ঠাকুরের ছবি সামনে রেখে, পাশাপাশি বসেছে স্থির হয়ে। দু'জনের মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। আর দু'জনের মুখে উচ্চারিত এক মন্ত্র, এক প্রার্থনা: 'ঠাকুর, দেখা দাও। দেখা দাও।'

কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রিক্ত গাত্রে নাচছে দু' বন্ধু। চারদিকে খোলের চাঁটি, করতালের ঘা, আর দুই বন্ধুর মুখে এক বুলি এক ধ্বনি: 'রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ!'

নতুন যুগের জগাই-মাধাই। লম্পট ছিল, দুজনেই এখন পরম ভাগবতে

রূপান্তরিত হয়েছে।

সেই কালীপদকে গিরিশ তার 'শঙ্করাচার্য' নাটক উৎসর্গ করল। লিখল: 'ভাই, আমরা উভয়ে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি! কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার শঙ্করাচার্য দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমাকে উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ করো।'

'শঙ্করাচার্যে' অষ্ট সখী বেষ্টিতা মহামায়া গান গাইছে:

'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে গাল বাজালে হয় খুশি,
মান-অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম ভোলা' বলে কেন, নাও না নেচে যা খুশি।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁস-ই॥'

অহেতুকী কৃপার আধার, কল্পতরু গুরু সম্পর্কে বলছে মণ্ডন মিশ্র: 'হ্যাঁ, কুহকী বটেন, যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ সেই কুহকী, আর সামান্য কী বলছেন? সামান্য হতেও সামান্য—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারেও উনি প্রার্থী হন?

এ গিরিশেরই নিজের জীবনের কথা।

'যার গুরু আছে তার উপর পাপেরও কোনো প্রভুত্ব নেই।' বলেছে গিরিশ, 'তার সাধন-ভজনের দরকার কী?'

'গুরুদেব, আমায় একটু বুদ্ধি দিন।' 'শঙ্করাচার্যে' শান্তিপ্রদ তার গুরু শঙ্করকে বলছে, 'এমন বুদ্ধি দিন যাতে আমি বুঝতে পারি।'

শঙ্কর বললে, 'বৎস, সাধন প্রয়োজন, সাধন করো, সমস্ত বুঝবে।'

'যা করতে হয় আপনি করুন।' বললে শান্তিপ্রদ, সাধন করে তো মন বশ করতে বলেন? সে আমার কর্ম নয়! আমি চোখ বুজে মন স্থির করতে বসলেই—মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভালো, চোখ বুজলেই অমনি সৃষ্টি-সংসার ঘুরতে চলল। অমন মন নিয়ে কী সাধন করব বলুন। আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমারও বেশ মিষ্টি লাগে—ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা—এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলাম—এখন যা করবার আপনি করবেন।'

শঙ্কর বললে, 'বৎস, সারতত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনার ফলে এ ধারণা জন্মে, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।'

গর্বে পর্বতায়মান হয়ে গিরিশ একদিন বলত, 'মানুষকে ঈশ্বরবুদ্ধি কেমন করে করব?' আজকের গিরিশ শঙ্করাচার্যে বলছে 'মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর নিজ মায়ায় নরদেহ ধরে গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন।'

'ভগবান—ভগবান আমার মাথায় থাকুন।' 'কালাপাহাড়ে' লেটো তার গুরু চিন্তামণিকে বলছে, 'ভগবান মানুষের মত মানুষ হয়, তাহ'লে বুঝি যে ভগবান প্রেমময় বটেন।'

'আহা, লেটো, সে মানুষ হয়ে এসে রে, মানুষ হয়ে এসে।' বললেন

চিন্তামণি।

'তা আর বুঝিনে বাবাজী? এই তো মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। নইলে লেটোকে কেউ খোঁজে, লেটোর জন্যে কাঁদে—'

শঙ্করাচার্যকে মোহাচ্ছন্ন করতে উগ্র ভৈরব অবিদ্যাসঙ্গিনীদের পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা নাচছে আর গাইছে:

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে বইছে মলয় বায়।
সোহাগে গাইছে পাখি, চকোর উধাও ধায়।
অবশে এলোকেশে অরুণ আঁখি চায় আবেশে
কাঁচলি পড়ে খসে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য জলে, তরঙ্গে রঙে চলে
হিল্লোলে কমল দোলে, উথলে মধু যায়॥

ঠাকুর গিরিশকে বললেন, 'আমার যে অবস্থা সে শুধু নজিরের জন্যে। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। সত্যি বলছি, আমার ঈশ্বর বই কিছু ভালো লাগে না। তোমরা অনাসক্ত হয়ে সংসার করো। কলঙ্কসাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়।'

'আপনারও তো বিয়ে আছে।' গিরিশ বললে পরিহাসের সুরে।

'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে? গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে-খুলে পড়ে যায়—সামলাতে পারি নি। তবে জানবে কামিনীকাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

'কিন্তু কামিনীকাঞ্চনই ছাড়ে কই?' কাতর স্বরে প্রশ্ন করল গিরিশ।

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্য প্রার্থনা করো।'

'বিবেক?

'ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়, ময়লা এক দিকে ভালো জল আরেক দিকে পড়ে। তেমনি বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। অবিদ্যাকে বাদ দিয়ে তোমরা বিদ্যার সংসার করো।'

'বিদ্যার সংসার?

'তাকে জেনে সংসার করো। তবেই সংসার বিদ্যার সংসার। দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখন দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা, এরা গেছে। আমাদের হারুকে চিনতে তো? এমন সুন্দর ছেলে, তাকে এখন পেতনীতে পেয়েছে।

'পেতনীতে পেয়েছে?'

'আর বোলো না। ওরে কোথা গেল, হারু কোথা গেল? সবাই গিয়ে দেখে,

হার্ বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই, তেজ নেই, সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে। স্ত্রী যদি বলে, যাও তো একবার, অমনি উঠে দাঁড়ায়। যদি বলে, বসো তো অমনি বসে পড়ে। এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও সব কিছু ভালো লাগে না। মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।'

'শঙ্করাচার্যে' অবিদ্যাসহচরীরা গাইছে :

'হেসে হেসে কাছে বসে মনমোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে সেই রসে তারে ভোলাই।
কারো প্রেমিকা নারী কারো করে দিই তরবারি—
মনের জ্ঞানে কেউ জটাধারী।
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে আশা ধরে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝতে পারে, ধরতে সোনা ধরে ছাই॥'

'অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে।' বললেন ঠাকুর, 'সে আত্মহত্যাই করুক আর যাই করুক। আর বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। সেই ঠিক ভগবানের দিকে নিয়ে যায়।'

'অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান তবে তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন?' ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞেস করলে।

'আহা, তাঁর লীলা। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না।' বললেন ঠাকুর, 'মন্দ জ্ঞান থাকলেই তবে ভালো জ্ঞান হয়। আমের খোসাটা আছে বলেই আম বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আম আর আমের খোসা দুইই দরকার।'

'শঙ্করাচার্যে'ও গিরিশের সেই বক্তব্য। বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হলে জীবের চৈতন্যলাভ হয় না।

'পরলে পরে সাধের বাঁধন, খুললে খোলে না,
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না।
সোনায় লোহায় ঘসে ঘসে তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিনতে মেলে না।
সে শেকল শক্ত লোহার আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার
হার বলে পরেছে গলে অমনি ফেলে না।
লোহার শেকল মনে হলে তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না॥'

এই গিরিশকেই গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ দিলেন ঠাকুর।

তাঁর দ্বাদশ ভক্ত মানে দ্বাদশ সূর্য—ঠিক করলেন, তাদের তিনি গেরুয়ার আর রুদ্রাক্ষে রাজপদে অভিষিক্ত করে যাবেন। বুড়ো গোপালকে বললেন, 'যা,

বারোখানা গেরুয়ার কাপড় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা কিনে নিয়ে আয়।

নিয়ে এল বুড়ো গোপাল।

কিন্তু বারোজন হয় কী করে? হিসেবে তো এগারো জন। নরেন রাখাল তারক বাবুরাম যোগীন শরৎ কালী হরি লাটু নিরঞ্জন আর বুড়ো গোপাল। আরেকজন কে?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'এখানে নেই, বাড়িতে আছে। তারটা বাড়িতে গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে।'

'কে সে?'

'গিরিশ।'

'গিরিশ গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের অধিকারী? সে তো মশাই পাপী, অপবিত্র।'

ঠাকুর হাসলেন: তার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তার প্রগাঢ় ভক্তি, তার প্রচণ্ড আনন্দ।

'সে তো মশাই গৃহী। ও কি গেরুয়ার মান রাখবে? না কি রুদ্রাক্ষের?'

গৃহই তো এ যুগের সাধনার পীঠস্থান। আর মনোমালাই তো জপমালা।

২১

ক্লাসিকে গিরিশের 'মনের মতন' প্লে হল। অঘোর পাঠক ফকির সাজলে। গান ধরল:

'লাগা রহো মেরি মন
পরম ধন কি মেলে বিন যতন।
যাঁরা ভাসাওয়ে হুঁয়াই ভাসকে চল না।
কব আঁধিয়া উঠে উসকা ক্যা ঠিকানা
মগন রহেকো আপনা সামাল না—
হরদম উসি পর নজর ফেলনা
ওহি হ্যায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কোন?
ওহি আপনা সব ভি বেগানা
সমজ লে না কো আপন—
এক হ্যায়—উও পরম ধন।।'

বিবেকানন্দ মানে নরেন বললে, 'তোমার ফকিরের গান চমৎকার হয়েছে, কিন্তু যাই বলো, ভাষায় মাথামুণ্ডু নেই। এটা হিন্দী না উর্দু—কি বলো দেখি?'

'খাঁটি হিন্দী বা উর্দু দিলে সাধারণ দর্শক বুঝতে পারবে না।' গিরিশ

বললে, 'হিন্দী বা উর্দুর শুধু একটা কাঠামো থাকলেই দর্শক বোঝে যে চরিত্রটা স্বতন্ত্র আর গানের মর্মটাও তাদের বোধগম্য হয়। ভাষার মাথামুণ্ডু দিতে গেলেই সমস্ত ঝাপসা।'

দুজনে সব সময়েই প্রায় মতভেদ, ঝগড়া, দুজনেই আবার মহাভাব। সব সময়ে পাশাপাশি। একজন প্রশ্নপ্রদীপ্ত জ্ঞান, আরেকজন প্রশ্নবিহীন ভক্তি। ঝগড়া কোথায়? দুজনে পাশাপাশি খেতে বসেছে বলরাম বোসের বাড়িতে। আম দিচ্ছে দুজনকে। যত আম গিরিশের পাতে, সব মিষ্টি, আর যত আম নরেনের পাতে, সব টক।

নরেন চটে গিয়ে বললে, 'শালা জি-সি, তোর পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক। নিশ্চয়ই তুই শালা বাড়ির ভেতরে গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিস।'

গিরিশ বললে, আমরা গৃহী, সংসারী, আমরাই তো মজা মারব। তুই শালা সন্ন্যাসী ফকির, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবি, তোদের কপালে তো সুঁটকো টোকোই জুটবে।'

এই নিয়ে বেধে গেল ঝগড়া। তর্কাতর্কি। সংসারী বলছে, আমাদেরই তো মজা, আমাদেরই তো মিষ্টি আম, সরস আম। কেল্লায় থেকে আমাদের যুদ্ধ। ঘরে বসেই সব জুটে যাচ্ছে আমাদের। ছাই জুটছে। উত্তর দিচ্ছে সন্ন্যাসী। ক্ষুদ্র আয়তনে ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে বসে আছিস। ঘৃণা দ্বেষ দ্রোহ অশান্তি, ছোট ছোট হিসেবে দিন যাচ্ছে। আমাদের কোনো বন্ধন নেই, পিছটান নেই, সমস্ত বসুন্ধরাই আমাদের ঘর-উঠোন। ওরে বাবা, তোদের কত ক্লেশ, কত তপস্যা, কত রৌদ্রের দাহ, কত শীতের উৎপীড়ন। তোদের তপ্ত হওয়াই বা কি কম? তোদের শীতার্ত হওয়া? কত তোদের দারিদ্র্যদুঃখ, অপমানক্লেশ। কত শোক কত গ্লানি কত নৈরাশ্য। তোদের তপস্যা আরো বেশি।

তাই তো, লাফিয়ে উঠল সংসারী, তাই তো ঠাকুর আমাদের 'বীরভক্ত' বলেছেন। তুই সন্ন্যাসী, তুই শুধু ভক্ত, আর আমরা সংসারী, আমরা বীরভক্ত। ঠাকুর বলেছেন, সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কী! তুই সংসারী, তুই যে ঈশ্বরকে ডাকিস, যেন বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখিস, গহ্বরে কী আছে। তুইই বাহাদুর, তুইই বীর, তুইই বীরভক্ত। কী, বলেন নি?

নরেনের সঙ্গে ঝগড়া করার মত সুখ আর কোথায়? গিরিশকে চটিয়ে দিয়ে তার মুখে গালমন্দ শোনাও আনন্দময়।

'কী অশুভক্ষণে দুজনে দেখা হয়েছিল যে একদিনও একটি মিষ্টি কথা বলতে পারলাম না।' নরেন সম্পর্কে বলছে গিরিশ: 'বরাবর কেবল ঝগড়াই করলাম, গালমন্দ করলাম। তার সঙ্গে ঝগড়া গালমন্দ না করলে আমার সোয়াস্তি হত না, বুকটা যেন খোলসা হত না। এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় যে কথা কয়ে সুখ হয়—মিষ্টি কথাই হোক আর রুক্ষ কথাই হোক—সব যেন মিষ্টি।'

আর দুজনের প্রতিই ঠাকুরের কী টান, অসীম ভালোবাসা! নরেনকে

খাওয়াবার জন্যে কী ব্যস্ত! বলরামের বাড়িতে ঠাকুরের জন্যে মোহনভোগ এসেছে, নিজে না খেয়ে নরেনকে ডাকছেন, ওরে মাল এসেছে! মাল! খা, খা! আবার গিরিশের বাড়ির ছাদে পাত পেড়ে খেতে বসেছেন, নরেনও বসেছে কিন্তু আধেক খাওয়া হতে না হতেই ঠাকুর নিজের পাত থেকে দই আর তরমুজের পানা নিয়ে নরেনের কাছে এসে উপস্থিত। বলছেন, নরেন, তুই এটুকু খা।

মা কালীর প্রসাদী একবাটি পায়েস নিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। বালকের মত বাটির উপরে হাত চাপা দিয়ে রেখেছেন আর বলছেন, 'এ পায়েস গিরিশ খাবে। গিরিশের জন্যে রেখেছি।'

'শুধু গিরিশের জন্য?' অন্যান্য ভক্তরা বললে, 'কেন আমরা কি কেউ নয়?'

সে সব কথা ঠাকুর কানেও তুলছেন না। মুখে শুধু এক বুলি: 'এই পায়েস গিরিশ এসে খাবে। আর কারু নয়, এ পায়েস গিরিশের জন্যে।'

'গিরিশ কোথায়?'

'না, সে আসবে।' বালকের মত বিশ্বাস নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আসবে।'

'তার আসবার কি কথা আছে? সে কি খবর পাঠিয়েছে?'

'খবর পাঠাবে কেন? সে নিজে আসবে! সে এসে খাবে। এই সে এল বলে।'

বলতে বলতে গিরিশের গাড়ি এসে হাজির।

গিরিশকে দেখে ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন: 'এই তো এসেছে! ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়েস রেখেছি। খেয়ে নে। ওরা সব কাড়াকাড়ি করতে আসছে। শিগগির খেয়ে নে। নে, বোস আমার সামনে। খা।' বলে বাঁ হাত গিরিশের কাঁধের উপর রাখলেন, তারপর মা যেমন সাত আট বছরের ছেলেকে পায়েস তুলে তুলে খাইয়ে দেয় তেমনি ডান হাতে একটু একটু করে পায়েস তুলে গিরিশের মুখে দিতে লাগলেন। শেষে বুড়ো আঙুল দিয়ে বাটি চেঁছে বাটির গায়ে যেটুকু লেগেছিল তাও খাইয়ে দিলেন। বললেন, 'যা, এবার আঁচা গে যা।'

'কী আশ্চর্য', ঠাকুরের স্নেহ-করুণায় গিরিশ একেবারে অভিভূত। বলছে, 'আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ো মিনসে, কলকাতার বদমাস গুন্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি, কত বদখেয়ালি করি ঠিক নেই। কিন্তু তিনি যখন তাঁর বাঁ হাতখানি কাঁধে রেখে ডান হাতে আমার মুখে পায়েস দিতে লাগলেন, তখন আমি সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত আট বছরের নিষ্পাপ বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যেবুদ্ধি কোথায় তলিয়ে গেল। এ যে কী অদ্ভুত ভালোবাসা তা কাকে বলব কাকে বোঝাব।'

তারপর দয়ারই বা কী পার আছে। বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছিলেন সন্ধের পর, কোথায় ফিরে যাবেন দক্ষিণেশ্বর, তা নয়, রব তুললেন গিরিশের বাড়ি যাবেন।

গিরিশ তখন বেশ একটু রঙে আছে, ঠাকুরকে দেখে কী করবে কোথায় বসাবে কী ভাবে আদর-যত্ন করবে, একেবারে এলোমেলো হয়ে পড়ল। চাকর ঈশানকে বললে, 'যা শিগগির দোকান থেকে লুচি আর আলুর দম নিয়ে আয়।'

বৈঠকখানা ঘরে মেঝেতে তোষক পাতা, তার উপর লম্বা জাজিম, তাতেই বসেছেন ঠাকুর। অন্যরাও বসেছে। জাজিমটা তত পরিষ্কার নয়। তাতে কী? মন পরিষ্কার। ঈশান ঠোঙায় করে খাবার নিয়ে এল।

গিরিশ বললে, 'যা, যে কাঁসার থালায় আমি খাই সে থালাটা নিয়ে আয়।'

নিজের ব্যবহৃত থালায় লুচি আর আলুর দম সাজিয়ে ঠাকুরকে ধরে দিল গিরিশ। থালাটা রাখল জাজিমের উপর। বললে, 'নিন, খান।'

ঠাকুর দ্বিধা করতে লাগলেন। একে তো এই অপরিচ্ছন্ন ফরাস, তার পর এই ব্যবহৃত থালা! সঙ্গের একজন ভক্ত হয়তো সে দিকে ইঙ্গিতও করল।

গিরিশ টং করে উঠল : 'কেন বলরামের বাড়িতে খেতে পারেন আর এখানে খেতে যত আপত্তি? নিন, খান, হাঁ করুন—'

এতটুকু শুচি-অশুচির দ্বন্দ্ব নেই, কিছুমাত্র আপোস নেই ভালোবাসায়। সমস্ত-দিয়ে-ফেলা সমস্ত-গ্রাস-করে-নেওয়া ভালোবাসা। ঠাকুর থালার থেকে তুলে লুচি-আলুর দম খেতে লাগলেন আর হাসতে লাগলেন মৃদু-মৃদু।'

গিরিশ ঈশানকে ডাকল : 'দ্যাখ দিকিনি সকালবেলার পুঁইশাক আর চিংড়ি মাছের চচ্চড়িটা আছে কিনা। যদি থাকে তো নিয়ে আয়—খেতে বড় ভালো হয়েছিল—'

একটা বাটিতে করে সকাল বেলাকার পুঁইশাকের চচ্চড়ি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল ঈশান। ঠাকুরের থালায় ঢেলে দিল চচ্চড়ি।

যিনি অন্যের স্পর্শ-লাগা খাবার খেতে পারেন না, অশুচিতে যাঁর এত আপত্তি সেই ঠাকুর নির্দ্বিধায় চচ্চড়ি খেতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।'

গিরিশের কী ভাব? আড়াল নেই অন্তরাল নেই অর্গল নেই আবরণ নেই—নিষ্কপট ভক্তি বা ভালোবাসার ভাব। আর তুমিই পরশরতন মানুষরতন, এই দ্বন্দ্বাতীত নিস্পন্দ বিশ্বাস।

কাশীপুরে ঠাকুরের খুব অসুখ, সন্ধেসন্ধি গিরিশ এসেছে। ঠাকুর বসে আছেন বিছানায়। ঘরের কোণে লণ্ঠন জ্বলছে। গিরিশ আসতেই ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওগো, আলোটা একটু কাছে আনো। গিরিশকে দেখি।

গিরিশের প্রতি লক্ষ্য স্বচ্ছ হয়ে এল। জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো আছ?'

গিরিশ হাসল। তোমাকে ভালোবেসে ভালো না থেকে উপায় কী?

অস্থির হয়ে লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর : 'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।' কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, 'জলখাবার এনে দে।'

একটি ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা এনে দিল ঠাকুরকে। সবগুলি মালা ঠাকুর একে-একে পরলেন নিজের গলায়। হৃদয়মধ্যে হরি বসে, যেন তাঁরই পূজা করলেন। হঠাৎ দুগাছি মালা তুলে নিয়ে গিরিশকে দিলেন। মাস্টারমশাই পাখা করছিল। তাকেও দিলেন দুগাছি। বললেন, পরো।

কিন্তু কই গিরিশের খাবার কই।

সেই বরানগরে গেছে তো, সেই ফাগুর দোকানে। তাই বুঝি দেরি হচ্ছে। কিন্তু বেশি দেরি হলে কচুরি গরম থাকবে তো?

এই এসে গেছে খাবার। লুচি কচুরি আর মিষ্টি।

সমস্ত ঠাকুরের সামনে রাখা হলে তিনি তা প্রসাদ করে দিলেন। নিজের হাতে করে কচুরি গিরিশের হাতে দিলেন। বললেন, 'বেশ কচুরি।'

গিরিশ পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে লাগল। এখন জল দিতে হয়। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস, সারাদিন কী প্রচণ্ড গরম গিয়েছে। ঠাকুরের শয্যার এক কোণে কালো কুঁজোয় জল ভরা। এই জলই ভালো, এই জলই গিরিশকে দাও। কিন্তু কে দেবে? ঠাকুর নিজেই উঠলেন। ভীষণ অসুস্থ, দাঁড়াবার শক্তি নেই, তবু উঠলেন। বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন কোনোরকমে। তাঁকে বাধা দেবার কথা কেউ ভাবতেও পারল না, নিজেই জল গড়ালেন। গ্লাস থেকে একটু জল হাতে নিয়ে দেখলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কি না। না, গিরিশ খাবে, যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু কী করা, এর চেয়ে ঠাণ্ডা পাবার আশা নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ জল দিলেন।

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কচুরি বেশ গরম আছে।'

'ফাগুর দোকানের কচুরি।' গিরিশকে বললে মাস্টার 'বিখ্যাত।'

'বিখ্যাত!' ঠাকুর সপ্রশংস সমর্থন জানালেন।

খেতে খেতে গিরিশও সহাস্যে বললে, 'বেশ কচুরি।'

ঠাকুর বললেন, 'লুচি থাক, কচুরি খাও।' তাকালেন মাস্টারের দিকে, 'কচুরি কিন্তু রজোগুণের।'

দক্ষিণের ছোট ছাদে হাত ধুতে গেল গিরিশ।

'অনেকগুলি কচুরি খেল।' ঠাকুর বললেন মাস্টারকে, 'ওকে বলে দাও আজ আর যেন কিছু না খায়।'

একেই বলে ঈশ্বর শুধু সুখকর নন ঈশ্বর কল্যাণকর। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন।

এই ঈশ্বরত্ব না অবতারত্ব নিয়ে আবার গিরিশে-নরেনে ঝগড়া।

নরেন মানতে চায় না। বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যে অনন্ত তার আবার অংশ কী! তার অংশ হয় না।

গিরিশ বলে, ঈশ্বর সব কিছু করতে পারেন, শুধু একটা মানুষ হতে পারেন না?

'তাঁকে ধারণা করে এমন কার সাধ্য? তিনি অন্তহীন।'

'তাঁকে ধারণা করা কী দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল।' বললে গিরিশ, 'তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা।'

'আবার অবতার?' নরেন বুঝি বিদ্রূপ করে ওঠে।

'হ্যাঁ, অবতার।' গিরিশ জোর দিয়ে বললে, 'আগুন সব জায়গায় আছে কিন্তু কাঠে বেশি। তেমনি ঈশ্বর সর্বত্র আছেন কিন্তু মানুষে বেশি। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, যে মানুষ ঈশ্বরের জন্যে পাগল, তাঁর প্রেমে

মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয়ই ঈশ্বর অবতীর্ণ।'

নরেন চুপ করে গেল।

'নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।' ঠাকুরকে একদিন এসে বললে গিরিশ।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'না, হারেনি! আমায় এসে বললে, গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কী বলব। এমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

ক্লাসিকে গিরিশের লেখা 'ভ্রান্তি' নামল। গিরিশ নিজে রঙ্গলাল সেজেছে। বলছে দেবমূর্তিকে: 'অমন পাথুরে মাকে মানি না-মানি এসে যায় না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে। আমার দেবতা অমন দৃষ্টি-ভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর।'

'কে তোমার দেবতা?'

'মানুষ আমার দেবতা। আমার দেবতা প্রাণময় পুরুষ—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না ভালো করেছি কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পুজায় কোনো শাস্ত্রে নিন্দা নেই, তর্কবিতর্ক নেই।'

মানুষরতনই পরশরতন। কী বিশ্বাস গিরিশের!

'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্যে!' সরাসরি বললে ঠাকুরকে। বলতে পারলে।

ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে আপনজনের মত ঘরের লোকের মত কে জানিয়ে দেবে কে বুঝিয়ে দেবে ঈশ্বরই সার আর সব অসার। কে অধম পতিত দুর্বল সন্তানকে তুলবে হাত ধরে? কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে তুলবে? আর যদি মানুষরূপে সঙ্গে-সঙ্গে না বেড়ান তা হলে যারা ঈশ্বরে মন-প্রাণ ফেলে রেখেছে, যাদের ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না, তারা কী করে থাকবে, কী করে কাটাবে দিনরাত্রি?

'যেমন ভক্তের বিশ্বাস তেমনি ভগবানের দয়া।'

'ভ্রান্তি'তে পুরঞ্জন বলছে, 'সংসার যে সাগর বলে এ কথা ঠিক। কূলকিনারা নেই। তাতে একটি ধ্রুবতারা আছে—দয়া।'

অমর দত্ত 'মিনার্ভা'রও ভার নিল। কিন্তু চালাতে পারল না। চলে গেল মনোমোহন পাঁড়ের হাতে। ক্লাসিকও রাখতে পারবে এমন মনে হলো না। ক্রমশই ঋণে ডুবে যাচ্ছে। গিরিশই আবার এগিয়ে এল। টাকা দিয়ে উদ্ধার করল অমরকে। তবু শেষ উদ্ধার হল না। পাওনাদাররা মোকদ্দমা করল। ক্লাসিক ছেড়ে দিল অমর। গিরিশও তিন মাসের মাইনে বাকি রেখে ক্লাসিক ছেড়ে চলে এল মিনার্ভায়।

ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবে।'

শুনে ঠাকুর খুব খুশি নন, অসুখের জন্যে কথা বলতে পারছেন না, আঙুল দিয়ে মুখ দেখিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তার বাড়ির লোকজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কী করে? সংসার চলবে কিসে?'

'তা জানি না।' একটু থেমে গিরিশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাঁকে ডাকা?'

'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে', বললেন ঠাকুর, 'তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি, এও করো ওও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাকো। সব ত্যাগ করতে বলি না।'

'আচ্ছা মশাই', গিরিশের আরো প্রশ্ন: 'মনটা এই বেশ উঁচু আছে আবার নীচু হয় কেন?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু কখনো নীচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে আবার কখনো কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে, কখনো পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কী? মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'

গিরিশের সঙ্গে মহিমাচরণ তর্ক করছে। মহিমাচরণকে পরাস্ত হয়ে গিরিশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল।

ঠাকুর বললেন, 'দেখলে তো, তর্ক করতে-করতে ও জল খেতে ভুলে গেল। যদি ওর কথা না মানতে তাহলে তোমায় ও ছিঁড়ে খেত।'

২২

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। বিবেকানন্দই সমস্ত দেখছে-শুনছে। মঠের সন্ন্যাসীরা এসেছে। গিরিশও উপস্থিত। সন্ন্যাসীদের কী খেয়াল হল, স্বামীজিকে যোগীর বেশে সাজাল। কানে শাঁখের কুণ্ডল, সারা গায়ে শ্বেত ভস্ম, মাথায় দীর্ঘ জটাভার, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা আর বাঁ হাতে ত্রিশূল? পদ্মাসনে বসল পশ্চিমাস্য হয়ে। শুরু করল রাম-কীর্তন। সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ। রাম রাম শ্রীরাম রাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল গিরিশের দিকে। নিজের বেশবাস খুলে গিরিশকে সাজাতে লাগল। গিরিশ এতটুকু আপত্তি করল না, কী রকম যেন আরেক রকম হয়ে গেল।

গিরিশের বিশাল দেহে স্বামীজি নিজ হাতে ভস্ম মেখে দিল, কানে পরিয়ে দিল কুণ্ডল, মাথায় সেই জটাজুট, বাহুতে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ। শুধু এতেই হবে না। পরনের শাদা কাপড় ছেড়ে পরো এবার গেরুয়া।

'এ যে একেবারে ভৈরব মূর্তি ধরেছে।' সপ্রশংস চোখে বললে স্বামীজি: 'ঠাকুরই তো বলতেন গিরিশ ভৈরবের অবতার।'

ঠাকুর গিরিশকে গেরুয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, স্বামীজি এবার সে গেরুয়া পরিয়ে দিল নিজের হাতে।

'জি-সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে।' বললে স্বামীজি, উপস্থিত ভক্তদের লক্ষ্য করে বললে, 'তোরা সব স্থির হয়ে বোস।'

কিন্তু কোন কথা কইবে আজ গিরিশ ?

আনন্দে সে নিশ্চল হয়ে রইল। বললে, দয়াময়, ঠাকুরের কথা আমি কী বলব। তোমাদের মতন কামকাঞ্চনত্যাগী কুমার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এ অধমকে একাসনে বসতে অধিকার দিয়েছেন, তাঁর অপার করুণার কথা বলি এমন সাধ্য কী !' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল গিরিশের। সে বিহ্বলের মত কাঁদতে লাগল।

'গিরিশ আঁস্তাকুড়ের আমগাছ।' বললেন ঠাকুর, 'নির্মল গিরিশে কোনো দোষ নেই।'

থিয়েটার পাশে দেখবেন না, টিকিট কেটে দেখবেন—গিরিশকে জানালেন ঠাকুর। গিরিশ বললে, বেশ তো, আট আনা দেবেন, গ্যালারিতে বসে দেখবেন। ঠাকুর গ্যালারিতে বসতে রাজি নন, সে ভারি র‍্যাজলা। না, বেশ, গ্যালারিতে বসবেন না, যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসবেন, কিন্তু দেবেন শুধু আট আনা। বিবেক-সান্ত্বনা আট আনা।

ঠাকুর গম্ভীর হলেন। বললেন, না, আমি তোমাকে ষোল আনা দেব ! একেবারে ঢেলে দেব, ভরে দেব, নিঃশেষ করে দেব।

পরে নিজেই আবার বলছেন, 'আমি গিরিশকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলাম, ও আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

দিয়ে ফেললে ভক্তি আর বিশ্বাস। হ্যাঁ, অন্ধ বিশ্বাস আর নীরন্ধ্র ভক্তি। ভক্তি যদি জাগে আইন-বিধি নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় একবাঁশ জল।

'আমাদের উপায় কী ?' গিরিশ জিগগেস করলে।

ঠাকুর বললেন, 'ভক্তিই সার।'

'ভক্তির তো আবার সত্ত্ব-রজ-তম আছে।'

'হ্যাঁ, ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তির রজ লোক-দেখানো জাঁকজমক। আর ভক্তির তম যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আমার পাপ কী ! তুমি যখন আমার মা, আপনার মা, আমাকে দেখা দিতেই হবে।'

'ভক্তির তমই তো আপনি বেশি শেখান।'

'হ্যাঁ, যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো কাটো লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার হরহর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ !'

একবার আমি তাঁকে মেনেছি, তাঁকে ধরেছি, আমার আবার ভয় !

'আশ্চর্য হচ্ছি', নিজের মনে বলছে গিরিশ, 'আমি কিনা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কী তপস্যা করেছি যে আমি এই সেবার অধিকারী হয়েছি। কিন্তু যাই বলো তুমি ভাব-টাব ধোরো না। ভাব-টাব ধরলেই দশ হাত তফাতে যাই, ভাল হয়। তুমি শুধু এই গুরু রূপটিই ধরে থাকো।'

ঠাকুর বললেন, 'যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন।'

'হ্যাঁ, গুরু-রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না।' বলেই আবার বলছেন, হ্যাঁ

গা, এবার রূপ নিয়ে আসোনি কেন গা ?'

এ যেন ঠাকুরেরই ভাষায় ফোয়ারা-লুকিয়ে-রাখা পোড়ো বাড়ি। যেন রাজা নিজের রাজ্য দেখতে বেরিয়েছেন ছদ্মবেশে। এবার রাজ্য-উদ্ধার।

গিরিশ বলে উঠল : 'এবার বুঝি বাঙলা উদ্ধার।'

'শুধু বাঙলা কেন,' কে আরেকজন ভক্ত বললে, 'সমস্ত জগৎ উদ্ধার।'

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ফিচকেমিতেও ওস্তাদ। সেখানেও তাঁর সর্বাতিশায়ী বিভূতি।

'হ্যাঁ গা, তোমার আমার কথা কি কইছিলে ?' ঠাকুর নিরীহ মুখে তাকালেন গিরিশের দিকে : 'আমি খাই দাই থাকি।'

'আপনার কথা আর কি বলব!' গিরিশ ঝলসে উঠল : 'আপনি কি সাধু ?'

'না, না, আমি সাধু-টাধু নই। আমার সত্যিই কোন সাধুবোধ নেই। আমি খাই দাই থাকি।'

'আশ্চর্য, ফিচকেমিতেও পারলুম না আপনার সঙ্গে।' গিরিশ ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'আপনার সব ঢং। আপনার সমস্ত ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢং করত—'

'হ্যাঁ,' সরল সমর্থনের ভঙ্গি করলেন ঠাকুর : 'শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নর-লীলায় ঐ রূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন ধরেছিলেন অথচ নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন একটা কাঠের পিঁড়ি বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!'

'তোমাকে বুঝেছি।' গিরিশ বললে, 'তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই।'

আবার আরেক দিন বললে, 'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু। এমন কি ফিচকেমিতেও।'

'না গো তা নয়।' বললেন ঠাকুর, 'এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার মধ্যে ঢের তফাৎ। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা কঠিন। পড়ে বা দেখে-শুনে জানার মধ্যে সেটা হয় না।'

সকলের গত জীবনের কথা জানতে চাইতেন ঠাকুর কিন্তু গিরিশের বেলায় তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। একবার জিজ্ঞেস করে, দেখতাম! সব মহাভারত উগরে দিতাম। কি করেছি না-করেছি, কোথায় গেছি না-গেছি, রাত কাটিয়েছি। এতটুকুও 'কিন্তু' করতাম না। আর, গিরিশের পুরোপুরি বিশ্বাস, তিনি পুরোপুরি শুনতেন। আর মহাভারত শেষ হলে ঠিক বলতেন, যা করেছিস বেশ করেছিস। কোনোদিন নিন্দাতিরস্কার করেন নি, করতেনও না।

'রঙ্গালয়' নামে এক সাপ্তাহিক বেরুল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক। গিরিশ তাতে আত্মকথা লিখল।

'আত্মজীবনী লেখা মানেই কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছে গিরিশ, 'শুধু লোকের কাছে বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা। আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, ভগবানের স্পেশ্যাল মার্কার তৈরি—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই বলা ফলাও করে। দম্ভের এর চেয়ে আর বড় প্রকাশ হতে পারে না। আত্মজীবনী

মানেই হচ্ছে নিজের পক্ষে ওকালতি।'

'আত্মজীবনীতে কেউ-কেউ তো নিজের কুকীর্তির কথাও বলে থাকেন।' একজন ফোড়ন দিল।

'তাও পাকে-প্রকারে নিজের মহত্ত্বই প্রমাণ করবার জন্যে।'

তার পরেই মিনার্ভায় 'বলিদান' নামল।

কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানি করুনাময়ের পার্টে স্বয়ং গিরিশ। বিয়ের পর মেয়ে প্রথম শ্বশুর বাড়ি গেছে, ঝি ফিরে এসে বউ-কাটকি শাশুড়ির কথা বলছে করুণাময়কে : 'পালকি খুলে বউয়ের মুখ দেখে মাগী অমনি ডুকরে কেঁদে উঠল! বলে ওমা, কোথাকার কাঠকুড়ুনি এল গো—কোথাকার হাঘরের মেয়ে আনলুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—'

সেই যুগের শাশুড়িদের সম্পর্কে গাইছে 'বলিদানে' :

'খা লো কনে আফিং কিনে বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি,
কলিতে অমর কনের শাশুড়ি॥
ইটে ভিটে বেচে কনের বাপের নাইকো পার,
হাত নাড়া দে করবে কত মায়ের তোর খোয়ার।
শাশুড়ির মুখের তোড়ে দৌড় মারে ডোমহাড়ি॥
মরে জুড়ো চোখের জলে হবি লো নাকাল,
উঠতে খোঁটা বসতে খোঁটা শুনবি সাঁজ-সকাল।
তোর শাশুড়ির সোনার ছেলে, তুই রাঙের থুবড়ি॥'

তারপরেই মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলা।' এ পর্যন্ত সিরাজকে ইংরেজের লেখা ইতিহাসের ভিত্তিতে কলঙ্কিত করে আঁকা হচ্ছিল—এমন কি নবীনচন্দ্র সেনও বিভ্রান্ত হয়েছিল। গিরিশই তাকে সত্যের আলোতে প্রতিষ্ঠিত করল নাটকে। অপরিণত বয়সের অস্থিরতা ছাড়া সিরাজের আর কোনো দোষ ছিল না। সিরাজ ক্ষমাশীল, দয়ার্দ্র, প্রজাবৎসল। শুধু বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতাই তার সর্বনাশ করেছে আর শত্রু ইংরেজ সব সময়েই শত্রু।

'সিরাজদ্দৌলায়' সিরাজ সাজল দানী, আর করিমচাচা গিরিশ।

মিরজাফর আর জগৎ শেঠকে বলছে সিরাজ, 'আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি সত্যিই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙলার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পবিবর্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য প্রদান করব, আপনাদের আত্মীয়স্বজন স্বদেশীই নির্বাচিত হবে। হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই রাজকার্য প্রাপ্ত হবে।'

আর ক্লাইভকে বলছে করিমচাচা : 'সাহেব, বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। তোমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির আশা বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজিত।'

করিমচাচা আবার বলছে : এই বাঙলায় যদি তিনজনের দুর্মত দেখাতে

পারেন তা হলে আমি নাকে খত দিয়ে আফিং ছেড়ে দেব। যদি একমতে বাঙলায় কাজ হত, যদি একমতে চলতে শিখত, তা হলে বাঙলার মাটি থাকত না, সোনা হয়ে যেত। বাঙলার বুদ্ধি যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝুড়ি-ঝুড়ি।'

মীরমদনকে বলছে সিরাজ : মীরমদন, তুমি জানো না, মোগল বংশ উচ্ছেদ করতে ইংরেজ জন্মগ্রহণ করেছে—শিখগুরু তেগ বাহাদুরের অভিশাপ শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে মোগল বংশ উচ্ছেদ করবে।'

আর জহরা ক্লাইভকে বলছে : 'এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী, দিন দিন যুদ্ধবিগ্রহে প্রজার শান্তি নেই। সেই শান্তিস্থাপনের ভার ঈশ্বর তোমাদের প্রদান করেছেন। আবার তোমরা যদি অত্যাচারী হও তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে।'

নবীনচন্দ্র লিখছে গিরিশকে : তুমি আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখেছিলাম শত্রু-চিহ্নিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। নব যুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত দিয়েছিলাম, শোকের সময় সঙ্গীত আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলে বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন। সেই জন্যে আমি পরে সঙ্গীত বাদ দিয়েছি। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ ধরেছ।'

গিরিশের হাঁপানি রোগ দেখা দিল। শরীর ভেঙে পড়তে লাগল দিন-দিন। কে তার এই ব্যাধির নিরাকরণ করে?

'তোমার এই অসুখ আমি ভালো করে দেব।' ঠাকুরকে বললে একদিন গিরিশ, 'মন্ত্রবলে ভালো করে দেব।'

'কী মন্ত্র?' ঠাকুর তাকালেন উৎসুক হয়ে।

'তুমি শুধু বলবে, রোগ আরাম হয়ে যাক। বলো', গিরিশ এক পা এগিয়ে এল, দৃপ্তস্বরে বললে, 'বলো, ভালো হয়ে যাক। আচ্ছা, বেশ, আমি ঝাড়িয়ে দেব। কালী! কালী!' গিরিশ কান্না-ছলছল স্বরে বললে, 'বলো, তুমি শুধু বলো, ভালো হয়ে যাবে।'

ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা হয়েছে তা যাবে।'

তার মানে কি এই যে, দেহ হয়েছে, দেহই চলে যাবে। আর দেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে রোগচ্ছায়া।

শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে স্বামীজি বেদব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। এমন সময় গিরিশ এসে উপস্থিত।

'কী জি-সি, এসব তো কিছু পড়লে না,' বললেন স্বামীজি, 'কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!'

গিরিশ বললে, 'অত বুদ্ধি কোথায় যে ওর মধ্যে সেঁধুব! ঠাকুর তোমাদের দিয়ে ঢের-ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সবে দরকার নেই। বেদবেদান্ত মাথায় রেখে জয় রামকৃষ্ণ বলে এবার পাড়ি মারব।' বলে প্রকাণ্ড ঋগ্বেদকে গিরিশ বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল, আর বলতে লাগল,

'জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়।'

স্বামীজি অন্যমনা হয়ে কী ভাবছেন, গিরিশ সখেদে বললে, 'হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে কিন্তু এই যে দেশে এত দুঃখ কষ্ট হাহাকার অন্নাভাব ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা মহামহাপাতক চোখের সামনে ঘটছে, তার উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে নিত্য পঞ্চাশখানা পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি—ঐ অমুকের বাড়ির বউটাকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে—ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, নয়তো অমুকে জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ সব প্রতিরোধ করার রহিত করার কোনো উপায় বেদে আছে কি?'

গিরিশ একের পর এক সমাজের দুর্গতির ছবি স্বামীজির সামনে তুলে ধরতে লাগল। নির্বাক হয়ে শুনলেন স্বামীজি। তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল। পাছে বিহ্বল হয়ে পড়েন, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন বাইরে।

শরৎকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'দেখলি এত বড় প্রাণ! আর্তজীবের প্রতি করুণায় বেদবেদান্ত ভেসে গেল।'

'বেশ পড়া হচ্ছিল,' শরৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনি কী কতগুলো ছাই-ভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করে দিলেন।'

'রেখে দে তোর বেদবেদান্ত! জগতে কত দুঃখকষ্ট, সে দিকে চেয়ে উনি বেদ পড়তে বসেছেন।'

'আপনি শুধু হৃদয়ের কারবারী, জ্ঞানের নন।' শরৎ বললে, 'নইলে যার চর্চায় জগৎ ভুল হয়ে যায় তার আপনি আদর করলেন না।'

'বটে? জ্ঞান আর প্রেমের ভিন্নতাটা কোথায় আমায় দেখিয়ে দে দিকি। তোর বেদ যদি জ্ঞান আর প্রেমকে পৃথক করে থাকে, সে বেদ আমার মাথায় থাকুক।'

কথাটা বুঝি মানল শরৎ। গিরিশের কথা তো বেদেরই কথা।

'কী কথা হচ্ছিল তোদের?'

কুণ্ঠিত মুখে শরৎ বললে, 'বেদের কথা। গিরিশবাবু বেদবেদান্ত পড়েন নি বটে কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল।'

স্বামীজি বললেন, 'গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়। পড়বার শোনবার দরকার হয় না। এমন ভক্তি-বিশ্বাস আর কোথায় আছে? জি-সির মত যার ভক্তি-বিশ্বাস তার শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। তাই বলে ওকে অনুকরণ করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ হবে। ওর কথা শুধু শুনে যাবি, ওর দেখাদেখি কিছু করতে যাবিনে।'

২৩

'মানুষ জপায় বিধি মাপায়।'

তিনকড়ির পিছনে বাবু লেগেছে। এ বাবুটি আবার গিরিশের বন্ধু। যেমন ধনী তেমনি উচ্ছৃংখল।

সিঁথিতে বাগানবাড়ি আছে। মাঝে-মধ্যে মাইফেল বসে। সে মাইফেলে আর-আর নটনটীদের সঙ্গে গিরিশও হাজিরা দেয়।

'তুমি শুধু আমাকে একটা টাকার সংখ্যা দাও।' বাগানবাড়ির বাবু বললে তিনকড়িকে।

তিনকড়ি চুপ করে রইল।

'যা বলবে তাই দেব। কিন্তু ঐ থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।' বরদ-বদান্য ভঙ্গিতে বাগানবাড়ি হাসল : 'ছেড়ে দিয়ে আমার হোলটাইম হয়ে থাকবে।'

বিরস মুখে তিনকড়ি বললে, 'একটু ভেবে দেখি।'

'তা দেখ।' বাগানবাড়ি গম্ভীরভাবে বললে, 'বলতে পারো যৌবন ক্ষণস্থায়ী। তা, তোমার থিয়েটারও ক্ষণস্থায়ী। এখন হিরোয়িন সাজছ, ক'দিন পরে ঝি সাজবে। তারপরেই ঝিঁ ঝি হয়ে যাবে!'

ম্লান রেখায় তিনকড়ি একটু হাসল।

'থিয়েটার থেকে নীট কত নিয়ে আসতে পারবে ভেবেছ? আমার থেকে তার চেয়ে ঢের বেশি গুছিয়ে নিতে পারবে।'

'বললাম তো ভেবে দেখি।'

তিনকড়ি গিরিশের কাছে উপদেশ চাইল।

গিরিশ এক বাক্যে নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'তুমি পাগল হয়েছ? টাকা—টাকা দিয়ে কী হবে? আসল—আসল হচ্ছে থিয়েটার। শিল্পসৃষ্টি।'

'কিন্তু ও যে আপনার বন্ধু।' মুখ টিপে হাসল তিনকড়ি।

'বন্ধু—তা কি করা যাবে? বন্ধুর চেয়ে

বাগানবাড়িকে তিনকড়ি প্রত্যাখান করে দিল। মাপ করুন, পারবো না।

'তাতে কী?' উদার হবার ভাব দেখাল বাগানবাড়ি : 'এখন না পারো, পরে পারবে। আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

বুঝল, প্রত্যাখানের মূলে গিরিশ। ঠিক করল গিরিশকে খুন করবে। গিরিশকে খুন না করলে তিনকড়ির পথ খোলসা হবে না।

মনের ছুরি মুখের মধু দিয়ে ঢাকল বাগানবাড়ি। সম্প্রীতির প্লাবনে গিরিশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে তিনকড়িকেও।

দু-তিনটে মাইফেল হয়ে গেল এর মধ্যে। কারু মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইল না বাগানবাড়ির মনের কোণে সাপ-খোপ আছে।

আবার একটা আসর বসাল—শেষ আসর। নাচ গান বাজনা—ফুল ফরাস ফরাসি। আর মদ—অপর্যাপ্ত মদ। বলতে পারো অতল বোতল।

অনেক ইয়ারবক্সি বন্ধুবান্ধব এসেছে। গিরিশ এসেছে। সঙ্গে চাকর ফকিরকে নিয়ে নটিনী তিনকড়ি।

শুধু রাজেন এখনো আসেনি।

'এই এল বলে।' বাগানবাড়ি আশ্বস্ত করল।

অন্যান্য দিন সমস্ত রাত ফুর্তি চলে, আজ কেন কে জানে বাগানবাড়ি হুকুম করেছে, রাত বারোটার মধ্যেই আসর শেষ হবে। সবাই চলে যাবে, শুধু গিরিশ থাকবে—তার সঙ্গে আছে একটা জরুরি পরামর্শ। আর সেটা যখন থিয়েটার-সংক্রান্ত, তখন তিনকড়িও থাকতে পারে ইচ্ছে করলে।

রাত প্রায় দশটায় রাজেন এসে হাজির।

সরাসরি উপরে উঠতে পা উঠল না। দেখল একটা গাছের নিচে কতগুলো কালো-কালো লোক ফিসফিস করে কি সব কথা কইছে।

চিনতে দেরি হল না। তুমি গোলাপ সিং ?

মোদো-মাতালের লাইনের মানুষ, গুণ্ডাদের সঙ্গে আলাপ রাখতে হয় একটু-আধটু। সেই সুবোদেই গোলাপকে চিনত রাজেন। কিন্তু এখানে, এ সময় দলবল নিয়ে ও উপস্থিত কেন ?

গোলাপ এগিয়ে এল দু'পা। নিম্নস্বরে বললে, 'রাত বারোটার আগেই চলে যাবেন।'

'কেন বলো তো ?'

বলব না বলব না করেও বলে ফেলল গোলাপ। তা ছাড়া রাজেন তো বাগানবাবুরই সাগরেদ।

ব্যাপারটা তেমন-কিছুই নয়, প্রায় জল-ভাত, এমনি ভাবের থেকে গোলাপ সিং বললে, 'আজ গিরিশ ঘোষকে খতম করব। ওকে খতম না করা পর্যন্ত তিনকড়ি বিবি বাবুর কবজায় আসছে না।'

'গিরিশবাবু কোথায় ?'

'ওপরে।'

'তিনকড়ি ?'

'তার খবর জানি না।'

দলের কে আরেকজন বললে, 'সেও ওপরে। সে না থাকলে আসর জমবে কেন ?'

'কিন্তু ফকির ?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল রাজেন : 'তাদের চাকর ফকির ?'

'এখানেই কোথাও ঘোরাফেরা করছিল—'

'তাকে তো কোনো ছুতো করে সরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'তা ঠিক বলেছেন।' গোলাপ সিং সায় দিল : 'ও ব্যাটা সাক্ষী হয় কেন ? ভালোয়-ভালোয় আগে থেকেই সরে পড়ুক।'

'তাই—' ফকিরকে এদিক-ওদিক খুঁজতে বেরুল রাজেন।

ঘাটের ধারে পেল তাকে নিরিবিলি।

'তুই এখুনি চলে যা।' রাজেন তাকে কাছে টেনে এনে আবছা গলায় বললে, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এনে পেছনে গলির মোড়ে চুপটি করে তুই অপেক্ষা কর। যতক্ষণ তোর বিবি আর গিরিশবাবু না আসে, ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি। দেরি হয়, গাড়োয়ানকে বেশি দিবি। দেখিস ঠিক থাকিস—'

দোতলায় আসরে উঠে এল রাজেন।

'কি হে, এত দেরি কেন ?' বাগানবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'বোসো, খাও গান শোনো।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রাজেন : গিরিশবাবু কোথায় ?'

'পাশের ঘরে। সঙ্গে তিনকড়ি। মনের সুখে অঢেল খাচ্ছে দু'জনে। বারোটা বাজবার আগে—' বাগানবাবু কথাটা শেষ করল না, নির্দোষ চোখে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল।

রাজেন পাশেই বসেছিল, হঠাৎ উঠে পড়ল।

'এ কি, পালাচ্ছ নাকি ?'

'না, না, কোথায় পালাব ?' যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে গায়ের দামি শাল ফরাসের উপর ফেলে গেল রাজেন।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখল—বাগানবাবু যা বলেছে—গিরিশ আর তিনকড়ি বসে আছে, সামনে আহার্য ও পানীয়।

'খাচ্ছেন তো, খেয়ে নিন।' রাজেন বললে পরিহাসের সুরে, 'কে জানে কাল জুটবে কিনা—'

'কেন, কী হয়েছে ?' চোখে মুখে আতঙ্ক, গিরিশের হাতের গ্লাশ কেঁপে উঠল।

'আসর উঠে গেলেও আপনি আর তিনকড়ি খানিকক্ষণ থেকে যাবেন তো ?'

'সেই রকমই তো কথা। বাবুর কী এক জরুরি পরামর্শ আছে।'

'জরুরি পরামর্শই বটে। শুনুন', রাজেন গলা প্রায় অনুচ্চারিত রেখে বললে, 'ঠিক করা হয়েছে, আসর উঠে গেলে, কেউ যখন থাকবে না তখন আপনাকে খুন করা হবে।'

এ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নয় তো ? গিরিশ অস্ফুটে চমকে উঠল : 'খুন ?'

'শুধু খুন নয়, লাশ-কে-ল্যাশ লোপাট করে ফেলা হবে।' রাজেন আরো ঘন হয়ে এল : 'বাগানে গর্ত খুড়ে লাশ পুঁতে দেওয়া হবে, আর তার উপরে একটা গাছ বসানো হবে। ঘাসের কাজ এমন পরিপাটি হবে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।'

'আর তিনকড়ি—তিনকড়ির কী হবে ?' ভয়ে আধখানা উড়ে গিয়েছে, তিনকড়ির দিকে তাকাল গিরিশ।

'ওরে কি আর মারবে ?' রাজেনও তাকাল : 'ওর তো বাঁচবার অস্ত্র আছে, ওর রূপ-যৌবন। কিন্তু আপনারই কিছু নেই। আপনিই নিরস্ত্র।'

'না, না, আমারও আছে।' গিরিশ উঠে দাঁড়াল।

'কী আছে ?'

'গুরুকৃপা।' গিরিশ এগুলো সিঁড়ির দিকে।

'কৃপা করে ও দিকে যাবেন না।' রাজেন বাধা দিল : 'নিচে সিঁড়ির মুখে চার চারটে গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে পথ নেই।'

'পথ নেই ?'

'একটা মাত্র পথ আছে। এ ঘরের পাশে বারান্দা দেখছেন, তার শেষে পায়খানা।' রাজেন দ্রুত নিশ্বাসে বলে যেতে লাগল : 'পায়খানার উত্তর দিকে যে জানলা তাতে গরাদ নেই। সেখান দিয়ে নেমে আমগাছের ডাল বেয়ে পাঁচিলের উপর পড়বেন। ব্যস, তা হলেই হল। পাঁচিলের বাইরেই রাস্তা। পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে রাস্তা পাবেন, আর সেই রাস্তা ধরে এগুলেই দেখবেন ফকির গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

গিরিশ হতাশ মুখে বললে, 'এর চেয়ে খুন হয়ে যাওয়া সোজা।'

'কিন্তু হতে দিচ্ছে কে? তা হলে দেখি, আমিই আপনাকে পিঠে করে নামাব। দেখি কতটা ওজন আপনার শরীরের ?'

গিরিশকে পাঁজাকোলে করে তুলল রাজেন। ভয়ে মানুষের শরীর ভারী হয়, গিরিশের হালকা হয়ে গেল। গিরিশকে নামিয়ে দিয়ে বললে, পারব নামিয়ে নিতে।'

'কিন্তু আমার কি হবে ?' তিনকড়ি প্রায় কেঁদে ফেলল।

'তোমার আবার কী হবে? তুমি বাগানবাড়ি আলো করে থাকবে।' রাজেন হাসল।

'অসম্ভব।'

'না, না, তোমাকেও নামিয়ে নেবে।' গিরিশ আশ্বাস দিল।

'তবে তার আগে ফরাস থেকে আমার শালখানা কুড়িয়ে নিয়ে এস।' রাজেন বললে, 'আমার যাওয়া চলবে না। আমি এখন ওখানে গেলেই বাবু আমাকে আটকে রাখবে, বেরুতে দেবে না। পালাবার প্ল্যান তা হলে বানচাল হয়ে যাবে। তুমি যাও, গিয়ে কায়দা করে তুলে নিয়ে এস। দেখব তুমি কেমন অভিনেত্রী।'

আসরে প্রবেশ করল তিনকড়ি। জমজমাট আসর। মত্তদোলে নৃত্যরোল চলেছে, চলেছে গীতবাদ্য। মদে প্রায় সকলে চুর। কে আছে কে নেই, কার আর তখন অত হিসেবের মাথা! যদি এসেছ তো বসে পড়ো, গড়াগড়ি দাও। এখুনি পালাবে কী? বারোটার এখনো ঢের বাকি।

মৃদু-মদির কটাক্ষে হাসল তিনকড়ি। এখনো শরীর যেন নৃত্যের মত উপযুক্ত তপ্ত হয়নি। বেশ একটু শীত শীত করছে না? কৌশলে শালটাকে কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াল। কার শাল কে জড়াল এসব কেউ লক্ষ্যেই আনল না। তিনকড়ি যা করে, শাল গায়েই রাখে বা ফেলেই দেয়, সমস্তই সাবলীল, সমস্তই অনবদ্য।

এই একটু আসি চাঙ্গা হয়ে—মৃদু-মদির কটাক্ষ বুলিয়ে তিনকড়ি উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

'কোথায় গেল তিনকড়ি ?'

'পাশের ঘরে। আরো খানিকটা টেনে আসতে।'

সকলে হেসে উঠল। সন্দেহ কী, তিনকড়ি ঢের বেশি সম্ভ্রান্ত। এ সব বাজার-বেপারী হেঁজিপেঁজিদের ভিড়ে বসে সে পানাহার করতে পারে না।

ঠিক বলেছ। তিনকড়ি যা-ই করে, বসে বা ওঠে, থাকে বা চলে যায়, সমস্ত সুন্দর। সমানসুন্দর।

'তা ছাড়া ঐ ঘরে তার নাটের গুরু, ম্যানেজার আছে।' বাগানবাবু বললে বিহ্বল কণ্ঠে।

'কে ম্যানেজার ?'

'শোনো, ম্যানেজারকে চেনে না ! সমস্ত থিয়েটারের চাবিকাঠি যার হাতে সেই ম্যানেজার একমেবাদ্বিতীয় গিরিশ ঘোষ।'

কিন্তু তিনকড়ি কি একটু বেশি দেরি করে ফেলছে না ? বাগানবাবু তাকাল ঘড়ির দিকে। মিনিট পনেরো হয়ে যায়নি কি ?

'আর রাজু ? রাজেন কোথায় ?' বাগানবাবুর সঙ্গে সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল।

'এখানে শাল রেখে গিয়েছিল, সে শালই বা কোথায় গেল ?'

'বোধহয় সেও পাশের ঘরে টানতে গেছে।'

'যাও, ওকে ধরে নিয়ে এস।' বজ্রকণ্ঠে হুকুম ছাড়ল বাগানবাবু।

কয়েকজন ত্বরিত পায়ে চলে গেল পাশের ঘরে। কই রাজেন কই ? তিনকড়িও বা কোন চুলোয় ?

'আর ম্যানেজার ?' বাগানবাবু আর্তনাদ করে উঠল।

ম্যানেজারও অদৃশ্য। ঘর ফাঁকা। শূন্যের চেয়েও শূন্য। ফকিরের আনা ঘোড়ার গাড়িতে করে তিনজন তখন বড় রাস্তায় এসে পড়েছে—গিরিশ, রাজেন, তিনকড়ি।

'কি, বলেছি না ? সমস্তই ভগবৎ-ইচ্ছা, ভগবৎ-কৃপা।' গিরিশ বিশ্বাসভরা চোখে তাকাল রাজেনের দিকে। বললে, 'মানুষ জপায়, বিধি মাপায়।'

বাগবাজারের কেদার বোস পাড়ায় 'কাট মামা' নামে খ্যাত, গিরিশের সঙ্গে চলেছে গাড়ি করে, আপার চিৎপুর রোড দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

হঠাৎ মদনমোহনতলার কাছাকাছি এসে কেদার বললে, 'ডাইনে সরু স্ট্রিট দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে গেলে আমার সুবিধে হয়।'

'না, না, যেমন যাচ্ছে তেমনি যাক।' গিরিশ আপত্তি করল : 'তোমায় ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেব।'

'ডাইনে দিয়ে গেলে আমার অনেক সময় বাঁচে।' কেদার ফের পিড়াপিড়ি শুরু করল।

'যিনি বাঁচাবার তিনি না বাঁচালে কিছুই বাঁচে না। সময়ও বাঁচে না।'

কেদার সরোষে বললে, 'এ সব আপনাদের প্রেজুডিস।'

'বেশ, তবে চলো, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।' গিরিশ গাড়িকে সরু স্ট্রিট

দিয়েই যেতে বলল।

সক্ স্ট্রিটের শেষে গঙ্গার দিকে যাবার পথের মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি পোর্ট ট্রাস্ট রেলওয়ে লাইন। ঐ লাইনের উপর একখানা মালবোঝাই ট্রেন দাঁড়িয়ে। রাস্তা বন্ধ।

গিরিশদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দেখলে তো?' গিরিশ বললে, এখন যাই কি করে?'

'দুচার মিনিটের তো ব্যাপার।' কেদার বিজ্ঞের মত মুখ করল : 'এখুনি লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

দু'চার মিনিটে লাইন ক্লিয়ার হল না। দশ-বারো মিনিটেও না।

'তখন বলেছিলাম না, তুমি-আমি কোনো কাজের কর্তা নই,—ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস, মানুষ জপায় বিধি মাপায়।' গিরিশ গম্ভীর হল : 'কী হে ফিরে যাবে, না, আরো সময় বাঁচাবে?'

নতমুখে কেদার বললে, 'ফিরে চলুন।'

কিন্তু বাগানবাড়ি কি সত্যি ছেড়ে দিয়েছে গিরিশ? সিঁথির বাগানবাড়ি বন্ধ হয়েছে সত্যি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ি অহোরাত্র খোলা। রাতের সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়েছে গিরিশ। কিন্তু এত রাতে কোন বাগান খোলা আছে গিরিশের জন্যে?

নিজের থেকেই বলে উঠল গিরিশ : 'শুধু রাসমণির বাগান খোলা আছে।'

চলো সেই বাগানে চলো। সেই বাগানেই মিলবে নতুন মদ, নতুন নেশা। নেশা কাটিয়ে দেবার নেশা।

দরোয়ানকে দিয়ে গেট খোলালেন ঠাকুর। এক হাতে গিরিশকে ধরলেন, আরেক হাতে তার সঙ্গিনীকে। বল হরিবোল হরিবোল। হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলেন তিনজনে। বল হরিবোল হরিবোল।

'সুরা পান করি নে রে সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমায় মন মাতালে মাতাল করে
মদ মাতালে মাতাল বলে॥'

আরেক নেশা পেয়ে বসল গিরিশকে। মদ ছাড়া যায় কিন্তু হরিরসমদিরা ছাড়া যায় না। চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী। মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥

ঠাকুর বললেন, 'ছেলে বলেছিল, বাবা, তুমি একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে। বাপ খেয়ে বললে, তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

'হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।
একবার লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে॥
হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে॥'

আর গিরিশের নিজের গান শোনো :

'যদি শরণ নিতে পারি রাঙা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায় ॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায় ॥
যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে
অভয় চরণ তার তরে আছে।
ডাকো পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায় ॥'

'অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই হীনস্থানে জন্ম হয়েছে।' গিরিশকে বললে তিনকড়ি, 'বলতে পারেন কী হলে এই জন্মযন্ত্রণা শেষ হবে ?'

'শুধু তাঁকে ডাকো। তিনি পতিতপাবন, তিনিই পতিতাকে পায়ে স্থান দেবেন।' বললে গিরিশ।

'কত ভালো ভালো লোক তাঁকে ডাকছে', তিনকড়ির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে: 'তার মধ্যে আমার মত দীনহীনার ডাক কি তিনি শুনতে পান ?'

'নিশ্চয়ই পান। নইলে তোমার চোখে জল কেন ?' বললে গিরিশ, তাঁর কাছে পাপী-তাপী নেই, দীন-হীন নেই। এমন কোনো পাপ নেই যা হরিনামে না স্খালন হয়। হরিনামই হরি।'

হরিনামকীর্তনই ভক্তিরাজ্যের মহারাজচক্রবর্তী। 'কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার ॥'

'হেন পাপ নেই যা করি নি।' বলছে গিরিশ, 'কিন্তু আমি যে আমি, আমিও তরে গেলাম। যদি জানতাম তরে যাব তা হলে আরো পাপ করে নিতাম।'

নিরঞ্জনানন্দ স্বামী এসে বললে গিরিশকে, 'ঠাকুর তো তোমাকে সন্ন্যাসী করেছেন, ঘরে থেকে আর করবে কী ? চলো দুজনে কোথাও চলে যাই।'

গিরিশ বললে, 'তোমরা ঠাকুরের সন্তান, তোমরা যা বলবে তা ঠাকুরেরই কথা জ্ঞান করে আমি করতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছে করে আমার সন্ন্যাসী হবার ক্ষমতা নেই, কারণ ঠাকুরকে আমি বকলমা দিয়েছি।'

'তবে আমি বলছি, চলে এস।'

'চলো।' নগ্নপদে একবস্ত্রে বেরিয়ে এল গিরিশ। মিলল, সন্ন্যাসী গুরু-ভাইদের সঙ্গে।

কিন্তু যাই বলো, গিরিশ কি পারবে ভিক্ষাটনের ক্লেশ সহ্য করতে ? আর-আর সন্ন্যাসীরা লাগল বলাবলি করতে। পারবে না, এ বয়সে পারবে না। শরীর শেষ হয়ে যাবে। ওর মত বিশ্বাসী ভক্তের কী দরকার আছে ঘর ছাড়ার ? তার চেয়ে চলো জয়রামবাটিতে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসি।

তবে তাই চলো।

'সিরাজদ্দৌলা'র পর 'মীরকাশিম' লিখল গিরিশ।

সারদানন্দ স্বামীকে লিখছে : 'যতদিন কলকাতায় আছ রোজ একবার করে আসবে। তোমাদের দেখলে ভালো থাকি। অনেকদিন ঠাকুরের কথা হয়নি। মীরকাশিম নাটক লিখছি, কেবল ষড়যন্ত্র, কেবল ষড়যন্ত্র। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।'

'মীরকাশিমে' নবাবের ডাক্তার ফুলারটনের প্রাণদণ্ড রহিত হল। মুক্ত হয়ে আক্ষেপ করতে লাগল ফুলারটন। বললে, 'বাউটনও ইংরেজ ডাক্তার ছিল। সম্রাট সাজাহানের মেয়েকে চিকিৎসা করে আরোগ্য করেছিল। বদান্য বাদশা তাকে পুরস্কার দিতে চাইল। বাউটন অনায়াসে ক্রোরপতি হতে পারত কিন্তু সে নিজের জন্যে কিছু চাইল না। ট্রু-বর্ণ ইংলিশম্যান নিজের স্বার্থ না দেখে জাতের স্বার্থ দেখলে। ইংরেজরা যাতে বিনাশুল্কে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারে তারই সনদ চেয়ে নিল। আমিও ইংরেজ ডাক্তার, আমিও চিকিৎসা করে নবাবের বেগমকে আরাম করলাম, কিন্তু আমার ভাগ্যে এ কোন পুরস্কার! স্বদেশবাসীদের হত্যা দেখবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে, আমার প্রাণদণ্ড মকুব করে দিলে।'

আর হে-সাহেব বলছে : 'হামরা ঘরের মধ্যে ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, ডুয়েল লড়ে, লেকিন, দুসরা যখন দুষমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। ইণ্ডিয়া হামাদের সব শিখিতে পারিবে, এইটা কখনো শিখিতে পারিবে না। জাতের দুষমন সবার দুষমন, এ ইণ্ডিয়ান লোক কখনো শিখিবে না।'

গিরিশকে হাঁপানিতে ধরল। শীতকাল, অসুখে পঙ্গু অবস্থায় ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে গিরিশ, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ এসে ধন্না দিয়ে পড়ল : 'আমাদের একটা নতুন নাটক লিখে দিন।'

গিরিশ বললে, 'আমার শরীরের এই হাল—'

তা কোন তারা না দেখছে! কিন্তু গিরিশের মনের বলের খবর তো কারুই অজানা নয়।

'সব থিয়েটারেই নতুন বই হচ্ছে। শুধু আমরাই কিছু করতে পারলাম না।' কর্তাব্যক্তিরা বিষাদের সুর ধরল।

'যান, ভাববেন না। যা হোক একটা করে দেব।' মনের জোরেই আশ্বাস দিল গিরিশ।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের নাটক অবলম্বন করে একটা প্রহসন দাঁড় করিয়ে দিল। নাম রাখল 'য্যায়সা-কা ত্যায়সা'।

মেয়ে পর হয়ে যাবে সেই ভয়ে বাবা মেয়ের বিয়ে দেবে না ঠিক করেছে। বলছে, 'বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশ হাজার গয়না, হীরে-মানিক সোনা-রুপোর খাট-বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি। চোর-দায়ে ধরা পড়েছি—সাদি নেহি দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে কভি

নেহি দেঙ্গা! জাত যাঙ্গা? যাঙ্গা। বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের বেটা নবাব জামাই বাড়ি নিয়ে যাবেন! আবার দান-সামগ্রী দাও, টাকা দাও,—সে পাত্র আমি নই। সে পাত্র আমি নই।'

তারপর মেয়ের অসুখ করেছে। যত রকম চিকিৎসক আছে আসছে। গোবৈদ্য ভেটারিনারি, বেদিনী, জোঁকওয়ালি, ধাত্রী—এমনকি ড্রেসার পর্যন্ত। তারপর এল হাকিম আর কবরেজ। রাহু-কেতু কাটল তো এল দুই য়্যালোপ্যাথিক ডাক্তার—শনি আর মঙ্গল। এ রোগের নাম বলে 'ক্যাকহেকসিয়া', ও বলে, 'য়্যাসফিকসিয়া।' এ বলে বমি করান, ও বলে জোলাপ দিন! তুমুল ঝগড়া। তারপর ওরা গেল তো এল হোমিওপ্যাথ।

'দাঁড়ান, বই খুলে সিমটম মিলুচ্ছি।' হোমিওপ্যাথ বলছে, 'বলতে পারেন শুয়ে ক'বার পাশ ফেরে? ভ্রূর উপর মাছি বসে কি না?

বাড়ির ঝি বলছে, 'আমি বলছি। ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কামড়ালে গা চুলকোয়, মাছি বসলে তাড়ায়—আর তোমার মত ডাক্তার পেলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।'

প্রহসন ছেড়ে গিরিশ আবার চলে গেল ঐতিহাসিকে। এবার শিবাজীতে। লিখল 'ছত্রপতি শিবাজী'। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার ডাক। দেশবাসীকে একত্র করো, আর কিছুতে না পারো, দেশমুক্তির ঐকান্তিক স্পৃহায় সকলকে একসূত্রে বাঁধো, তারপর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। মরতে হয় তো মরো, সর্বস্ব ত্যাগ করো, যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতাকে কায়েম করো।

তাই করল শিবাজী! রামদাস স্বামী তাকে আশীর্বাদ করল: 'যেখানেই স্বাধীনতার অভ্যুদয় সেখানেই তোমার উৎসব হবে, সেখানেই তুমি অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করবে। আর তোমার সম্মানে আমিও সম্মানিত হব।'

ইংরেজের এ নাটক ভালো লাগল না। বাজেয়াপ্ত করল।

তেমনি 'সৎনাম' বন্ধ হল মুসলমানদের আন্দোলনে। আওরঙ্গজেবের জিজিয়া-করের বিরুদ্ধে সৎনামী হিন্দুদের বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে এই নাটক! তেজস্বিনী রাজপুতরমণী বৈষ্ণবী এই বিদ্রোহের নেত্রী, তারই প্ররোচনায় মাঠ ছেড়ে সব চাষাভুষো সৈন্য হয়ে গিয়েছিল। শেষে বাদশাহ হিন্দুসেনাপতি বিষণ সিংহের কাছেই পরাস্ত হ'য়ে গেল।

ফকিররাম ছিল সৎনামীদের 'রুদ্র অবতার হনুমান।' নগরবাসী হিন্দুদের বলছে, 'ধর্মের ভান করে হিন্দুদের হৃদয়ে ভীরুতা বাসা বেঁধেছে। যদি বলবান হতে তবে তোমার মার্জনার অর্থ থাকত। তা নয়, তোমার মার্জনা ভয়ে, মুসলমানদের কাছে পরাভূত হবে এই ভয়ে মার্জনা। দেখ কি ভীরুতা। সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পুড়তে চাচ্ছ অথচ তার সম্মুখীন হতে সাহসী হচ্ছ না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কী পরিচয় দেবে? ? হায়, মাতৃভূমির দুঃখে শোণিত দান করে এমন একজনও সর্বত্যাগী নেই।'

'দুর্বল হৃদয়ে কাঁদিব কেন?' বলছে বৈষ্ণবী, 'নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন,

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন, আমি মোগল বধ করব।'

ধর্মগুরু মহান্তকে ফকিররাম ব্যঙ্গ করছে : 'কেন মহান্তজী, তোমরা তো ঢোল করে শিক্ষা দিচ্ছ নির্বাণ লাভ করো, যদি কেউ মারে সে কিছু নয়, সে স্বপ্নমাত্র। বাড়ি কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন, কিছু নয়—মায়া। শুধু নির্বাণ হওয়ার চেষ্টা করো।'

'আচ্ছা ফকির, তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ', বলছে মহান্ত, 'কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?'

'কে বলে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা!' বলছে ফকিররাম, 'মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জানতেন, অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুষ্যাকারে গাছ-পাথর হবে, জড়ের মত সকল অত্যাচার সহ্য করবে, বিচলিত হবে না, তা হলে বোধহয় তাঁরা শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন আর তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। আপনার কি ধারণা যে হিন্দুরা সব সত্ত্বগুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়, চোখ খুলে দেখুন, দেশ ঘোর তম-তে আচ্ছন্ন, অলস কুম্ভকর্ণের মত জড় হয়ে পড়ে আছে। রজোগুণ ছাড়া তমোগুণ নাশ হবার নয়। জড় তমোগুণের কি চৈতন্য আছে? আমাদের চেয়ে মুসলমান শ্রেষ্ঠ, তারা তম-তে আচ্ছন্ন নয়, তারা রাজোগুণী বীরপুরুষ। জড় অলসেরা নয়, বীর রজোগুণীরাই সত্ত্বগুণ লাভ করতে পারে।'

এ সব যেন বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

কুড়ুলগাছির জমিদার শরৎ রায় এমারেল্ড থিয়েটার কিনে বসল। গিরিশকে বললে, 'আপনি চালান। আপনি ম্যানেজার হোন।'

'কত দেবে?'

'চারশো টাকা মাইনে আর বোনাস দশ হাজার টাকা।'

মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে গিরিশ চলে এল এমারেল্ডে। এমারেল্ডের নতুন নাম হল কোহিনুর। গিরিশের তত্ত্বাবধানে প্রথম বই নামল ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি। প্রথম রাত্রেই দারুণ সাফল্য। প্রায় আড়াই হাজার টাকার টিকিট বিক্রি। কিন্তু সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হল না। ছ'মাস যেতে না যেতেই শরৎ রায় মারা গেল। গিরিশেরও হাঁপানি বাড়ল। শরতের ভাই শিশির এসে হাত ধরতে চাইল, এসেই গিরিশের মাইনে বন্ধ করলে। হাঁপানির রুগী, কত আর সক্ষম হবে ম্যানেজারিতে। তার উপর তিন মাস একটাও নাটক লেখেনি।

দাঁড়াও 'ঝান্সির রানী' লিখে দিচ্ছি।

কথাটা রাষ্ট্র হতেই পুলিশের কানে গেল। উঁচুস্তরের এক কর্মচারী গিরিশের সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, 'ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন না। ছত্রপতি শিবাজী বন্ধ হয়েছে, সিরাজদ্দৌলা আর মীরকাশিম বন্ধ হয়েছে, এটারও সেই দশা হবে। আপনার কলম তো কলম নয়, আগুনের চাবুক। ইংরেজের মর্মশূল।'

'বেশ, তা হ'লে সামাজিকই লিখব।'

তিন মাসে চার অঙ্ক শেষ হয়েছে, গিরিশের চেতন হল, মাইনে পাচ্ছে না।

'মাইনে কই ?'

শিশির এক বিন্দুও ঝরল না। গিরিশ তখন কোর্ট করলে। ডিক্রিজারিতে আদায় করল বকেয়া পাওনা। কোহিনুর ছেড়ে আবার ফিরে এল মিনার্ভায়। মাইনে চারশো আর নীট লাভের পঞ্চমাংশ। 'শান্তি কি শান্তি' লিখল।

'এক জীবনে এত হয় ?' নাটকের নায়ক প্রসন্নকুমার বলছে, 'এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারির আবাসে ভিখারিনি, ফৌজদারি আদালতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, হৃদিভঙ্গ হয়ে স্ত্রীর মৃত্যু, রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়, যারা পদলেহন করেছে তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে আপনাদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়, হাতে হাতকড়ি, বিমল পুত্র-বধূকে বর্বরে টেনে আনে, খুনে অপবাদ দেয়—এক জীবনে কি এত হয় ?'

মদ নেই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই—প্রসন্নকুমারের শান্তি কোথায় ? আশ্চর্য, মৃত্যু তো আছে। যদি মৃত্যুও না থাকত ! এমন যদি হয় এই ভূতের রাজ্যে যদি আকস্মিক অমর হয়ে থাকে প্রসন্নকুমার ! মৃত্যু দুর্বিষহ, আবার মৃত্যু সুখবাহ ! ভাগ্যিস মৃত্যু বলে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ! নইলে সবাই যখন এখানে এলোমেলো তখন একজন যদি ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকত চিরকাল ! সেটি হবার নয়। হে ঈশ্বর, তোমার কি করুণা, প্রসন্নকুমার মরবে।

একদিকে এই ট্রাজিডি, অন্যদিকে আবার প্রহসন !

এংলো-বাংলোদের নিয়ে গান হচ্ছে :

'এরা বাছা বাছা সাচ্চা জানোয়ার।
দিশি কি বিলিতি ছাঁচে আঁচে বুঝে ওঠা ভার।
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতি কচুর গোড়া, দৌড়টা খুব চটকদার ॥
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে, বেরিয়ে এল জাহাজ চ'ড়ে।
কে জানে কে খেল্ শেখালে খেল্ খেলে খুব চমৎকার ॥
ইটি ঠিক বাঁদর খাঁটি ভিরকুটিতে পরিপাটি,
এক ধরনের জন্তু কটি, এরও নাচের বেশ বাহার ॥
গাধা কিন্তু ছিল হেথায়, ধাত পেয়েছে গা ঘসে গায়,
এখন আর ওকে কে পায়, গাধার হয়েছে সরদার ॥
আধ-বিলিতি আধ-দিশি ঢং দোআঁসলা নাচন-কোঁদন,
ভাবি তাই লেজ কেন নাই, এইটি তো ভুল বিধাতার ॥'

রোগের প্রকোপ বেড়ে চলল, গিরিশ হাওয়া-বদলের জন্যে চলে এল কাশীধাম। কোথায় নিজের অসুখ সারাবে তা নয়, অন্যের অসুখে হোমিওপ্যাথি করতে লাগল। গিরিশের নাম তার তখন গিরিশ নেই, নাম এখন 'ডাক্তার-সাব্'।

'দেখ অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনো মমতা নেই,' নিজের সম্পর্কে

বলছে গিরিশ : 'এই দেহের পুষ্টির জন্যে কত তাকে উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে সাজিয়েছি গুজিয়েছি—এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানিকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে। সত্যিই আমার প্রাণের ইচ্ছে নয় যে এ রোগ সেরে যায়। হাঁপানির প্রত্যেক টানে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জগদীশ্বর, তুমি মঙ্গলময়, যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিশ্বাস থাকে।'

পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলে, 'ঈশ্বরলাভের খেই কোথায় ?'

মহাদেব বললে, 'বিশ্বাসই এর খেই।'

'বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'ল।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই।'

হ্যাঁ, আমার মা আছেন আর আমি আছি, শুধু এই বিশ্বাস।

'আর আমার মা আনন্দময়ী।' বলছেন ঠাকুর, সংসারে তাঁর নিত্য উৎসব চলেছে। যেন সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিরানন্দ হয়ো না। ঐহিকের সুখ-দুঃখ আছেই, তা থাকুক। আমাদের মা আছেন, আনন্দ করো ঝি এর ছেলে ভালো খেতে পায় না, পরতে পায় না, বাড়ি নেই, তবু বুকে জোর আছে,তার মা আছে। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা তো নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কী হবে। কোথায় যাব, সব মা জানেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার হয় মা জানাবেন। অত কে ভাবে! মায়ের ছেলে শুধু আনন্দ করো।'

ঈশান মুখুজ্জে এসেছে।

ঠাকুর বলছেন, 'ঈশানের খুব বিশ্বাস। বলে, একবার যে দুর্গা নাম করে বাড়ি থেকে যাত্রা করে তার সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। বিপদে ভয় কি ? শিব নিজে রক্ষা করেন। হ্যাঁ, সত্যি কথা। শুধু বিশ্বাসেই তাকে পাওয়া যায়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

যেমন গিরিশ পেয়েছে।

রোগ আছে, উপশমও আছে। রোগ আমার স্বকৃতকর্মের বিপাক কিন্তু উপশমই ঈশ্বরের করুণা।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গিরিশকে বললে, 'পাপের জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্তবিধির এই উদ্দেশ্য।'

গিরিশ মৃদু হাসল। বললে, 'প্রার্থনার আগেই তো তিনি ক্ষমা করে বসে আছেন। সংসারের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের অপরাধ হচ্ছে। তিনি দোষ গ্রহণ করলে মানুষের সাধ্য কী এক মুহূর্ত স্থির থাকে।'

দূর-দূরান্তর থেকে রুগী আসে গিরিশের কাছে, কত জটিল-কুটিল রোগ, 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ তুলে এক ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছে, তাইতেই রোগের আরাম।

রামকৃষ্ণই কল্পতরু।

গিরিশ ঠাকুরের কুষ্ঠি দেখছে।

'আপনার কুষ্ঠি দেখছি।'

ঠাকুর বললেন, 'দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি চন্দ্র বুধ—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নেই।'

'কুম্ভ রাশি কর্কট আর বৃষ', বললে গিরিশ, 'রাম আর কৃষ্ণ। সিংহের চৈতন্যদেব।'

'দুটি সাধ ছিল, প্রথম ভক্তের রাজা হব, আর দ্বিতীয় শুঁটকে সাধু হব না!'

'আচ্ছা আপনার সাধন করা কেন?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'শিবের জন্যে ভগবতীকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল,' বললেন ঠাকুর, 'পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা, সূর্যের দিকে চেয়ে থাকা একদৃষ্টে। স্বয়ং কৃষ্ণ রাধামন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। ব্রহ্মযোনি, তাঁরই পুজো, তাঁরই ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকেই কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।'

যেদিন কল্পতরু হলেন জিজ্ঞেস করলেন গিরিশকে, 'তুমি যে অত কথা যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছ আমার মধ্যে তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?'

সকলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল গিরিশ। হাত জোড় করে গদগদস্বরে বললে, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি আর কী বলতে পারি।'

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। দিব্যদীপ্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হল।

গিরিশ চেঁচিয়ে উঠল: 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

ঠাকুরের অসুখ ভীষণ বেড়েছে, কিন্তু কই গিরিশ তো তাঁকে দেখতে আসে না।

সেই একদিন এসেছিল, এসে হিসেবের খাতা পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। গৃহী-ভক্তদের আনাগোনা বাড়ছে বলে খরচও বেড়ে যাচ্ছে, সন্ন্যাসী ভক্তরা অত কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তারপর হিসেবের খাতা লেখা—এ তাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা সেবা করবে, টাকা-পয়সার ধার ধারবে না।

গিরিশের কাছে খবর গেল। গিরিশ এসে হিসেবের খাতা পুড়িয়ে ফেলল। বললে, 'মাস খরচায় যা বাকি পড়বে তা আমি দেব।'

টাকা দিচ্ছে বটে কিন্তু আসছে না একটিবার।

'আসবে কি রে' ঠাকুর বললেন কাতর মুখে, 'সে যে আমার যন্ত্রণা দেখতে পারে না।'

ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন কে এক ভক্ত গিরিশকে খবর দিতে এল।

গিরিশ বললে, 'মিথ্যে কথা। ঠাকুরের মৃত্যু নেই।'

'আমি যে মশাই সেখান থেকে আসছি।'

'সেইখানেই তবে ফিরে যাও।'

'আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলুম।'

'তোমার যা খুশি তুমি বলো।' গিরিশ চোখ ঢাকল: 'আমি দেখিওনি, বিশ্বাসও করি না।'

শেষ শয্যায় ঠাকুরের একখানি ছবি কে নিয়েএসেছে গিরিশের কাছে। গিরিশ আর্তনাদ করে উঠল : 'ও ছবি আমি দেখব না।'

নরেন এসেছে। ঠাকুর সম্পর্কে গিরিশের রচিত গান গাইছে ললিত সুরে :

'দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে
কে রে ওরে দিগম্বর, এসেছে কুটির-ঘরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছে একা
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে।।
ভূতলে অতুলমণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতর।।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদি পরে।।'

ঐতিহাসিক নাটক পুলিশে পাশ করানো কঠিন, তাই গিরিশ 'শঙ্করাচার্য' লিখলে। নাটক উৎসর্গ করল যৌবনসুহৃদ কালীপদ ঘোষকে বা দানাকালীকে। লিখল : 'আমরা উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ তুমি নরদেহে আমার শঙ্করাচার্য দেখলে না।'

ব্রাহ্মণপণ্ডিত গিরিশকে লিখে পাঠালেন : 'যিনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্মমর্ম জলের মত বুঝিয়ে দিলেন তিনি যে ঈশ্বরানুগৃহীত তাতে আর সন্দেহ নেই।'

২৫

কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে শঙ্করাচার্য স্নান করতে এসেছে। দেখল একটা চণ্ডাল কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পৃশ্য চণ্ডাল। শঙ্কর বললে সরে যেতে।

চণ্ডাল সবিস্ময়ে বললে, 'আরে কেমনধারা বাৎ বলে রে? কে কাকে কোথায় সরতে বলছে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে। সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দরূপটা চেনে না, চৈতন্যকে ফারাক করে। ও কেমন মানুষটা রে? ওর আক্কেলটা তো দেখি না।'

শঙ্কর তো স্তম্ভিত। নিজের মনে প্রশ্ন করছে : 'কে এ চণ্ডাল? এ যে বেদনির্ণীত বাক্য প্রয়োগ করছে! সত্যিই তো, অসঙ্গ সৎ অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর তো ভেদ নেই।'

'আরে থোড়া-থোড়া আক্কেল বুঝি আসছে রে কেলো!' সঙ্গের কুকুরকে সম্বোধন করে বললে চণ্ডাল, 'বল তো—গঙ্গাজীতে সূর্য আর হাঁড়িয়ার সরাপে যে সূর্য চমকে, ও কি জুদা সূর্য? ও বাৎটা বোঝে না। বোঝে না সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির বিচে আকাশটা জুদা-জুদা বলছে। ও তো ফারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?'

'আরে কে বটে রে—কে বটে?' ঘাটে কতগুলো দলের স্ত্রীলোক ছিল, কোলাহল করে উঠল।

'কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল—এ সন্ন্যাসী, ও কি বলে রে?' চণ্ডাল বললে, 'আঁধারে এককে নানান দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে। এক জানে না, জুদা জুদা জানে।'

শঙ্করের চৈতন্যোদয় হল। এক ব্রহ্মই তো সর্বঘটে অধিষ্ঠিত। সন্ন্যাসী-চণ্ডালে প্রভেদ কোথায়? শ্মশানে-ভবনে তৃণে-হিরণ্যে পরে-আপনে সর্বত্রই সেই এক অদ্বৈতপুরুষ। বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ চিনল শঙ্কর, চণ্ডালবেশী মহাদেবের স্তব করতে লাগল।

'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশি।
মান-অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে
বোম ভোলা বলে কেন, নাও না যেচে যা খুশি।
যা ফেলে দেছে নেয় সে বেছে ভাল মন্দ নাই হুঁস-ই॥'

তারপরে গিরিশ 'অশোক' লিখল। তারপরেই 'ঝকমারি'!

'ঝকমারি'র প্লট অবিনাশ গাঙ্গুলির। প্লট শুনে গিরিশ বললে, 'তুমি-ওটা নিয়ে একটা প্রহসন লেখ।'

'কিন্তু গান?'

'গান আমি বেঁধে দেব।'

অবিনাশ নাটক লিখে নিয়ে এল গিরিশের কাছে। গান বাঁধতে গিয়ে গিরিশ দেখল আমূল সংশোধন দরকার। প্রায় খোল-নলচে বদলে গেল গিরিশের হাতে। মিনার্ভায় নামাবার আগে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল এ প্রহসন গিরিশের রচনা। এ জালিয়াতি সহ্য করল না গিরিশ। বই ছাপা হলে ভূমিকায় সত্যকথা প্রকাশ করে দিল। গানগুলো আমার বটে, গল্পাংশ ও সংলাপ মূলতঃ অবিনাশের। প্রস্তাবনায় আড়খেমটায় কবির সুরে গান হচ্ছে:

'ভিটে বেচে পথে যদি বসতে চাও।
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও।
বলে দিই তোমায়, শামলা যার মাথায়,
ধরবে গে তার পায়, ভিটে বেচবার বাতলাবেন উপায়,
গামলা ভরে ছোবড়া দেবে, যত পারবে তত খাও॥
জয়েণ্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশি আর
পার্টিসন সুট লাগিয়ে দাও দেদার—
বউগুলো হন্নে হয়ে, হাড়মাস ফেলবে খেয়ে
বাধিয়ে দেবে ঠিক ভেয়ে-ভেয়ে—
রয়েছে পাওনা দেনা রাখবে জেদ—মেটাবে না,
গ্রাটিসে পেঁয়াজ-পয়জার মরদ হও তো কিনে নাও॥'

মামলার সাক্ষীরা গান গাইছে :

'আমাদের তালিম দিতে হয় না আর
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর
ঘাড়ে চেপে বসি যার ॥
জোটে না মুড়ি ঘরে, মোণ্ডা ফেলি থু-থু করে,
বসি যে বায়না ধরে, পেতে দেরি হয় না তার ॥
ধুতিচাদর কামিজ জুতো, সেমিজ শাড়ি মিহি সুতো,
চোখ রাঙানি দিই পেলে জুতো—
উড়ছে মজা আফিং গাঁজা, দুধে বাটা সিদ্ধি তাজা
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা—
কাণ্ট্রিলিকার ঢালো দেদার
চাট খেয়ে নাও যে সখ যার ॥'

তারপরেই শেষ গান :

'মামলা করা ঝকমারি
সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো, দেখতে পেলে কাছারী !
মামলায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে
ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে,
সাক্ষী আমলা, মোক্তার শামলা, তেলা হাত চাই সবারি ॥
কাছারির মাটি হাঁ ক'রে, চলতে গেলে কামড়ে পা ধরে,
চালচুলো সব পোরে উদরে—
লাগলে পরে ছাড়ে নাকো আইনের ভেল্কি ভারী ॥
ছাড়লে তো হাড়ীর বেহাল, জিত হলে সমান নাকাল,
ধুয়ে খাও ডিক্রি নিয়ে, মামলাকে বলিহারি ॥'

'তুই কে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে প্রণাম করে চোখ চাইতেই গিরিশ দেখল একটি ছোট মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে গিরিশ : 'কে তুই ?'

'আমি তারা।' উজ্জ্বল চোখে বললে সেই মেয়ে।

'তুইই বুঝি সরলা-নাটকে গোপাল সাজিস ?' মেয়েটার মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখল গিরিশ।

'হ্যাঁ,' আনন্দে উছলে উঠে তারা বললে, 'তার আগে নসীরামে ভীল বালক।'

তারাসুন্দরী অমৃত মিত্রের আবিষ্কার। অমৃত মিত্রকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'এই মেয়েটাকে যত্ন করিস, এর মধ্যে জিনিস আছে।'

এই তারাসুন্দরীই সিরাজদ্দৌলায় জহরা, ছত্রপতি শিবাজীতে লক্ষ্মীবাঈ, অশোকে পদ্মাবতী, হরিশ্চন্দ্রে শৈব্যা, রিজিয়ায় রিজিয়া, চাঁদবিবিতে চাঁদবিবি।

এই তারাসুন্দরীকেই সারদামণি বললেন, 'তোমার থিয়েটারের একটা বীরভাবের পার্ট আবৃত্তি করে শোনাও।'

তারাসুন্দরী শোনাল আবৃত্তি করে। আর তিনকড়ি গান গেয়ে শোনাল। সেই বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর গান—'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।'

এরা, তারাসুন্দরী আর তিনকড়ি, ঠাকুর-ঘরে ঢোকে না, মাঠাকরুনের পা-ও স্পর্শ করে না। গলবস্ত্র হয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে। মা তাদের প্রসাদ দেন, পান দেন। প্রসাদের উচ্ছিষ্ট জায়গা তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে, মার হাতের পান আলগোছে নেয় যাতে না ছোঁয়া লাগে।

'এদেরই ঠিক-ঠিক ভক্তি।' ওরা চলে গেলে বললেন সারদামণি, 'যেটুকু ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে। আহা, কি সুন্দর গান শোনাল তিনকড়ি! আর তারাসুন্দরী কি সুন্দর পাঠ বললে।'

কালীঘাটে কালীদর্শনের পরে নকুলেশ্বরের দিকে যাচ্ছেন, গৈরিকপরা এক ভৈরবী ত্রিশূল হাতে মায়ের পথরোধ করে দাঁড়াল। চকিতে গান ধরল : 'কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা, বল মা তাই।'

সঙ্গে যারা ছিল তাদের কাউকে মা বললেন ভৈরবীকে পয়সা দিতে।

ভৈরবী বললে, 'যার কাছে যা নেবার তাই নিতে হয়, মা। তোর কাছে যা নেবার তা আমি নিজেই নেব। তুই যেখানে যাচ্ছিস, যা।'

মা চলতে শুরু করলেন। দেখলেন ভৈরবী রাস্তা থেকে মায়ের পায়ের ছোঁয়া ধুলো তুলে মাথায় দিতে দিতে চলে গেল।

কী রকম আনমনা হয়ে গেলেন মা। বাসায় ফিরে এসে সন্তান-সেবকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ভৈরবীটি কে?'

সেবক বললে, 'গিরিশবাবুর থিয়েটারের কেউ হবেন বোধহয়। এখন ঐ রকম হয়ে গিয়েছেন।'

কিন্তু গিরিশ কী রকম হল? গিরিশ জয়রামবাটি গেল মায়ের কাছাকাছি হতে। সঙ্গে তিন সন্ন্যাসী—বোধানন্দ, প্রবোধানন্দ আর নির্ভয়ানন্দ। আর এক রসুই বামুন আর চাকর।

মাকে গিরিশ প্রথম কবে দেখে?

বাড়ির ছাদে সস্ত্রীক বেড়াচ্ছে গিরিশ, হঠাৎ তার স্ত্রী বলে উঠল : 'ঐ দেখ, বলরামবাবুদের বাড়ির ছাদে মা দাঁড়িয়ে।'

প্রতিবেশী বলরাম বোস। এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির ছাদ স্পষ্ট চোখে আসে। স্ত্রীর কথায় মুখ ফিরিয়ে নিল গিরিশ। বললে, 'না, না, আমার পাপনেত্র, ছাদ থেকে লুকিয়ে মাকে দেখব না। না, দেখব না।' বলতে বলতে ছুটে নেমে গেল নিচে।

তারপর বরানগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে যখন ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তখনও মা'র মুখ দেখেনি গিরিশ, দেখেছিল শুধু পা দুখানি। কিন্তু আজ জয়রামবাটিতে সকালে স্নানান্তে ভিজে কাপড়ে মাকে প্রণাম করতে এসে কী দেখল? দেখল জগজ্জননী তাঁর সম্পূর্ণ মুখ তুলে বদান্য প্রসন্নতায় নিজেই তাকিয়েছেন তার দিকে।

'এ্যা, মা, তুমি ?' গিরিশ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এ যে সেই মূর্তি যাকে ঘোরতর অসুখের সময় স্বপ্নে দেখেছিল গিরিশ, তার মুখে মহাপ্রসাদ দিচ্ছেন, যে প্রসাদ খেয়ে সে নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। সেদিন শরীরের রোগ সারিয়েছিলেন, আজ বুঝি জীবনের রোগ, জন্মজন্মান্তরের রোগ সারাতে এসেছেন। করুণার সুধাপদ্ম, মাতৃমুখখানি নিজেই উন্মোচিত করেছেন।

'মা, তুমি আমার কী রকম মা ?' আকুল অশ্রুতে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।'

মা বললেন, 'আমি তোমার সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি মা, সত্যিকারের মা।'

দয়ারূপা দয়াদৃষ্টি দয়ার্দ্রা দুঃখমোচিনী। আমি তোমার অকিঞ্চন প্রজা, তোমার অকৃতী তনয়। হেন পাপ কাজ নেই যা করিনি, হেন নেশা নেই যাতে মজিনি—বলছে গিরিশ—তবু ধুলো কাদা মুছে মা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। এ আমার গৌরব নয়, আমার মায়ের গৌরব।

'আমি পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি রে ? ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, পাহাড় উড়ে যাবে।'

কী কী নেশা করেছেন ? একজন অন্তরঙ্গ জিজ্ঞেস করল গিরিশকে।

'তামাক ঢের খেয়েছি, ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক ? মদ গাঁজা আফিং চরস চণ্ডু ভাং—কী নয়, কোনটা বাকি আছে ?'

'মদ ?'

'বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন তো বাইশ বোল বিয়ার গিলেছিলাম। মদে কী হয় জানো ? জোর করে মনকে ধরে রাখা যায়। সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে। তখন আবার সেই অবসাদ দূর করবার জন্যে আবার মদ খাও।'

'আর গাঁজা ?'

গাঁজার স্তোত্র শুনেছ ? শোনো :

গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঞ্জা ত্বরিতানন্দদায়িনী।
উচ্যতে প্রাকৃতৈর্গেজা ইতি তে নামপঞ্চকম্ ॥
সদ্যঃ পাপৌঘসংহন্ত্রী সদ্যশ্চিন্তাবিনাশিনী।
সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমা গতিঃ ॥
সংসারাসক্তচিত্তানাং সাধুনাং গঞ্জিকে সদা।
দুশ্চিন্তাবিস্মৃতেহেতুঃ ত্বং হি লক্ষ্মীবিরোধিনী ॥

'জানো, গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। আমি যখন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়েছি তখন বাস্তবিকই উইল-পাওয়ারে লোকের রোগ ভালো করেছি। কিন্তু, যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই।'

'এখন আর নেশা করতে ইচ্ছে হয় না ?'

'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না। এখন মাঝে-সাঝে দু' একটা সিগারেট খাই মাত্র।

নেশাই মানুষের পরম শত্রু—অবশ্যি তামাকটা নয়।' গিরিশের কণ্ঠ আবেগে ভরে উঠল : 'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণাও যদি মদে-গাঁজায় থাকত !'

'ছাড়লেন কী করে ?'

'ও কি আর সাধে ছেড়েছি ? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'সুরেন মিত্তিরও ছেড়েছে নাকি ?'

'নেশায় আমি ওর বড়দা ছিলাম।' হাসল গিরিশ : 'বড়দাই যখন ছেড়েছে তখন ছোট ভাইয়ের আর গতি কী ! ঠাকুর ওকে অন্য কায়দায় ঘায়েল করেছেন।'

সুরেনের বাড়িতে কালী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সুরেন রোজ আফিস থেকে এসে স্নানাদি সেরে বিগ্রহের কাছে বসে স্তোত্র-পূজা করে আর এক গ্লাস কারণ বারি সেবন করে। আসলে মদ, বলে কারণ।

সুরেনের বন্ধুরা ঠাকুরকে গিয়ে ধরল : সুরেনকে মদ খেতে বারণ করুন।

'কেন বারণ করব ? ও ওর নিজের পয়সায় খায়, ওর ধাত আছে তাই পারে হজম করতে।' ঠাকুর ধমকে উঠলেন : 'তাতে তোদের কি মাথাব্যথা ?'

ওদিকে সুরেন বলছে, ঠাকুর যদি আদেশ করেন, ছেড়ে দেব।

ঠাকুর-সোজাসুজি অমন নিষেধের কথা বলবেন না কাউকে। তিনি শুধু একটু বেঁকিয়ে দিলেন।

সুরেনকে ডাকিয়ে বললেন, 'তুমি মদ খাও কেন ? ফূর্তির জন্যে তো ?'

'তা ছাড়া আবার কী।' সস্মিত মুখে সলজ্জে সায় দিল সুরেন।

'কিন্তু মদে তো শুধু মধু নেই, মদে বিষও আছে।'

'তা কে অস্বীকার করবে ?'

'আর তুমি মধুর জন্যে খাচ্ছ বিষের জন্যে নয়। বিষ ধারণ করতে পারো এমন তোমার সাধ্য নেই। সুতরাং মদের বিষটুকু মাকে নিবেদন করে দাও, আর মধুটুকু তুমি খাও।'

সুরেন ঠাকুরের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'খাবার আগে বিষটুকু মাকে নিবেদন করে দাও। ও বেটি বিষ খেতে ওস্তাদ। ও অনায়াসে খেয়ে নেবে বিষ ! তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে মধু তুমি আস্বাদ করো।'

ব্যস, এইটুকু ? এতে আর হাঙ্গামা কী ? মদে মদ খাওয়া হবে, বিষে আর বিপন্ন হতে হবে না।

পরদিন যথারীতি কালীর সামনে মদের গ্লাস নিয়ে বসল সুরেন। বললে 'মা, বিষটুকু তুই নে আর মধুটুকু আমি খাই।' বলে ঢকঢক করে পুরো গ্লাস উড়িয়ে দিল।

বিন্দুমাত্র ঝামেলা নেই। সমস্তই জলের মত তরল।

এক দিন দু' দিন তিন দিন, কোথাও এতটুকু বাধল না, গলা দিয়ে ঠিক নেমে গেল। চার দিনের দিন কী রকম যেন কানে লাগল—মা, বিষটুকু তুই নে, আর মধুটুকু আমি খাই। মনে ডাক দিল, আমি ছেলে হয়ে কাঁহাতক মাকে বিষ

দেব ? তা হলে এই কালী আমার মা নয়, আমার এত সব পুজোপাঠ বুজরুকি ? আমি যদি মার সমর্থ সাবালক ছেলে হই, তা হলে স্বার্থপরের মত নিজে মধু খেয়ে কতদিন মাকে বিষ খাওয়াব ? অসম্ভব। মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখল সুরেন। আর হল না মদ খাওয়া।

কিন্তু গিরিশের বেলায় তো শুধু নেশা ছাড়ানো নয়, নতুন নেশা ধরিয়ে দেওয়া। আর সে নেশার নামই সর্বনাশের নেশা।

ষোল আনার বদলে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেলার নেশা।

সকালে উঠে কৃষাণদের সঙ্গে আলাপ করতে মাঠে গিয়েছিল গিরিশ, ফিরে এসে দেখল পুকুরঘাটে মা তার বিছানার চাদর সাবান দিয়ে কাচছেন।

গিরিশ স্তব্ধ অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে কী বলবে ভেবে পেল না। কাঁদবে না আনন্দ করবে সমস্ত তার বোধের অতীত হয়ে রইল। তার মত কলুষক্লিষ্ট লোকের বিছানার চাদর মা স্বহস্তে কাচছেন এতে যে তার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার ভাবছে কলুষক্লিষ্ট জেনেও মা তাঁর অসীম ক্ষমায় তাকে শুচিশুভ্র করে তুলছেন এতে তো আনন্দে প্রাণ বিভোর হয়ে উঠছে। বলো আমি কাঁদব না হাসব, মাকে বাধা দেব, না বলব আমার সমস্ত সত্তাকে মার্জনা করে পবিত্র করে তোলো।

'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।' ঠাকুরের সেই করুণার কথা মনে করে কাঁদতে বসল গিরিশ।

গাঁয়ের চাষীদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে গিরিশের। তারা জেনে নিয়েছে গিরিশ নাটক করে, নাটক লেখে। আর গান যখন সে বাঁধতে পারে তখন গান গাইতেই বা কেন না পারবে।

'কত্তা, গান ধরো।'

'ওরে আমি গান লিখি, গাইতে পারি না।'

কেউ বিশ্বাস করে না সে কথা। তাই অনুপায় হয়ে গাইতে হয় গিরিশকে।

আর কী আশ্চর্য, দূরে থেকে মা তাই শোনেন এক মনে। আরো আশ্চর্য সেই শোনা গান নিজেই সেদিন গেয়ে ফেললেন :

'হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়,
রানী পাছে তোলে কোলে।
রানী কুতূহলে, ধর ধর বলে
হামা টেনে তত গোপাল চলে ॥'

সকালে উঠে গাঁয়ের কারু বাড়ি গিয়ে দুধ যোগাড় করে আনেন মা।

'এত সকালে দুধ দিয়ে কি হবে ?' জিজ্ঞেস করে কেউ কেউ।

'গিরিশের জন্যে চা হবে। ওর যে সাত সকালে চা খাওয়া অভ্যেস।' বললেন মা। সেই চায়ে কি শুধু দুধ আর চিনিই মেশে ? না কি মেশে মার স্নেহ, মার অন্তরের মিষ্টি ?

'মা, তোমার কাছে যখন আসি তখন আমার মনে হয় আমি যেন ছোট্ট শিশু,

নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছি।' গিরিশ মায়ের পায়ে প্রণত হয়ে পড়ল : 'কিন্তু কই আমি তোমার সেবা করব, তা নয়, তুমিই আমার সেবা কর। বলো আমি কি তোমার সেবা করতে পারি ? আর আমি অশক্ত অসমর্থ, মহামায়ীর সেবার কি-ই বা জানি।'

'তুমি সন্তান, মার কাছে এসেছ, মা-ই তো সন্তানের সেবা করবে।'

গিরিশ কাঁদতে বসল।

তারপর সেদিন গিরিশ আর মা দু'জনেই কাঁদতে বসল যেদিন দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী এসে বেহালা বাজিয়ে গান ধরল :

'কি আনন্দের কথা উমে,
লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে ?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভংকরী
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে ?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে-পরে
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে ॥'

তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা, বলে কত মানুষ মার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহংকারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি ?

'আমি ইচ্ছে করলেই এ শেকল এখুনি কেটে দিতে পারি', বললেন মা, 'কিন্তু তা দিই না, দয়ায় দিই না, নইলে আমার আবার মায়া কী !'

২৬

'আমাকে কে ছুঁল ? যীশুখৃস্ট পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে তা কি কিছু ঠিক করে বলা যায় ?' বললে পিটার।

'আমোদ দেখতে অনেক ধাক্কা মেরেছে কিন্তু ভক্তিভরে ছুঁয়েছে শুধু এই একজন। তোমাকে বলছি', বললেন যীশু, 'তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'।

সেই একজন সামান্য এক স্ত্রীলোক। কঠিন রোগে ভুগছে। মনে বিশ্বাস, যীশুকে ছুঁলেই তার রোগ সেরে যাবে। তাই ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছিল, হাত বাড়িয়েছিল।

তা, সে তো যীশুর বস্ত্রপ্রান্ত মাত্র ছুঁয়েছে। তাই তিনি টের পেয়েছেন।

ছুঁতেও হয় না হয়তো। শুধু স্মরণ করলেও বোঝেন ঠিক-ঠিক।

সন্দেহ কী, সেই রুগ্ন স্ত্রীলোক ভালো হয়ে গেল।

এই উপাখ্যানটা শুনছিল গিরিশ। জ্বলন্ত কণ্ঠে গর্জন করে উঠল: 'ঠিক কথা। হাজার হাজার লোক আমাদের জন্যে যায়, একজন কি দুজন দেখবার জন্যে যায়। খুদিরাম চাটুজ্জের ব্যাটা গদাই চাটুজ্জেকে হাজার হাজার লোক দেখেছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল? ওরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কটা লোক দেখেছিল রে?' গর্জন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, তলহীন তন্ময়তায় ডুবে গেল গিরিশ।

ঠাকুরের দেহভস্মের ঘড়া মাথায় নিয়ে শশী-মহারাজ চলেছে, রাম দত্তের বাড়ি থেকে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে। সঙ্গে সংকীর্তনের দল। এ উপলক্ষ্যে নতুন কোনো গান তৈরি হল না? কে তৈরি করবে? তবে, উপায় কী, গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' থেকেই বেছে নেওয়া হোক একটা। আর কথা নেই, 'চৈতন্যলীলা'ব শেষ গানটাই সবচেয়ে জুৎসই। সেই শেষ গানটাই এই শেষের দিনে গাইল সকলে:

'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা দাও হে দেখা
প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজালে বাঁশি,
ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী
কূল ত্যজে হে অকূলে ভাসি
হৃদয়বিহারী কোথায় হরি
পিপাসী প্রাণ তোমার চায়॥'

'ঈশ্বরে শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়।' বললেন সারদামণি, 'তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে, ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? কর্মক্ষয় ধীরে ধীরে।'

গিরিশের ইচ্ছে হল তার বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় মা-ঠাকরুন উপস্থিত থাকেন। সারদানন্দকে দিয়ে জয়রামবাটিতে চিঠি লেখাল। মা, তোমার আসা চাই। তুমি না এলে গিরিশের পুজোই এবার অর্থহীন। কিন্তু মা কী করে আসেন? ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে তাঁর শরীর ভীষণ কাহিল হয়ে গেছে। তার উপর কলকাতায় এখন দাঙ্গা।

'মা যদি না আসেন', বললে গিরিশ, 'তাহলে পুজো বন্ধ করে দেব। কোনো দিনই আর পুজো করব না। মা ছাড়া আর ভগবতী কে!'

গাঁয়ের চৌকিদার অম্বিকা বাগদি বলেছিল, 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কী বলে, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।' মা বললেন, তোমার বোঝবার

দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকে দাদা, আমি তোমার সারদাবোন।'

জয়রামবাটিতে মায়ের যখন মন্দির নির্মাণ হচ্ছে বৃদ্ধা গয়লা-মা বললে, 'সারি বামনি, তার আবার মন্দির! এই সেদিনও তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি।'

আরো বললে: 'তোমরা তাকে ভগবতী বলো, কিন্তু আমরা জানি, আমাদের গাঁয়ের ঝিউড়ি সারু, আমাদের ঠাকুরঝি। বাসন মাজত, কাপড় কাচত, ঢেঁকিতে পাড় দিত, মুনিষদের খেতে দিত। ঠিক আমাদেরি মত। তখন কি বুঝেছি গা? শিষ্যসেবক আসত, কত জিনিস দিত, কত টাকা পড়ত পায়ের কাছে। মনে করতাম —বামনি, বড়-বড় শিষ্যসেবক, তাই অত দিচ্ছে। বলেছিলাম একদিন, ঠাকুরঝি, ভায়েদের পিছনে খরচ না করে গাঁয়ে তিনদিন অষ্টপ্রহর দাও। আমার কথা শুনে হেসে ফেলল ঠাকুরঝি, বললে, কত অষ্টপ্রহর দেখবি পরে। অত বুঝিনি তখন, এখন বুঝছি। মহামায়া মায়ায় আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছিল। তাই ভাবি বেঁচে থাকতে যে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়েছিল, মরলে সে কি পায়ে জায়গা দিবেনি?'

মা এলেন। উঠলেন বলরাম বোসের বাড়িতে।

গিরিশের বাড়ি কাছেই, খবর শুনে দিদি দক্ষিণাকে নিয়ে গিরিশ গেল মাকে প্রণাম করতে। দক্ষিণা বললে, 'গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল, মা। বলছে, মা না এলে পুজো করব কাকে নিয়ে? পুজো এবার বাদ যাবে।'

মা সস্নেহে হাসলেন। পুজো কি বাদ যেতে পারে? কত বড় বীর ভক্ত গিরিশ, তার ডাক কি উপেক্ষা করতে পারি?

মার সামনেই কল্পারম্ভ হল। কিন্তু মা ক'জায়গা সামলাবেন? সপ্তমীর ভোর থেকেই বলরামের বাড়িতে ভিড়, দলে-দলে লোক এসে মার পায় পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে আর প্রণাম করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থেকে এই পুজা-প্রণাম গ্রহণ করলেন মা। তারপর বেলা প্রায় এগারোটায় গিরিশের বাড়ি থেকে ডাক এল। সেখানে প্রতিমার পুজা! কিন্তু পরমাকে পেয়ে ভক্তের দল ছাড়বে কেন? প্রতিমার পাশে পরমা দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। দেবীর দুই মূর্তির পদতলেই পুজাঞ্জলি পড়তে লাগল। সকলেরই পুজা-প্রণাম স্বীকার করলেন মা, কাউকে বিমুখ করলেন না।

মহাষ্টমীর দিন আরো ভিড়, আরো অসহনীয় অবস্থা। শরীর অসুস্থ তবু মা চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়ালেন। দুজায়গাতেই—বলরামের বাড়ি, আবার গিরিশের বাড়ি। বলরামের বাড়িতে একাকিনী, গিরিশের বাড়িতে প্রতিমাপ্রতিরূপিণী।

দুর্বল শরীরে কত আর সইবে? মার ঠিক জ্বর এসে গেল। গভীর রাতে সন্ধিপুজা, স্থির হল, সন্ধিপুজায় মা আর উপস্থিত হবেন না। গিরিশ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু উপায় কি! অসুখের উপর কথা নেই। অভিমানে গিরিশ আর গেল না মণ্ডপে। শোকার্তমুখে নীরবে বসে রইল। মধ্যরাত্রে খিড়কির দরজায় মৃদু করাঘাত পড়ল। কে জানে কে! ঝি খুলে দিল দরজা।

'আমি এসেছি।'

ওরে মা এসেছেন, মা এসেছেন ! গিরিশ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, 'ভেবেছিলুম আমার পুজোই হল না ! এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, আমি এসেছি। ওরে মা কি সন্তানের ডাকে না এসে পারে ?'

'বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, জল থাকে নিচুতে।' মা বলছেন, 'জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও। সূর্য আপন স্বভাবেই জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়। সুতরাং যে মা বলে মেনেছে তার আর ভয় কী !'

গিরিশ 'তপোবল' লিখল। জড়শক্তির চেয়ে ব্রহ্মশক্তিই মহত্তর, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের সংঘর্ষ নিয়ে নাটক। শেষ পর্যন্ত তপস্যার শক্তিতে বিশ্বামিত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন। আত্মা সকলেরই সমান, যে আত্মদর্শন করতে সক্ষম হয়, সেই ব্রাহ্মণ।

'তপোবল' গিরিশ নিবেদিতাকে উৎসর্গ করল। নিবেদিতা তখন কোথায় ?

দার্জিলিঙে নিবেদিতা অসুস্থ। স্যার জগদীশ দেখতে গিয়েছিল। তার কাছে নিবেদিতার শুধু গিরিশের কথা। কিছু করল না, ছাড়ল না, অথচ কী দুর্মদ ভক্তি !

'তোমাকে নিবেদিতা কত যে ভালোবাসে !' বললে জগদীশ।

উৎসর্গপত্রে লিখল গিরিশ : 'বৎসে, তুমি আমার নতুন নাটক হলে আমোদ করতে। আমার নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছে, তুমি কোথায় ? দার্জিলিঙ যাবার সময় আমাকে পীড়িত দেখে স্নেহবাক্যে বলে গিয়েছিলে, এসে যেন তোমার দেখা পাই। আমি তো জীবিত আছি, কেন বৎসে দেখা করতে আস না ? শুনতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করেছিলে, যদি সেবাকার্যে নিযুক্ত থেকে আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ করো।'

মায়ের প্রতি মায়ের মতোই ভালোবাসা নিবেদিতার। জয়রামবাটি থেকে মা ফিরেছেন কলকাতা, নিবেদিতা লিখছে এক ভক্তকে :

'শ্রীমা এখানে এসেছেন, শরীর একেবারে ক্ষয়ে গেছে, এত রোগা আর ছোট্ট আর এমন কালো হয়ে গেছেন—বোধহয় গ্রামে থেকে, ওখানকার কষ্টে। কিন্তু সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সেই মহিমা আর মাতৃত্ব আগের মতোই আছে। আহা, ওঁকে কত আরামে রাখতে সাধ জাগে। নরম একটি বালিশ, ছোট্ট একটা আলমারি আরও কত কী ওঁর দরকার ! এত ভিড় ওঁর চারদিকে।'

আমেরিকা থেকে মাকে চিঠি লিখছে নিবেদিতা : 'প্রিয়তমা মা, আজ খুব সকালে গির্জেয় গিয়েছিলুম, সারার জন্যে প্রার্থনা করতে। সেখানে সকলেই যীশুজননী মেরীর বিষয় চিন্তা করছিল, কিন্তু আমার মনে হঠাৎ তোমার চিন্তা এল। তোমার প্রিয় মুখখানি, তোমার স্নেহভরা দৃষ্টি; তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা দু-গাছি,—এ সবই ভেসে উঠল চোখের সামনে। কী ভাবছিলুম জানো ? ভাবছিলুম ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় আমি নির্বোধের মত তোমার ঘরে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছি। তখন আমি কেন বুঝতে পারিনি

যে তোমার স্নিগ্ধ চরণতলে একটি ছোট্ট শিশু হয়ে বসে থাকলেই তো যথেষ্ট হত। প্রিয়তমা মা, তুমি শুধু ভালোবাসায় ভরা, সে ভালোবাসা আমাদের জাগতিক ভালোবাসার মত উত্তাল-উদ্দাম নয়। সে শুধু একটা শীতল শান্তি যা সকলের কল্যাণে বিস্তীর্ণ, যাতে কারু প্রতি একটুও অশুভস্পর্শ নেই। বিচিত্র লীলায় আন্দোলিত এ এক দিব্য জ্যোতির তরঙ্গ। প্রিয়তমা মা, ইচ্ছে হয়, তোমাকে সুন্দর একটি বন্দনা-সঙ্গীত বা প্রার্থনা পাঠাই, কিন্তু মনে হয় তোমার সম্পর্কে তাও একটা তীব্র উচ্চধ্বনি বা কোলাহলের মত শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম বস্তু এবং শিশুর মত একটু আনন্দ করা ছাড়া তোমার কাছে আমাদের অত্যন্ত নীরব ও শান্ত হয়ে থাকাই উচিত। ভগবানের সমস্ত বিস্ময়কর বস্তুই নীরব—নীরবে সবার অলক্ষ্যে তারা আমাদের জীবনে প্রবেশ করে—বাতাস আলো ফুল জল—নদী—গঙ্গা। মা, এই নীরবতাগুলি তোমারই মত।'

'আমি তাকে দেখেছি।' অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল ম্যাকলাউড, 'আমি তাকে দেখেছি।'

দুই বোন, মিস লেগেট আর মিস ম্যাকলাউড। দুজনই স্বামীজির শিষ্যা, চিরকুমারী। স্বামীজি নাম রেখেছেন জয়া আর বিজয়া।

ম্যাকলাউড উদ্বোধনে মার সঙ্গে দেখা করে ফিরেছে মঠে। তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছে, ঠাকুরঘরে এসে প্রণাম করে ধ্যান করল খানিকক্ষণ। পরে ফিরে চলল গেস্ট হাউসের দিকে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, এক ব্রহ্মচারী আলো নিয়ে চলল সঙ্গে। আলোর দরকার নেই, ম্যাকলাউড নিজের মনে এগিয়ে চলেছে। ব্রহ্মচারী কাছাকাছি হতেই শুনতে পেল ম্যাকলাউড অস্ফুটস্বরে আপনমনে বলছে : আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে দেখেছি।'

কে—কাকে ? ব্রহ্মচারীর প্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে তার কানের কাছে মুখ এনে আরো গভীরে উচ্চারণ করল ম্যাকলাউড : 'মাকে দেখেছি। মূর্তিমতী পবিত্রতা। জ্যোতিষ্মতী।'

কোথায় পা পড়ছে হুঁশ নেই, টলতে টলতে চলেছে ম্যাকলাউড : 'আমি তাকে দেখেছি।'

নিবেদিতা অল্প অল্প বাঙলা শিখছে।

একদিন মাকে স্পষ্ট বাঙলায় বলল, 'মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদের কালী।'

সঙ্গে ক্রিস্টিন ছিল, সেও ঐ কথাই বলবে ইংরিজিতে।

মা হেসে বললেন, 'না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তা হলে।'

কথাটা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দেওয়া হল। তখন দুজনেই বললে, 'না, না' তোমাকে অত কষ্ট করতে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব। তুমি তাঁর ঘরণী, আমাদের জননী হয়েই থাকো।'

পশমের তৈরি ছোট একখানি পাখা নিবেদিতাকে উপহার দিলেন মা।

বললেন, 'এটি আমি তোমার জন্যে করেছি।'

কী পেল নিবেদিতা যেন হিসেবে আনতে পাচ্ছে না। পাখাটা কখনো মাথায় ঠেকায়, কখনো বুকে রাখে, আর বলে, 'কী সুন্দর, কী চমৎকার।'

'কী একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ!' নিবেদিতার শুচিসুন্দর মুখখানির দিকে তাকালেন মা : 'আর কী সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কী ভক্তিই করে! নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাণ ঢেলে তার কাজ করছে। কী গুরুভক্তি। আর এদেশের উপর কী টান! আমাকে বললে, মা, আমি আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

ভক্তছেলে রামময়, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, মায়ের বাক্স থেকে পুরোনো কাপড়-চোপড় বের করে দিচ্ছে। একখানা জীর্ণ এণ্ডির চাদর হাতে নিয়ে রামময় বললে, 'মা এটা রেখে কী হবে? এটাতে কিছু নেই, ফেলে দি।'

মা শিউরে উঠলেন। বললেন, 'না বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়ে ছিল, ওখানি থাক।' ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালো জিরে দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখলেন মা। বললেন, 'চাদরখানি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কী মেয়েই ছিল! আমার সঙ্গে প্রথম-প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাঙলা শিখে নিলে। আর আমার মাকেই বা কী ভালোবাসত!'

দিদিমা শ্যামাসুন্দরীকে একবার নিবেদিতা বলেছিল, দিদিমা, আমি তোমাদের দেশে যাব। তোমার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করব।'

শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'না দিদি, উ কথাটি বোলোনি, তুমি আমার হেঁসেলে ঢুকলে দেশের লোক আমাদের ঠেকো করবে।'

মায়ের ছবি নেওয়া হবে, কে মাকে সাজিয়ে দেয়। আর কে? নিবেদিতা! নিবেদিতাই মাকে ধ্যানাসনে বসিয়ে চুল ও আঁচল পরিপাটি করে গুছিয়ে দিল। ডান কাঁধ থেকে ঘনকৃষ্ণ চুল নেমে এসেছে বুকের উপর আর বস্ত্রাঞ্চল কেমন বিস্তীর্ণ লাবণ্যে উঠে গিয়েছে মাথার দিকে, বরাভয়ের ডান হাতটি মুক্ত।

এই ছবিই ঘরে-ঘরে পুজো পাচ্ছে।

বিনোদবিহারী সোম ওরফে পদ্মবিনোদ ছেলেবয়েস থেকেই যেত ঠাকুরের কাছে, এখন থিয়েটারে ঢুকে মদ খেতে শিখেছে।

মাতাল হয়ে বেশি রাত করে ফিরছে মার বাড়ির পাশ দিয়ে, আর শরৎ মহারাজের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছে, 'দোস্ত! মাকে একবার তুলে দাও না। করুণাময়ীকে একটু দর্শন করি।'

শরৎ মহারাজ জেগেও সাড়া দিচ্ছে না, আর সবাইকেও বলছে চুপ করে থাকতে। মার যেন না ঘুম ভাঙে।

পরের দিন রাত্রে পদ্মবিনোদের আবার সেই দর্শনপিপাসা। তবে এবার দোস্তের শরণাপন্ন না হয়ে একেবারে মার উদ্দেশেই সে গান ধরল : 'ওঠো গো করুণাময়ী, খোলো গো কুটির দ্বার—'

মায়ের ঘরের জানলা খোলার শব্দ হল।

'এই রে, মাকে তুলেছে।' শরৎ মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'উঠেছ মা, সন্তানের ডাক কানে গেছে ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।' বলে পদ্মবিনোদ রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। খানিক ধুলো গায়ে-মাথায় মেখে চলে গেল সে গান গাইতে গাইতে : 'যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিনি-শ্যামা মাকে। মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে—অন্তত দোস্ত যেন নাহি দেখে॥'

'ছেলেটি কে ?' সকালে উঠে জিজ্ঞেস করলেন মা। সব শুনে বললেন, 'দেখেছ জ্ঞানটুকু টনটনে আছে।'

গিরিশের জ্ঞানও কি টনটনে নয় ? যাই করুক-বলুক ঠাকুরকে রেখেছে ঠিক মাথায় বেঁধে আর মাকে মর্মে গেঁথে।

পদ্মবিনোদ হাসপাতালে মারা গেল। মৃত্যুসময়ে বললে, ঠাকুরের কথামৃত শোনাও।'

শুনতে-শুনতে তার দু-চোখে দুফোঁটা জল দেখা দিল। মুখে ফুটল 'রামকৃষ্ণ',সঙ্গে-সঙ্গেই ছেড়ে দিল শেষ নিঃশ্বাস।

মা বললেন, 'তা হবে না ? ঠাকুরের ছেলে যে। কাদা মেখেছিল তা হয়েছে কী ! যাঁর ছেলে তাঁর কোলেই গেছে।'

গিরিশের অন্তিম মুহূর্তেও কি এসেছিল রামকৃষ্ণ-নাম ?

বাবুরাম মহারাজ ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ কাশী থেকে লিখছে :

'শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর প্রায় সুস্থ হচ্ছে, আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। আহা, স্বভাব কী চমৎকার হয়েছে ! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে। ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কী চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি—যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্য তাঁর কাছে হ্যাক-থু হয়েছে। অনেক অনেক সাধুরও এমন ভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কী অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। আটষট্টি বছর বয়স, কিন্তু বালকের মত স্বভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির কথায় একেবারে মাতোয়ারা। তাঁর চাকরবাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা।'

পশ্চিম জয় করে ফিরেছে স্বামীজি। গিরিশকে দেখেই বলে উঠল : 'জি-সি, তোমার ঠাকুরকে সাগরপারে রেখে এলুম।'

গিরিশ স্বামীজির পায়ের ধুলো নিতে নত হল।

'কী করো, জি-সি, এতে যে আমার অকল্যাণ হবে।' এই বলে স্বামীজিই গিরিশকে প্রণাম করল। জিগগেস করল আবার সেই পুরোনো কথা : 'সাড়ে তিন হাত মানুষের মধ্যে কি ভগবান আসতে পারে জি-সি ?'

গিরিশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'হ্যাঁ, এসেছে, আমি দেখেছি।'

আমি দেখেছি ! আমি দেখেছি !

কাশী থেকে গিরিশ কলকাতায় যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকে চিঠি লিখছে। যতীন্দ্রের পুত্রবিয়োগ হয়েছে। তাই এই চিঠি।

'যোগেন মহারাজ যখন খুব পীড়িত, বোসপাড়ায় মার বাড়িতে আছেন, ন-দিদি একদিন বললেন, যোগেন, তোমার অসুখের কথা মাকে বলো না, ঠাকুরকে বলুন, আরাম হোক। যোগেন মহারাজ বললেন, ন-দিদি তুমি জানো না, ওরা যা করবার তা করে, কারুর বলা-কওয়ায় কিছু হয় না। যাকে ভালো করবার তাকে আপনিই ভালো করে দেয়, যাকে ভালো করবার নয়, কাঁদাকাটা করলেও তার ভালো করবে না।

ঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে, মা-ঠাকরুন তারকেশ্বরে হত্যে দিতে গেলেন, কিন্তু হত্যা দিলে এমনি বেদান্তভাব এল যে আর কামনা চলল না। দেখলেন, কেউ মরে না, কেউ বাঁচে না। পূর্ণ ভাবে সমস্তই থেকে গেছে। আবার একবার যখন কেশব সেনের ব্যারাম হয়, ঠাকুর সিদ্ধেশরীর কাছে ডাব মানেন, সেবার কেশব সেন আরাম হলেন। কিন্তু কেশববাবুর মৃত্যুরোগের সময়, কেশববাবুর মা কত বললেন, ঠাকুর কোনোরকমেই ঘাড় পাতলেন না। আমাদের কাছে ঠাকুর গল্প করেছিলেন, শেষবার কামনা এলোনি। কেশবকে বললাম, কেশব, তুমি বসরাই গোলাপ, মালী যেমন ভালো করে বসরাই ফোটাবার জন্যে গোড়া খুঁড়ে দেয়, তেমনি দিচ্ছেন।

বোঝো, ঠাকুরের শরণাপন্ন হলে তিনি তার প্রকৃত উন্নতি দেখেন। বালককে শিক্ষা দেবার মত মারও আছে। কাঁদো-কাটো কিছুতেই এড়ানো নেই। তবে একমাত্র তোমার সান্ত্বনা এই যে ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুর নিয়েছেন। সে নিশ্চয়ই তাঁর স্বগণ, নচেৎ মেনিনজাইটিসের দারুণ তাড়নায় ঠাকুরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারত না, ঠাকুরের নাম নিতে পারত না। তোমাদের শিক্ষার জন্য ঠাকুর তাঁর স্বগণকে পাঠিয়েছিলেন। কঠোর শিক্ষা দিয়ে গেল। শোক করতে হয় তো করো, কিন্তু শোকের সঙ্গে সঙ্গে ভোলবার জো নেই যে সাধুবালক অন্তকালে মৃত্যুযন্ত্রণা উপেক্ষা করে ঠাকুরের চরণে দৃষ্টি রেখেছিল।

এ সংসার এমনি স্থান যে যার প্রতি ভালবাসা রাখবে তার কাছেই তেমনি ঠকবে। আমি ঠকে ঠকে আমার দুটো নাতির বাগে চাই না! তাদের দরকার সাধ্যমত কুলান করি এই পর্যন্ত। সংসারে এরূপ থাকা ভিন্ন উপায় নেই। নচেৎ পদে-পদে যন্ত্রণা। পুত্রশোকী কাঞ্জিলালের শেষ পত্রে বোধহয়েছে যে ভাবনারাশিই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—ক দিক ভাববে ভেবে না পেয়ে মাস্তুলের পাখির মত ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে। এই গুয়ের হেগো সংসারে আবার পরজন্মের কামনা করে। ইহজন্মেই রক্ষে নেই। যে স্থানে অনিত্য বস্তুআপনার মনে হয়, সে স্থান যমালয় অপেক্ষা ভীষণ। কারণ পদে-পদে নিরাশ হতে হয়, যাকে আনন্দের বস্তু বিবেচনা করেছে যত উদ্বেগ তারই জন্যে। ঠাকুরের কথামৃতে আছে না যে একজনের

পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল—ঝড়ের সময় রামের দোহাই লক্ষ্মণের দোহাই হনুমানের দোহাই দিয়েও দেখল ঘর রাখা যায় না, শেষে বললে, যা শালার ঘর উড়ে। তবে নিশ্চিন্ত। বাবাজি, জেনো সংসার এই।

ইতিপূর্বে তোমায় চিঠি লিখেছিলাম যে আমার 'নিব্রিচের' মাপ নেওয়া হয়েছিল, সেই সঙ্গে তার কোটেরও মাপ নেওয়া হয়েছিল কিনা স্মরণ নেই। আমার সেই নিকারবকার সুটের প্রয়োজন। যে সুট পাঠিয়েছ তা ঠিক বেড়াবার পক্ষে সুবিধের নয়, তবে ভড়ং করে কোথাও যাবার পক্ষে সুবিধের বটে। আর হাফ-ডজন সার্ট আর তদুপযুক্ত নেক-টাই কলারের কথা ছিল, তাও পাঠাওনি। টুপি রেসপেক্টেবল দেখে তোমাদের পছন্দমতই পাঠিয়ে দিও, আমার তো সাহেব সাজবার ইচ্ছে নয়। তবে রেলে উঠতে গেলে বা একজিবিশন প্রভৃতি কোনো দৃশ্য দেখতে গেলে 'কালা বাঙালী' বলে উঠিয়ে না দেয়, এই আমার উদ্দেশ্য।

আমার শরীরের অবস্থা এরূপ যে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করা দূরে থাক, বাসা থেকে দু-পা গেলে 'দাউজি' দর্শন হয়, তা এ পর্যন্ত হয়নি। এ স্থানের একটু মমতা আছে, নচেৎ স্থানান্তরে যাবার চেষ্টা করতাম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে গুরুদেব, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও উত্তরবাহিনী গঙ্গার মাতৃ-উচ্চারণ করি, বলি শালা-শালীরে, আমায় কি করতে আনলি? তা গাল দাও আর স্তুতিই করো, শালা-শালীরা কানের মাথা খেয়ে বসে আছে। ভরসা করি এতদিনে ঠাকুরের পাদপদ্ম স্মরণ করে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেছ আর এই পত্র সকলের কুশল অবস্থায় পেঁছুবে।'

অন্তকালে গিরিশ কী দেখল? কী বলল?

তিরিশে শ্রাবণের শনিবার বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। মিনার্ভায় 'বলিদান' হবে, প্ল্যাকার্ড পড়ে গিয়েছে, করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশ। সন্ধে পর্যন্ত টিকিট বিক্রি পঞ্চাশ টাকা। থিয়েটারের সকলেই গিরিশকে বললে, 'আপনার আজ নেমে কাজ নেই। এ ঠাণ্ডা সহ্য হবে না আপনার।'

হাঁপানির রুগী, ঠাণ্ডা লাগলেই নিমোনিয়া। আর করুণাময়কে তিনবার স্টেজে খালি গায়ে আসতে হবে। মেয়ে হিরণ্ময়ীর বিয়ের সময়, হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পরে, আর একবার গলায় দড়ি দিয়ে মরবার সময়ে। তিন-তিনবার বেশ খানিকটা সময় খালি গায়ে থাকতে হলে বিপদ না ঘটে যায়।

গিরিশ বললে, 'দাঁড়াও, দেখি, কি রকম হয়।'

আস্তে-আস্তে চারশো টাকার মত টিকিট বিক্রি হল।

'থাক, তবু আপনার নেমে কাজ নেই।' থিয়েটারের মালিক মহেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত বারণ করল: 'এমনিতে আপনি অসুস্থ, তার উপর ঠাণ্ডা লাগলে আপনার অসুখ আরো বাড়বে।'

'তা কি হয়? দুর্যোগেও কত লোক এসেছে টিকিট কেটে। শুধু আমার অভিনয় দেখবার জন্যে।' গিরিশ বললে, 'আমি কি তাদের নিরাশ করতে পারি?'

গিরিশ নামল স্টেজে। আর এই তার শেষ অভিনয়।

শেষ পর্যন্তও সে মঞ্চকে, থিয়েটারকে ধরে ছিল। ঠাকুর তাকে কিছু ছাড়তে বলেননি। যা ছাড়বার তা নিজের থেকেই ছেড়ে চলে যাবে। তুমি শুধু আমাকে ছেড়ো না।

'আচ্ছা, আপনি মদ কি করে ছাড়লেন?' জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ।

'আমি কি ছেড়েছি?' বললে গিরিশ, 'মদই আমাকে ছেড়ে গেছে।'

'ঠাকুর তো নিষেধ করেননি।'

'না, তাঁর হাঁ-ও নেই, না-ও নেই। তাঁর—যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে। কারুর ভাব তিনি নষ্ট করেন নি। সব পথই পথ। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হয়ে গেল।' বলতে-বলতে গিরিশের চোখ জলে ভরে উঠল।

'তপোবনে' ব্রহ্মণ্যদেব গান গাইছে :

আপনাকে চেন আগে, চিনবে আমায় তার পরে।
দেখেছ কি এদিক-ওদিক, দেখ কে আছে ঘরে॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ—
মনের ভুলে মুল খোয়ালে, কাঁচ নিলে সোনার দরে॥'

একটা দেহের মধ্যে দশ-বারোটা গিরিশ ঘোষ বাস করছে। যেমন সেজেছে 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ, 'নীলদর্পণে' উডসাহেব, 'পলাশীর যুদ্ধে' ক্লাইভ, 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ, 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র, 'প্রফুল্লে' যোগেশ, 'কালাপাহাড়ে' চিন্তামণি, 'বিল্বমঙ্গলে' সাধক, 'নসীরামে' নসীরাম, 'জনা'য় বিদূষক, 'সিরাজদ্দৌলা'য় করিমচাচা। আবার ধাম-লীলা ছেড়ে তাকে নিত্যলীলায় দেখতে চাও, দেখবে নিতান্ত সাধাসিধে, বালকস্বভাব, ভক্তিতে-বিনতিতে দ্রবীভূত।

এদিকে সঙের গান লিখতেও ওস্তাদ :

'আয়লো আয় বুকের মাঝে উল্কি দেগে নে।
ভেলকি করে পয়সাওয়ালা নাগর কিনে নে॥
উল্কি পরা নাগর ধরা সখের নূতন ফাঁদ
উল্কি দেখে ভেলকি খাবে পয়সাওয়ালা চাঁদ।
তোর সাধের বেণী ওলো শোন বিনোদিনী
যদি বেণীর গুমোর করিস তবে খাবি আমানি।
উল্কিতে ভেলকি খেয়ে মুখপানে তোর থাকবে চেয়ে
হতচ্ছাড়া নাগর তোমার হবে না আর ভ্যানভেনে॥'

উল্কি-ওয়ালার পর গান গাইছে সাপুড়েরা :

'কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর
কালনাগিণী কেটে গেল সোনার লখিন্দর রে সোনার লখিন্দর।
ভাসিয়ে ভেলা বেউলো সতী, নিয়ে যাবে মরা পতি

সতীর মেয়ে বেউলো সতীর এয়োৎ ভারি জোর রে
এয়োৎ ভারি জোর ॥'

ঠাকুর শুধু শিবের গানই লিখতে বলেননি, সঙের গানও লিখতে বলেছেন তার মানেই সমস্ত সংসার নিয়ে লেখ—সংসারে সঙও আছে সারও আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর। আমি সমগ্র বেলটিকে চাই। জানি আমি শুধু শাঁস খাব, কিন্তু শাঁস নিতে হলে খোল-বিচি আঠাও নিতে হবে। খোল বিচি আঠার মধ্যেই শাঁসের বাসা। সঙের মধ্যেই সারের অধিষ্ঠান।

মাথায় শাদা ঝাঁকড়া চুল, গালে শাদা দাড়ি, হাতে মোটা লাঠি এক বুড়ো বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর চেনা-অচেনা যাকে পাচ্ছে তাকে ধরে বলছে, 'ওহে শুনেছ, গিরিশবাবু কী বলেছেন? এ কথা পুরাণেও লেখেনি, ব্যাসও বলেনি—এ অতি নতুন কথা—গিরিশ ঘোষই প্রথমে এ কথা বলেছে। কী কথাটা শুনেছ? কৃষ্ণদর্শনের ফলই কৃষ্ণদর্শন। মুক্তি নয়, বৈকুণ্ঠ নয়, স্বর্গ নয়,—কৃষ্ণদর্শনের ফলই কৃষ্ণদর্শন—আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাঃ, কী সুন্দর কথা! শুনে রাখো, শিখে রাখো। তোমাকে দেখলুম মানে তো তোমাকেই দেখলুম।'

নরেন তখন কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়ে খালি পায়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, এক গণৎকার তার হাত-পায়ের লক্ষণ দেখে বললে, 'এর পায়ে শঙ্খচক্র চিহ্ন আছে, এ অসাধ্য সাধন করবে কিন্তু তার এখন যা হাল দেখছি তাতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছি না।'

গণৎকার চলে গেলে গিরিশ বললে, 'এখন বোঝা যাচ্ছে না বটে পরে যাবে।'

স্বামীজির আমেরিকা-বিজয়ের কাহিনী শুনে গিরিশ অভিভূতের মত বললে, 'ওহে এ হল কী! এ যে মিরাক্যল-এর দিন আবার ফিরে এল। বহু শতাব্দী আগে যা হয়েছিল সেই মিরাক্যল যে চোখের সামনে দেখছি। এ যে বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে গেল। এ কি তর্ক-যুক্তিতে হয়? একটা শক্তি পেছনে না দাঁড়ালে এ সব কাজ কি কেউ করতে পারে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে বারে বারে প্রণাম করতে লাগল: 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। এ যে শঙ্কর-বুদ্ধের দলে গেল, সাধারণ লোকের হিসেবে আর রইল না।'

মিরাক্যল কি শুধু স্বামীজি? স্বয়ং গিরিশ মিরাক্যল নয়? সে যে ধ্রুব-প্রহ্লাদের দলে গেল। তার শুধু ভক্তি-বিশ্বাস। ধ্রুবের বিশ্বাস আর প্রহ্লাদের ভক্তি। ঠাকুর গিরিশকে বলতেন, ছিপ-ভাঙা ছেলে।

এক জমিদারের দুই ছেলে, বড়টি বিদ্বান, বিনয়ী, বাপের অনুগত। ছোটটা বয়াটে, লেখাপড়ায় মন নেই, দিনরাত কেবল গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মশগুল। যা সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে, বাপের ধারে-কাছেও ঘেঁসে না, ভয়ে-ভয়ে থাকে। একদিন ছোট ছেলেকে বাপ জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে, বাগানে যাবি? তোর দাদাও যাচ্ছে।' শুনে ছোটভাইও রাজি হল। বাপ দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়ি করে বাগানে গেল। বাগানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বাপ বড় ছেলেকে বোঝাতে লাগল, কোন

গাছটা কোথা থেকে আমদানি, কোন কলমের কী বৈশিষ্ট্য, কার কত ফল দেবার সম্ভাবনা—নানা তত্ত্ব নানা তথ্য—এই দিকে আবার দেখ শাকশবজির খেত। কিন্তু ছোট ছেলেটা উধাও। সে মালীর ঘর থেকে বড় একগাছা ছিপ নিয়ে চারের জোগাড় করে দিব্যি একটা পুকুরে মাছ ধরতে বসেছে। বিকেলের জল খাবার এসে গেল, ছোট ছেলের দেখা নেই। ছোটকা কোথায় গেল? বড় ছেলে খুঁজে এসে বললে, পুকুরে মাছ ধরছে। বলছে, তোমরা খাও গে, আমি গোটা দুই মাছ না ধরে উঠছি না। ব্যাটা যেখানে যাবে সেখানেই জ্বালাবে। চটে-মটে বাপ নিজেই গেল পুকুরে, ছোট ছেলের হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিল, তারপর ছোট ছেলের হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে এল, জোর করে জলখাবার খাওয়াল, তারপর দু ছেলেকে এক সঙ্গে গাড়ি করে ফিরিয়ে আনল বাড়ি। ছোট ছেলেটা দুরন্ত বলে অবাধ্য বলে তাকে বাগানে একা ফেলে রেখে এল না।

ঠাকুর বললেন গিরিশকে লক্ষ্য করে, 'তুমি আমার ছোট ছেলে আর নরেন আমার বড় ছেলে। বাড়ি যাবার সময় তোমাকে আর নরেনকে একসঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার ছিপ-ভাঙা ছেলে।'

স্টার থিয়েটারে বাবা-ভারতী এসেছে। পরনে গেরুয়া, খালি পা, কেটে গিয়েছে বলে পটি বাঁধা। আসলে এ সুরেন মুখুজ্জে, লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার এককালের সম্পাদক।

অভিনয় দেখার পর গিরিশ, বাবা-ভারতী ও কৃষ্ণধন দত্ত তিনজনে মিলে মদ খেল। খাবার পর খেয়াল উঠল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসকে দেখতে যাবে। রাত প্রায় দুটো, একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরুলো তিনজন। দক্ষিণেশ্বরে পেঁছে দেখল, ফটক বন্ধ। দরোয়ানকে এক টাকা বকশিস দিতেই সে ফটক খুলে দিল। তিনজনে ঢুকেই ঠাকুরের ঘরের দরজায় কিল-চড় মারতে সুরু করল। সঙ্গে দানাই চিৎকার। খুলুন, বেরিয়ে আসুন। ঠাকুর জেগে ছিলেন, দরজা খুলে দিলেন।

'আমরা তিনজনে ঢুকে পরমহংস মশাইকে মাঝে করে দানাই-নাচ শুরু করে দিলুম।' বলছে বাবা-ভারতী, 'কৃষ্ণধন শালা ভারি বেরসিক। মদ খেয়ে কিনা গান ধরলে, রাধে গোবিন্দ বলো! মাতাল জাতের বদনাম করে দিল। আবার বলছে, দক্ষিণেশ্বরের ঐ লোকটার মত প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি—খুব উঁচুদরের ইয়ার। নাচে-গানে রাত ভোর করে ফিরলুম তিনজন।'

আরো একজন আসে গিরিশের বাড়ি। অন্যের সঙ্গে সমান আসনে না বসে মেঝের উপর বসে, তামাক সেজে সকলকে খাওয়ায়। যদি কখনো কীর্তন হয় যুক্তকরে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নাম দুর্গাচরণ নাগ।

'নিজেকে এত দীনহীন ভাবেন কেন?' নিরঞ্জনানন্দ স্বামী বললে, 'দীনহীন ভাবলে দীনহীনই হয়ে যেতে হয়।'

'যে সত্যি দীনহীন, সে আর দীনহীন হবে কী!' বললে নাগমশাই, 'কীট

যদি নিজেকে কীট ভাবে তবে সত্যের অমর্যাদা হয় না। তেমনি আমি যখন নিজেকে ক্ষুদ্র বলি সত্যের অপলাপ করি না। তাই দোষস্পর্শও হয় না।'

এর পর কে আর কী বলবে ?

গিরিশ তাই বললে, 'মহামায়া দুজনকে বাঁধতে পারল না, এক নরেনকে আরেক নাগমশাইকে। নরেনকে যত বাঁধে সে তত বড় হয়—দড়িতে আর কুলোয় না। আর নাগমশাইকে যত বাঁধে সে তত ছোট হয়—দড়িতে গিঁট পড়ে না। একজন বেরিয়ে গেল, আরেকজন গলে গেল।'

নাগমশাইকে একখানা কম্বল দিয়ে গিরিশ বিপদে পড়ল। কি শীত কি গ্রীষ্ম, নাগমশাই সেই কম্বল গায়ে না দিয়ে পুঁটলি বেঁধে মাথায় করে বয়ে বেড়াতে লাগল। এটা কী—কেউ জিজ্ঞেস করলে নাগমশাই বলে : 'এ কম্বল আমাকে গিরিশবাবু দিয়েছেন, এ কম্বল কি আমি গায়ে দিতে পারি ? তাই একে আমি মাথায় করে রেখেছি।'

যাকে দেখে তাকেই প্রণাম করে। বলে : 'আমি শুদ্দুর-ক্ষুদ্দুর, আমি কি জানি, আপনারা আমাকে পদধূলি দিয়ে পবিত্র করতে এসেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম।'

গিরিশেরও এই প্রণাম-ভাব।

বললে, 'রাম-অবতারে ধনুর্বাণে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ-অবতারে জগৎ-জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, এবার রামকৃষ্ণ-অবতারে জগৎ-জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।'

শেষ 'বলিদান' করে এসে গিরিশ অসুখে পড়ল। সেই অসুখ আর সারে না। প্রথমে হোমিওপ্যাথি হল, শেষে কবিরাজি। কবিরাজিতে একটু সুরাহা হল বোধ হয়। কবিরাজ বললে, 'আপনি ভালো হয়ে উঠলে প্রত্যহ আপনাকে গঙ্গাস্নান অভ্যেস করাব।'

আর গঙ্গাস্নান ! মণিলাল মুখুজ্জের ছেলে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। ভাবতে-ভাবতে রাত্রে গিরিশের শ্বাসরোধ—বাতাসের জন্যে ওর প্রাণ না-জানি কত হাঁপিয়ে উঠেছিল !

এদিকে মোহনবাগান আই-এফ-এ শিল্ড্ পেয়েছে, তাতে কী আনন্দ। বলছে উদ্বেল কণ্ঠে, 'বাঙালি দশ বছর এগিয়ে গেল।'

ক্রমে ক্রমে শীত এসে পড়ল। সুরু হল ধোঁয়ার উৎপাত।

'কোথাও বাইরে যান না।' কেউ কেউ পরামর্শ দিল।

'বড় সাধ বাইরে যাবার, কিন্তু হাঁপানিই বুকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে।'

'ঠাকুরকে বলুন না ভালো করে দিতে।'

'কল্পতরুতলে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি', বললে গিরিশ, 'আমি কি তাঁকে ডেকে এ রোগ থেকেও মুক্ত হতে পারি না ? পঞ্চবটীতে গড়াগড়ি দিয়ে এস এক্ষুনি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার কি প্রার্থনা করবার উপায় আছে ? আমার যে তাঁকে বকলমা দেওয়া।'

মাস্টারমশাই এসেছে দেখা করতে।

একবার বুঝি নৈরাশ্য এসেছিল গিরিশের মনে। ভেবেছিল, এর পরে আমার কী হবে? নিজেরই গানের কলি মনে পড়ল:

'কাল কি হবে আজ ভেবে কি হবে,
ভেবে ভেবে ভবের খেলা বুঝতে পারে কে কবে?'

মাস্টারমশাইকে দেখতেই বলে উঠল: 'ভাই, ঘা কতক জুতো লাগিয়ে দিতে পারো আমাকে?'

'ও কথা কেন বলছেন?' মাস্টারমশাই স্তম্ভিত হল।

'আমার ঠাকুর রয়েছেন, তবু কিনা আমি ভাবছি আমার কী হবে।'

থিয়েটারের অভিনেত্রীরাও কেউ কেউ এসেছে দেখতে।

নরীসুন্দরী বলছে, 'আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমাকে বলেছিল, পুণ্যের ছাপমারা স্কুলে যখন তোর জন্ম নয় তখন তুই চিরদিন পাপই করতে থাক আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করতে থাকি। কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়েও চৈতন্যলীলার নিতাই-এর, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলিয়েছিলেন।'

অভিনেত্রী বসন্তকুমারীরও সেই কথা: 'তাঁর চরণতলে বসে আমরা শুধু অভিনয়ই শিক্ষা করিনি—সেই মহাপুরুষ গিরিশবাবু এই দুঃখিনীদের প্রাণস্পর্শ করেছিলেন, কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখে আদরে যত্নে আশ্বাসে এ জ্বালাময় জীবনে শান্তিজল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

কে না জানে অভিনেতার জীবন কী কণ্টকর। 'রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ।' কে না জানে 'দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।' তবু বহু উচ্চাশা নিয়ে রঙ্গভূমিকে ভালোবেসেছিল গিরিশ। 'রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি-রাশি, আশার নেশায় করি জীবনযাপন।' তবু অভিনয় লোকে ভালোবাসলেও অভিনেতাকে কেন নিন্দা করে?

গিরিশেরই নিজের আক্ষেপ:

'লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদন হায় পরে কি বুঝিবে তায়
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কয়জন॥'

'বখাটে নট আর অর্থাটি নটীদের দিয়ে দেশে ধর্মপ্রচার হল। ছি ছি। একথা মনে এলেও স্বীকার করতে নেই, তাতে পাপ আছে।' অমৃত বোসের কথাগুলি আবার মনে করো: 'মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে জঘন্য বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন করতে শুনেই ধর্মবিপ্লবকারী বীরের দল অন্তরে কম্পিত হল আর ধর্মপ্রাণ নিন্দিত হিন্দু জাগ্রত হয়ে ব্রজরাজ আর নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করতে আরম্ভ করল। নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে

সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। গীতা আর চৈতন্যচরিতামৃতের নানা সংস্করণে দেশ ছেয়ে গেল। বিলেতফেরত বাঙালি সন্তানও লজ্জিত না হয়ে সগর্বে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সচেষ্ট হল।'

আর বিপিন পাল তো অভিভূত। বলছে: 'আমরা তখন কলেজের ছাত্র, কলকাতার হালফ্যাশানের বাবু—র‍্যাংকিনের বাড়ির ডবল-ব্রেস্ট সার্ট গায়ে, তার উপরে পাকানো চাদর শক্ত করে বাঁধা, হাতে ছড়ি। আমরা চৈতন্য-লীলার অভিনয় দেখতে স্টার থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করেছি। প্রথম কয়েকটি দৃশ্যের পর যখন শিঙা আর খোল-করতাল নিয়ে স্টেজের উপর হরি-সংকীর্তনের দল উপস্থিত হল তখন মনে করলাম—এবার উঠতে হল। কিন্তু নিতাই আর নিমাই-এর গান শুনে এমন অভিভূত হলাম যে আর ওঠা হল না। এদিকে বুকের চাদরের বাঁধন খুলে গেছে। চোখ সজল, শেষ অবধি বসে রইলাম। ফেরবার সময় গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।'

আর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ তো দর্শকের আসন থেকে উঠে ভাবাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন।

ভক্তিরসের তুফান তুলে দিল গিরিশ। ভগবান শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। নাস্তিকের হৃদয়েও জাগল ভগবদবিশ্বাস।

রঙ্গালয় গিরিশের গুণে জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পরিণত হল।

গিরিশ অমৃতলালের 'সাথি, মিত্র, গুরু', শুধু নাট্যজীবনে নয়, আধ্যাত্ম-জীবনে। 'রামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে করে দিল স্থান।'

সেবার অধর সেনের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। গিরিশও গিয়েছে।

অধর বললে, 'অনেকদিন আসেননি, ঘর অন্ধকার হয়ে ছিল। আজ দেখুন ঘরের কেমন শোভা হয়েছে। কেমন সুগন্ধ বেরিয়েছে। আমি আজ ঈশ্বরকে খুব ডেকেছিলাম। এমন কী, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল!'

বল কী গো!' ঠাকুর সস্নেহে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

সেইখানেই বঙ্কিমের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা—প্রথম আর শেষ। অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাই তার সহকর্মীদেরও নিমন্ত্রণ করে এনেছে। এসেছে আরো অনেক নতুন লোক। বেশ একটা উৎসব-সভা বসে গিয়েছে।

বঙ্কিমের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে অধর। বললে, 'মশায়, ইনি একজন খুব বড় পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র।'

'বঙ্কিম!' ঠাকুর হাসলেন: 'তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'

বঙ্কিম সহাস্যে উত্তর দিল: 'আর মশায়, জুতোর চোটে, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা!'

'না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'তুমিও তেমনি প্রেমে বঙ্কিম!'

কিন্তু গিরিশ এসেছিল না? সে গেল কোথায়? সে পাশের ঘরে নিভৃতে

বসে মদ খাচ্ছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, টেবিলের উপর থেকে মদের বোতল পড়ে গেল মাটিতে। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সভাস্থ লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'ভগবৎ প্রসঙ্গ ছেড়ে ডি-গুপ্তের বোতল ভাঙায় কেন তোমরা উতলা হচ্ছ?'

আশ্চর্য মদ কোথায়, সকলে ডি-গুপ্ত ওষুধেরই গন্ধ পেল! ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করলেন ঠাকুর। গিরিশকে কেউ আর দোষী করতে পারল না।

সভাশেষে বাড়ি ফিরবে বঙ্কিম, ঠাকুরকে প্রণাম করল। বললে, 'একটি প্রার্থনা আছে, যদি অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন—'

'তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে। সেখানেও হরিনাম হয়।''

'কী রকম হরিনাম গো।' ঠাকুর পরিহাসে সরস হয়ে উঠলেন: 'তবে একটা গল্প শোনো। কণ্ঠিমালা তেলক ছাপা এক স্যাকরার দোকানে কটা লোক সোনা বেচতে এসেছে। ভেকধারী বৈষ্ণবের দোকান, বেচারী খুব নিশ্চিন্ত আছে। স্যাকরার কী ভক্তি, লোকটাকে দেখেই বলে উঠল, কেশব! মানে এরা সব কে? একজন দোকানের কর্মচারী বলে উঠল, গোপাল! মানে কিনা গরুর পাল, হাবাগোবা গেঁয়ো লোক। তাই শুনে স্যাকরা বললে, হরি হরি! মানে তাহলে হরণ করি? কর্মচারী বললে, হর হর। অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে হরণ করো। কী গো,' বঙ্কিমের দিকে হাসিভরা চোখে তাকালেন: 'এই রকম হরিনাম নাকি?'

কথা শুনতে শুনতে কী রকম উদাস হয়ে গিয়েছে বঙ্কিম। গায়ের চাদর ফেলেই চলে যাচ্ছে। একজন চাদরখানা কুড়িয়ে ছুটে দিয়ে এল তাকে। বঙ্কিম যেন কী ভাবতে-ভাবতে চলেছে।

গিরিশকে বঙ্কিমের বাসায় পাঠালেন ঠাকুর। সঙ্গে মাস্টারমশাই। সেই যে বলে গিয়েছিল তার বাসায় নিয়ে যাবে, কই এল না তো। যাও তোমরা একবার খোঁজ নিয়ে এস।

কিন্তু বঙ্কিমের আর আসা হয়নি।

গিরিশের প্রতিও বঙ্কিমের অটুট শ্রদ্ধা। বঙ্কিমের কত উপন্যাস গিরিশের কলমে নাটকায়িত হয়েছে। গিরিশকে বঙ্কিম লিখেছে: 'আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার যত্নে আমার রচনা আশাতীত সফলতা লাভ করিবে ইহা আমি খুব ভরসা করি।'

'আগে আমি আপনার উপর বিরূপ ছিলাম কিন্তু আপনার ম্যাকবেথ দেখে ভারি খুশি হয়েছি।' একজন এসে বললে গিরিশকে।

'সেকালের রাজারা রুষ্ট হলে শূলে দিতেন আর তুষ্টি হলে জায়গির দিতেন।' বললে গিরিশ, 'তা আপনি যখন তার কিছুই করেননি তখন আপনার রুষ্টি-তুষ্টি একই কথা।'

শুধু ম্যাকবেথ নয় শেকসপিয়রের আরো অনেক নাটকের স্থানবিশেষ গিরিশের

মুখস্থ। বায়রনেরও অনেক জায়গা। শুধু আবৃত্তি নয়, ব্যাখ্যাতেও তার অসীম নৈপুণ্য। বলছে গিরিশ, 'আমার অবস্থা হয়েছে কী জানো? প্রকাণ্ড বড় মাথা, একটুখানি শরীর। অর্থাৎ জিনিসটা বোঝবার শক্তি খুব আছে কিন্তু সেইটে উপলব্ধি করে জীবনে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা নেই। এই জন্যেই দুঃখটা বেশি যে বুঝতে পারলাম, করতে পারলাম না।'

পরক্ষণেই আবার বলছে: 'করতে পারি আর না পারি, বুঝতে পারি আর না পারি, তাঁকে ধরে পড়ে আছি, আমার আর কোনো ভাবনা চিন্তার আবশ্যক নেই। তিনিই আমার সব, আমার সব তিনিই করে নেবেন।'

রাম দত্ত 'তত্ত্বমঞ্জরী' লিখেছে। শুনে ঠাকুর বললেন, তা তুমি তো এত লিখেছ কিন্তু তার কী করলে? যে লোক শুদ্ধাচারে থাকে, হবিষ্যি করে, জলটুকুও ছেঁকে খায় অথচ ভগবানে ভক্তি নেই, সে বড়, না যে আচার-বিচার মানে না, ভগবৎ প্রসঙ্গে অশ্রুপাত করে সে বড়?'

গিরিশ কি শুধু বইই লিখেছে না কি প্রেমাশ্রুতে সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়েছে!

'এ আবার কাকে নিয়ে এল?' এক আগন্তুককে দেখে বৈকুণ্ঠ সান্যালকে বললেন ঠাকুর, 'এক সের দুধে এক সের জল থাকলে মারতে পারি কিন্তু দশ সের জল থাকলে মারতে হাল্লাক হয়ে যাব।'

গিরিশের ক সের জল? না কি যা জল সবটাই অশ্রু?

কথায়-কথায় ছোট ভাই অতুল ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে ফেলেছে।

গিরিশ তখুনি আগুন। বললে, 'আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। এখুনি বাড়ি ভাগ করে পাঁচিল তুলে নাও।'

মর্মান্তিক দুঃখে ম্লান হয়ে গেল গিরিশ। বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

বৈঠকখানায় একা বসে আছে অতুল, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল ঠাকুর দাঁড়িয়ে।

এ কী আপনি?

'গিরিশের জন্যে এসেছি। বাড়ি নেই, তাই না? তুমি তো বেশ লোক গো!' ঠাকুর অনুযোগ করে উঠলেন: 'অমনি করে বুঝি কেউ বলে!'

অতুল ঠাকুরের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিল। ভক্তের মনের বেদনা ঠাকুর ঠিক টের পেয়েছেন। শুধু গিরিশের নয়, অতুলেরও মনের বেদনা। অপ্রিয় কথাটা বলার পর থেকেই অতুলেরও দুরন্ত মর্মদাহ।

নেশা কাটিয়ে দাও, নেশা কাটিয়ে দাও। অন্তিমে গিরিশের শুধু এই আকুতি।

স্বজনে-পরিজনে গিরিশের তো কত বড় সংসার, কামনার শেকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু সুরেন মিত্তির তো নিঃসন্তান। ঝাড়া-হাত-পা হয়েও তার শান্তি নেই, কোত্থেকে একটা ভাইঝি জুটিয়ে এনেছে। এখন তার মোহেই বিভোর। ঠাকুর গান করছেন: 'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।

বিধি বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে।'

সুরেনের মুখোমুখি হলেন। বললেন, আঁটকুড়ো হলি, বেল হল। কোথায় এখন ভগবানে মন দিবি, তা নয়, বেড়াল কুকুর টিয়ে পাখি পুষে তার জন্যে মশগুল। মোটেই ওকে মেয়ে ভাববি নে, ভগবতীর মূর্তি ভাববি, মা-জননী আর ভগবতী বলে সেবা করবি—কল্যাণ হবে।'

কিন্তু গিরিশের ভগবতী কই ? শুধু দয়া দিয়ে কে তার জীবন ধুয়ে দেবে ?

কিন্তু আমি মা-জননীকে পুজো করেছি। প্রণাম করেছি।

আর প্রণামের জন্যেই পুজো। পুজোর জন্যেই প্রণাম।

শিবানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পুজো করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, জ্যান্ত দুর্গার পুজো দেখাব তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁক ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। তোমরা জোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পুজো খুব করেছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ। দাদা, ঐ যে বলছি ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।'

'এই মাতৃভাব—এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এই শেষ কথা।'

বৈঠকখানায় দেবেন মজুমদারকে বসিয়ে ঠাকুর যদু মল্লিকের অন্দরমহলে ঢুকেছেন, শিগগির আর ফেরবার নাম নেই। মেয়েমহলে যে খুব প্রতিপত্তি ! দেবেনের কী রকম সন্দেহ হল। সমস্ত ভ্রম নিরসন করার জন্যে যিনি এসেছেন তিনি আশ্রিতকে রাখতে পারেন না সংশয়ে। তাই অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন দেবেনকে। হ্যাঁ, দেখে যাও নিজের চোখে। দেবেন দেখল যদু মল্লিকের মা ঠাকুরকে নিজহাতে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে আর সজল চোখে বলছে, 'চৈতন্যামৃতে শ্রীচৈতন্যের লীলা পড়েছি বটে, সে কোন কালের কথা, কিন্তু আজ বাবা মূর্তিমান চৈতন্য তোমাকে খাইয়ে আমার জন্ম সার্থক হল।'

দেবেন হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করিনে।'

গিরিশ ক্রমশই শান্ত ভাব ধরছে। ঠাকুর বললেন, 'তোমার এ ভাব বেশ ভালো—শান্ত ভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা, ওকে শান্ত করে দাও, যা-তা আমায় না বলে !'

'কিন্তু আমার এ রশুনগোলা বাটির গন্ধ কি যাবে ?' আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'যাবে। রশুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নতুন হাঁড়ি হয়ে যায়। ভক্তি লাভ করে কর্ম করলে কোনো দোষ নেই। দুর্গাচরণ ডাক্তার এত

মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত কিন্তু কাজের বেলায় ঠিক—চিকিৎসা করবার সময় কোনো ভুল হবে না।'

'আপনার কৃপা হলেই সব হয়।' গিরিশ বললে, 'আমি কি ছিলাম, কী হয়েছি!'

'ওগো তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে।' বললেন ঠাকুর, 'সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভালো হয়ে এল তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ বেটে খেয়ো। তারপর রোগ ভালো হল। তা মরিচ দিয়ে ওষুধ খেয়ে ভালো হল, না, আপনি ভালো হল, কে বলবে?'

সব মনে পড়ছে। সেই যে ঠাকুর গিরিশের গায়ে হাত দিয়ে ভাবোল্লাসে গান গেয়েছিলেন সেই গান :

'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি ॥'

বাড়ির দোতলার বৈঠকখানায়ই গিরিশের শয্যা, যেহেতু এই ঘরেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ। এই ঘরই গিরিশের গয়া-গঙ্গা-বারাণসী।

'তুমি কি কোথাও বেরুবে?' অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করল গিরিশ। পরে বলল, 'আজ কোথাও বেরিয়ো না।

জ্বর বেড়েছে। তারই জন্যে অসুস্থতা। কিন্তু জ্বর তো ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে দেখছি। এখন যে দেখছি ছিয়ানব্বুই। গিরিশ বললে, 'কোল্যাপ্সের সময় হয়ে এল।'

টানের জন্যে শুতে পাচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু তুমি কত রাত জাগবে, বলছে অবিনাশকে তুমি ঘুমোও। তুমি পড়লে কাকে তুলব?

রাত তিনটের সময় অবিনাশ শুনল গিরিশ "রামকৃষ্ণ" নাম তিনবার উচ্চারণ করল।

অবিনাশ উঠে বসল।

'উঠলে যে?' গিরিশ জিজ্ঞেস করল।

'ঘুম হল না।' অবিনাশ মিনতির সুরে বললে, 'আপনি একটু ঘুমুন।'

'খাড়া হয়ে বসে কী করে ঘুমুই?'

বসা অবস্থায় শ্বাস চলছে। শ্বাসে শ্বাসে নাম চলছে।

মিনার্ভা থিয়েটার ফরিদপুরে বায়নায় গিয়েছে, দানিও সেই দলের মধ্যে। দানিকে টেলিগ্রাম করো। তাকে কত কথা বলবার আছে।

সকালে বললে, 'আমাকে সরিয়ে বিছানা ঝেড়ে দাও।'

বেলা নটা, বললে, 'চলো।'

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল অবিনাশ।

'গাড়ি এসেছে।'

তারপর থেকে-থেকে শুধু চলো, চলো, চলো।

'মা-ঠাকরুনের কাছে খবর পাঠাব কী ?' দেবেন জিজ্ঞেস করল।

'কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

রাত্রে দানি এসে হাজির। বাবার মুখে জল দিল।

'আমাকে কত কী বলবে বলেছিল।' দানি কেঁদে উঠল।

আর কিছু বলাবলি নেই। এখন শুধু চলা। এখন শুধু চলা। এখন শুধু 'নেশা কাটিয়ে দাও।' এখন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ।

রাত্রি বারোটা থেকে সারদানন্দ স্বামী কীর্তন আরম্ভ করল। 'রামকৃষ্ণ হরিবোল।' একটা কুড়ি মিনিটে পড়ল শেষ নিঃশ্বাস। ১৩১৮ সালের পঁচিশে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

মা বলতেন, 'আগে ছিল রাহুখেগো চাঁদ, ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছে ষোল-কলায় পরিপূর্ণ। ভাবনা কিসের ? ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন।'

আর ঠাকুর বলছেন, 'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল, বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই। বিশ্বাস করো, নির্ভর করো, তা হলে নিজের কিছু করতে হবে না। যার ঠিক বোধ হয়েছে ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা, তার আর বেতালে পা পড়ে না। আমি ওকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলুম ও আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেলেছে!'

না, ভাবনা কিসের ? শুধু বিশ্বাস আর ভক্তি। ভক্তি আর বিশ্বাস।



অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী

ও

গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

ইতিপূর্বে রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড হতে অচিন্ত্যকুমার-রচিত জীবনী-সাহিত্য সংযোজিত করা শুরু হয়েছে। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' দিয়ে এই সংযোজনের শুভারম্ভ। তারপর, রামকৃষ্ণ-শিষ্য এবং ভক্তদের যে সকল জীবনী তিনি প্রণয়ন করেছেন, সেই গ্রন্থসকল ক্রমান্বয়ে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই বিষয়ে রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ড দুটির অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ ও তথ্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

পঞ্চম খণ্ড : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (প্রথম দুই খণ্ড)
: 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি'
: তথ্যপঞ্জী—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পশ্চাৎপট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত (আংশিক)। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি চরিতামৃত (সম্পূর্ণ)। গ্রন্থ-পরিচয়।

ষষ্ঠ খণ্ড : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
: কবি শ্রীরামকৃষ্ণ
: সংকলন ও তথ্যপঞ্জী—শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী (দেড়-শতাধিক)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত (সম্পূর্ণ)। তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয়।

বর্তমান সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : 'ভক্ত বিবেকানন্দ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড), এবং 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র'। 'ভক্ত বিবেকানন্দের' মতো পৃথিবীব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য ভক্তজন রয়েছেন। তাঁর বিষয়ে সেই অসংখ্য কিছু ভক্তজনের স্মৃতিচারণ সংকলন অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' পরেই অচিন্ত্যকুমারের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দের' স্থান। এই গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। স্থানাভাববশতঃ রচনাবলীর এই খণ্ডে উক্ত গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড সংযোজিত হলো। অন্য দুটি খণ্ড রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং সেই সংগে উক্ত গ্রন্থের তথ্যপঞ্জীও সংযোজিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অগ্রণী। তিনিই একমাত্র গৃহী-ভক্ত যাঁকে ঠাকুর গেরুয়া-বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেছিলেন। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাই অচিন্ত্যকুমারের অন্যতম প্রধান জীবনী-গ্রন্থ 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' সংযোজিত হলো। অচিন্ত্যকুমারের জীবনী-সাহিত্য কথকতা-রূপে রচিত। ধারাবাহিক জীবনের ইতিহাস তার থেকে সংকলন করা সহজসাধ্য নয়। সেইজন্য, পরিপূরক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হলো।

গিরিশচরিত

কলকাতা শহরের উত্তরে বাগবাজারপল্লীর বোসপাড়া লেনে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন গিরিশচন্দ্রের জন্ম। পিতা নীলকমল ও মাতা রাইমণি। নীলকমল অস্‌টেণ্ড ব্যাণ্ড হিলজার সাহেবের অফিসে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। (বর্তমানে ঐ অফিসের নাম হিলজার কোম্পানী)। কথিত আছে, হিসাবরক্ষার আধুনিক ডাবল্‌-এন্‌ট্রি পদ্ধতি নাকি তিনিই প্রথম এতদঞ্চলে প্রবর্তিত করেন। তাঁর সাতটি কন্যা এবং পাঁচটি পুত্রসন্তান। প্রথমে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, নাম কৃষ্ণকিশোরী। তারপরেই প্রথম পুত্র নিত্যগোপাল। তারপরে পর পর পাঁচটি কন্যা—কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণভামিনী, দক্ষিণাকালী, কৃষ্ণরঙ্গিণী ও প্রসন্নকালী। তারপরে চারটি পুত্র—গিরিশচন্দ্র, কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ এবং ক্ষীরোদচন্দ্র। সর্বশেষে একটি কন্যা।

গিরিশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হবার পরেই মাতার কঠিন অসুখ হয়। বাড়ির বান্দিনী ঝি-এর উপরে শিশুর পালনের ভার পড়ে। নিজের স্তন্যপান করিয়ে সেই বান্দিনীই শিশুকে রক্ষা করে। উপর্যুপরি কয়েকটি কন্যার পরে অষ্টম গর্ভে গিরিশচন্দ্রের জন্ম বলে তিনি পিতার অত্যন্ত আদরের পুত্র ছিলেন। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন অগ্রজ নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়। তার এক বছরের মধ্যেই মাতৃবিয়োগ। রাইমণি তাঁর শেষ গর্ভের মৃতকন্যাটি প্রসব করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন পল্লীস্থ পাঠশালায়, তারপরে তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের (বর্তমানে উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোডের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) পাঠশালা বিভাগে ভর্তি হলেন। এই পাঠশালা বিভাগের শেষ পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'প্রাইজ' পেলেন ; ভবিষ্যতে প্রখ্যাত খ্রীস্টান অধ্যাপক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন গিরিশচন্দ্রের সহপাঠী। উপরোক্ত স্কুলে দু'বছর পড়বার পরে তাঁকে মধ্য কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই হেয়ার স্কুলে পড়বার সময়েই গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতার মৃত্যু হয়।

দুঃসহ পুত্রশোকের পরে নিদারুণ পত্নীশোকে ক্রমশঃ নীলকমলবাবুর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। পুরাতন আমাশয় রোগ হতে তিনি আর মুক্তি পেলেন না। ৫২ বৎসর বয়সে ১৮৫৮ সনে তিনি পরলোকগমন করেন। তখন গিরিশের বয়স মাত্র চৌদ্দ। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণকিশোরী অল্পবয়সে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে এসেই বাস করছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে নাবালক পুত্রই হলেন সংসারের কর্তা, এবং দিদি কৃষ্ণকিশোরী অভিভাবিকা। পিতার মৃত্যুর সময়ে গিরিশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। হেয়ার স্কুলে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্কুল ইন্‌সপেক্টার বেণীমাধব দে। দুঃখের বিষয় পিতার মৃত্যুর পরে গিরিশচন্দ্র স্কুলের পড়াশুনো ছেড়ে দিলেন।

১৮৫৮ সন ছিল গিরিশচন্দ্রের জীবনে সত্যই দুর্বৎসর। একদিকে সাংসারিক দুর্যোগ এবং অন্যদিকে দেশে তখন সিপাহী-বিদ্রোহ। নাবালক গিরিশচন্দ্রের মাথার উপরে কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিল না। একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ ব্যক্তির কন্যার সংগে গিরিশের বিবাহ দিতে পারলে সর্বদিক দিয়েই ভালো হয় ভেবে অভিভাবিকা দিদি অ্যাটকিন্স টিলটন্ কোম্পানীর হিসাবরক্ষক শ্যামপুকুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সংগে ১৮৫৯ সনে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে বাল্যবিবাহ তেমন দোষণীয় ছিল না।

যাহা হোক ১৮৬০ সনে তিনি পুনরায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ তিনি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। পুনরায় ১৮৬২ সনে পাইকপাড়া গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হতে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেন। কিন্তু নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ায় তিনি ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন নি।

স্কুলের পাঠ ছেড়ে দিলেও গিরিশচন্দ্র প্রাচীন কবিদের কাব্যপাঠে বাঙলা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে কবিতা লিখতে শুরু করেন। এখনও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহের পরে যৌতুকের টাকায় তিনি বেশ কিছু ইংরাজী সাহিত্যের বই কিনে পড়াশুনোয় গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। ঐ পড়াশুনো করাই তখন তাঁর দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান হলো। এমনকি কিছু ইংরাজী কবিতার বাঙলা অনুবাদ কবিতাতেই করলেন।

মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসুর প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নবীনকৃষ্ণ কলকাতা একাডেমি হতে সগৌরবে পাশ করে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানের শেষ পরীক্ষায় সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি দশখানি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডাক্তারী পেশায় প্রতিপত্তিলাভ করলেও তিনি ঐ পেশা কিছুকাল পরে ত্যাগ করেন। পরে তিনি গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার পদে নিয়োজিত হয়ে বাঁকীপুরে চলে যান।

গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে মাতুলালয়ে যেতেন। সেখানে নবীনকৃষ্ণের সংগে নানা বিষয়ে তাঁর যে শুধু তর্ক-বিতর্কই হয় তা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে নানা পাঠও হতো। এইভাবেই তিনি ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠ করে সেই সকল বিষয়ের গুহ্যতত্ত্ব আয়ত্ত করেন। তাঁর অধ্যয়ন-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র 'এসিয়াটিক সোসাইটির' সদস্য হলেন। উক্ত সোসাইটির লাইব্রেরীই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপকরণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

উপরোক্ত ঐ সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হলেও মাথার উপরে অভিভাবক না থাকায় গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে বিভিন্ন দোষ সমপরিমাণে দেখা দিল। পানদোষের সঙ্গে দেখা দিল স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও হঠকারিতা। পাড়ায় একটি বখাটে দলের সৃষ্টি হল, গিরিশচন্দ্র তাদের নেতা। কখনও তুবড়িওয়ালা ও সাপুড়েদের সঙ্গে বাণ খেলা, আবার কখনও অত্যাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসীদের ধরে পিটানো চলল। আবার দেখা গেল পীড়িত ব্যক্তির সেবা, মৃতদের সৎকার। গরিবদের ঔষধ-পথ্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতেও দেখা গেল গিরিশচন্দ্রকে।

বেকার জামাতার এইপ্রকার ভাব-গতিক দেখে শ্বশুর নবীনবাবু তাঁকে অ্যাট্‌কিন্স টিল্‌টন্‌ কোম্পানীতে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। নবীনচন্দ্রের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে অচিরেই গিরিশচন্দ্র একজন সুদক্ষ হিসাবরক্ষক হয়ে উঠলেন এবং চাকরিতে সুনামও অর্জন করলেন।

রঙ্গ-নাট্যশালার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সেই নাট্যশালার প্রারম্ভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে চয়ন করা বোধ হয় বাহুল্য হবে না।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হেরাসিম্‌ লেবেডেফ নামে একজন রাশিয়ানিবাসী কলকাতায় বাস করতেন। গোলোকনাথ দাস নামক এক বাঙালীর কাছে তিনি বাংলা ভাষাও শেখেন। থিয়েটার করা তাঁর সখ। The Disguise এবং Love is the Best Doctor নামে দু'খানি ইংরাজি নাটক তিনি অনুবাদ করেন। গোলোকবাবুর সাহায্যে তিনি বাঙালী অভিনেতা, অভিনেত্রী সংগ্রহ করেন। ১৭৯৫/৯৬ খৃষ্টাব্দে চিনাবাজারের মাঝে ২৫নং ডোমতলায় তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। দর্শকদের নিকট টিকিট বিক্রী করে তিনি সেখানে দু'রাত্রি The Disguise নাটকটির অভিনয় করান। একেই বলা যেতে পারে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাচীনতম ইতিহাস।

যাহা হোক, ইংরাজী থিয়েটার দেখেই বাঙালীরা প্রথমে থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হন, সন্দেহ নেই। তৎকালে ইংরেজগণ প্রথমে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' স্থাপন করেন। তৎপরে 'সাঁ-সুছি' (Sans Soucci)। এই সকল রঙ্গালয়ের দর্শকগণ সাধারণতঃ ইংরেজ। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো দু'একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীও ঐ ইংরাজী থিয়েটার দেখতে যেতেন।

এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়। সেখানে আধুনিক নাট্যমঞ্চের মতো অঙ্কিত-নানা দৃশ্যাবলী ব্যবহার না করে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যগুলি বাড়ির আঙিনার নানা অংশে সজ্জিত করে অভিনয় করা হয়েছিল। দৃশ্যপরিবর্তনের সময়ে দর্শকগণকে স্থানপরিবর্তন করে বসতে হতো।

১৮৩২ সনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক উইলসন সাহেবকে দিয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংস্কৃত নাটক 'উত্তররামচরিতের' ইংরেজী অনুবাদ করান। উইলসনের

শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ প্রসন্নকুমারের বাগান-বাড়িতে ঐ নাটকের অভিনয় করে।

ক্রমে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ঐ অভিনয়স্পৃহা সংক্রামিত হয়। কলকাতায় তখন হিন্দু কলেজ এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিখ্যাত বিদ্যালয়। ইংরেজ কাপ্তান রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের, এবং ফরাসী হারমান্ জেফ্রয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর তখন প্রধান শিক্ষক। উঁহারা উভয়েই নাট্যবিদ ছিলেন। সেমিনারীর ছাত্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করে এবং সেই আদর্শে নানাস্থানে সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনীতও হয়। তখন অভিনয় উপযোগী বাংলা-নাটকও ছিল না। 'বিল্বমঙ্গল' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' নামক দু-খানি তথাকথিত বাঙলা নাটকে আবার দৃশ্যপটের বিভাগ বা প্রবেশ-প্রস্থান লিখিত ছিল না। তাই কলকাতার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নিজ-নিজ বাড়িতে ইংরাজী নাটকেরই অভিনয় করাতে লাগলেন।

তারপরেই শুভলগ্ন এলো রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে বাংলা নাটকখানি নিয়ে। রঙ্গপুরের জমিদার দেশহিতৈষী কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' বিজ্ঞাপন দিলেন যে, 'গৌড়ীয় ভাষায়' ছয়মাসের মধ্যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে 'একখানি মনোহর নাটক' যিনি রচনা করে দিতে পারবেন, তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার পাবেন। তর্করত্ন মহাশয় ঐ নাটকখানি রচনা করে উক্ত পুরস্কার লাভ করেন। উক্ত নাটকটির অভিনয় জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ১৮৫৭ সনে পাথুরিয়াঘাটায় জয়রাম বসাকের বাড়িতে উক্ত নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি দর্শকদের নিকট এ রকম সমাদৃত হয় যে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজ-নিজ ভবনে ইংরাজী নাটকের পরিবর্তে বাংলা নাটক অভিনয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেন। ঐ বৎসর হতে ১৮৬৭ পর্যন্ত কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ভবনে বাংলা নাটক অভিনীত হয়—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শকুন্তলা', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী' এবং মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা', কেশবচন্দ্র সেনের 'বিধবা বিবাহ', মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বাড়িতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মালতীমাধব' ইত্যাদি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'নব-নাটক', শোভাবাজার রাজবাড়িতে 'কৃষ্ণকুমারী' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল অভিনয়ে ব্যবহৃত দৃশ্যপট ও পোষাকের জন্য বহু অর্থব্যয় হতো। অবশ্য দর্শকগণের নিকট এই সকল অভিনয় দেখবার জন্য টিকিট বিক্রয় করা হতো। তাতে কতটুকুই বা অর্থপ্রাপ্তি হতো। বস্তুতপক্ষে ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বঙ্গীয় নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

চারদিকে থিয়েটারের পশরা দেখে এবং শুনে গিরিশচন্দ্রের মনে এক থিয়েটারের দল গড়বার বাসনা জাগে। কিন্তু সেরূপ দল তৈরি করা খরচসাপেক্ষ। তখন সখের যাত্রা ও কনসার্ট দলও গড়ে উঠেছিল পাড়ায় পাড়ায়। প্রতিবেশী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও এমনি একটি কনসার্ট দল গড়ে উঠেছিল।

যাত্রায় খরচ অনেক কম। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলে বাগবাজারে এক সখের যাত্রাদল তৈরি করলেন এবং মনোনীত হলো মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক। যাত্রার উপযোগী গান দরকার। গীত-রচয়িতা অনেকের কাছে যাতায়াত করা হলো, কিন্তু গান আর পাওয়া যায় না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র নিজেই গান বাঁধলেন। সেই হলো গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার জীবনের শুরু। এই উপলক্ষে গিরিশ-রচিত প্রথম গানটি আংশিক উদ্ধৃত করা বোধ হয় বাহুল্য হবে না :

"(১) দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি
('সখি ধর ধর' সুরে গেয়)
আহা! মরি! মরি!
অনুপমা ছবি মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী!
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢল-ঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ॥" ইত্যাদি

'শর্ম্মিষ্ঠা' যাত্রার অভিনয়ে বাগবাজার দলের বেশ নাম হলো, এবং গান রচনার জন্য গিরিশচন্দ্রের কবিখ্যাতি হয়। উৎসাহ পেয়ে দলটি শেষ পর্যন্ত থিয়েটার করবে বলেই মনস্থ করে। বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অতিরিক্ত দৃশ্যপটেরও দরকার নেই এমন একটি নাটক চাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' তখন মাত্র প্রকাশিত হয়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মনোনীত হলো সেই নাটক। গিরিশচন্দ্রের উপরে পড়ল পরিচালনার ভার। গীত-রচয়িতাও তিনি। দলের নাম হলো 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'। নটকুলশেখর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীও যোগ দিলেন এই দলে। ১৮৬৯ সনের শারদীয় পূজার রাত্রে বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ঐ দলের 'সধবার একাদশী' প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন 'নিমচাঁদের' ভূমিকায়। 'কেনারাম' অর্ধেন্দুশেখর, আর অটল নগেন্দ্রনাথ।

পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র 'শাস্তি কি শান্তি' নামক নাটক দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করে লেখেন : 'যে সময় 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত ; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র "সধবার একাদশী"-তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া "সধবার একাদশী" অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

অভিনয় দর্শন করে নাট্যকার দীনবন্ধু স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে বললেন : 'নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হয়েছিল। তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনয় হত না।'

অতঃপর দীনবন্ধু এই দলকে 'লীলাবতী' অভিনয় করতে বলেন, নানা প্রচেষ্টার ভিতরে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়িতে স্থায়ী রংগমঞ্চ নির্মিত হলো। 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' নাম বদলে নূতন নামকরণ হলো 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'। 'লীলাবতী' নাটক নিয়েই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'-এর সূচনা হলো।

গিরিশচন্দ্র তাঁর চাকরিজীবনে প্রায় আগাগোড়াই হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। ১৮৬৭ সনে তিনি জন্ অ্যাটকিন্সন এণ্ড কোম্পানীর কর্মচারি ছিলেন। কর্মদক্ষতার জন্য প্রতি অফিসেই স্বল্পকালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র বড়সাহেবদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতেন। এই অফিসের বড়সাহেব অ্যাটকিন্সনেরও তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে চৌরংগীতে 'থিয়েটার রয়েল' নামে ইংরেজদের একটি থিয়েটার ছিল। আমেরিকানিবাসী মিসেস্ লুইস্ ঐ থিয়েটারের প্রধান অভিনেত্রী। পরে ঐ থিয়েটার তিনি ভাড়া নেন। সাধারণে তাই সেই থিয়েটারকে বলত 'লুইস্ থিয়েটার'। মিসেস্ লুইস অ্যাট্কিন্সন সাহেবের বান্ধবী, এবং সেই সূত্রে তাঁর অফিসে এই মহিলার গতায়াত ছিল। সেই সূত্রে তার সংগে গিরিশচন্দ্রেরও আলাপ হয়। মিসেস্ লুইসের অভিনয় দেখার সুযোগ তাঁর ঘটে। যে-কোনও নাটক অভিনয় দেখার পরে গিরিশচন্দ্র তার দোষ-গুণের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতেন। একজন সাধারণ হিসাবরক্ষকের মুখে ইংরাজী নাটকের এইপ্রকার আলোচনা শুনে মিসেস্ লুইস্ মুগ্ধ হয়ে তাঁর সংগে আরও ঘনিষ্ঠ হন। অফিসের ছুটির পর তাঁকে নিয়ে ফিটনে মিসেস্ বেড়াতে বেরুতেন, এবং নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনায় দুজনে মুখর হয়ে উঠতেন। এইভাবে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ হতে লাগল বিভিন্ন নাটকদর্শনের মাধ্যমে।

আশ্চর্যের বিষয়, এই উচ্ছৃংখল, মদ্যপ গিরিশচন্দ্রের মনে কিন্তু শান্তি ছিল না। হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধায় তিনি ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন। পুলিস বিভাগের উচ্চ কর্মচারি কালীনাথ বসু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং বন্ধু। ১৮৬৭ সনে তিনি রাণীগঞ্জে কর্মরত ছিলেন : গিরিশচন্দ্র তখন সেখানে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যান। কালীনাথ ডায়েরী লিখতেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭ সনের ডায়েরীতে দেখা যায় : 'দুপুরবেলা গিরিশ এবং আমি সোফায় বসে। নৈতিক জীবনযাপনের কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। গিরিশ স্বীকার করল যে, সে এক নিন্দনীয় জীবনযাপন করে অধঃপাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে শোধরাতে চায়। তাঁর জন্য আমি দুঃখিত, এবং তাঁর পুনরুজ্জীবন কামনা করি।

কি সাংঘাতিক কথা সে বলল ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই ! আমি তার জন্য প্রার্থনা করব : কখন তার জীবনে পরিবর্তন আসে এটা দেখবার জন্যই আজ এ কথা লিখে রাখলাম। গিরিশ অবশ্য স্বীকার করল, ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিতর শান্তি আছে। আঃ ! আমি সেই শান্তিলাভেরই সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। প্রতিদিন আমি প্রার্থনা করে যাচ্ছি।' (ইংরেজী হতে তর্জমা) ।

কালীনাথ কলকাতায় এলে গিরিশচন্দ্র কিছুদিন তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। একদা সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাও শ্রবণ করেন। পরদিন কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা নিয়ে আন্দোলন হয়। গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বিতর্ক শুনে তাঁর মনে হলো, এদের ভ্রাতৃভাব একটা কথার কথা মাত্র। সেইদিন থেকে ব্রাহ্মদিগের দল পরিত্যাগ করে আবার তিনি নাস্তিক হয়ে উঠলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর ধর্মজীবনের ইতিহাস এইরূপে বর্ণনা করেছেন : 'আমাদের পঠদ্দশায় ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ-বা ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের উপর বিশ্বাস কেহ বড় একটা করিতেন না। যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের ভিতর আবার নানান্ দলাদলি। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব ; আবার বৈষ্ণবের ভিতরও নানান্ সম্প্রদায়।...এরূপ অবস্থায় স্বধর্মে আর কোন আস্থা রহিল না। আবার দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া দেখিলাম, যাঁহারা জড়বাদী বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে চারিযুগ ধরিয়া যাহার নাম চলিয়া আসিতেছে, হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একেবারে হট্ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে-মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে-মাঝে যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা,—থাকেন যদি, কোন্ ধর্ম অবলম্বন করা উচিত ? মনে-মনে ঈশ্বরকে ডাকিতাম,—ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখাইয়া দাও। ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট্,—জল, বায়ু, আলোক—যাহা ক্ষণিক ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা ছড়ান রহিয়াছে—না চাহিলেও পাওয়া যায় ; তবে ধর্ম—যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন ? সব ঝুট্ কথা ! জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ,—তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।'

পারিবারিক জীবনে নানা আঘাত পেয়েই বোধ হয় গিরিশচন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। অল্পবয়সের মধ্যেই সংসারে অনেকগুলি মৃত্যুর ছায়া পড়ে। তেইশ বছর বয়সে গিরিশচন্দ্রের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে' মাস দুয়েকের ভিতরেই মারা যায়। ১৮৬৮ সনে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া ভগ্নী কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যু হয়। উক্ত ভগ্নীর মৃত্যুর পরে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলালের অকালমৃত্যু হয়। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ইঁহার বিবাহ হয়েছিল। যাহা হোক,

এত শোকের ভিতর সান্ত্বনা এই যে ১৮৬৮ সনের ১১ই ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। (ইনিই পরবর্তীকালের বিখ্যাত অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ওরফে দানিবাবু)। সুরেন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় চার বছর পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা কন্যা সরোজিনির জন্ম হয়।

সুরেন্দ্রনাথের জন্মের পরে কয়েকটি বছর গিরিশচন্দ্রের গৃহে কিছুটা শান্তি ছিল। সেইজন্যই তিনি ঐ সময়ে রঙ্গমঞ্চের দিকে নজর দিতে পেরেছিলেন। যাহা হোক, গিরিশচন্দ্রের বয়স যখন ত্রিশ তখন সংসারে আবার অশান্তি দেখা দিল। এই সময়ে একটি সন্তান প্রসবের পরে তাঁর স্ত্রী সূতিকা-পীড়ায় আক্রান্ত হন। শিশুটিও জীবিত ছিল না। তার কয়েকদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ একুশ বছরের ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র মাত্র এক রাত্রির অসুখেই মারা যান। ভ্রাতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর তৃতীয়া ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী-ও তখন সূতিকায় রোগশয্যায়। অফিসের অবস্থাও ভালো নয়। থিয়েটারে যাওয়া বা অভিনয় করা তিনি প্রায় বন্ধই করে দিলেন। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে রোগিণীর তত্ত্বাবধান এবং গ্রন্থপাঠে কখনো কখনো তিনি সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। এই সময়ে তিনি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ করছিলেন।

এইরূপে প্রায় এক বছর কেটে গেল, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ১২৮১ সালের ১০ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪) স্ত্রী সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিলেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে শিশু পুত্রকন্যার দায়িত্ব নিয়ে তিনি বিপত্নীক হলেন। আবার অ্যাট্‌কিন্সন কোম্পানী ফেল পড়ায় তিনি আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। এই সময়ে কবিতায় কবিতায় তাঁর মর্মবেদনা ফুটে উঠতে লাগল। তিনি লিখলেন :

'তিন-দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন,
তিন-দশ পূর্ণকায় জীবন-প্রবাহ ধায়
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

*

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়ে কায় পেয়েছিনু প্রমদায়,
মনে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন!' ('আজ')

কিছুদিন পরে মনে একটু শান্তি এলে তিনি ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানীতে চাকরি নিলেন। এই অফিসের কাজে মাল খরিদের জন্য তাঁকে ভাগলপুর এবং অন্যান্য স্থানে যেতে হতো। শিশু পুত্রকন্যাকে রেখে বাইরে যেতে হয় বলে তিনি এই চাকরি ছেড়ে দেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' তৎকালের সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ বঙ্গীয় নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং তিনি নাটকও

রচনা করেছেন। ছোটলাট টেম্পল সাহেবের স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্তনের সময়ে 'ইণ্ডিয়ান লিগ' নামে একটি সাধারণ সভা গঠিত হয়। শিশিরকুমার এই সভার সংগে যুক্ত ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্রেরও পরম সুহৃদ। শিশিরকুমারের অনুরোধে তিনি ১৮৭৬ সনে উক্ত সভার হেড্-ক্লার্ক ও কেশিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী সুরতকুমারী ছিলেন কলকাতার সিমলার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী এবং বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা। এই বিবাহের কিছুকাল পরেই তিনি ইণ্ডিয়ান লিগের কাজ ছেড়ে পার্কার কোম্পানীর অফিসে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এইসময় হতেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্রমশঃ নট এবং নাট্যকারের পরিবেশেও ফিরে গেলেন। ১৮৭৭ সনে তিনি ভুবনমোহনবাবুর নিকট হতে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' লিজ নিলেন। প্রথমে থিয়েটারে পুরুষেরা মেয়ে সেজে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করত। এখন শুরু হলো স্ত্রী-ভূমিকার জন্য মেয়েদের রংগমঞ্চে আগমন। এলো মাইকেল ও বঙ্কিমের যুগ। সংগে সংগে চলল নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকের অবদান। এই সময়ে অভিনীত বিশেষ বিশেষ নাটকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে : 'গজানন্দ', 'মেঘনাদবধ', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'আগমনী', 'অকাল বোধন'। অবশ্য এই নাটকগুলির মধ্যে 'অকাল বোধন' ব্যতীত অন্যান্য নাটক গিরিশচন্দ্রের রচিত নয়। নাট্যমঞ্চ গিরিশচন্দ্রকে এতটা প্রভাবিত করল যে, তিনি পার্কার সাহেবের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৮৮১ সন হতে পুরোপুরি রংগালয়-জগতে প্রবেশ করলেন। উপরোক্ত 'অকাল বোধন' নাটক দিয়ে তাঁর নাট্যকার জীবনের উদ্বোধন হয় বলা যেতে পারে। তারপরে লিখলেন 'মায়াতরু', 'মোহিনী-প্রতিমা', 'আলাদিন', 'আনন্দে রহো'। তারপরে গৈরিশী ছন্দে 'রাবণ বধ' রচনা করবার পরেই নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকৃত হলো। *

দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে, তাঁর নাস্তিক জীবনের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এই সময়ে তিনি নিদারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তারগণ রোগীর আশা ছেড়ে দিলেন। আত্মীয়স্বজন রুদ্ধকণ্ঠে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য। প্রায় অবচেতন রোগশয্যায় এই সময় তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখলেন, তাঁর স্বর্গগতা মাতা এসে তাঁকে মহাপ্রসাদ খাইয়ে বলে গেলেন, আর ভয় নেই। আশ্চর্য! এই অলৌকিক ঘটনার পর মুমূর্ষু রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করতে লাগল। এই সময়ের কথা গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন : 'বন্ধু-বান্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে···উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন ? তাঁহাকে ডাকিলে

---

*'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার গিরিশের নাটক ও নাট্যপ্রতিভা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বলে এখানে সে-আলোচনা সংক্ষেপ করা হলো।

কি উপায় হয় ? মনে-মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কূল দাও।...সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিল, বিপদসাগরে কূল পাইলাম।'

কিন্তু তবুও মনের সংশয় দূর হয় না। অনেকে বলে, গুরুর উপদেশ নাও। কিন্তু কে গুরু ? তিনি কেশ ও শ্মশ্রু রাখলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও শিবপূজো করে হবিষ্যান্ন ভোজন করতে লাগলেন। পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর দর্শন করলেন। শনি-মঙ্গলবারে নিয়মিত কালীঘাটে যেতে লাগলেন। তবুও অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এলো না।

মনের এই অবস্থাও কিন্তু নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অগ্রগতি রোধ করতে পারল না। চলল পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ। তাদের মধ্যে প্রধান 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ইত্যাদি।

তারপরে 'চৈতন্যলীলা'। এই 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ে তিনি শুধু দেশকে ঈশ্বরপ্রেমের বন্যায় ভাসালেন না, তাঁর ভবিষ্যৎ গুরুকে পর্যন্ত আনয়ন করতে সক্ষম হলেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত একদিন এই 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করতে এলেন। অবশ্য, ইতিপূর্বেও ঠাকুরের দর্শনলাভ তাঁর হয়েছিল। কিন্তু, গিরিশচন্দ্রের গুরুদর্শনলাভ এইবারই হলো, তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হলো। এই গুরুদর্শনলাভের বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন :

"বহুদিন পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এ দেখেছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসু-পাড়ায় ৺দীনবন্ধু বসুর বাড়িতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে যাইলাম কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথবাবুর বাড়িতে আমি যখন উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে ?' আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কিনা ? আমি কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।"

এর পরে দ্বিতীয় দর্শন পাড়ার বলরাম বসুর বাড়িতে। পরমহংসদেব সেখানে এসেছেন, বিধু কীর্তনী তাঁকে গান শোনাচ্ছে। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "আমি জানতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না···এ পরমহংসের ব্যাপার

সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃপুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছে।...এমন সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা-বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'চল আর কি দেখব ?' আমার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।"

তৃতীয় দর্শন 'ষ্টার থিয়েটারে' (৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট)। সেখানে তখন 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় হচ্ছে। গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বাইরের বাগানে বেড়াচ্ছেন। এমনি সময়ে ভক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে খবর দিল যে, পরমহংসদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন। তাঁর বসবার বন্দোবস্ত না করে দিলে তিনি টিকেট কেটেই অভিনয় দেখবেন। অবশ্য তাঁর নিজের জন্য টিকেট কাটতে হলো না, গিরিশচন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে প্রেক্ষাগৃহের একটি 'বক্সে' এনে বসিয়ে দিয়ে শরীর অসুস্থ থাকায় সেদিন বাড়ি চলে গেলেন।

তার পরবর্তী দর্শন নিজের বাড়িরই সম্মুখে। তৃতীয় দর্শনের তিনদিন পরের ঘটনা। গিরিশচন্দ্র তাঁর বাড়ির রকে বসে আছেন। পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে চলেছেন অসুস্থ বলরাম বসুর বাড়িতে। তাঁকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ নমস্কার করলেন। গিরিশচন্দ্রও প্রতিনমস্কার করলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলরাম বসুর বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছেন। একজন ভক্ত এসে তাঁকে জানাল, পরমহংসদেব তাঁকে ডাকছেন। তিনি বলরামের বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। পীড়িত বলরাম উঠে পরমহংস-দেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঠাকুর হঠাৎ কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি।' তারপর আবার বললেন, 'না না, ঢং নয়—ঢং নয়।'

এ-যেন গিরিশচন্দ্রের সংশয়েরই প্রত্যুত্তর। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পরমহংসদেব বসলেন। 'গুরু কি ?' গিরিশচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার গুরু হয়ে গেছে।' 'মন্ত্র কি ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরের নাম।'

আরও কিছু প্রশ্ন এবং উত্তরের পরে গিরিশচন্দ্র ফিরে এসে ভাবলেন : 'যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই।...পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন-দিন উঠে।'

তারপরে পুনঃ পুনঃ দর্শন। গিরিশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের একান্ত দর্শন লাভ করলেন। লিখলেন, 'তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার আছেন,

তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—আমার জন্ম সফল।' শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়লাভ করে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। নরেন্দ্রনাথ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদির সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তর্কবিতর্ক হতো। কোন কোন সময়ে ঠাকুরের সম্মুখেই এই তর্ক জমে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের (১২৯৩ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ১৫ আগস্ট, ১৮৮৬) মাস-তিনেক পূর্বে তিনি তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের মধ্যে বারজনকে গেরুয়াবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা অর্পণ করেন। তাঁদের মধ্যে এগারো-জনই পরবর্তীকালে গৃহত্যাগী-সন্ন্যাসী। একমাত্র গিরিশচন্দ্রই ঐ বারজনের মধ্যে গৃহী-শিষ্য। *

*

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার পরে গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়জগৎ ছেড়ে দিতে চাইলেন। বললেন সে কথা গুরুকে। ঠাকুর বললেন, 'না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।'

তাই গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়জগৎ পরিত্যাগ করলেন না। এই সময়ে তিনি 'চৈতন্যলীলা'-র পরে আরো কয়েকখানি ভক্তিমূলক নাটক রচনা এবং অভিনয় করেন। তাদের মধ্যে 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'প্রভাস যজ্ঞ', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ইত্যাদি প্রধান।

*

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী সুরতকুমারীর গর্ভে দুটি কন্যা এবং একটি পুত্র-সন্তান হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি শিশু অবস্থাতেই কন্যা দুটির মৃত্যু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি যাচ্ঞা করেছিলেন, তুমি আমার ছেলে হও, আমি সাধ মিটাইয়া তোমার সেবা করিব। গিরিশচন্দ্রের ধারণা, ঠাকুর ঐ পুত্ররূপেই তাঁর ঘরে এসেছেন। এই শিশুপুত্রের উপর তাই তাঁর অগাধ স্নেহ ছিল। কিন্তু এই পুত্রের জন্মের পরেই মাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসায়ও কোন ফললাভ হয় না। অবশেষে ১২৯৫ সালের ১২ই পৌষ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু নানাপ্রকার পারিবারিক শোক পাইবার জন্যই যেন গিরিশচন্দ্রের জীবন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা তিনি শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে ভুলেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। মাত্র তিন বছর বয়সে সেই পুত্রও সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেল।

উদ্ধৃতিগুলি গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব' হইতে গৃহীত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, এবং তার প্রতিফল অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে (রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন বলে এখানে পুনরায় উদ্ধৃত হলো না।

প্রথম বয়স হতেই গিরিশচন্দ্রের অঙ্ক এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার উপরে অনুরাগ ছিল। ঐ দুটি বিষয় শিক্ষাতেই গভীর নিবিষ্টতা দরকার। স্ত্রী-পুত্র ও কন্যা দুটির মৃত্যুজনিত বেদনা ভুলবার জন্য গিরিশচন্দ্র আবার বিজ্ঞানানুশীলন ও গণিতচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। এমনকি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার সভ্য হয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য উপস্থিত থাকতেন।

এইরূপে প্রায় বছরখানেক কেটে গেল। বিজ্ঞান ও গণিতচর্চার পরে অবশিষ্ট সময় তিনি পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসংগ এবং ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করতেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণ গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে তাঁকে উপদেশ দিল যে, ঠাকুরের জন্মস্থান কামার-পুকুরে গিয়ে তিনি যেন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে আসেন। গুরুভাইদের পরামর্শে তিনি একদা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সংগে শ্রীমায়ের দর্শনার্থে কামার-পুকুরে গমন করলেন।

কামারপুকুরে গিয়ে শ্রীমায়ের দর্শনলাভ করে তিনি ধন্য হয়ে গেলেন। তিনি যেন মনেপ্রাণে বুঝলেন, শ্রীমা বাস্তবিকই তাঁর মাতা! ঠাকুরের কাছে গিরিশচন্দ্র বালকের ন্যায় পিতার স্নেহলাভে ধন্য হতেন। এখানেও শ্রীমায়ের স্নেহে আপ্যায়িত হয়ে বালকের ন্যায় কয়েকমাস কাটিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন।*

*

কলকাতায় ফিরে এসে যেন তিনি নূতন কর্মোদ্যম পেলেন। পারিবারিক রোগ-শোকের জন্য নিয়মিত থিয়েটারে যেতে পারতেন না বলে পূর্বেই তাঁর ষ্টার থিয়েটারের চাকরিটি গিয়েছিল। যাহা হোক, নীলমাধববাবুর 'বীণা থিয়েটারে' তিনি বছরখানেক কাজ করেন। তারপরে পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য জনের চেষ্টায় বিডন ষ্ট্রীটে 'মিনার্ভা থিয়েটার' স্থাপিত হলো।

সুযোগ পেয়ে এবার নাটকাভিনয়ে নূতন যুগ আনবার জন্য গিরিশচন্দ্র নূতন নূতন নাটক লেখবার প্রয়াসী হলেন। প্রথমেই মহড়া চলল 'ম্যাকবেথ্'-এর। তারপরে চলল 'মুকুল-মুঞ্জরা', 'আবু হোসেন', 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'জনা' ইত্যাদি। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আর্থিক অনটনের জন্য গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার সংগে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বাধ্য হন।

পুনরায় তিনি ষ্টারে যোগ দেন। তারপর আবার 'ক্লাসিক' থিয়েটারে, তারপরে আবার মিনার্ভায় প্রত্যাবর্তন। ১৩০৩ সাল থেকে ১৩১০ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র একবার এ-থিয়েটারে, একবার ও-থিয়েটারে যোগদান করতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর রচিত নাটকসংখ্যাও অনেক ; তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'পাণ্ডবগৌরব', 'সীতারাম', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী',

* শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' গ্রন্থে (রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য) বিশদ আলোচনা করেছেন বলে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

'অভিশাপ', 'প্রফুল্ল', 'ভ্রান্তি', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' ইত্যাদি। এই মিনার্ভা থিয়েটারেই বলতে গেলে গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবনের অবসান হয়।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র দারুণ হাঁপানী রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি ১৩১৬ এবং ১৩১৭ সালের শীতকালটা কাশীধামে বাস করে বিশেষ ফললাভ করেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে আবার যে-কে-সেই।

কলকাতার ধূম্রদূষিত বায়ুতে হাঁপানী বৃদ্ধি পায় বলে বন্ধু ও সুকবি সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘুঘুডাঙ্গার বাড়িতে গিয়ে তিনি কিছুকাল বাস করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ইউনিয়ন সাহেবের ওষুধও শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যকরী হলো না। দীর্ঘদিন নানাভাবে নানা চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অবস্থার ক্রমশই অবনতি হতে থাকে।

এমনি করে শীতের দিন কেটে ১৩১৮ সালের মাঘ মাস এলো। পরমহংসদেবের নানা শিষ্যগণ গুরুভাইয়ের যথাবিহিত সেবায় লেগে যায়। ২৫শে মাঘ রাত্রি ১১টার সময়ে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তগণ ইষ্টদেবতার নামগান আরম্ভ করেন। গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্নাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই মধ্যে যখন একটু সচেতনতা ফিরে আসে তখন ক্ষীণকণ্ঠে কখনো বলে উঠেন "চলো", কখনো "নেশা কাটিয়ে দাও", কখনও "রামকৃষ্ণ"! অতঃপর রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময়ে এক বিচিত্র মহাপ্রাণের মহাবায়ু ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। অগণিত জনসাধারণের প্রিয় মহাকবি, নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের জীবন এইভাবে অবসান হয়।